অবিকল্পসন্ধান

বাংলা থেকে বিশ্বে

কলিম খান ■ রবি চক্রবর্তী

'আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো
তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি বাসিতে পারি যে ভালো'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অবিকল্পসন্ধান : বাংলা থেকে বিশ্বে

কলিম খান
রবি চক্রবর্তী

দিবারাত্রির কাব্য
২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২

41, Aziz Super Market
তক্ষশিলা
TAXILA
Tel: 9680158

ABIKALPASANDHAN : BANGLA THEKE BISHWE (In Quest of the Grand Design : From Bengal(i) to the World by Ravi Chakravarti & Kalim Khan.
© কলিম খান ও রবি চক্রবর্তী
❐ প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা, ২০০৮ ❐ **প্রচ্ছদ** : হিরণ্ময় ❐ **প্রকাশক** : আফিফ ফুয়াদ, 'দিবারাত্রির কাব্য', ২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২ ❐ **মুদ্রক** : গীতা প্রিন্টার্স, ৫১ এ, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ ❐ **পরিবেশক** : একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

১২৫ টাকা

যাঁদের অদৃশ্য উপস্থিতি
আমাদের সকলভাবে প্রেরণা যুগিয়েছে
এমন দুই মহাভাগ —

হুগলী জেলার কোন্নগর নিবাসী
মান্যবর রমণীকান্ত চক্রবর্তী (১৮৯০-১৯৭৬)
এবং
মেদিনীপুর জেলার মৈনান নিবাসী
মান্যবর পিজিরুদ্দিন আহম্মদ (১৯০৬-১৯৭৪)

এঁদের স্মরণে গ্রন্থটি উৎসর্গ করে আমরা কৃতার্থ বোধ করছি।

গ্রন্থকারদ্বয়

লেখকদ্বয়ের পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থ

বাংলা বানান বাংলা ভাষা (২০০৪ কলকাতা)

বাংলাভাষা: প্রাচ্যের সম্পদ ও রবীন্দ্রনাথ (২০০৬, ২য় মুদ্রণ ২০০৮, কলকাতা)

কলিম খান-এর পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থ

মৌলবিবাদ থেকে নিখিলের দর্শনে (১৯৯৫, ২য় সংস্করণ ২০০৪, কলকাতা)

দিশা থেকে বিদিশায় (১৯৯৯ কলকাতা)

ফ্রম এনলাইটেনমেন্ট টু ইমোশনাল বন্ডেজ (২০০০ কলকাতা)

পরমাভাষার সংকেত (২০০১ ঢাকা)

আত্মহত্যা থেকে গণহত্যা (২০০২ কলকাতা)

পরমাভাষার বোধন উদ্বোধন (২০০২ কলকাতা)

রবি চক্রবর্তী-র পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থ

India Rediscovered (2002)

সূচি

উপক্রম / রবি চক্রবর্তী কলিম খান ৯

অপরের সন্ধানে / কলিম খান ১১
বিদর্ভের কথা: ভারত-ইতিহাসের অমৃতকথার কণিকামাত্র / কলিম খান ৪৭
এ পাঁচিল কি দুর্লঙ্ঘ্য? এই হিন্দু-মুসলিম বিভাজন? / রবি চক্রবর্তী ৬৬
গণনেতা: দুর্বৃত্তকে পুনরায় শিবঠাকুর বানাবেন কীভাবে? / কলিম খান ৮৭
মাতৃভাষারূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে / রবি চক্রবর্তী ১০৭
বিশ্বায়নের মূল সমস্যা — দৈব না পুরুষকার? / রবি চক্রবর্তী কলিম খান ১৩৩
বিশ্বায়নে ঋষিপ্রবাহ : এবার তবে জোড়ার পালা / কলিম খান ১৪৯
উত্তরপ্রজন্মের লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষা / কলিম খান রবি চক্রবর্তী ১৬৭
বাংলাই বিশ্বকে পথ দেখাতে পারে / কলিম খান রবি চক্রবর্তী ২০৮

অতিক্রম / কলিম খান রবি চক্রবর্তী ২৪৫
পরিশিষ্ট : বৃষোৎসর্গ / কলিম খান ২৬১

উপক্রম

গ্রন্থের শুরুতে একটি ভূমিকা লিখে দেওয়া সাহিত্যজগতের একটি রীতি। সাধারণত তাতে গ্রন্থোৎপত্তির কারণ, গ্রন্থটিতে কী পাওয়া যাবে, ... ইত্যাদি বিষয়ে ইশারা দিয়ে পাঠকপাঠিকাকে স্বাগত জানানো হয়ে থাকে। আমাদের পূর্ববর্তী গ্রন্থ ছিল 'বাংলাভাষা : প্রাচ্যের সম্পদ ও রবীন্দ্রনাথ'; তাতে আমরাও এই রীতি মান্য করেছিলাম। পরে আমরা লক্ষ করি, আমাদের 'ভূমিকা' পাঠক/পাঠিকাকে বিশেষ দিকে চলার জন্য প্রভাবিত করেছে। ফলে, গ্রন্থের বিষয় বিচারের ক্ষেত্রে তাঁদের নিজস্ব বিবেচনার জায়গা কিছুটা হলেও কমেছে।

তাই, এ গ্রন্থে আমরা কোনো 'ভূমিকা' লিখছি না। আমরা চাই, পাঠক/পাঠিকা তাঁর নিজের বিচারবুদ্ধি অনুসারে এগোন; প্রবন্ধগুলি পাঠ করুন, নিজেই বিচার-বিবেচনা করুন, কী পেলেন না-পেলেন। গ্রন্থের 'ভূমিকা' তাকে কোনো বিশেষ দিকে চালিত করে ফেলুক, আমরা তা চাই না। সেকারণে গ্রন্থটির 'ভূমিকা' লেখা থেকে আমরা বিরত হলাম।

কিন্তু তার পরেও কথা থেকে যায়। সমাজেই হোক আর সাহিত্যজগতেই হোক, যে কোনো রীতির আবির্ভাব ঘটে প্রয়োজন থেকেই। পরে কোনো কারণে সেই রীতি দোষাবহ হয়ে গেলেও প্রয়োজনটি থেকেই যায়। আগে আপ্যায়ন করতাম পাদ্য-অর্ঘ্য বা জলচৌকি দিয়ে, অভ্যাগতকে চৌকিতে বসিয়ে থালার উপর পা রাখতে বলতাম, এবং সেই পা ধুইয়ে দিতাম স্বহস্তে জল দিয়ে। তোয়ালে বা গামছা দিয়ে পা মুছিয়ে তাঁকে বসতে দিতাম পরিপাটি আসনে। গ্রামের বাড়িতে অতিথি-অভ্যাগত এলে, গৃহস্থের ছেলে বা মেয়ে এসে একঘটি জল সামনে রেখে ভূমিতে গড় হয়ে প্রণাম করত। আজ এসব প্রথায় আপ্যায়ন করতে গেলে, অতিথি-অভ্যাগতই অস্বস্তিতে পড়ে আপত্তি তুলবেন। অর্থাৎ প্রথাটি সেকেলে হয়ে গেছে। কিন্তু তাই বলে আপ্যায়নের প্রয়োজন কি লুপ্ত হয়েছে বা কমে গেছে? আমাদের বিশ্বাস তা আদৌ কমেনি; লোকে সেকারণেই আপ্যায়নের নতুন নতুন উপায় বের করছে, 'আপ্যায়ন-প্রথা'র 'একালিকরণ' (update) ক'রে। বাঙালির বিয়েবাড়ি বা বউভাতে আজকাল তাই নতুন নতুন আপ্যায়ন-প্রথার সাক্ষাৎ মেলে।

এক্ষেত্রে আমরাও সেরকম একটি নতুন প্রথার আশ্রয় নিচ্ছি। আমরা এই গ্রন্থের শেষে 'অতিক্রম' নামে একটি অধ্যায় সংযোজিত করছি। তাতে পাঠক/পাঠিকার সেই চাহিদাগুলি পূর্ণ করার চেষ্টা করা হয়েছে, সাধারণত গ্রন্থের ভূমিকা যেসকল চাহিদা পূর্ণ করে থাকে। কেবল তাই নয়, এই অধ্যায়ে আরও কিছু বাড়তি বয়ান থাকছে কথোপকথন আকারে। থাকছে, গ্রন্থটির বিষয়বস্তু, তার এবম্প্রকার নামকরণের কারণ, গ্রন্থোৎপত্তির কারণ ... ইত্যাদি। গ্রন্থপাঠ শেষে পাঠক/পাঠিকা চাইলে তাঁর নিজের 'পাঠপ্রতিক্রিয়া'কে এই 'অতিক্রম' অধ্যায়ের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বিচার করে দেখে নিতে পারবেন।

১৩ জানুয়ারি, ২০০৮

রবি চক্রবর্তী কলিম খান

অপরের সন্ধানে

কলিম খান

অদৃষ্টেরে শুধালেম, চিরদিন পিছে
অমোঘ নিষ্ঠুর বলে কে মোরে ঠেলিছে?
সে কহিল, ফিরে দেখো। দেখিলাম আমি,
সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি।[১]

উত্তরাধিকারের বিন্দুতে সিন্ধুদর্শন

'রাস্তায় গাড়িঘোড়া বিশেষ ছিল না, পকেটে ট্যাক্সি ধরার মতো টাকাকড়িও ছিল না; তাই দেরি হয়ে গেল।' — এই বাক্যের মানে বুঝতে আমাদের কোনো অসুবিধে হয় না।

কিন্তু দেখুন, এই বাক্যে অন্তত দুটি এমন শব্দ রয়েছে, যা নিরর্থক, যার অস্তিত্ব কার্যক্ষেত্রে নেই; কিন্তু আমাদের ভাষায়, আমাদের কথা বলার অভ্যাসের ভিতরে, শব্দ দুটি নির্বিবাদে থেকে গেছে; যেমন 'কড়ি' ও 'ঘোড়া'। মাত্র দেড়শো বছর আগেও কড়ি ছাড়া আমাদের চলত না, আজ কড়ি নেই; একালের বহু ছেলেমেয়ে জানেই না 'কড়ি' জিনিসটি দেখতে কেমন; অথচ আমাদের ভাষাতে তার অস্তিত্ব আজও বহাল। কথাবার্তায় 'টাকাকড়ি' শব্দটি এখনও প্রায় সব বাঙালিই ব্যবহার করে থাকেন। ওদিকে, ১৯০০ সালের কলকাতায় বাঙালির প্রধান বাহন ছিল ঘোড়া; ছিল ঘোড়াগাড়ি, জুড়িগাড়ি। আজ তা সেভাবে নেই বললেই চলে। অথচ কথায় কথায় আজও আমরা বলি, 'গাড়িঘোড়া ছিল না, তাই দেরি হয়ে গেল।'

আসলে, মানুষ যে-যে যুগের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে বর্তমানে এসে পৌঁছায়, সেই সেই যুগের বহু কিছু বিলুপ্ত হয়ে গেলেও সেগুলির চিহ্ন কিন্তু এভাবেই তার ভাষায় থেকে যায়। চাইলে, অতীতের চিহ্নবাহী এরকম অজস্র শব্দ সংগ্রহ করে তালিকা বানিয়ে যে-কেউ তা দেখিয়ে দিতে পারেন।

অপরিমিত টাকার মালিককে আমরা বলি 'লোকটা টাকার কুমীর', অথবা 'লোকটা ঘোড়েল লোক'। (ঘোড়েল হল ঘড়িয়াল, এক জাতের ছোট কুমীর।) কিংবা বলা হয়, 'ও হল রাঘব বোয়াল'। শুধু তাই নয়, ধনী মানুষদের উল্লেখ করতে গিয়ে এমনও বলা হয় — 'যারা সামনে দাঁড়িয়ে ফটর ফটর করছে, ওরা তো চুনোপুঁটি, যারা গভীর জলের মাছ, রুইকাৎলা, তারা কিন্তু চুপচাপ!' আর, জ্যেষ্ঠ-ধনী যখন কনিষ্ঠ-ধনীকে গ্রাস করে ফেলে, আমরা বলি, 'বড় মাছ ছোট মাছকে এভাবেই খায়; এটাই তো মাৎস্যন্যায়!' আবার, এক ব্যক্তিমালিক যখন অন্য-ব্যক্তিমালিকের ধনসম্পত্তি দেখে সইতে পারে না, হিংসা-দ্বেষ বা ঈর্ষা করে, আমরা বলি, এটাই 'মৎসর'। এই 'মাৎসর্য' ভাল নয়। 'সংসারের পাঁকে থাকলেও পাঁকাল মাছের মতো গায়ে পাঁক লাগতে দিয়ো না'— বলতেন আমাদের পিতৃ-পিতামহেরা।

কৌতূহল হতে পারে — সত্যিই তো! আমাদের ভাষায়, ধনসম্পদের মালিকদের শনাক্ত করতে এভাবে জলজ প্রাণীদের উল্লেখ করা হয় কেন? ব্যক্তিমালিক-মানুষের সঙ্গে জলজ

প্রাণীদের কি কোনো সম্পর্ক ছিল? সে সম্পর্কের কথা কি আমরা ভুলে গেছি? অথচ দেখা যাচ্ছে, আমাদের ভাষায় এখনও তার অভ্রান্ত ছায়া থেকে গেছে![২] সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের ভাষায় উপরোক্ত শব্দগুলির প্রচলন থেকে বোঝা যায়, ধনসঞ্চয় বিষয়ে আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষদের বেশ একটি বিরাগমূলক ধারণা ছিল: এবং সেরকম বিরাগ না-থাকলে ওই শব্দগুলি ব্যবহারও করা যায় না। তাহলে কি, ধনসম্পত্তি বিষয়ে আমাদের পূর্বপুরুষেরা কোনো কারণে ওইরূপ বিরাগমূলক ধারণা অর্জন করেছিলেন? ধনসম্পত্তির প্রতি সেই বিরাগ উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা আজও কি বহন করে নিয়ে চলছি?

আমার নিবেদন এই যে — এরকম কৌতূহল যদি আপনার হয়, জানবেন তা খুবই যথার্থ। কেননা, এ-ও আমাদের এক প্রাচীন উত্তরাধিকার। আদিম যৌথসমাজের স্বাভাবিক নিয়মে পরিচালিত সেকালের 'সম্প্রদায়'[৩]-এর জনসাধারণকে তখন 'জল'ও বলা হত।[৪] সেই জলের ভিতরে যার যার কমবেশি ধনসম্পত্তি হয়েছে, তাদের সাধারণভাবে বলা হত 'মৎস্য'[৫]; যাদের সেই ব্যক্তিগত সম্পদের পরিমাণ খুবই কম তাদের বলা হত চুনোপুঁটি; যাদের যথেষ্ট সম্পত্তি তারা রুইকাৎলা। আর, অন্যদের সম্পদ হরণ করে যাদের প্রচুর সম্পদ সঞ্চিত হয়েছে, তাদের বলা হত রাঘব-বোয়াল।[৬] তবে, যাদের সম্পত্তি অন্য 'মৎস্য'দের পক্ষে রীতিমত বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল, তাদের বলা হত ঘড়িয়াল বা ঘোড়েল এবং যারা একেবারে 'কুম্ভের'[৭] বা 'নিজস্ব সম্পদাগার'-এর মালিক, তাদের বলা হত কুম্ভীর বা কুমীর। এই সেই প্রাচীন সময়, যখন আমাদের প্রাচীন যৌথসমাজে সর্বপ্রথম নগদ-নারায়ণের বা পুঁজির আবির্ভাব ঘটেছিল 'মৎস্যাবতার' রূপে। আর, সেই কাহিনী আমাদের পূর্বপুরুষেরা লিখে রেখে গেছেন মৎস্যাবতারের কাহিনীতে, 'মৎস্যপুরাণ'-এ।[৮]

তবে কিনা, সে-কাহিনী লেখা হয়েছিল ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায়[৯], আর সে-ভাষা একালের বাংলাভাষীরা গেছেন ভুলে। তাই সে-কাহিনীর কোনো কথাই আজকের বঙ্গভাষীরা জানেন না। যদিও উপরোক্ত 'টাকার কুমীর', 'ঘোড়েল', 'রাঘব-বোয়াল' প্রভৃতি শব্দের মাধ্যমে সেই প্রাচীন ঘটনাবলীর স্মৃতিচিহ্ন আজও বাঙালির ভাষায় থেকে গেছে।

আর, ভাষায় ভেসে থাকা ওই স্মৃতিচিহ্নগুলি সরোবরের জলে ভেসে থাকা পদ্মপাতার মতো, যার তলায় রয়েছে পদ্মের নাল; আর সেই নালগুলি গিয়ে ঠেকেছে জলের গভীরে পদ্মমূলে। অর্থাৎ ভাষায় ভেসে থাকা ওই সব স্মৃতিচিহ্নের সম্পর্কসূত্রটি আমাদের মনের গভীরে গিয়ে 'বদ্ধ' হয়ে রয়েছে সম্পত্তি-সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে চিরন্তন বিরাগ রূপে এক 'মূল-ধারণা'য়, যার চরিত্র ওই পদ্মমূলের বা 'গেঁড়'-এর মতন।[১০] পদ্ম-চাষিরা জানেন, পদ্মের গেঁড় পাঁকের ভিতরে সজীব থাকলে পদ্মগাছ কিছুতেই মরে না, বরং অনুকূল পরিস্থিতি পেলেই তার থেকে নাল বেরিয়ে পাতা ও ফুল হয়ে একদিন তা জলের উপরে ভেসে ওঠে।

মনে হতে পারে, প্রাচীন উত্তরাধিকারের স্মৃতিচিহ্ন যদি আমাদের ভাষায় এভাবে থেকে গিয়ে থাকে, থাক না; তাতে আমাদের তো কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। প্রথমে আমারও তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু, ওই-যে পদ্মমূলের মতো মানুষের 'বদ্ধমূল-ধারণা'! বাঙালির মনের গভীরে

যা সুপ্ত! ভাষায় প্রবাহিত শব্দ ও বাক্‌ধারার গভীরে যে-মূল এখনও রীতিমত সজীব! যার উৎসার এখনও ঘটে চলেছে আমাদের রোজকার ভাষায়! মানুষের মনের গভীরে শায়িত সেই 'বদ্ধমূল-ধারণা'গুলি যে কত শক্তিমান, মানুষের ও তার সমাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে কতখানি নির্ণায়ক ভূমিকা তারা গ্রহণ করে, তখনও আমি তা জানতাম না।

যাঁরা ইতোপূর্বে আমার লেখালিখির পরিচয় পেয়েছেন, তাঁরা জানেন — ঘটনাচক্রে আমার হাতে এসে গিয়েছিল ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি,[১১] যে-বিধি শুধুমাত্র ভাষার হাতিয়ার নয়, একটি সামগ্রিক দর্শনও বটে। তাই দিয়েই আমি রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণাদি-সহ বর্তমানের চারদিকেও ইতস্তত দেখছিলাম। এক সময় দেখি কি, একটি দুটি নয়, এরকম অজস্র 'বদ্ধমূল-ধারণা' মানুষের মনের গভীরে নিহিত থেকে তার সমাজের অগ্রগতির স্রোতধারার বিভিন্ন বিন্দুতে সক্রিয় হয়ে সেই ধারার গতিমুখ নিয়ন্ত্রণ করছে! ভাষার উত্তরাধিকারের পাশাপাশি অর্থনীতি-রাজনীতি-ইতিহাস-অধ্যাত্মধারণা — এক কথায় সমগ্র সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ওই সব 'বদ্ধমূল-ধারণা'র ভিতরে বসে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে সমাজের অগ্রগতির প্রায় সব কিছুকেই ট্রাফিক পুলিশের মতো নিয়ন্ত্রণ করছে এবং সেই অগ্রগতি কোন দিকে যাবে তা ঠিক করে দিচ্ছে! আমি বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে যাই!

পরিষ্কার দেখতে পাই, সরোবরের উপরিতলের চেহারা কেমন হবে তা নির্ধারণ করছে জলের গভীরে পাঁকের ভিতরে অবহেলায় পড়ে থাকা পদ্ম, শালুক, শ্যাওলা আর নানাবিধ জলজ উদ্ভিদের মূল বা বীজ! তাদের অঙ্কুর নাল হয়ে বেরিয়ে, পাতা হয়ে, আগাছা হয়ে, উপরে উঠে ছেয়ে ফেলছে সরোবরের জলের উপরিতল। মাঝে-মধ্যে ঝড়-ঝাপটা বা অন্য কেউ এসে সেই প্রক্রিয়াকে সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত করছে বটে, কিন্তু মহাকালের বিচারে সে খুবই 'সাময়িক-বিপর্যয়' মাত্র। জলের উপরিতলের চেহারার চিরকালীন ও প্রকৃত নির্ণায়ক জলের গভীরে অবস্থিত ওই সব জলজ উদ্ভিদের মূল!

বুঝতে পারি, একটি ভাষার সমকালীন চেহারা কেমন হবে, তা নির্ভর করে সেই ভাষা-ব্যবহারকারীদের মনের গভীরে ওই সব পরম্পরাগত 'বদ্ধমূল-ধারণা'গুলি কী অবস্থায় রয়েছে, কতখানি বিবর্তিত হয়েছে, কী পরিমাণ সজীব ও সক্রিয় রয়েছে, তার ওপর। অর্থাৎ, ভাষার চেহারা সমকালীন কবি-সাহিত্যিকদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। তাঁদের চেষ্টার শুধুমাত্র সেটুকুই টিকে থাকে, যেটুকু ওই 'বদ্ধমূল-ধারণা'র সক্রিয়তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাকি সবটাই সেই ভাষা ব্যবহারকারী সমাজটি ফেলে দেয়।

কিন্তু তখনও প্রধান অংশটিই দেখতে বাকি ছিল; সেটি চোখে পড়তেই বাক্‌রুদ্ধ হয়ে যাই। দেখি — সেই 'বদ্ধমূল-ধারণা'গুলি কেবল মানুষের ভাষার চেহারাকেই নিয়ন্ত্রণ করছে না, নিয়ন্ত্রণ করছে সমকালীন সমাজের চেহারাকেও। মানবজাতির সমগ্র সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার খণ্ড খণ্ড হয়ে, মানুষের মনে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারারূপে প্রবাহিত সেই 'বদ্ধমূল-ধারণা'গুলির ভিতরের 'ড্রাইভিং সিটে' বসে নিয়ন্ত্রণ করছে সমকালীন সমাজের উপরিতলের চেহারা, সমাজের কর্মকাণ্ডের দিগ্‌দিশা, সভ্যতার ও সমাজের অগ্রগতির

অভিমুখ! অর্থাৎ, মানুষের উত্তরাধিকার ইতিহাসের বইপত্তর বা মন্দির-মসজিদ কিংবা দু-চারটে উৎসবের বাৎসরিক পুনরাবৃত্তির মাধ্যমেই কেবল বাহিত হয় না, প্রধানত বাহিত হয় মানুষের মনের 'বদ্ধমূল-ধারণা' সমূহের ফল্গুধারার মাধ্যমে! কেবল তাই নয়, সেই 'ধারণা'গুলির অভ্যন্তরে দেখি, তাদের অধিকাংশের ভিতরে 'ক্রিয়া' রূপে এবং বাকিদের ভিতরে 'প্রতিক্রিয়া' রূপে সক্রিয় রয়েছে স্বয়ং বিশ্বপ্রকৃতির 'ইচ্ছে'! এতকাল ইয়োরোপীয় শিক্ষার ধমকানিতে শিখেছিলাম, 'এই বিশ্বপ্রকৃতির কোনো ইচ্ছে-ফিচ্ছে নেই, ওসব বাজে কথা'; আর পিতৃ-পিতামহের কাছ থেকে জেনেছিলাম — এ পরমাপ্রকৃতি প্রাণময়ী, ইচ্ছাময়ী; কিন্তু তার কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ তখনও পর্যন্ত সেভাবে আমার চোখে পড়েনি। আজ তার সাক্ষাৎ প্রমাণ পেয়ে অভিভূত হয়ে যাই এবং পিতৃপুরুষের উদ্দেশে করজোড়ে প্রণাম জানাই।

বুঝতে পারি, আমরা কোন দিকে যাব, মানুষের সমাজ সভ্যতা কোন দিকে এগিয়ে যাবে, বিশ্বব্যবস্থা কোন দিকে যাবে, তা দৃশ্যত আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে বলে মনে হয় বটে, কিন্তু তা একেবারেই ঠিক নয়। কার্যত আমাদের সেই ইচ্ছাকে বহু দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করছে অন্য এক 'অমোঘ নিষ্ঠুর' শক্তি — সমাজমনের গভীরে সক্রিয় ওইসব 'বদ্ধমূল-ধারণা'গুলি, যাদের ড্রাইভারের সিটে বসে রয়েছে মানুষের উত্তরাধিকার এবং পিছনের সিটে বসে রয়েছে স্বয়ং প্রকৃতি। লক্ষ করি, বাইরের বড় বড় রাজনৈতিক ঘটনা, যুদ্ধবিগ্রহ ও নেতানেত্রীরা একেবারেই 'নিমিত্তমাত্র'। কার্যত সেই 'বদ্ধমূল-ধারণা' চালিত বা প্রকৃতি-ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছনোর অগ্রগতিকে দ্রুত বা শ্লথ করার চেষ্টা ছাড়া, এ যাবৎ কোনো জনগোষ্ঠীর নেতানেত্রী-রাজা-মহারাজারা অধিক কিছুই করতে পারেনি। ...

বুঝতে পারি, এই বিশ্বব্যবস্থা মানুষের ইচ্ছানুসারে চলছে না, চলবে না কোনোদিনও। মানুষকে কেবল একটিই ভূমিকা দেওয়া হয়েছে, আর তা হল পরমাপ্রকৃতির ইচ্ছাকে সাধ্যমত বুঝে নিয়ে তার অনুকূলে সক্রিয় হওয়া। তাতেই মানুষের সামাজিক সুস্থিতি ও দৈহিক নিশ্চয়তা, তাতেই তার জন্য 'জীবনের সার্থকতা', তৃপ্তি শান্তি মোক্ষ অমৃত কৈবল্য ইত্যাদি উপহার বরাদ্দ করে রাখা হয়েছে। এ তাবৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বুঝে না-বুঝে মানুষ সেভাবেই সক্রিয় হয়েছে; কখনও-বা তা না-করে মানুষ স্বেচ্ছাচারী হয়েছে, বাহাদুরি করেছে। আর তখনই সমাজের উপরিতলে দেখা দিয়েছে 'সাময়িক-বিপর্যয়', সামাজিক সুস্থিতি ও দৈহিক নিশ্চয়তায় ছেদ পড়েছে, মানুষের শান্তি বিঘ্নিত হয়েছে, বেড়েছে দুঃখ-দুর্দশা। বলতে গেলে আজকের মানুষের অধিকাংশ দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ তার বাহাদুরির ফল। মানুষকে প্রকৃতি যে-স্বনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিয়েছিল, তার সে অমর্যাদা করেছে। ভেবেছে, এর জোরেই সে বিশ্বজগতের নিয়ন্তা হয়ে উঠবে। আজ সে তারই ফলভোগ করছে।

স্পষ্ট শুনতে পাই, পরমাপ্রকৃতি যেন ডাক দিয়ে বলছেন — হে মহামানব! তোমাকে জীবন দিয়েছিলাম পুরুষ রূপে, ঈশ্বর রূপে, স্বনিয়ন্ত্রক রূপে; যাতে আমার অসুবিধেটুকু তুমি 'নিমিত্ত' হয়ে দূর করতে পার। তোমার বোঝা উচিত ছিল, 'প্রকৃতির পোয়াতি ব্যথায় হাত লাগানোই পুরুষের কর্ম, পুরুষের ধর্ম'। তাতেই তোমার মুক্তি, আমার শান্তি। তা না-করে তুমি

কেবল নিজের নশ্বর দেহের কথা ভাবতে বসলে! বিশ্বজগতের নিয়ন্তা হতে দৌড়লে! তাতে, আমার উদ্দেশ্য তো ব্যর্থ হচ্ছেই; তোমার বিপদও দেখো, অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এখনও সময় আছে! স্বকর্মে মন দাও! স্বধর্মে ধ্যান দাও! নইলে তোমার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

আমার মনে হতে থাকে, আমরা যারা আমাদের সকলের দুঃখ-বেদনা-শোষণ-পীড়ন-হিংসা-দ্বেষ ইত্যাদি নিয়ে মানসিক কষ্ট পাই, আমরা যারা এই পরিস্থিতির পরিবর্তন চাই এবং সেই উদ্দেশ্যে সমাজবদলের কথা ভাবি; আমাদের নতুন করে সমগ্র বিষয়টিই ভেবে দেখা দরকার। সমাজ-সভ্যতা কোন দিকে যেতে চায়, আমাদের মনের বদ্ধমূল-ধারণাগুলি তাকে কোথায় নিয়ে যেতে চলেছে, বহিরাগত 'ঝড়-ঝাপটা'র প্রভাবই বা কতটুকু, সেই সব বিষয়ে সাধ্যমত অবহিত হওয়া দরকার। তদনুসারে প্রকৃতির সেই ইচ্ছার অনুকূলে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করার উপায়গুলিও খুঁজে বের করা দরকার।

সেই অনুসন্ধানের ফলই আজকের নিবেদন।

অবশ্য, অনুসন্ধানেরও একটা পরম্পরা আছে। মানুষ ও তার সমাজ আগামীকাল কোথায় পা রাখতে চলেছে এবং তার ফলে কী কী সুবিধা ও অসুবিধার মুখোমুখি হতে চলেছে, তা নিয়ে মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই ভেবে এসেছে; অসুবিধাগুলি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কীভাবে তার উপায় উদ্ভাবন করেছে। সেই উপায়কে সেকালে বলা হত 'মন্ত্র'। সেই পরম্পরার সংক্ষিপ্ত সংবাদ নিয়ে আমরা আজকের অনুসন্ধান ও তার 'মন্ত্র' বিষয়ে অনুপ্রবেশ করব।

নিজের লগন পরকে দিয়া / গণেশ রইল আবড়া হয়া[১২]
বাংলার গ্রাম্য প্রবাদ

ভারতের 'অপর' বিষয়ক বিদ্যা

'আমন্ত্রণ' ও 'নিমন্ত্রণ' দুটি বাংলা শব্দেরই এখন একটাই মানে — invitation। ইংরেজির প্রভাব আমাদের এই শব্দ দুটির সমস্ত অর্থ ফেলে দিয়ে দুটি শব্দকেই শুধুমাত্র invitation-এ পরিণত করেছে, যার মানে দাঁড়িয়েছে 'ভোজনার্থ আহ্বান'।

আগে তা ছিল না। মন্ত্রণা করার জন্য ডাকলে সে-ডাককে বলা হত 'আমন্ত্রণ' এবং 'মন্ত্র' দেওয়ার জন্য ডাকলে, তেমন ডাককে বলা হত 'নিমন্ত্রণ'। আমন্ত্রণে মন্ত্রের আয়োজন ছিল, নিমন্ত্রণে মন্ত্রের নিয়োজন[১৩] ছিল। একালের মতো করে বললে বলতে হয় — মুখ্যমন্ত্রী যখন জেলায় জেলায় বন্যা-পরিস্থিতি বিষয়ে 'মন্ত্রণা' করার জন্য জেলাশাসকদের ডেকে পাঠান, সেটি 'আমন্ত্রণ'। কিন্তু যখন বন্যা-মোকাবিলার উপায় বা 'মন্ত্র' তিনি নিজেই ঠিক করে রেখেছেন, সেটি রূপায়ণের উদ্দেশ্যে জেলাশাসকদের বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যদি তিনি তাঁদের ডেকে পাঠান, তখন সেই আহ্বানকে বলে 'নিমন্ত্রণ'। আর, ডেকে সকলের সঙ্গে 'মন্ত্রণা' করে অবশেষে একটি 'মন্ত্রে' উপনীত হয়ে, সেই মন্ত্র রূপায়ণ করার নির্দেশ দিয়ে ফেরত পাঠালে, তাকে আমন্ত্রণ ও নিমন্ত্রণ দুইই বলা যায়।

আর, মন্ত্রী তো মন্ত্রণা করবেনই। কেননা, 'মনকে ত্রাণ করে যে' তাকেই তো 'মন্ত্র' বলে

এবং সেই 'মন্ত্রের ধারক ও বিকাশসাধনকারী'কেই তো 'মন্ত্রী' বলে। আপনার মন যেখানে আটকে গেছে, সে আপনার চাষের সেচের চিন্তায় হোক, আর ছেলেমেয়ের ইস্কুলের অব্যবস্থার চিন্তায় হোক, কিংবা রুগ্ণ আত্মীয়কে হাসপাতালে ভর্তির চিন্তায় হোক — সেই আটকানো অবস্থা থেকে, সেই দুশ্চিন্তার ঘেরাটোপে বন্দীদশা থেকে যে-উপায়ে আপনার মনকে ত্রাণ করা যাবে, সেটিই সেই সেই বিশেষ পরিস্থিতির মন্ত্র। জীবনে আমাদের চলার পথে এরকম অজস্র মন্ত্র লাগে।

সকল মন্ত্রের বা উপায়ের সারাৎসার যে-মন্ত্র, তাকেই আমরা 'জীবনের মূলমন্ত্র' বলে থাকি। জীবনের সেই মূলমন্ত্র, দেশোদ্ধারের মন্ত্র, সমগ্র সমাজমনের ত্রাণের যে-মন্ত্র, সেই সমস্ত মন্ত্রই সেকালে থাকত মহর্ষি নামক 'সম্প্রদায়-নেতা'দের হাতে, একালে থাকে মন্ত্রীদের হাতে। মানবজীবনের ও সমাজজীবনের সমস্ত মন্ত্রের সারাৎসার ধারণ করে রাখত যে, সেই মন্ত্রাধার-স্বরূপ গ্রন্থকে সেকালে 'ব্রাহ্মণ' বলা হত, বলা হত 'পরাবিদ্যা'; একালে সেগুলিকেই 'তত্ত্ব' বা 'সমাজতত্ত্ব' বলা হয়ে থাকে। আমাদের সেকালের 'আদি ব্রাহ্মণ' বা শিবঠাকুর,[১৪] যাঁদের মহা-ঋষি বা মহর্ষিও বলা হত, তাঁরা সারাৎসার স্বরূপ সেই পরাবিদ্যার ধারক ছিলেন। তাঁদের যুগের মানুষের ও সমাজের মন তাদের চলার পথে কোথায় কোথায় আটকে যেতে পারে এবং কী কী উপায়ের বা মন্ত্রের সাহায্যে তার থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে, তাঁরা তার উপায় বা মন্ত্র উদ্ভাবন করতেন। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে 'মন্ত্রদ্রষ্টা' 'মন্ত্রস্রষ্টা' সেই ঋষিদের ও তাঁদের 'মন্ত্রের' কথা বিস্তারিতভাবে লিখে রাখা আছে। যদিও, সেই মন্ত্রসমূহের বিস্তারিত অর্থ বুঝবার কৌশল একালে আমরা ভুলে গেছি। তবে, এখনও আমাদের হাতে পরম্পরাগতভাবে রয়ে গেছে অজস্র 'বদ্ধমূল-ধারণা' এবং তা রয়েছে আমাদের মনের গভীরে। তারই একটি হল — 'আত্মানং বিদ্ধি' বা 'নিজেকে জানো'।

হ্যাঁ, আমাদের সেই মহর্ষিরা বলতেন, 'আত্মানং বিদ্ধি'। পাশ্চাত্য বলতেন Gnothi seauton – Know thyself।[১৫] একালে আমরা বলি, 'নিজেকে জানো'। মানুষের (নর বা নারীর) নিজের 'আমি'টিকে জানার এই বিদ্যাকেই সেকালের প্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে সর্বোচ্চ বিদ্যা বলে মনে করা হত। কিন্তু মানুষ তো নিজের ভিতরে নিজে সম্পূর্ণ নয়; তার দেহমনের অজস্র চাহিদা বা প্রয়োজন আছে। তাই তাকে নিজের বাইরে হাত বাড়াতে হয়। এই হাত বাড়াতে গিয়ে মানুষের হাত ক্রমশ এগোতে এগোতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সীমাও পেরিয়ে যায়। অর্থাৎ মানুষ তার দেহটুকুতে সীমাবদ্ধ থাকে না, নেই। তার প্রয়োজন তাকে শরীরের বাইরে তো টেনে নিয়েই যায়, তার ওপর তার মন বলে একটি অদৃশ্য পদার্থ আছে, এবং সে-মন যেতে পারে না হেন স্থান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নেই। মানুষের অস্তিত্ব তাই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বাইরেও প্রসারিত। এই মানুষের কথা বলতে গিয়েই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বিশ্বকে বুদ্ধির গণ্ডীর মধ্যে আঁটিতে পারে, মানুষের অসীম ব্যক্তিত্বের এই বিশেষত্ব'; বলেছেন, মানুষ এমনকী 'ব্রহ্মাণ্ডের চেয়েও বড়ো'। এই যে 'অসীম মানুষ', তার সেই সমগ্র অস্তিত্বকে জানার বিদ্যাই অখণ্ড মানববিদ্যা। সেকালের ভারতে এই বিদ্যাকেই অধ্যাত্মবিদ্যা[১৬] বলা হত।

নিজের দেহের বাইরের যা-কিছুতে মানুষের 'প্রতিপালন রহে' ('পালন রহে যাহাতে'), ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধিতে তাকে 'পর' বলে। সেই সুবাদে মানুষের দেহের খোরাক ও মনের খোরাক, যার জন্য মানুষ তার নিজের বাইরে হাত বাড়ায়, তা-সবই 'পর' পদবাচ্য। প্রাচীন ভারতবাসী দেহের খোরাকের চেয়ে মনের খোরাককে বেশি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান মনে করতেন। তাই মনের খোরাকের সর্বোচ্চ বিদ্যাকে তাঁরা বলতেন 'পরাবিদ্যা'। সেই খোরাকে তার মন বাঁচে, মন সুস্থ-সবল-সতেজ হয়, চলার পথে আটকে গেলে তার থেকে ত্রাণ পায়। এই পরাবিদ্যা তাই মন্ত্রের আধার।

আর, যা-কিছু 'পর' নয়, 'ন-পর', যাদের না হলেও আমাদের নিজ নিজ পালন-পোষণের কাজ চলে যায়, অর্থাৎ যে-বিষয় ও বস্তুগুলিতে আমাদের শরীর ও মনের পালন-পোষণ নাই, নিজের বাইরের সেই সব কিছুই 'অপর' পদবাচ্য। এই দৃষ্টিতে মানুষের বাইরের জগৎ দু ভাগে বিভক্ত, মানুষের প্রয়োজনের জগৎ ও অপ্রয়োজনের জগৎ। প্রয়োজনের জগৎকে 'পর' বলে এবং অপ্রয়োজনের জগৎকে 'অপর' বলে।

আরও একরকম 'অপর' রয়েছে। 'যাহা হইতে পর নাই' তাও 'অপর' পদবাচ্য। 'অপর' তাই দুই রকমের — প্রথমটি 'ন-পর' এবং দ্বিতীয়টি 'যাহা হইতে পর নাই' অর্থাৎ পরের চেয়েও বেশি পর, বা 'পরাৎপর'। প্রাচীন ভারতের চিন্তাবিদেরা দ্বিতীয় 'অপর'কে অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'পরাৎপর' বলেই উল্লেখ করে গেছেন। তাঁরা প্রথম অপর (ন-পর) বিষয়ক বিদ্যাকে বলতেন 'অপরাবিদ্যা', আর দ্বিতীয় অপর বিষয়ক বিদ্যাকে বলতেন 'পরাৎপরা বিদ্যা'। তবে, বহু ক্ষেত্রেই তাকে 'পরাৎপরা বিদ্যা' না বলে 'শ্রেষ্ঠ পরাবিদ্যা'ও বলা হত।

অতএব, আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের পূর্বপুরুষেরা জগৎকে মোট তিন ভাগে ভাগ করে দেখেছিলেন — প্রয়োজনের জগৎ, অপ্রয়োজনের জগৎ, অতি-প্রয়োজনের জগৎ। তাই বিদ্যাও তাঁদের ছিল তিন প্রকার — পরাবিদ্যা, অপরাবিদ্যা, পরাৎপরাবিদ্যা। পরের থেকেও যে পর, প্রয়োজনীয় থেকেও যে বেশি প্রয়োজনীয়, যার পরে আর পর নাই সে-'অপর' তাই 'অমূল্য'র মতো — 'যার কোনো দাম নেই' এবং 'যার এত দাম যে দেওয়াই যায় না'। প্রয়োজনের জগতের নিম্নসীমার নীচে যে-থাকে উন্মাদের মতো এবং প্রয়োজনের জগতের ঊর্ধ্বসীমার ওপরে যে-থাকে বিজ্ঞানীর মতো; তাদের দুজনকেই দেখতে একরকম বলে উভয়কেই সমাজ 'পাগল' বলে থাকে— এই দুই 'অপর'ও সেরকমই। যার কোনো প্রয়োজন নেই সেও 'অপর', যার এত বেশি প্রয়োজন যে, সর্ব প্রকারের প্রয়োজনকে সে ছাড়িয়ে যায়, সেও 'অপর'। এই দ্বিতীয় অপর বিষয়ক বিদ্যার নাম তাই 'পরাৎপরাবিদ্যা'। পরবর্তীকালে তা 'শ্রেষ্ঠ পরাবিদ্যা' রূপে চর্চিত হতে হতে একসময় 'পরাবিদ্যা' নামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

'পরাবিদ্যা'র অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেও এই দ্বিতীয় অপর বা পরাৎপর কিন্তু মন্ত্র নয়, পর নয়, তার চেয়েও বেশি; এ হল মন্ত্র-সৃষ্টির বা মনকে ত্রাণ করার উপায়-উদ্ভাবনের বিদ্যা। এ হল পুরুষ-প্রকৃতির বা আধেয়-আধারের মধ্যেকার সম্বন্ধ বিষয়ক জ্ঞান; একে তন্ত্রও (system) বলা হয়ে থাকে। পুরুষ-প্রকৃতি, এই দুইকে কী কী নিয়মে কতরকমভাবে একত্র ও

পারস্পরিকভাবে কর্মরত রাখা যায়, তদ্বিষয়ক চর্চাই এই পরাৎপরা বিদ্যার মূল পাঠ্য। একালের বিজ্ঞান তার খণ্ডদৃষ্টিতে একে দেখে এর নামকরণ করেছে 'দুইকে একত্রে দাঁড় করানো'র বিদ্যা বা 'system designing'-এর বিদ্যা (system = standing together)। সমগ্র বিশ্ব যে 'পুরুষ-প্রকৃতি রূপে বিভাজিত হয়ে কামসূত্রে গ্রথিত' হয়ে রয়েছে, সমাজ যে শাসক-শাসিতে বিভাজিত হয়ে কর্মসূত্রে পরস্পরনির্ভর হয়ে টিকে রয়েছে,[১৭] মানুষ যে মন ও দেহে বিভাজিত হয়ে একসূত্রে গ্রথিত হয়ে রয়েছে, সেই সূত্রগুলিকে দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে বুঝে নিয়ে তদনুযায়ী মন্ত্র সৃষ্টি করার এই বিদ্যাই হল দ্বিতীয় অপর বিষয়ক বিদ্যা। এই বিদ্যা যার হস্তগত তাকেই বলা হত পুরুষ। এই বিদ্যাই নিজের নাম হারিয়ে, বিচ্ছিন্ন টুকরো টুকরো হয়ে, আজকের পৃথিবীর সমস্ত নতুন তত্ত্বের জন্ম দিয়েছে। একমাত্র এই পরাৎপরা-বিদ্যাই আসন্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নতুন সূত্রে নিজেদের গ্রথিত করার মন্ত্র উদ্ভাবনের যোগ্যতা ধরে।

যাই হোক, এই তিনরকম বিদ্যাকে নিয়েই গড়ে উঠেছিল ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্যা বা অখণ্ড মানববিদ্যা। তার মধ্যে পরাৎপর পদবাচ্য দ্বিতীয় 'অপর' বিষয়ক বিদ্যাই ছিল সবচেয়ে সম্মানীয়। মানুষের আগামীকাল, তার মনের সম্ভাব্য বন্দীদশা ও তার থেকে তার মুক্তিই ছিল এই বিদ্যার মূল বিষয়। উপনিষদ, পুরাণ ও তন্ত্রাদি গ্রন্থে তার নানা 'ভার্সন' রয়েছে। আগ্রহী পাঠকের জন্য শিবপুরাণ থেকে, একালে দুর্বোধ্য, তারই একটি বর্ণনাকে সাজিয়ে দেওয়া হল; যার থেকে এটুকু অন্তত বোঝা যাবে 'পরাৎপর'-পদবাচ্য 'অপর'-এর স্থান কোথায়?

অখণ্ড অধ্যাত্মবিদ্যার বিষয়

		(১)	(২)	(৩)
সমগ্র	—	**অপর (ন-পর)**	**পর**	**পরাৎপর (অপর)**
মানুষ	—	মন	দেহ	আত্মা (আমি)
সমগ্র	—	অজড়	জড়	নিয়ন্তা
সমগ্র	—	সচেতন	অচেতন	পরিচালক
সমাজ	—	পশু (শাসক)	পাশ (শাসিত)	পতি (সম্বন্ধ)
পৃথিবী	—	জীব	মায়া	ঈশ্বর
সমগ্র	—	অক্ষর	ক্ষর	ক্ষরাক্ষরপর
অস্তিত্বমাত্র	—	পুরুষ	প্রকৃতি	পরমেশ্বর (পরমাপ্রকৃতি)
মহামায়া	—	মায়াবৃত ব্রহ্ম	মায়া	পরমেশ্বর শিব (ব্রহ্ম)
কর্মজগৎ	—	চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ	পরমেশ্বরের শক্তি	স্বাভাবিক বিশুদ্ধি বা শিবতা
সমগ্র	—	আধেয়	আধার	সম্বন্ধ

জগৎকে এইভাবে দেখবার, বুঝবার, ভাববার যে-রীতি, আত্মাকে বা নিজেকে জানতে গিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষেরা সেই সমগ্র মানববিদ্যার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন; জেনেছিলেন আগামীকালের 'মন্ত্র' উদ্ভাবনই তাঁদের প্রধান সমস্যা এবং তার সুরাহার পথ দেখাতে পারে একমাত্র পরাৎপরা-বিদ্যার চর্চা বা দ্বিতীয়-অপর বিষয়ক চর্চা।

বলে রাখা দরকার — যাঁরা ইয়োরোপের 'Other' ধারণাটিকে বাংলার আধুনিক সারস্বত মহলে 'অপর' নামে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, তাঁরা 'অপর' বিষয়ে বাংলাভাষীর নিজস্ব যে উত্তরাধিকার তা দেখতে পাননি। প্রতীকী বাংলাভাষায় 'পর' ও 'অপর' দুটি শব্দই একার্থবাচক হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা 'পর'কে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র 'অপর' শব্দটিকে ইংরেজি Other শব্দের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহার করে 'অপর'কে অকারণ কলুষিত করেছেন। তাঁদের সেই প্রচেষ্টার ফল হয়েছে এই যে, আমাদের 'অপর'-এর সমগ্র অতীতটাই বাদ পড়ে গেছে; 'অপর' বিষয়ে আমাদের যেন কোনো অর্জনই নেই, যা আছে তা পাশ্চাত্যের! বলে দেওয়া হয়েছে — এই যে হরি জানা, এ আমাদের বাংলার কেউ নয়, তার কোনো বাঙালি-অতীত কিংবা বাঙালি বাপ-ঠাকুরদা নেই; এ আসলে ইয়োরোপের Harry Jones, হরি জানা সেজে বাংলার মাটিতে ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে। এইভাবে নিজের লগ্ন অন্যকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে তাই সুস্পষ্টভাবে বলে রাখা দরকার, 'Other' হল আদার ব্যাপারী, 'অপর'-এর জাহাজের খবর সে কিছুই জানে না।

পথ ভাবে 'আমি দেব', রথ ভাবে 'আমি',
মূর্তি ভাবে 'আমি দেব' — হাসে অন্তর্যামী।
রবীন্দ্রনাথ

'বদ্ধমূল-ধারণা'গুলি আমাদের কোথায় এনে ফেলেছে!

ইংরেজ চলে যাওয়ার পরেই ভারতে জাতিভেদ প্রথার সূত্রপাত হয়েছে, এমন কথা মূর্খেও বলে না। কিন্তু আমরা দেখছি, জাতপাতের সমস্যা ভারতসমাজের উপরিতলে উঠে আসছে ১৯৬২ সালে, ভারত-চীন যুদ্ধের পর থেকে। এবং বলতে কী, এই মুহূর্তে এই সমস্যা ভারতসমাজকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। এরকম হল কেন?

এর উত্তর পাওয়া যায়, পূর্বোক্ত উপরিতলের 'সাময়িক বিপর্যয়'-এর হিসাব থেকে। ভারতসমাজের মনের গভীরে তান্ত্রিক-বৈদিক, বৌদ্ধ-হিন্দু, হিন্দু-মুসলমান, হিন্দু-শিখ, হিন্দু-জৈন, এবং হিন্দুধর্মের নিজস্ব ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র-শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব-সহজিয়া-কর্তাভজা ইত্যাদি অজস্র ভেদ ও তজ্জাত 'বদ্ধমূল-ধারণা'গুলি তো ছিলই, কিন্তু উপরিতলে ঝড়-ঝাপটা রূপে তুলকালাম করছিল বহিরাগত 'শক হুণ দল পাঠান মোগল' এবং ইংরেজরা। ফলে জলের (জনগণের মনের) গভীর থেকে ভারতের নিজস্ব অর্জনের 'ক্রিয়ামূলক বদ্ধমূল-ধারণা' ও বাহাদুরির 'প্রতিক্রিয়ামূলক বদ্ধমূল-ধারণা' থেকে উৎপাদিত শ্যাওলাদি সমাজের উপরিতলে কিছুতেই আপন সাম্রাজ্য বিস্তার করতে পারছিল না। ভারত স্বাধীন হওয়ার প্রাক্কালে সেই ধারণাসমূহের কিছু অংশ আম্বেদকর ও পেরিয়ার রামস্বামী নাইকারের মাধ্যমে সমাজের উপরিতলে মাথা তোলার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু ভারত-পরিবারের অন্যান্য সদস্যের চাপে এবং ব্রিটিশের দাপটে তা সাময়িকভাবে চুপ করে যায়। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরেই সে মাথা তুলতে শুরু করলেও এসে যায় পাকযুদ্ধ, চীনযুদ্ধ; অগত্যা পুনরায় কিছুদিন অপেক্ষা

করতে হয়। চীনযুদ্ধের পর বাইরের শত্রুভয় যখন স্তিমিত, বহিরাগত ঝড়-ঝাপটা নাই, তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে ঘরের কথা। এইবার তাহলে ভাই-ভাইয়ের এতদিনকার আকচা-আকচির ফয়সালা হয়ে যাক। বাপের বড়ছেলে হওয়ার সুযোগে তুমি সব মেরে খাচ্ছ, চোখের উপর দেখেও এতদিন কিচ্ছুটি বলিনি, বাইরের ডাকাত সামলাতেই ব্যস্ত ছিলাম। এখন তা হলে কোন ছেলের কী প্রাপ্য, তার হিসেব-নিকেশ হয়ে যাক। আমি কী করে অচ্ছুৎ হলাম, তুমি কী করে প্রণম্য হলে, তার হিসেব হোক!

ব্যস! যা হবার হয়ে গেল — ভারতসমাজের মনের গভীর থেকে উপরিতলে, প্রধানত সাহিত্যে ও রাজনীতিতে, উঠে পড়ল জাতপাতের সমস্যা সমাধানের (প্রতিক্রিয়ামূলক বদ্ধমূল-ধারণার) ডাক। এবং আজ পর্যন্ত তা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, ভারতসমাজের উপরিতলের কতখানি অংশকে ছেয়ে ফেলেছে, তা বোধ হয় ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু যে 'বদ্ধমূল-ধারণা'গুলি থেকে এই জাতপাতের সাহিত্য ও রাজনীতির উদ্ভব হল, ভারতবাসীর মনে সেই ধারণাগুলি গেড়ে বসেছিল মাত্র ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে। তার আগেও তো আরও অনেক ধারণা মানুষের মনে গেড়ে বসেছিল। আজ, ভারতসমাজের উপরিতল যখন অনুকূল, তখন সেই সমস্ত 'বদ্ধমূল-ধারণা'গুলিই-বা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকবে কেন? অতএব সেগুলিও এক এক করে পাতা হয়ে, ফুল হয়ে, শৈবাল হয়ে, ভারতসমাজের উপরিতল ছেয়ে ফেলবার চেষ্টায় নেমে পড়ল। আমরা দেখলাম, অস্পৃশ্যের পিছু পিছু উপজাতি আদিবাসী ঝাড়খণ্ডী, কূর্মী যাদব রাজবংশী ... ইত্যাদি ইত্যাদি অজস্র আঞ্চলিক সাহিত্য, আঞ্চলিক সাহিত্যিক, আঞ্চলিক রাজনীতিবিদের জন্ম হয়ে গেল; দলগুলি টুকরো টুকরো হয়ে গেল, প্রদেশগুলি খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল; ভারত-সরোবরের উপরিতল বদ্ধমূল-ধারণাসম্ভূত শৈবালে ক্রমান্বয়ে ছেয়ে যেতে লাগল। ...

তবে ঝড়-ঝাপটাহীন অনুকূল পরিস্থিতি কেবল ইংরেজ চলে যাওয়ার পরেই প্রথম পাওয়া গেল, তা নয়। আগেও বেশ কয়েকবার তেমন পরিস্থিতি কমবেশি পাওয়া গিয়েছিল। মানুষের মনের আদি 'বদ্ধমূল-ধারণা'গুলি সেই পরিস্থিতিতে নিশ্চয় চুপ করে বসে থাকেনি। তার খবর নিলেই আমরা ভারতসমাজের উপরিতলের পট-পরিবর্তনের একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পেয়ে যেতে পারি এবং ভারতীয়দের মনের গভীরে যে 'বদ্ধমূল-ধারণা'গুলি আছে, তারা আমাদের কোথায় এনে ফেলেছে, তার একটা সামগ্রিক চেহারা পেয়ে যেতে পারি।

ভারতের আদি 'বদ্ধমূল-ধারণা'গুলি মানুষের মনে গেড়ে বসেছিল সনাতন ভারতের বুক চিরে যখন বৈদিক ভারতের উদ্ভব হয়, তখন (আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে)। এই ধারণাগুলি ছিল প্রধানত দুই শ্রেণীর — বহুকালক্রমাগত স্বাভাবিক প্রাকৃতিক অর্জনজনিত বিশ্বাস থেকে যে-ধারণাগুলি গড়ে উঠেছিল (ক্রিয়ামূলক বদ্ধমূল-ধারণা), এবং বৈদিক সমাজের সূত্রপাতের আঘাতে যে-ধারণাগুলি আহত হয়ে মানবমনে প্রতিক্রিয়া-রূপে গেড়ে বসেছিল (প্রতিক্রিয়ামূলক বদ্ধমূল-ধারণা)। সংক্ষেপে এগুলিকে আমরা 'সনাতন বদ্ধমূল-ধারণা' বলব। বলে রাখা যাক, এই ধারণার উত্তরাধিকার পৃথিবীর প্রায় সমস্ত জাতিরই কমবেশি

রয়েছে। ভারতের বাইরে সেই 'সনাতন বদ্ধমূল-ধারণা'ই পরবর্তীকালে মার্কসবাদী-সমাজতন্ত্রের শৈবালে পরিণত হয়। তবে সে প্রসঙ্গ এখন নয়।

ধূলিকণা থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত প্রকৃতির প্রত্যেক সদস্যকে নিজের সমান শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা উচিত, সব জীবকে, সব মানুষকে সমান মান্য করা উচিত, কেননা যত্র জীব তত্র শিব, নরই নারায়ণ — এই 'সনাতন-ধারণা' মানুষের মনের গভীরে থাকায়, ডিনামাইটে পাহাড় গুঁড়িয়ে যেতে দেখলে মানুষ হায়-হায় করে ওঠে, গর্তে পড়ে যাওয়া জীবকে বাঁচাতে হাত বাড়িয়ে দেয়, ক্ষুধার্তকে খাওয়াতে লাগে, আতুরের সেবা করতে লেগে যায়। এইরকম আরও কয়েকটি ধারণা হল — ক) দেহের প্রয়োজনের বিচারে সব মানুষ সমান, তবে অগ্রাধিকার শিশুর ও গর্ভবতীর এবং তারপরই বৃদ্ধের; জ্ঞানবান-বলবানদের কোনো বিশেষ মর্যাদা থাকতে পারে না; খ) মনের প্রয়োজনের বিচারে সম্বন্ধজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানই আরাধ্য, ব্রহ্মজ্ঞানীই পথপ্রদর্শক হতে পারেন, তাঁকে অনুসরণ করাই ঝাঁকজীব-রূপী মানুষের সমাজ-পরিচালনার স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নীতি; গ) মনের (আত্মার) তৃপ্তিই মানুষের উদ্দিষ্ট, বাহ্য-সম্পদ আত্মাকে শান্তি দিতে পারে না, নির্যাতিত আত্মা আত্মহত্যাও করতে পারে, এ তার স্বাভাবিক প্রাকৃতিক অধিকার; ঘ) জন্মসূত্রে মানুষ তিনটি মূল অধিকার পায় — নিজের উপর সম্পূর্ণ অধিকার, সমাজের উপর তার অংশগত অধিকার, বিশ্বের উপর তার অংশগত অধিকার; কর্তব্যও তিনটি; এবং এই অধিকার মানুষ স্বেচ্ছায় কাউকে না দিলে, তা কেড়ে নেওয়া উচিত নয়। মানুষের ধর্মেরও তাই তিনটি স্তর — ব্যক্তিগত, সামাজিক, ও জাগতিক। ... এগুলিকে 'সনাতন পৃথিবীর আধ্যাত্মিক অর্জন'ও বলা যায়।

এই সমস্ত বদ্ধমূল-ধারণার অন্তত দুটিকে আঘাত করে ভারতের গোবলয়ে বৈদিক যুগের সূত্রপাত হয় — ১) জ্ঞানীর বিশেষ মর্যাদা থাকবে (ক-বিরোধী) এবং ২) যে-অধিকার একবার সম্প্রদায়ের নেতাকে (মহর্ষিকে) দিয়ে দেওয়া হয়েছে, সে তার চিরকালীন অধিকারী; সম্প্রদায়ের সদস্যরা সে-অধিকার চিরকালের জন্যই হারিয়ে ফেলে (ঘ-বিরোধী)।

ফলত, ভারতের গোবলয়ে আর্যাবর্তের প্রতিষ্ঠার পর গোবলয়ের বাইরের সমগ্র পৃথিবী তার বিরুদ্ধবাদী হয়ে যায়। তাদের নাম 'সনাতন' থেকে কালক্রমে 'তান্ত্রিক' হয়ে যায়। ভারত-বাংলাদেশ-তিব্বত-নেপাল-শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশ থেকে এ-পর্যন্ত যে-ছয় শতাধিক তন্ত্রগ্রন্থ উদ্ধার করা গেছে, তার সবগুলিই পাওয়া গেছে গোবলয়ের বাইরে, এবং সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় পাওয়া গেছে বঙ্গদেশে, কেরালা ও মাদ্রাজে, বিহার-উড়িষ্যা-আসামে এবং দাক্ষিণাত্যে। এর থেকে নিশ্চিত হওয়া চলে, এই দেশগুলিতে তান্ত্রিকদের রমরমা হয়েছিল। বৌদ্ধযুগের ঝড়-ঝাপটাহীন সময়ে দেখা যায়, এই দেশগুলির অধিকাংশ মানুষই বৌদ্ধ হয়ে গেছেন। হিন্দুযুগের প্রবর্তনার পরে এই দেশগুলির অধিবাসীদের নির্বিচারে শূদ্র, ম্লেচ্ছ ও অস্পৃশ্য বলে ঘোষণা করা হয়। ভারতে ইসলামের আগমনের পর, পুনরায় দেখা যায়, এই দেশগুলির তথাকথিত শূদ্র মানুষেরাই অধিক পরিমাণে মুসলমান হয়ে গেছেন, এবং সবচেয়ে বেশি হয়েছেন বঙ্গবাসী-বঙ্গভাষীরাই। পাঠান রাজত্বের ছত্রছায়ায় এই বঙ্গবাসীদের একটি

বড় অংশই বৈষ্ণব হয়ে যান। এমনকী ইংরেজ যে-সৈন্যবাহিনী গঠন ক'রে তার সাহায্যে গোবলয় দখল করেছিল, তার সৈন্য ও কেরানি সরবরাহ করেছিল এই তান্ত্রিক দেশগুলিই। বলতে গেলে, স্বাধীনতার পর থেকে বিগত ৩০/৪০ বছর এই তান্ত্রিক দেশগুলি একনাগাড়ে গোবলয়-বিরোধী রাজনীতিকেই উপরে তুলে ধরেছে, তার দ্বারাই শাসিত হয়ে আসছে। একই রীতি অনুসরণ করে, গান্ধী-পরিচালিত প্রথম যুগের কংগ্রেসকে এবং পরে, ভারতের বুকে যখন মার্কসবাদ পা রাখল, তাকেও পায়ের তলায় মাটি জোগাল এই তান্ত্রিক দেশগুলিই।

এমন হতে পারল এই জন্য যে, এই দেশগুলির মানুষের মনের মাটির গভীরে গেড়ে বসেছিল উপরোক্ত 'সনাতন বদ্ধমূল-ধারণা'। আর, সেই ধারণা নিজের সমর্থন খুঁজে পেয়েছিল তান্ত্রিকতায়; বৌদ্ধ ধর্মে, ইসলাম ধর্মে, বৈষ্ণব ধর্মে, গান্ধীর আন্দোলনে,[১৮] এমনকি মার্কসবাদেও। মার্কসবাদের বহুকিছুই এই 'সনাতন-ধারণা'র ঘোর বিরোধী হলেও, উপরোক্ত ক-নীতিটি মার্কসবাদে তার স্পষ্ট সমর্থন খুঁজে পায়; আর গ-নীতিতে মানুষের মনের যে-গুরুত্ব, মার্কসবাদ তা না-মানলেও এই নীতির দ্বিতীয় অংশটি ছিল ঘোরতর পুঁজিবিরোধী, সে ক্ষেত্রে তা মার্কসবাদের ভিতরে নিজের পূর্ণ সমর্থন পেয়ে যায়; তার ওপর ভারতের মার্কসবাদীরা 'যত্র জীব তত্র শিব', 'নরই নারায়ণ'-এর 'সনাতন বদ্ধমূল-ধারণা'টিকে সুকৌশলে কাজে লাগিয়ে নেন।[১৯] পশ্চিমবাংলায় বা কেরালায় সমাজের উপরিতলে মার্কসবাদীরা যে সুদীর্ঘকাল ধরে ছেয়ে রয়েছেন, তার কারণ এই নয় যে, তাঁরা খুবই করিৎকর্মা। বরং তার মূল কারণ এই যে, এই দুটি রাজ্যের মানুষ নিজেদের সনাতন বদ্ধমূল-ধারণার তাড়নায় তান্ত্রিক হয়েছে, বৌদ্ধ হয়েছে, বৈষ্ণব হয়েছে, মুসলমান হয়েছে, কংগ্রেস হয়েছে, এবং অবশেষে কমিউনিস্টও হয়েছে, (পুববাংলায়, পাকিস্তান থেকে নিজেকে মুক্ত করে 'বাংলাদেশী'ও হয়েছে,) তবুও শান্তি পায়নি; মার্কসবাদীরা নিমিত্তমাত্র। বলতে গেলে, মার্কসবাদীরা নিজেদের অজান্তে বাংলার ও কেরলের মানুষের মনের গভীরে অত্যন্ত সক্রিয় 'সনাতন বদ্ধমূল-ধারণা' থেকে নিজেদের অস্তিত্বের জীবনরস সংগ্রহ করে নিয়েছেন, নিচ্ছেন। যদিও তাঁরা নিজেরা এ-বিষয়ে যথেষ্ট সচেতনভাবে কিছুই করেননি, করেছেন নিজেদের অজ্ঞাতসারে; প্রায় সম্পূর্ণতই ইতিহাসের ক্রীড়নক রূপে।

সব মিলিয়ে বিগত পঞ্চাশ বছরের 'শান্তির' সময়ে ভারতসমাজের উপরিতলে ঝড়-ঝাপটা না থাকায়, সমাজমনের গভীরে যত বদ্ধমূল-ধারণার বীজ ছিল, যাদের অধিকাংশই প্রতিক্রিয়ামূলক বদ্ধমূল-ধারণার বীজ, সে সবের থেকে নাল বেরিয়ে পাতা-ফুল-ফল ও শ্যাওলাদি হয়ে ভারতসমাজের উপরিতল প্রায় সম্পূর্ণ ছেয়ে ফেলেছে। পরিস্থিতি এখন এমনই দাঁড়িয়েছে যে, বলতে গেলে, ভারত-সরোবরের উপরিতলে এখন সূর্যের বা জ্ঞানের আলো আর সরাসরি পড়তেই পায় না, নানা জাতের শৈবালে তা আটকে যায়। একটি সামান্য চলচ্চিত্র বানিয়ে ভারতীয়ের জীবনের উপরে কোথাও সামান্য আলো ফেলুন, দেখবেন, তৎক্ষণাৎ ওই চলচ্চিত্র দেখানোর 'অপরাধে' সিনেমা-হলে আগুন ধরানোর জন্য কোনো-না-কোনো গোষ্ঠী বা দল হাজির হয়ে গেছে; অর্থাৎ, কোনো-না-কোনো শৈবালে আপনার ফেলা আলোটি আটকে যাবে।

'... বেগানা শাদি মে আবদুল্লা দিওয়ানা
অ্যায়সে মনমৌজি কো মুশকিল হ্যায় সমঝানা।'
সেকেলে হিন্দি গান

পথ ছাড়ো বাছা, বিশ্বায়ন-ঠাকুর আসছেন দেখছ না!

সম্প্রতি আবার ঝড় উঠেছে। সমাজের উপরিতল সমাজমনের গভীরের 'বদ্ধমূল-ধারণা'র দ্বারা আর নিয়ন্ত্রিত হতে পারছে না। বহিরাগত উপদ্রব আবার শুরু হয়েছে, ভারতসমাজের উপরিতলকে এলোমেলো করে দিচ্ছে — এখন এসেছে 'বিশ্বায়ন'। বস্তুটি কী, তা নিয়ে বহু আলোচনাই হয়েছে এবং হচ্ছে। মার্কস সাহেবও তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে দেখে ফেলেছিলেন যে, এরকম পরিস্থিতি ভবিষ্যতে আসতে পারে। তবে তার থেকে তিনি সিদ্ধান্ত টেনেছিলেন তাঁর মতো — *'বুর্জোয়া যুগের ফলাফল, বিশ্বের বাজার এবং আধুনিক উৎপাদন-শক্তিকে যখন এক মহান সামাজিক বিপ্লব কব্জা করে নেবে এবং সর্বোচ্চ প্রগতিসম্পন্ন জাতিগুলির জনগণের সাধারণ নিয়ন্ত্রণে সেগুলো টেনে আনবে, কেবল তখনই মানব-প্রগতিকে সেই বিকটাকৃতি আদিম দেবমূর্তির মতো দেখাবে না যে নিহতের মাথার খুলিতে ছাড়া সুধা পান করতে চায় না।'* [২০]

ঠিকই। *'বুর্জোয়া যুগের ফলাফল, বিশ্বের বাজার এবং আধুনিক-উৎপাদন শক্তিকে'* এই বিশ্বায়ন (এটি মহান সামাজিক বিপ্লব কি না, সবাই জানেন) *'কব্জা করে'* নিচ্ছে। *'এবং সর্বোচ্চ প্রগতিসম্পন্ন* (মার্কিন, ব্রিটিশ প্রভৃতি) *জাতিগুলির জনগণের* (কর্পোরেট পুঁজির) *সাধারণ নিয়ন্ত্রণে সেগুলো'*কে টেনেও আনছে বটে। এর ফলে *'মানবপ্রগতিকে'* মার্কস সাহেব যেরকম ভেবেছেন, সেরকম দেখাচ্ছে কি না, পাঠক বিচার করে দেখুন।

আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরাও বিশ্বায়ন দেখেছিলেন, তবে তাঁদের বিশ্ব ছিল অনেক ছোট। বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীগুলি ('সম্প্রদায়'গুলি) মৎস্যাবতারের প্রলয়কালে[২১] যখন একত্রিত হয়ে গিয়েছিল, তাঁরা দেখেছিলেন বিশ্বায়ন হয়ে যাচ্ছে। তাঁরা একে নাম দিয়েছিলেন 'একার্ণব'।

একার্ণব হলে গর্ত, ডোবা, পুষ্করিণী, সরোবর, হ্রদ সব একাকার হয়ে যায়। পুরাণ কথিত 'পৃথক পৃথক জল' আর পৃথক থাকতে পারে না। সমস্ত জল পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে যায়। বন্যার সময় এই পরিস্থিতি আমরা দেখেছি। দেখেছি, বাইরের ঘোলা জলের গন্ধ পেয়েই পুকুরের মাছেদের সে কী কোলাহল আর নাচ! এখন সেরকমই হচ্ছে। ছোট-বড় দেশের মৎস্যদের উদ্দাম নৃত্য শুরু হয়েছে। হ্রদ-সরোবর-পুকুরের জলসমূহ ফুলে উঠে পরস্পরের সঙ্গে মিলে যাওয়ায়, হাঙর কুমির থেকে চুনোপুঁটি পর্যন্ত সব্বাই বেরিয়ে পড়েছে, তাদের 'পৃথিবী বিস্তারিত' হয়ে গেছে। হইহই রইরই ব্যাপার!

প্রাচীনকালে ছোটবড় পৃথক জনগোষ্ঠীগুলি যখন একত্রিত হয়ে গিয়েছিল, তাদের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক মিলন ঘটেছিল, তখন কীরূপ অবস্থা হয়েছিল, তার সাক্ষী ছিলেন আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা। সে ঘটনার বর্ণনা তাঁরা দিয়ে গেছেন তাঁদের নিজেদের ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায়। আজ তা যথেষ্ট দুর্বোধ্য। পাঠকের অবগতির জন্য পুরাণ থেকে এখানে

তারই একটুখানি নিদর্শন দিয়ে যাওয়া যাক।

> "... পৃথক পৃথক ভাবে বহু জল থাকিলেও তাহাদিগকে জলই বলা যায়। কিন্তু যখন মিলিত বহু জল পৃথিবীর বহু স্থান ব্যাপিয়া থাকে, তখন তাহাকে সাগর সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। (তাহারা) আভাত অর্থাৎ প্রকাশিত হয়, আবার নাও হয়। পরন্তু স্বীয় ব্যাপ্তি ও দীপ্তি দ্বারা বিভাসিত অর্থাৎ জ্ঞানগোচর হয়; এ জন্য ইহাকে অম্ভঃ ('শব্দকারক') বলে। এই অম্ভঃ সমস্ত পৃথিবীকে বিস্তারিত করে। ..." (বায়ুপুরাণ। বিষ্ণুপুরাণেও এরূপ বয়ান আছে।)

পুরাণে মানবসমাজের আদি রাষ্ট্রের এলাকাকে 'পৃথিবী' বলা হত। জল (জনগোষ্ঠীগুলি) মিলিত হলে সেই 'পৃথিবী'র এলাকা বেড়ে যায়! ... কিন্তু এভাবে ধরে ধরে সমগ্র বর্ণনার অর্থ করতে গেলে এ নিবন্ধ শেষই করা যাবে না। তার চেয়ে বরং বলে নেওয়া যাক, পুরাণাদি অনুসারে এই একার্ণব কালে বায়ুর (মিডিয়ার) প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ একালের ভাষায় ইনফরমেশন প্রযুক্তির রমরমা হয়; সূর্য মহিমা হারায় অর্থাৎ একালের ভাষায় রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির মহিমা খর্ব হয় ... ইত্যাদি ইত্যাদি। আজকের বিশ্বায়নের দিকে তাকিয়ে পাঠক নিজেই দেখতে পাবেন, সেরকম হচ্ছে কি না।

মোট কথা, বিশ্বায়ন বা একার্ণবের এই 'একাকার'-এর ফল হয় প্রথমে শুভ, পরে অত্যন্ত অশুভ। পুরাণ অনুসারে সেকালে তাই হয়েছিল, এখনও তাই হওয়ার কথা; যদি বিভিন্ন চিন্তাবিদের স্বপ্ন-অনুসারে আমাদের ভাঙাকুলো-রাষ্ট্রসঙঘটি ইতোমধ্যে বিশ্ব-পার্লামেন্ট নির্ভর বিশ্বরাষ্ট্রে উন্নীত হয়ে না যায়। আর, সেরকম যে অদূর ভবিষ্যতে হচ্ছে না, বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতির দিকে তাকালেই সেটা অনুভব করা যায়। তবুও রাতারাতি বিশ্বের কর্পোরেট পুঁজির মাথায় যদি ভবিষ্যতের বিপদের সম্ভাবনাটি ঢুকে যায়, এবং তাঁরা বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আলাদা কথা। তেমন কোনো কিছু না-হলে, আমরা ধরে নেব, এ-যাত্রায় একার্ণবের একাকারের একই ফল ফলবে — প্রথমে শুভ এবং পরে অশুভ।

শুভ ফল ঘটতে চলেছে এইভাবে — একই কর্মের পুনরাবৃত্তিতে অত্যন্ত অভ্যস্ত স্পেশালাইজেশনবাদী-সমাজ নিজেই যে-অনিচ্ছাকৃত কিন্তু অজস্র অনিবার্য ঘেরাটোপ তৈরি ক'রে তারই ভিতর অনন্যোপায় হয়ে হাঁসফাঁস করতে থাকে, একার্ণব বা বিশ্বায়ন তার থেকে সেই সমাজ, দেশ বা রাষ্ট্রগুলিকে মুক্তি দেয়। সমাজব্যবস্থার নানাদিকের অনেক বাঁধন খুলে গিয়ে জীবনের রস ও রসদের বহু উৎসমুখ উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। হ্রদ, সরোবর, পুষ্করিণীর সমস্ত জল ফুলে ফেঁপে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গেলে যা হয়, জলজ প্রাণীদের যে-যে সুবিধা হয়, একার্ণবে তা সবই হয়।

তুমি চুনোপুঁটি হও আর রুইকাতলা কিংবা হাঙর-কুমীর যেই হও, ক্ষমতা থাকে তো এই বন্যায় দৌড়ে বেড়াও। হাঙর-কুমীর রাঘব-বোয়ালেরা তোমায় খেয়ে ফেলতে পারে বটে, কিন্তু তুমি তো আর আবদ্ধ নও, এই বন্যার বিশাল উন্মুক্ত সাগরে দৌড়ে আত্মরক্ষা করো। এখন সকলের সমমর্যাদার যুগ। হয় নিজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করো, অন্য মর্যাদাবানের মতো তুমিও মাথা উঁচু করে দাঁড়াও, নয় বিলুপ্ত হয়ে যাও। এ-বন্যা তোমাকে প্রবাহহীন নিথর

নিস্পন্দ কন্দরে নিষ্ক্রিয় বসে থাকতে দেবে না। হয় তোমার 'খুঁদিঘর' থেকে বেরিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে তোমার যেটুকু যা-হিম্মত আছে তার প্রমাণ দিয়ে শিরোপা গ্রহণ করো, নয় চিরকালের জন্য নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থেকে বিলুপ্ত হও!

তুমি কে? পণ্যবান? টাটা-বিড়লা? মেধাবান? স্পেশালিস্ট? এসো, বাজার তোমাদের মর্যাদা দেবে। তুমি কে? সেরা বেগুন ফলাও! বেশ, তাই নিয়ে এসো। বাজার তোমার অমর্যাদা করবে না। তুমি আড়বাঁশী বাজাও! মাতোয়ারা করে দিতে পারো! বেশ, তাই নিয়ে এসো। বাজার তোমার যথাযথ মর্যাদা দেবে। তুমি গিমে শাক তোল! সজনে খাড়া চাষ কর! কী হয় তা দিয়ে? সুগারবিরোধী? ওষুধ হয়? বেশ! তাই নিয়ে এসো। তোমাকেও সমান মর্যাদা দেওয়া হবে, যথাযথ দাম দেওয়া হবে। তুমি কে? দৌড়ে একলাফেই শূন্যে তিনবার ডিগবাজি দিতে পার! চার বার পার না? ঠিক আছে, তুমিও এসো। তুমিও তোমার মর্যাদা পাবে। তুমি লাল পিঁপড়ের ডিম পাড়তে ওস্তাদ! কিন্তু দাম পাও না! মর্যাদা পাও না! পাবে, বিশ্বায়নের বন্যার জল তোমার দোরগোড়া পর্যন্ত পৌঁছে যাক, পাবে। ততক্ষণ তুমি বরং তোমার পাহাড়ের কোল ছেড়ে একটু এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দাও, অন্তত বিশ্বায়নের বন্যার জলটা যতদিন তোমার দুয়ার পর্যন্ত না পৌঁছচ্ছে, ততদিন। দেখবে তোমার মর্যাদা তুমি ঠিকই পাচ্ছ। তুমি কে? কী? গল্প বানাও, কবিতা লেখ! ও-জিনিস খায় না মাথায় দেয়? কেউ কেউ খায়, কেউ-বা মাথায় দেয়! বাঃ! টু-ইন ওয়ান! নিয়ে এসো। তবে কেউ যদি তা দাম দিয়ে নিতে না-চায়, তোমাকে কিন্তু গোডাউন-চার্জ দিতে হবে। তুমি কে? কোনো পণ্য নেই তোমার! কোনো সার্ভিস? কোনো বুদ্ধি? দিতে পার না কোনো মনোরঞ্জন, কোনো এনটারটেনমেন্ট? কিছুই নেই! কিছু তো থাকতে হবে। হয় পণ্য হাতে নিয়ে হাত বাড়াও, নয় সার্ভিস, নয় মেধা, নয় মজা — কিছু একটা হাতে নিয়ে হাত বাড়াও। কোনো একটা এমন দিক তো থাকতে হবে, যে দিক থেকে তোমার সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়া যায়? এই বন্যার বাজার তোমায় ধরে, তো ধরে কোথায়? তোমার যে ধরার মতো কিছুই নেই। তা হলে তুমি বরং এই বানের জলে ভেসে যাও!

বিশ্বায়নের গল্প এই পর্যন্ত মন্দ নয়। একটাই দুঃখ, এতদিন মানুষের সমাজে সম্পূর্ণ নিষ্কর্মারও টিকে থেকে যাওয়ার একটা পরিবেশ ছিল। জলে মারা পড়ে না অথচ ঠিকমত সাঁতারও দিতে পারে না, এমন জীবও পুকুরে ডোবায় শ্যাওলার পাতাঝোপে এতকাল বেঁচে থাকতে পারত। কিন্তু এই বন্যায় তেমন জীবদের বড়ই দুর্গতি। বিশ্বায়নের বন্যায় অধিকাংশ মানুষই তাদের মর্যাদা পেতে পারে ঠিকই, কিন্তু বন্যার তোড়ে কিছু মানুষ ভেসে যাবেই। বিশ্বায়নের এ-ভবিতব্য অনিবার্য। সব শুভের ভিতরে যেমন একটি মন্দ দিক থাকে, বিশ্বায়নের শুভেরও এই মন্দ দিক।

কিন্তু অশুভ যেটি হয়, তা হয় বিশ্বায়নের বন্যার জল নেমে যাওয়ার পরে এবং তা ভয়ানক ও মারাত্মক। চারিদিকে কাদা আর কাদা, পলি পড়ে, বেজায়গায় ঝোপজঙ্গল জমে চারিদিক অগম্য হয়ে যায়; তার ওপর রোদ পড়ে খাঁ-খাঁ ফাটাফুটা মাঠ-ময়দান। একটা অদ্ভুত

হাহাকার দেখা দেয় চারদিকে। কোন মাছ কোথায় আটকা পড়ে গেছে, কেউ তো জানে না। সবচেয়ে বড় কথা, জল ও মাছের চলাচলের যে-অভ্যাস ইতোমধ্যে গড়ে ওঠে, অকস্মাৎ তা স্তব্ধ হয়ে যেতে বাধ্য হয়। তখনই মরণ বাঁচন সমস্যা! যে-আন্তর্নির্ভরতা (ইন্টারডিপেন্ডেন্স) একার্ণব-কালে গড়ে ওঠে, তা হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মাছেদের কে কোন জলে কোথায় আটকা পড়বে, জলই বা কোন গর্তহীন ডাঙায় ঠা-ঠা শুকোবে, তার তো ঠিক নেই! শুকনো ডাঙায় আছাড় খেয়ে মরাই তখন জল ও জলের মৎস্যদের ভবিতব্য হয়ে দাঁড়ায়।

আজ আমাদের সেলাই করা জামাকাপড় যাচ্ছে লন্ডন-নিউইয়র্ক, যাচ্ছে আম-ফুল-সবজি; আসছে ওষুধপত্র, যন্ত্রপাতি — এমনভাবে, যে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ বিশেষ বিশেষ বস্তুর জন্য বিশেষ বিশেষ দেশের উপর নির্ভরশীল হয়ে যাচ্ছে। যতদিন এই বন্যা আছে, ততদিন কোনো অসুবিধা নেই; ততদিন এই পণ্যস্রোত সেবাস্রোত মজাস্রোত মেধাস্রোত — এ সবের যাতায়াত ভালই চলবে, কিন্তু এক সময় তো এই স্রোত রুদ্ধ হয়ে যাবেই। তখন কী হবে? গরম কড়াইয়ে জ্যান্ত মাছ ফেলে দিলে সে যেমন ছটফটিয়ে মরে যায়, নির্ভরশীল দেশের হবে সেই অবস্থা। এবং এটিই যে আগামী দিনের ভবিষ্যৎ তা প্রায় হলফ করে বলে দেওয়া যায়।

হ্যাঁ, আজ আমাদের সমাজের উপরিতলের শৈবালেরা বন্যার তোড়ে প্রায় উপড়ে যেতে চলেছে, ছিঁড়ে যাচ্ছে মূলের সঙ্গে সম্পর্কের নাল। সাহিত্য-সাহিত্যিক, রাজনীতি-রাজনীতিবিদ কেউই আর 'নরই নারায়ণ' কিংবা 'যত্র জীব তত্র শিব'-এর গান গাইছেন না। কারণ এই বন্যার তোড়ে সে-গান শুনবে কে? সে-গানে রস জোগাবে কোন বদ্ধমূল-ধারণা? বন্যার তোড়ে নাল ছিঁড়ে আসছে মূল থেকে। এখন বরং পণ্যস্রোতে সেবাস্রোতে মজাস্রোতে মেধাস্রোতে গা-ভাসানোই ভাল। আমাদের প্রায় সমস্ত বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ এখন এই সুরেই কথা বলছেন। সমাজ বা রাষ্ট্র-পরিচালনার বিষয়ে তাঁদের মতামত এখন মূলত অভিন্ন, মুখে তাঁরা যে-যাই বলুন। এ-ব্যাপারে বিজেপি থেকে শুরু করে নকশাল পর্যন্ত সমস্ত দলের কর্মসূচি এখন একরকম; ফারাক কেবল বোতলে ও বোতলের উপরের লেখাজোকায়। একই পথে পা বাড়ানো ছাড়া উপায় নেই বলে, নেপাল থেকে বিজয়ী মাওবাদীরা পরামর্শ নিতে আসছেন কলকাতার দেশচালক কমিউনিস্টদের কাছে। একার্ণবের এ-বন্যায় দল-মত-আদর্শ-দর্শন-চিন্তাপদ্ধতি সব একাকার হয়ে যাচ্ছে। সব ঠাকুর ছেড়ে বিশ্বায়ন-ঠাকুরের সঙ্কীর্তনে এখন আকাশ-বাতাস মুখরিত।

তা হোক, কিন্তু আগামী কাল?

বিগত যুগগুলিতে এক-একটি সামাজিক ঝড় উঠেছে এবং কিছুদিনের মধ্যেই তা ঝিমিয়ে গেছে। এই ঝড়গুলির জীবৎকাল, এ যাবৎ যা দেখা গেছে, প্রায়শই 'ক্রমক্ষীয়মাণ নীতি' মান্য করে চলেছে। আগে যার জীবৎকাল ছিল ৫০০ বছর, পরবর্তী যুগে দেখা গেছে তেমন ঝড়ের জীবৎকাল হয়েছে ২৫০ বছর, আরও পরে তা ১০০ বছর। সমাজতন্ত্রের ঝড়ো হাওয়া ৫০ বছরও টেকেনি। এই বিশ্বায়নের ঝড়ো-হাওয়া উঠেছে ১৯৯৫ সালে, ২০২৫ সালের মধ্যেই সে ঝিমিয়ে যাবে; হয়তো-বা তার আগেই। তখন কী হবে? এখন যে পরস্পরনির্ভরতা গড়ে

উঠতে শুরু করেছে, হঠাৎ সেই নির্ভরতার জায়গাটা থাকবে না। স্রোতটা কেটে যাবে, 'ডিসকানেক্টেড' হয়ে যাব আমরা। তখন কোথায় যাব? সারা দেশজুড়ে বিদেশগামী পণ্য-সেবা-মেধা-মজা যথারীতি তৈরি হয়ে জাহাজঘাটে পৌঁছে দেখবে তাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য জাহাজ আর আসছে না, সব ডাঁই হয়ে পড়ে থাকবে; জমে জমে পাহাড় হবে, পচবে, দুর্গন্ধ ছড়াবে; তার সঙ্গে যুক্ত যাঁরা, তাঁরা পরিবার পরিজন নিয়ে শ্মশান আর গোরস্থানের দিকে মিছিল করবেন। এবং যে পণ্য-সেবা-মেধা-মজারা নিয়মিত আসত আমাদের অভাবগুলি মেটাতে, তাদের অপেক্ষায় হাঁ-করে বসে থাকব আমরা, আমাদের গোটা দেশ! অভাবীদের মিছিলও দেখা যাবে শ্মশান-গোরস্থানের দিকে।

আগামীকালের সবচেয়ে ভয়ানক শত্রু এই 'ডিসকানেকশন'! স্রোত রুদ্ধ হয়ে গেলেই দেখা দেবে এই প্রাণসংশয়ের পালা! সালিম গোষ্ঠীর কারখানাই বলো, আর সবজি-আমের রপ্তানিই বলো, সবই চিৎপটাং হয়ে পড়বে। তখন ডোবা আর ছোট পুকুরের বাসিন্দাদের কী হবে? তখন এই গরীব ও ছোট দেশগুলিকে, ভারতবাসীকে, পশ্চিমবঙ্গবাসীকে বাঁচাবে কে? গতকাল পর্যন্ত বিশ্বায়ন-বন্যাকে ঠেকাতে কমপিউটার ও ইংরেজির উপর খড়্গহস্ত হয়েছিলাম, আজ সেই বিশ্বায়ন-গঙ্গাকে শাঁখ বাজিয়ে ঘরে আনার জন্য সবার আগে ছুটতে চেষ্টা করছি, (প্রায় পাগলের মতো কমপিউটার-ওয়ালাদের জড়িয়ে ধরছি; ধাই-মাদের বলছি ছেলেপুলেদের ইংরেজির পথ্য দিতে ভুলো না; সিঙ্গুরের চাষিদের বলছি — পথ ছাড়ো বাছা, বিশ্বায়ন-ঠাকুর আসছেন দেখছ না!), আগামীকাল 'আত্মসমালোচনা করে' পুনরায় ভোল পালটে নিয়ে বলব — 'বিশ্বায়ন! গুলি মারো! যত্তোসব শোধনবাদ!' অন্যের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আমরাই বলতে শুরু করব, 'ঘর গোছাও, স্বনির্ভর হও!' আর কত আত্মসমালোচনার আগুনে পুড়ে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হবে আমাদের! এখন তো শুধু 'ধরণী দ্বিধা হও' বলে সতীর পাতালপ্রবেশটুকু বাকি!

'... এত শুনি দেবগণ কূর্ম্মে আরাধিল।
মন্দর ধরিতে কূর্ম্ম অঙ্গীকার কৈল।।
মহাভারত / কাশীরাম দাস

প্লাবন-কালের (বিশ্বায়নের) মন্ত্র : প্রাচীন ভারতবাসীর আবিষ্কার

কোন জীব কত দিন বাঁচে, আমাদের প্রাচীন যোগশাস্ত্রকারগণ তার খবর নিতে গিয়ে দেখেন, প্রত্যেক জীবের আয়ুর সঙ্গে তার দৈহিক গ্রহণ-বর্জনের, বিশেষত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের, একটি অদ্ভুত সম্পর্ক রয়েছে — যে-জীব যত বেশি সময়ে যত কম বার শ্বাস নেয়, সে-জীব তত বেশি দিন বাঁচে। কুকুর মানুষের চেয়ে কম দিন বাঁচে, কারণ সে মানুষের চেয়ে কম সময়ে বেশি বার শ্বাস নেয়। হাতি মানুষের চেয়ে বেশি দিন বাঁচে, কারণ সে মানুষের চেয়ে বেশি সময়ে কম বার শ্বাস গ্রহণ-বর্জন করে। তবে যে-জীবটি সবচেয়ে বেশি সময়ে সবচেয়ে কম বার শ্বাস গ্রহণ-বর্জন করে, সেটি হল কচ্ছপ। সে কারণে কচ্ছপই জগতের সবচেয়ে দীর্ঘজীবী

প্রাণী। তাঁরা আরও লক্ষ করেছিলেন যে, যারা দীর্ঘজীবী হয়, তারা খাদ্যাদি গ্রহণও কম করে থাকে। সে জন্যেই খাদ্য গ্রহণ-বর্জন ব্যাপারে 'একবার যোগী, দু বার ভোগী, বারবার রোগী' কথাটি আজও আমাদের প্রবাদরূপে প্রচলিত। তা হলে, মানুষও যদি তার শ্বাসকার্যকে, খাদ্য গ্রহণ-বর্জনকে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলে, তারও আয়ু বেড়ে যাবে! এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে তাঁরা গড়ে তোলেন তাঁদের যোগশাস্ত্র, মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ-বর্জনকে নিয়ন্ত্রণ করবার নানান কৌশল (প্রাণায়ামাদি) আবিষ্কার করেন; চেষ্টা চালান একাহারী হওয়ার, সাময়িক উপবাস করার। আর, যেহেতু তাঁরা ছিলেন অখণ্ডজ্ঞানের কারবারি, মানবশরীরের সঙ্গে সমাজশরীরকে সমান্তরালভাবে দেখার অভ্যাস ছিল তাঁদের মজ্জাগত। তাই দেখা যায়, তাঁদের গ্রহণ-বর্জন বিষয়ক ধারণাটি তাঁরা সমাজশরীরেও প্রয়োগ করে গেছেন।

মৎস্যাবতারের প্রলয়ের সময় (৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগে-পরে) মহর্ষিরা পড়েছিলেন মহাবিপদে। কী করলে পর এই সামাজিক বন্যার তোড়ে আত্মরক্ষা করা যায়, এবং বন্যার পরেই বা কী করা হবে, তা নিয়ে তাঁদের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। তাঁরা আবিষ্কারক-মহর্ষিদের (শিবের) শরণাপন্ন হন, এমন ব্যবস্থার কথা তাঁরা জানতে চান, যা প্রলয়বন্যার তোড়েও সগৌরবে টিকে থেকে যাবে, আবার জল সরে গেলেও টিকে থাকতে তার কোনো অসুবিধে হবে না; এবং সর্বোপরি যে-ব্যবস্থা হবে দীর্ঘজীবী। এই সমস্যার সমাধান তাঁরা পেয়েছিলেন কচ্ছপ বা কূর্ম্মের[২২] মডেল অনুসরণ করে — কূর্ম্মাবতারে। সেই সমস্ত কাহিনীই আমাদের পূর্বপুরুষেরা লিখে রেখে গেছেন কূর্ম্মপুরাণে, যথারীতি ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায়।

তাঁরা বুঝেছিলেন, মানবদেহের গ্রহণ-বর্জনই সমাজদেহের আমদানি ও রপ্তানি। অভাবের বস্তুগুলিকে বাইরে থেকে আনা এবং উৎপন্নের উদ্বৃত্তকে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া সমাজশরীরের গ্রহণ-বর্জন। এটির পরিমাণ যত কমানো যাবে, সমাজশরীরের কাঠামোটি ততই দীর্ঘজীবী হবে; এই ছিল তাঁদের ধারণা। অর্থাৎ, আমদানি-রপ্তানি করার প্রয়োজন যত কম হবে তত দীর্ঘজীবী হবে একটি সমাজকাঠামো। তার মানে, এমন সমাজকাঠামো গড়ে তোলা দরকার, যে বাইরের উপর নির্ভর করবে না, স্বনির্ভরতাই হবে যে-সমাজের বিশেষত্ব। তা হলে তো এমনভাবে সামাজিক-উৎপাদন কর্মযজ্ঞ চালাতে হবে যাতে উদ্বৃত্ত না হয়, অভাবও না হয়; যাতে সমাজদেহের গ্রহণ-বর্জনের একটা বিশেষ মাত্রা থাকবে।

কিন্তু এই সামাজিক অধ্যাত্মবিদ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজদেহের শারীরিক গঠন কাঠামোটি গড়ে তোলা যাবে কেমন করে?

বাস্তবে তার রূপায়ণ তাঁরা করেছিলেন দু ভাবে। এক দিকে সেই মহাপ্লাবনের সাগরজলে খাড়া করা হয়েছিল চার পা-ওয়ালা চতুর্বর্ণ-ভিত্তিক গ্রামসমাজের কাঠামো,[২৩] আর তদ্রূপ অসংখ্য গ্রামসমাজের উপর দাঁড় করানো হয়েছিল দেশের প্রশাসনিক আমলাতান্ত্রিক (মন্দগতিসম্পন্ন) ব্যবস্থা স্বরূপ মন্দর[২৪] পর্বতকে। অপর দিকে চিরশত্রু দেবাসুর বা আদি প্রাইভেট-সেকটর ও আদি পাবলিক-সেকটরকে হাত ধরাধরি করে জনসমুদ্র-মন্থনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল; আর মন্থনরজ্জু রূপে ব্যবহারের জন্য তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল

সেকালের পুঁজির আধার 'সমাজের দুধ-সর পালক' সর্পকে। ফল হয়েছিল এই যে, ভারতসমাজকে প্রলয়ের তোড়ে ভেসে যেতে হয়নি।[১৫]

একালেও সার্বিক পরিস্থিতি বলতে গেলে আগের মতোই। মঞ্চে আধুনিক প্রাইভেট সেকটর ও আধুনিক পাবলিক সেকটর হাত ধরাধরি করে আধুনিক সর্পকে (পুঁজিকে) বিনিয়োগ করে আধুনিক অচলায়তন-রূপী আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে ঘোরাতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু সেই পর্বতের তলায় আধুনিক কূর্ম্মের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। পর্বতটিকে খাড়া রাখা যাবে কীসের উপর? এখন তো আর সেই আদি কূর্ম্মরূপী গ্রামসমাজ নেই। অবশ্য, সেদিক থেকে দেখলে, আদি কোনো কিছুই তো নেই; সবই রয়েছে তাদের আধুনিক রূপে। সে ক্ষেত্রে, অতএব সেই গ্রামসমাজের আধুনিক উত্তরসূরিকে চাই। কিন্তু তাকে যে কোথাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না; সেই হয়েছে মুশকিল!

অর্থাৎ একার্ণবের এই আধুনিক যাত্রাপালায় আদি একার্ণবের সব চরিত্রই তাদের আধুনিক উত্তরসূরিদের পাঠিয়ে দিয়েছে, একজনই শুধু গরহাজির — আদি গ্রামসমাজের উত্তরসূরি। তাকে ডাকাডাকি করে আনতে না পারলে একার্ণবের আধুনিক যাত্রাপালাটির পুনরাভিনয় হবে না! সুতরাং জানা দরকার, আদি 'গ্রামসমাজ' কেমন ছিল, তার কোনো উত্তরসূরি রয়েছে কি না, থাকলে কী রূপে রয়েছে এবং কীভাবেই বা তাকে এই যাত্রাপালার যোগ্য করে গড়ে নেওয়া যাবে।

কূর্ম্মাবতার অবতীর্ণ হওয়ার আগে পর্যন্ত ভারতের যে ইতিহাস, তাতে দেখা যায় সমাজে সম্প্রদায়-নেতা হিসেবে ব্রাহ্মণের জন্ম হয়ে গেছে; ব্রাহ্মণে-ব্রাহ্মণে বিরোধে জন্ম হয়ে গেছে ক্ষত্রিয়েরও। বৈশ্য ও শূদ্রের আদিপুরুষ হিসেবে অত্যন্ত অল্প সংখ্যায় নিষাদ ও পাষণ্ডেরও জন্ম হয়ে গেছে; যদিও মানুষে মানুষে ভেদাভেদ তখনও বলতে গেলে খুবই কম; কেবলমাত্র ব্রাহ্মণের উচ্চ মর্যাদা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যদিও অর্থসঞ্চয় করে ধনী হওয়াকে সেই ব্রাহ্মণ যারপরনাই ঘৃণা করে; যে-কারণে তাকে সম্প্রদায়ের নেতা করে দিতে সম্প্রদায়গুলি স্বভাবতই আগ্রহী ছিল। অতএব সম্প্রদায়কে চার ভাগে ভাগ করার জন্য যে-পূর্বশর্তের প্রয়োজন ছিল, মঞ্চে সেই চারটি চরিত্রই কমবেশি হাজির। কেবলমাত্র তাকে 'অফিসিয়ালি' ঘোষণা করতেই বাকি ছিল। কূর্ম্মাবতারে সেই ঘোষণাই করে দেওয়া হয়।

যতদূর বোঝা যায়, ভারতসমাজ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগেই; অর্থাৎ, হিন্দুধর্মের জন্ম হওয়ার প্রায় ১৫০০ বছর আগেই।

বৈদিকযুগের সূত্রপাতের যে-সমাজকাঠামো — অজস্র সম্প্রদায়ে সমাজটি বিভক্ত ছিল এবং এক বা একাধিক মহর্ষি এক-একটি সম্প্রদায়কে চালাতেন — বিগত প্রলয়ে ইতোমধ্যেই তা প্রায় ভেঙে পড়েছিল; তাই সমাজের পুনর্গঠন না-করে উপায় ছিল না। অতএব, এই নতুন কাঠামোয় গোটা সমাজকে পুনর্গঠন করে নেওয়ার প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হল। অত্যন্ত উৎসাহ ও উন্মাদনার সঙ্গে সম্প্রদায়গুলি স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে এইভাবে সেকালের মহর্ষিদের এই গ্রামসমাজের নীতি অনুসরণ করে ভাঙা আধ-ভাঙা সম্প্রদায়গুলিকে পুনর্গঠিত

করে নিল। এবং নিঃসন্দেহে এ ছিল এক বিরাট সামাজিক বিপ্লব। এর ফলে, উদ্ভবকালের সম্প্রদায়ভিত্তিক-মন্দিরকেন্দ্রিক বৈদিক সভ্যতা অতঃপর গ্রামসমাজভিত্তিক-মন্দিরকেন্দ্রিক বৈদিক সভাতায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। বৈদিক সভ্যতার স্বর্ণযুগ শুরু হল।

পরিকল্পনাটি ছিল চমৎকার! প্রতিটি গ্রামসমাজ হবে পুরোপুরি কচ্ছপের মতো। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র হবে তার চার পা, মাথাটিতে থাকবে পরিকল্পনাকারী ব্যাসেরা এবং যখন প্রয়োজন সবই অন্তর্হিত হবে খোলসের ভিতরে। শ্বাসপ্রশ্বাস সে চালাবে খুবই কম, অর্থাৎ আমদানি-রপ্তানি সে করবেই না, করলেও অত্যন্ত কম। গ্রামে যা উৎপন্ন হবে, তা গ্রামের সদস্যদের প্রয়োজনেই খরচ হয়ে যাবে। তাঁতি-মুচি-কামার-কুমোর-তেলি-তামলি-বদ্যিরা গ্রামের প্রয়োজন মেটাবে, পরিবর্তে তাদের প্রয়োজনও মিটিয়ে দেবে গ্রামেরই জেলে-কৈবর্ত হেলে-কৈবর্তরা, ক্ষত্রিয় ও পুরোহিতরা। ...

কিন্তু এরপর যা ঘটল, সে আমাদের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও দেশভাগের মতো। ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ আমাদের বঙ্গভাষীদের সমাজে ফাটল ধরানোর জন্য বঙ্গ বিভাজনের পরিকল্পনা করল। আমরা ক্ষেপে গেলাম, আমাদের সাধের বঙ্গদেশকে কিছুতেই ভাগ করতে দেব না। ৪২ বছর ধরে বিস্তর চেঁচামেচির পর ১৯৪৭ সালে যখন আমরা স্বাধীন হলাম, দেখলাম আমাদের সাধের বাংলায় আর ফাটল নেই, একেবারে দু টুকরো হয়ে গেছে।

গ্রামসমাজ গড়ে তোলার ৫০০ বছরের মধ্যেই দেখা গেল, মর্যাদার অসাম্য সেই গ্রামসমাজকে গ্লানিতে ভরিয়ে তুলেছে। বৈদিক সভ্যতার স্বর্ণযুগ সম্প্রদায়ের জন্য আর স্বর্ণ প্রসব করছে না; যতটুকু করছে তার অনেকাংশই ব্রাহ্মণের জন্য। ব্রাহ্মণও তার ব্রহ্মগুণ হারিয়ে ক্রমশ বংশানুক্রমিক পুরোহিতে পরিণত হয়েছে, তার খাঁই গেছে বেড়ে, ক্ষত্রিয় সে-খাঁই মেটানোর জন্য বাকি সমাজসদস্য বৈশ্য ও শূদ্রদের যতখানি নিপীড়ন করা দরকার, তার প্রায় সবই করতে শুরু করে দিয়েছে। আরও কী কী ঘটেছে, পুরাণাদিতে ও বৌদ্ধসাহিত্যে তার ভূরি ভূরি নিদর্শন ও সংবাদ রয়েছে। ...

ব্রহ্মগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণের কাছ থেকে এমন ব্রহ্মগুণহীন ব্যবহার ভারতসমাজ আশা করেনি। ফলত, মহর্ষি গৌতমের গোত্রাপত্যদের ভিতর থেকেই অচিরে বুদ্ধের জন্ম হয়ে গেল। ব্রাহ্মণ কৌটিল্য কুশদের, কুশিক মুনির উত্তরাধিকারীদের নাশ করতে শুরু করে দিলেন। অশোকের হাত ধরে (১০০ খ্রিস্টাব্দের আগে পরে) বৌদ্ধধর্ম ভারতের বৈদিক গ্রামসমাজকে প্রায় ভেঙে ফেলে আধা-নগর আধা-গ্রামভিত্তিক মঠকেন্দ্রিক ষোড়শ মহাজনপদ গড়ে (রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে) তবে শান্ত হল। ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে এই বিপ্লবে মুখ্য রূপে ব্রাহ্মণের দোষগুলিকেই দেখা হল, তার মহত্তম অর্জনগুলিকে আত্মস্থ করা হল না। এ অবিচার প্রকৃতি সইবে কেন!

ফলত, বিপ্লবোত্তর মঠকেন্দ্রিক এই বৌদ্ধসমাজ, পূর্ববর্তী বৈদিক সমাজের শেষ লগ্নের মতোই, মৌলবাদী হয়ে পড়তে খুব বেশি দেরি করেনি। আর তা ছাড়া; যে-সমাজের মনের গভীরে বদ্ধমূল-ধারণায় রয়েছে পুঁজির প্রতি তীব্র বিরাগ, সে সমাজ কি দৈবের প্রাবল্য, বৌদ্ধযুগের শ্রেষ্ঠীদের রমরমা, মঠাধীশদের অনাচার বেশিদিন সইতে পারত? তার ওপর তার

ছিল বৈদিক সভ্যতার স্বর্ণযুগের সুখস্মৃতি। সে কারণে ভারতবর্ষে মঠের শাসনের উচ্ছেদ হতে খুব বেশি দেরি হল না। শঙ্করাচার্যের নেতৃত্বে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে 'হিন্দুধর্ম' নামে পুরুষকারের জয়জয়কার ঘোষিত হয়ে যায়, মন্দিরের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

এ-ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদের এক ধরনের 'কাউন্টার রেভলিউশন'; যে কারণে রবীন্দ্রনাথ একে বলেছেন 'প্রতিক্রিয়া'।[২৬] দেখা গেল, বৈদিকযুগের শেষে গ্রামসমাজের স্বভাবে যে-ব্রাহ্মণ্যবাদ ঘৃণিত হয়ে উঠেছিল এবং সেকারণেই বৌদ্ধযুগে তাকে ভেঙে ফেলা হয়েছিল, হিন্দুযুগের সূত্রপাতে সেই ব্রাহ্মণ্যবাদকে আইনসঙ্গতভাবে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা দেওয়া হল — জন্ম হয়ে গেল দ্বিতীয় যুগের গ্রামসমাজের। আদি-গ্রামসমাজের প্রতিষ্ঠাকালে মর্যাদার অসাম্যকে 'সামঞ্জস্য'-এর দ্বারা মৃদু করে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কালে কালে সেই গ্রামসমাজ মৌলবাদী হয়ে উঠলে মর্যাদার অসাম্য প্রখর হয়ে উঠল এবং ভারতবাসীর মনে আপত্তি দেখা দিল; সেই মৌলবাদী-গ্রামব্যবস্থার বিরোধিতা করতে গিয়ে (১০০ খ্রিস্টাব্দে বৌদ্ধযুগের শুরুতে) সেই আদি গ্রামসমাজকে প্রায় ভেঙে ফেলা হয়েছিল; (৭৫০ খ্রিস্টাব্দে হিন্দুযুগের শুরুতে) সেই মর্যাদার অসাম্যই ভারতবাসীর উপর সম্পূর্ণ রূপে চেপে বসে গেল।

এরকমই হয়। এতকাল এর জন্য আমরা ব্রাহ্মণ্যবাদকে অকারণ দোষারোপ করে এসেছি। নিপীড়কের পাপ ষোলো কলায় পূর্ণ হওয়ার আগে, বিপ্লবের সকল উপাদানগুলি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হওয়ার আগে বিপ্লবের ডাক দিলে এরকমই হয়। তাই, সমস্ত অকালবোধনের শেষ ফল হয় একেবারেই উলটো। চোখের সামনে আমাদের নকশালবাড়ি, রাশিয়ার নারদনিকরা তো রয়েছেনই। আর, বৌদ্ধযুগের রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠার আগে রামচন্দ্র তো 'অকালবোধন' করেই 'পুরোহিত শ্রেষ্ঠ রাবণ'কে হত্যা করেছিলেন! সুতরাং এই প্রতিক্রিয়া অনিবার্যই ছিল। স্বভাবতই রাম ও বাল্মীকিদের উপর কঠোর শাস্তি নেমে আসে।[২৭]

বলে রাখা যাক, তার আগে পর্যন্ত আমরা ভারতবাসীরা বৈদিক হয়েছিলাম, তান্ত্রিক হয়েছিলাম (যার ভিতরে উপজাতিরাও রয়েছেন), বৌদ্ধ হয়েছিলাম — খ্রিস্টান, ইসলাম, কবীরপন্থী, নানকপন্থী, বৈষ্ণব, এ সব কী বস্তু, তখনও আমরা তা জানতাম না।

সে যাই হোক, সনাতন যুগ থেকে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে হিন্দুযুগে এসে অবশেষে আমরা নিয়মতান্ত্রিক গ্রামসমাজ গড়ে ফেললাম, যা ব্রিটিশযুগের আগে পর্যন্ত প্রায় অক্ষত ছিল।

সনাতন যুগের ভারতসমাজ	—	(স্বাভাবিক) সম্প্রদায়ভিত্তিক নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা
বৈদিক যুগের ভারতসমাজ	—	(নিয়মতান্ত্রিক) সম্প্রদায়ভিত্তিক মন্দিরকেন্দ্রিক সভ্যতা
বৈদিক ভারতসমাজের স্বর্ণযুগ	—	(প্রায় স্বাভাবিক) **গ্রামসমাজ**ভিত্তিক মন্দিরকেন্দ্রিক সভ্যতা
বৌদ্ধ যুগের ভারতসমাজ	—	আধা নগর আধা গ্রামভিত্তিক মঠকেন্দ্রিক সভ্যতা
হিন্দু যুগের ভারতসমাজ	—	(নিয়মতান্ত্রিক) **গ্রামসমাজ**ভিত্তিক মন্দিরকেন্দ্রিক সভ্যতা

কত শক্তিশালী ছিল এই গ্রামসমাজ, তার বিবরণ দিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ ও কার্ল মার্কস। রবীন্দ্রনাথের কথা এখন থাক, এখন বরং মার্কস সাহেবের কথাই হোক। ১৮৫২ সালে তিনি লিখছেন, '*হিন্দুস্তানের সমস্ত ঘটনাপরম্পরা যতই বিচিত্র রকমের জটিল, দ্রুত ও*

বিধ্বংসকারী বলে মনে হোক না কেন, এই সবকিছু, গৃহযুদ্ধ, অভিযান, উৎপ্লব, দিগ্বিজয় ও দুর্ভিক্ষ তার উপরিভাগের নীচে নামেনি।'[২৮] নামবে কী করে? এ সমাজকাঠামোর মডেল যে বানানো হয়েছিল 'কচ্ছপ'-এর অনুকরণে, 'যে কচ্ছ বা খোলা দ্বারা আপনাকে রক্ষা করে'; উপর থেকে ডাণ্ডা মেরে কচ্ছপের কি কোনো ক্ষতি করা যায়? যায় না। সব আঘাতই তার উপর দিয়ে বয়ে যায়। যে-আক্রমণকারীই আসুক, গ্রামসমাজের পরিচালক পুরোহিত গাঁওবুড়ো তাকে তার প্রাপ্য-খাজনা দিয়ে বিদেয় করে, তারপর যেমন চলছিল চলতে থাকে। তার গ্রাম তো কারও ওপর নির্ভরশীল নয়। হ্যাঁ, কিছু লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে, কিছু হয়েছে বৈষ্ণব, আউল-বাউল। তাতে কী! তারা তো গ্রামসমাজের আবহাওয়ার ভিতর থেকেই জন্মেছে। স্বভাবতই নতুন ধর্ম গ্রহণ করেও গ্রামসমাজের পুরোনো অভ্যাসমতোই তারা তাদের জীবনযাত্রা অতিবাহিত করেছে।

দেখেশুনে মার্কস সাহেব বলছেন, '*আরবী, তুর্কী, তাতার, মোগল, যারা একের পর এক ভারত প্লাবিত করেছে, তারা অচিরেই হিন্দুভূত হয়ে গেছে; ইতিহাসের এক চিরন্তন নিয়ম অনুসারে বর্বর বিজয়ীরা নিজেরাই বিজিত হয়েছে তাদের প্রজাদের উন্নততর সভ্যতায়।*'[২৯] তার মানে 'সভ্যতা'র বিচারে বৈদিকযুগের গ্রামসমাজ ছিল উন্নত, যদিও বৌদ্ধযুগে তা প্রায় ভেঙে পড়েছিল, হিন্দুযুগে এসে তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়; এমনভাবে যে, তার পর থেকে আরও প্রায় ১০৫০ বছর ধরে দেশবিদেশের নানা আক্রমণ তার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে, কিন্তু তার '*উপরিতলের নীচে*' নামতে পারেনি, ভারতীয় কচ্ছপ বা গ্রামসমাজ যেমন ছিল তেমনই অক্ষত থেকে যেতে পেরেছে।

তবে এই গ্রামসমাজ মানুষের মানবিক বিকাশের পক্ষে কত ভয়ানক ও ক্ষতিকর হয়ে উঠেছিল, কীরকম 'জড় ও উদ্ভিদসুলভ জীবনে' ভারতবাসীকে অভ্যস্ত করে তুলেছিল তার বিস্তারিত বিবরণ মার্কস ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই দিয়ে গেছেন। আর (১৮৫২ সালে) মার্কস জানিয়ে গেছেন, যে, সেই কচ্ছপকে বিগত ১০৫০ বছর ধরে কেউ নাড়াতে না পারলেও, ব্রিটিশ এসে সেই কচ্ছপকে উলটে দিয়েছিল। পাঠক নিশ্চয় জানেন, কচ্ছপকে চিৎ করে দিলেই তার সব জারিজুরি শেষ হয়ে যায়। মার্কসের মতে, '*ব্রিটিশেরাই হল প্রথম বিজয়ী যারা হিন্দুসভ্যতার চেয়ে উন্নত এবং সেইহেতু তার কাছে অনধিগম্য। দেশীয় গোষ্ঠীগুলিকে ভেঙে দিয়ে, দেশীয় শিল্পকে উন্মূলিত করে এবং দেশীয় সমাজে যা কিছু মহৎ ও উন্নত ছিল তাকে সমতল করে দিয়ে ব্রিটিশেরা সে সভ্যতাকে চূর্ণ করে। ...*' [২০]

'*যা কিছু মহৎ ও উন্নত ছিল, তাকে সমতল করে*' দেওয়ার পরেও যে এই গ্রামসমাজের 'প্রাণশক্তি' সম্পূর্ণ নিঃশেষ না-হয়ে কিছুটা থেকে যায়, পরে মার্কস সাহেবই তা স্বীকার করেছেন। '*আমরা জানি, গ্রাম-গোষ্ঠীগুলির পৌর সংগঠন ও অর্থনৈতিক ভিত্তি ভেঙে গেছে, কিন্তু এগুলির যা সর্বমন্দ দিক — বাঁধিগৎ ও বিচ্ছিন্ন কণিকায় সমাজের বিচূর্ণীভবন, সেটার প্রাণশক্তি এখনো বজায়।*' [২০]

ভারত স্বাধীন হওয়ার পরও দেখা যায় এই 'প্রাণশক্তি' তখনও বজায় রয়েছে। কিন্তু

পশ্চিমবাংলায় গ্রামসমাজের এই শেষ 'প্রাণশক্তি'কে তলানিতে ঠেকিয়ে দেন বামপন্থীরা; নিজেদের অজান্তেই। তাঁদের কর্মসূচিতে সেরকম কোনো ইঙ্গিত পর্যন্ত ছিল না, তাঁরা নেহাতই ইতিহাসের ক্রীড়নক হিসেবে কাজটি করতে থাকেন; বলা ভাল, সনাতন প্রতিক্রিয়ামূলক বদ্ধমূল-ধারণার ইচ্ছা তাঁদের মাধ্যমে কাজটি সেরে ফেলে, তাদের অজান্তেই।[২৯] বঙ্গসমাজে প্রায় ২৬০০ বছর ধরে চলে আসা মর্যাদাবানদের মর্যাদা ১৯৭০-৮০র 'গ্রামদখলের ঝড়ে' ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তলানিটি থেকে যায়।

গ্রামগুলিতে সামাজিক চার-পাওয়ালা কাঠামোটি আজ আর নেই, মর্যাদাবানদের মর্যাদাই শুধু নয়, কারও মর্যাদাই আর নাই — সব্বাই সমান মর্যাদাহীন! এই শূন্য অবস্থান থেকে গ্রামবাংলার মানুষ সকলের মর্যাদা সমানতালে একটু একটু করে প্রতিষ্ঠা করার দিকে এগোতে শুরু করেছেন প্রায় ২০০০ সাল থেকে। প্রত্যেক গ্রামে এখন দুটি ক্ষমতাকেন্দ্র — গ্রামের পার্টি কমিটি এবং গ্রামের 'ধর্মীয়' কমিটি। অধিকাংশ গ্রামেই ধর্মীয় কমিটিটি রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিচারে একেবারেই শক্তিহীন, কিন্তু 'ধর্ম'-নামে দাগানো সামাজিক আচার আচরণ বিষয়ে এখনও সম্পূর্ণ কর্তৃত্ববান। এটিকে বামপন্থীরা নির্মূল করতে পারেননি। কারণ, এই ধর্মীয় কমিটিটি গ্রামের মানুষের তলানিতে পৌঁছে যাওয়া 'কুলাচার' (culture)-এর আধার হিসেবে কাজ করে, যার ভিতরে নিহিত রয়েছে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের শক্তি।

কিন্তু এই অধ্যাত্মবাদ তো আদৌ religious philosophy নয়, এই ধর্মও religion নয়। কেননা, আমাদের অধ্যাত্মবাদ ও ধর্মের সঙ্গে ইয়োরোপের religious philosophy ও religion-এর সাদৃশ্য ও পার্থক্য অনেকটাই হিমালয়ের সঙ্গে উইয়ের ঢিবির সাদৃশ্য ও পার্থক্যের মতো। কারণ, এই অধ্যাত্মবাদ হল মানুষের সামগ্রিক জ্ঞানের আধার, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম (religion) ও তার ঈশ্বর (God) এর নিমিত্ত মাত্র। মার্কসীয় তত্ত্বের অর্জন এই অধ্যাত্মবাদের তুলনায় যথেষ্ট নিকৃষ্ট। সে কারণেই গ্রামবাংলা দখল করে নিলেও, 'গ্রামসমাজের' কাঠামো ইত্যাদি ধ্বংস করে দিলেও, গ্রামবাংলার মন থেকে এই অধ্যাত্মবাদকে, মানবিক অর্জনের হিসেবে হীনবল মার্কসীয় তত্ত্ব এখনও 'রিপ্লেস' করতে পারেনি এবং কোনোদিনই তা পারবে না। বলতে কী, আধুনিক পৃথিবীর সমস্ত সামাজিক তত্ত্বই ভারতের অধ্যাত্মবাদের ভৈরবদের কাছেই হেরে বসে আছেন, পরাজিত আধুনিকতাবাদীরা যেকারণে ভারতীয় 'মিস্টিসিজম'-এর দুয়ারে গিয়ে প্রার্থীরূপে কড়া নাড়তে লেগেছেন; ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের শিব তো এখনও যুদ্ধেই যাননি।[৩০]

অপর দিকে, আমদানি-রপ্তানি বা গ্রামসমাজের গ্রহণ-বর্জনের অবস্থা পৌঁছেছে একেবারে বিপরীত মেরুতে — 'গ্রামসমাজ' তো নেই, গ্রামবাংলা নামে যে সমাজখণ্ডটি এখন আছে, সে এখন প্রধানত রপ্তানির জন্যই উৎপাদন করে।[৩১]

তার মানে, গ্রামসমাজের মন্দটুকুর দোষে তার কাঠামোটাই নিশ্চিহ্ন, মন্দটুকুও নিঃশেষিত। আছে কেবল তার অধ্যাত্মবাদের শক্তি। ... এই অবস্থায়, একালের প্রলয়বন্যার উপযোগী কৃষ্টিকে পাওয়া যাবে কীভাবে?

যাকে কর হীন, সেই রাখে দিন
বাংলার গ্রাম্য প্রবাদ

একার্ণবকালীন মন্ত্র : এখনই যা জপতে শুরু করতে হবে

কিছুদিন আগে আনন্দবাজার পত্রিকার এক সংবাদ-বিশ্লেষক লিখেছিলেন, বাঙালির যে ঘরকুনো স্বভাব, যা এতদিন যথেষ্ট নিন্দিত ছিল, একালের ইন্টারনেট যুগে সেই স্বভাবটাই বাঙালির প্লাস-পয়েন্ট হয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে দিনের পর দিন বসে থেকে আজকের বাঙালি সহজেই ইন্টারনেটের এই যুগে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিতে পারছে। আর বাস্তব তো এরকমই! প্রেক্ষাপট বদলে গেলে ভালটা মন্দ এবং মন্দটি ভাল হয়েই যেতে পারে!

তবে, তার জন্য নিজেকে আপডেটেড করে নিতে হয়, ঘরকুনোকে ইন্টারনেট শিখতে হয়। যে-'গ্রামসমাজ'কে এতকাল হীন বলে নিন্দা করে, যাচ্ছেতাই করে, নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার যারপরনাই চেষ্টা করেছি, সেই হীনই আজ প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে। এর যে শক্তির ও ভালর দিক ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই এবং আর কেউ না-বুঝুক, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেই তা অনুভব করেছিলেন। তাই গ্রামসমাজের কথা তাঁরা তাঁদের পরিকল্পনায় এনেছিলেন। কিন্তু অন্তত দুটি কারণে তাঁদের সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। প্রথমত, সেকালের গ্রামসমাজের উচ্চনীচ ভেদগ্রস্ত মডেলটি এ যুগে চলতে পারে না, এবং দ্বিতীয়ত সে মডেলকে আপডেট করার পরিকল্পনা করলেও তাকে রূপায়ণ করার মতো পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার দরকার ছিল। গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের কালে প্রেক্ষাপটের সেরকম বদল ঘটেনি।

আজ প্রেক্ষাপট বদলে গেছে। আজকের এই বিশ্বায়নের তোড় থেকে বাঁচার জন্য, বিশ্বায়ন-পরবর্তী বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য আমরা পুনরায় সেই আদি স্বনির্ভর গ্রামসমাজকে চাই, অবশ্যই তার আধুনিক 'আপডেটেড' রূপে। তার ভাল গুণগুলিকে চাই — 'সনাতন পৃথিবীর আধ্যাত্মিক অর্জন' তার থাকবেই, সে 'অসীম মানুষ'কে, 'অল-রাউন্ডার মানুষ'কে ধারণ করতে পারবে, সে হবে স্বনির্ভর, সে আমদানি-রপ্তানি সাধ্যমত না-করেই কাটাতে সক্ষম হবে, তার ভিতরে উচ্চনীচ ভাব থাকবে না, মর্যাদার অসাম্য থাকবে না, সমমর্যাদা তো থাকবেই, সম্ভব হলে পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহারের সম্বন্ধে উত্তীর্ণ হওয়ার চেষ্টাও তার থাকবে; আবার, সে বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কহীন 'অচল জড় উদ্ভিদসুলভ জীবনে' বিশ্বাসী হবে না, হবে সচল সচেতন মানুষসুলভ জীবনে বিশ্বাসী। কেবল তাই নয়, এই মুহূর্তে বিশ্বরাষ্ট্র গঠনচেষ্টা অকালবোধন বলে মনে হলেও, কাল যদি পরিস্থিতি বদলে যায় এবং নেহাত বিশ্বরাষ্ট্র বলে কিছু একটা গড়ে উঠতে চায়ই,[২৫] সে ক্ষেত্রে ওই 'আপডেটেড' গ্রামসমাজই তার ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। কীভাবে একই অঙ্গে তার এত রূপ সম্ভব? সর্বোপরি তাকে গড়ে তোলা যাবে কেমন করে?

আগামী সমাজে যার জন্ম হবে, তার ভ্রূণ নাকি বর্তমান সমাজেই দেখতে পাওয়া যায়। তো, বিশ্বায়ন-পরবর্তী কালে আমাদের রক্ষাকর্তারূপে যে-সত্তাটি আসবে, তাকেও নিশ্চয় কোনো না কোনো রূপে বর্তমান সমাজেই দেখতে পাওয়া যাবে। কে সে?

আমার বিচারবুদ্ধি মতে, সেই ভ্রূণের নাম 'স্বনির্ভর গোষ্ঠী'। এনজিও-দের হাত ধরে এবং সরকারের সহযোগিতায় এই গোষ্ঠীগুলি নানাভাবে নানারূপে গড়ে উঠছে। কোনো কোনো অঞ্চলে গোটা গ্রামকেই, কিংবা বেশ কয়েকটি গ্রামকেই এই 'স্বনির্ভর গোষ্ঠী'র অন্তর্ভুক্ত করে গড়ে তোলা হচ্ছে; যদিও তাদের সংখ্যা খুবই কম। যতদূর বুঝেছি, এই ভ্রূণ থেকেই জন্ম নিতে পারে আদি স্বনির্ভর গ্রামসমাজের আধুনিক উত্তরসূরি, যার নাম হতে পারে 'স্বনির্ভর স্বশাসিত অঞ্চল'। প্রদত্ত পরিস্থিতিতে পূর্বতন অভিজ্ঞতাবলীর সাহায্যে আসন্ন ভবিষ্যতের কথা ভেবে এই 'স্বনির্ভর স্বশাসিত অঞ্চল' গড়ে তোলা যাবে। এরই উপর নির্ভর করে দাঁড়াবে আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা, এবং সেই ব্যবস্থাকে পাবলিক সেকটর ও প্রাইভেট সেকটর পরস্পরের বিপরীত দিকে দেবাসুর হয়ে টানবে; তারই টানে সে ঘুরবে; জনসমুদ্র মথিত হয়ে মানুষের শ্রেষ্ঠ অর্জনগুলি উঠে আসবে। আর, অবশ্যই সেই অর্জন যাতে যথাবিহিত নিয়মে বিতরিত হতে পারে তার 'স্বাভাবিক' নিয়ম বলবৎ করা থাকবে।

কীভাবে এই 'স্বনির্ভর স্বতন্ত্র অঞ্চল' বা আমরা গড়ে তুলতে পারি?

এইখানে নির্ভর করতে হবে আমাদের আবিষ্কারকদের ওপর, হিরের টুকরো ছেলেদের ওপর, শিবশক্তির বাহন বৃষদের উপর, তাঁদের কল্পনাশক্তি ও সৃষ্টিশীল চিন্তাভাবনার ওপর; তাঁদের উপস্থাপিত প্রকল্পের ওপর। যে একটি বা কয়েকটি প্রকল্পকে সবচেয়ে যথাযথ বলে মনে হবে, তার সাময়িক প্রয়োগ করে, দেখে, গড়ে তুলতে হবে একটি সার্বিক প্রকল্প। তার পর সে-প্রকল্পের বাস্তব রূপায়ণে হাত লাগাতে হবে। বাংলায় যদি তা সফল হয়, হয়ে বিশ্বায়নের অশুভ ফলের হাত থেকে আমাদের বাঁচাতে পারে, তা হলে সারা ভারতই তাতে আগ্রহান্বিত হতে পারে; আগ্রহান্বিত হতে পারে সারা পৃথিবীই। তা হলে আজ বাংলাই কেন ভারতকে এবং পৃথিবীকে পথ দেখাবে না!

'মুক্তি? ওরে, মুক্তি কোথায় পাবি, মুক্তি কোথায় আছে!
আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন প'রে বাঁধা সবার কাছে। ... ...
কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে ঘর্ম পড়ুক ঝরে।' [৩২]

ভারতীয় 'অপর'-এর স্বপ্ন

সমগ্র ভাবনাচিন্তার উপস্থাপক হিসেবে আমার অন্ততপক্ষে একটি প্রকল্প হাজির করার দায় থেকে যায়। সেই সুবাদে আমার সাধ্যমত একটি প্রকল্পের খসড়া আমাকে রাখতেই হচ্ছে। অবশ্যই এটি একটি প্রাথমিক খসড়া মাত্র। এ বিষয়ে যাঁরা যোগ্য মানুষ, তাঁরা আরও ভাল ও ত্রুটিহীন প্রকল্প দিতে পারবেন, আশা রাখি।

স্বনির্ভর স্বতন্ত্র অঞ্চল (স্ব-স্ব-অঞ্চল)

মানুষ কীভাবে তার শরীর রক্ষা করবে, কখন খাবে, ঘুমোবে, কাজ করবে, কখন যোগব্যায়াম করবে, কখনই-বা নাচগান করবে, দলবদ্ধ হয়ে বা একলা কোন অচিনের পেছনে কখন ছুটবে— এ সবই ঠিক করে তার মন। স্ব-স্ব-অঞ্চলের 'আঞ্চলিক মন'-এর পালন-পোষণ,

রক্ষণাবেক্ষণ ও বিকাশ সাধনের পরিকল্পনা তাই সমগ্র প্রকল্পের আগে স্থান পাবে। এই কাজে আমাদের সবচেয়ে বড় সহায়ক 'সনাতন পৃথিবীর বদ্ধমূল ধারণা'গুলি। এই ধারণাগুলির মূলে রয়েছে 'সো-অহং'-এর ধারণা, যা প্রায় সব ধর্মের সর্বোচ্চ মনীষার অর্জন। ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্যার এই অর্জনের পালন-পোষণ ও বিকাশসাধনকেই রাখতে হবে সর্বাগ্রে। এর বিস্মৃত দিকটি পুনরুদ্ধার করে নেওয়ার উপায় সম্প্রতি পাওয়া গেছে, তা পুনরুদ্ধার করে নিয়ে স্ব-স্ব-অঞ্চলের হাতে দিয়ে দিতে হবে। তাতে কে শিব, কে নারায়ণ, কে ব্রহ্মা, কে ইন্দ্র, কে অগ্নি, কেই বা মিত্রাবরুণ, কে মহামায়া, কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী — তাঁদের সবাইকে চেনা যাবে, তাঁদের আরাধনা করা যাবে সঠিক ভাবে। এটি হাতে থাকলে, কোনো ধরনের কোনো মৌলবাদই স্ব-স্ব-অঞ্চলের গায়ে ঘেঁষতেই পারবে না, বিজেপি-আল কায়দা — এসব ফুৎকারে উড়ে যাবে।

এই অধ্যাত্মবিদ্যা হল অখণ্ডবিদ্যা, তাতে বিন্দু থেকে সিন্ধু পর্যন্ত একসঙ্গে দেখা হয়। স্বভাবতই চিন্তার নজর থাকবে বিশ্বের একক রূপে 'স্ব-স্ব-অঞ্চল'-এর উপর এবং সেগুলির যোগফলে যে-বিশ্ব গড়ে ওঠে তার ওপর। ভাবনার ভিত্তি এই বিন্দু থেকে সিন্ধু পর্যন্ত প্রসারিত থাকবে। যেহেতু মানুষের মনের সর্বোচ্চ তৃপ্তিলাভ ও শান্তিলাভই (ব্রহ্মলাভই) শেষ বিচারে মানবজীবনের সার্থকতা বোঝায়, মানুষের জীবনযাত্রা, সেই জীবনযাত্রার সহায়ক সমাজব্যবস্থা — সবই সেই উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত ও পরিচালিত হবে। আর, মানুষের জীবনের সেই সার্থকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করেই বাকি বিষয়গুলিকে দেখতে হবে, কার্যকরী করতে হবে। এরই উপর নির্ভর করে গড়ে তুলতে হবে স্ব-স্ব-অঞ্চলের সাংস্কৃতিক (শিক্ষা), রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কাঠামো। এর ভিতরে রাজনৈতিক দিকটির কথা বলব সংক্ষেপে, কেননা, অন্যত্র আমি সে-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ইতোমধ্যেই করেছি।[৩৩]

স্বনির্ভর-স্বতন্ত্র-অঞ্চলের রাজনৈতিক ব্যবস্থাটি হবে একটু নতুন প্রকৃতির। এটি কয়েকজন মানুষকে নিয়ে 'স্বনির্ভর গোষ্ঠী' হবে না, চতুষ্পদ কচ্ছপের অনুকরণে সেকালের গ্রামসমাজের মতো তো কিছুতেই হতে পারবে না, আবার 'স্বনির্ভর জেলা'ও হতে পারবে না। যত দূর বুঝেছি, এখন যে 'অঞ্চল-পঞ্চায়েত'গুলি রয়েছে, তাদের ৫/৭টির একটুখানি রকমফেরই হতে পারে এই নতুন গ্রামসমাজের মডেল। জনসংখ্যা ও ভৌগোলিক বিচারে তার একটা মোটামুটি নির্দিষ্ট মান ঠিক করে নিতে হবে। আমার বিচারে ৪০ থেকে ৫০ হাজারের মতো ভোটার সংখ্যা হবে, এমন জনসংখ্যা হলেই ঠিক হবে, এবং ভৌগোলিক এলাকা যেন অনেক বড়ো না হয়, খুব ছোটও না হয়। এর চরিত্র হবে 'গ্রামীণ শহর' বা 'শহুরে গ্রাম'-এর মতো। গ্রাম ও শহরের সুবিধাগুলি এতে থাকবে, অসুবিধাগুলি থাকবে না। পাকা রাস্তা, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, বাড়িঘর, ব্যাঙ্ক, দোকানহাট যেমন থাকবে, তেমনি শস্যক্ষেত্র থাকবে, জলাশয় থাকবে, বাগান থাকবে, অবকাশ থাকবে।

প্রতিটি স্ব-স্ব-অঞ্চলের থাকবে বিধানসভার মতো একটি করে অঞ্চলসভা (গোলোক)। এ হবে যেন একটি অণুরাষ্ট্র, যার সঙ্গে তার জনসাধারণ সরাসরি যুক্ত হতে পারে। অঞ্চলসভার

প্রতিটি (কমবেশি ১০০০ জন ভোটারে একটি) আসন থেকে একজন পুরুষ ও একজন নারী নির্বাচিত হবেন; কিন্তু অঞ্চলসভার পুরুষ-সভাপতি ও মহিলা-সভাপতি নির্বাচিত হবেন সরাসরি অঞ্চলের সমস্ত ভোটারের ভোটে। প্রত্যেকের থাকবে দুটো করে ভোট। অঞ্চলগুলির নেতা-নেত্রীর দুটি করে ভোটে গড়ে উঠবে জেলা, প্রদেশ, রাষ্ট্রের পরিচালক-সভাগুলি, যেগুলিতে প্রতিটি আসন হবে একজন পুরুষ ও একজন নারীর জন্য। ভবিষ্যতে যদি কখনও বিশ্বরাষ্ট্র গঠিত হয়, এই অঞ্চলগুলির প্রত্যেকটির নির্বাচিত নেতা-নেত্রীর দুটি করে ভোট যাবে সেই বিশ্বরাষ্ট্রসভা গঠিত হওয়ার জন্য। কেবলমাত্র এই স্ব-স্ব-অঞ্চলের নেতা-নেত্রীরাই জনসাধারণের ডকুমেন্টেড প্রকাশ্য ভোটে নির্বাচিত হবেন[৩৩], আর তার ওপরে সমস্ত উচ্চ সভাগুলির সদস্যরা নির্বাচিত হবেন পরোক্ষ ভোটে, অর্থাৎ স্ব-স্ব-অঞ্চলের পুরুষ সভাপতি ও মহিলা সভাপতির দ্বারা। যে-কোনো উচ্চতর নেতৃত্বকে 'রিকল' করার অধিকার থাকবে অঞ্চল সভাপতিদের এবং পরিবর্তে নতুন নেতা পাঠানোর অধিকার থাকবে। জেলা, প্রদেশ ও কেন্দ্রের নেতাদের উচ্চতর নেতৃত্বকে নির্বাচন করার জন্য কোনো ভোটাধিকার শুরু শুরুতে থাকলেও পরে আর থাকবে না।

প্রতিটি স্ব-স্ব-অঞ্চলের নিজস্ব পুলিশী-ব্যবস্থা ও আদালত থাকবে। যে-স্বনির্ভর স্বতন্ত্র অঞ্চলে আদালত ও পুলিশী-ব্যবস্থার কোনো প্রয়োজনই থাকবে না, আদর্শ স্ব-স্ব-অঞ্চলের সেটি হবে একটি বিশেষ গুণ। স্ব-স্ব-অঞ্চলের সোনার ছেলেরা অঞ্চলের সমস্ত প্রশাসনিক বিষয়গুলি দেখাশুনা করার জন্য নিযুক্ত হবেন, তাদের নিয়োগ করবেন অঞ্চলের মহিলা সভাপতি। বাইরে থেকে আনা, আবিষ্কার করা, উদ্ভাবন করা, এ সব বিষয়ে সর্বোচ্চ অধিকারী হবেন পুরুষ সভাপতি, কিন্তু যে সব বিষয় প্রচলিতকে ধারণ করে পালন-পোষণ করে রাখার ব্যাপার, সেগুলির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অধিকারী হবেন মহিলা সভাপতি। ...

কিন্তু কাদের এই অঞ্চলগুলির নেতা-নেত্রী রূপে নির্বাচিত করা হবে, কীভাবে করা হবে — এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বলতে গেলে, তারই উপর এই ব্যবস্থাটি টিকে থাকবে। তাই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে লিখতে হয়েছে এই গ্রন্থের চতুর্থ নিবন্ধে। এখানে তার পুনরুক্তি করছি না।

স্ব-স্ব-অঞ্চলের অর্থনীতির মূল লক্ষ্য অঞ্চলটিকে যত দূর সম্ভব স্বনির্ভর হিসেবে চালানোর চেষ্টা করা। মানুষের যা-যা শারীরিক প্রয়োজন, তা-সব যেন অঞ্চলেই উৎপাদিত হয়ে যায়, তার ব্যবস্থা করা। তার জন্য অজস্র স্বনির্ভর গোষ্ঠী থাকবে প্রতিটি স্বনির্ভর অঞ্চলেই। এলাকার প্রয়োজন কী কী এবং কতটা, তা সার্ভে করে সুনির্দিষ্টভাবে ঠিক করে নিয়ে পরিকল্পনাগুলি করতে হবে। সেই প্রয়োজনানুযায়ী সমস্ত উৎপাদন অঞ্চলের ভিতরেই কীভাবে করা যায়, তার উপায়গুলি বের করতে হবে এবং তা কাজে লাগাতে হবে। যা কিছুতেই উৎপাদন করা যাবে না, কিংবা যেগুলি এলাকার উদ্বৃত্ত বলে বাইরে পাঠাতেই হবে, সেগুলির হিসেব করে এলাকার আমদানি ও রপ্তানির একটি তালিকা তৈরি করতে হবে; এবং কী করলে পর সেই তালিকাটি কমশ ছোট করা যায়, প্রতি বছরই তার বার্ষিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রতিটি স্বনির্ভর

অঞ্চলের নিজস্ব কোষাগার, ব্যাঙ্ক থাকবে। অঞ্চলের সম্পদ অঞ্চলেই থাকতে হবে। প্রতিটি স্বনির্ভর অঞ্চলের নিজস্ব 'রাইটার্স বিল্ডিং' থাকবে। নিজস্ব আমদানি ও রপ্তানি দপ্তর থাকবে। সার্বজনীন প্রয়োজনগুলির বিষয়ে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য স্বনির্ভর প্রযুক্তিগুলির বিকাশসাধন করে নিতে হবে।

যেমন ধরা যাক বিদ্যুৎ। সৌরবিদ্যুৎ, বায়ুনির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে অঞ্চলকে স্বনির্ভর করার ব্যবস্থা করে নিতে হবে। অঞ্চলের এলাকার মধ্যে ঝরনা থাকলে তার থেকে নিজস্ব প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের উৎপাদন করে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মনে রাখতে হবে, অন্য এলাকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলে অঞ্চলটির যেন কোনো অসুবিধা না হয়।

অঞ্চলের পাবলিক সেকটর ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিই হবে উৎপাদনের মূল ভিত্তি। অঞ্চলের ভিতরে প্রাইভেট সেকটরও থাকবে। আমদানির তালিকার কোনো পণ্য তারা উৎপাদন করতে চাইলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মতোই তাদের সঙ্গে অঞ্চলের ব্যবহার হবে। কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না। অঞ্চলের সম্পদের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি না-করে তারা বিদেশে রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন করতে পারে, তবে সে হবে তাদের নিজেদের পছন্দ। তারা আন্তঃজেলা ব্যবসা করলে জেলাধিকারীরা, আন্তঃপ্রদেশ করলে প্রদেশের অধিকারীরা এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসা করলে কেন্দ্র তাদের নিয়ন্ত্রণ করবে। প্রাইভেট সেকটরের পরিচালক ও কর্মচারীরা অঞ্চলকে 'ডিসকানেকশন গ্যারান্টি ফি' মাসে মাসে দিতে পারেন, তাদের পণ্যস্রোত বন্ধ হয়ে গেলে যাতে অঞ্চল তাদের দেখার দায়িত্ব নেয়। না দিলে, অঞ্চল তাদের বিপদে এগিয়ে আসবে না। প্রতিটি অঞ্চল তাদের নিজেদের, জেলার, প্রদেশের, কেন্দ্রের জন্য কর আদায় করে ভাগ মতো জেলা, প্রদেশ কেন্দ্রকে পাঠাবে— সার্বজনীন ব্যবস্থাগুলির খরচের জন্য, যথা সেনাবাহিনী, স্যাটেলাইট-ব্যবস্থা, ইন্টারনেট, ফোন, রেল, বিমান, বৈদেশিক বাণিজ্য, খরা-বন্যা ইত্যাদি।

অঞ্চলের যে-ছেলেমেয়েরা বাইরে যাবে, পড়াশুনো, রুজিরোজগার ইত্যাদির জন্য, তাদের গতি হবে অবাধ। শিক্ষাদীক্ষা শেষে অঞ্চলে ফিরে এলে, অঞ্চল তাদের কাজে লাগাবে। ছেলেমেয়ের সঙ্গে বাবা-মা যে-ব্যবহার করেন, অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে অঞ্চল সেই ব্যবহার করবে। ছেলেমেয়েরাও বাবা-মায়ের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করেন, এ ক্ষেত্রে অঞ্চলের সঙ্গে সেইরকম ব্যবহারই করবেন। বহিরাগত কাউকে অঞ্চলের একজন সদস্য হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারেও কিছু বাধ্যবাধকতা থাকবে। এর ফলে উটকো লোক, তথাকথিত সন্ত্রাসবাদী হিংসার প্রকোপও থাকবে না। অঞ্চলের সবাই তো সবাইকে চেনেনই, তার ওপর ভোটার আইডি তো থাকছেই, থাকছে ভোট দেওয়ার 'ডকুমেন্টেড এভিডেন্স'।[৩৩]

স্ব-স্ব-অঞ্চলের সাংস্কৃতিক নীতি হবে অভিনব। অঞ্চলের নিজস্ব শিক্ষাদপ্তর, স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি থাকবে। নিজস্ব লাইব্রেরি ও তথ্যসম্ভারের জন্য থাকবে একটি কমপিউটার কেন্দ্র। এবং তার দেখাশোনার দায়িত্বে থাকবেন অঞ্চলেরই দু দল সেরা ছেলেমেয়ে, প্রকৃতিগুণসম্পন্ন ছেলেমেয়েরা আধারশক্তি রূপে কাজ করবেন, পুরুষগুণসম্পন্ন ছেলেমেয়েরা কাজ করবেন আধেয় রূপে। অঞ্চলের সর্বপ্রকারের তথ্য ও তত্ত্ব সরবরাহের দায়িত্ব থাকবে

এই কেন্দ্রের ওপর। অঞ্চলের শিক্ষকেরা, গবেষকেরা হবেন আদি ব্রাহ্মণের মতো; তাঁরা কখনও বাহ্যসম্পদের পিছনে ছুটবেন না, প্রায়শই ভ্রমণশীল হবেন, বিভিন্ন অঞ্চলে যাবেন জ্ঞানার্জনের জন্য ও জ্ঞান বিতরণের জন্য। সম্বন্ধ-জ্ঞানের আরাধনাই তাঁদের জীবনের ব্রত হবে। তাঁদের পালন-পোষণের সমস্ত দায়িত্ব থাকবে অঞ্চলের। বিপরীতে অঞ্চলের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তোলার সমস্ত দায়িত্ব থাকবে তাঁদের ওপর। ...

অঞ্চলসভার শিক্ষানীতিতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের অধিকারই প্রধান হবে। আর্টস পড়লে সায়েন্স পড়তে পারবে না, এখনকার শিক্ষানীতির এ সব অসভ্যতা যেন একেবারেই না থাকে। এই ক্ষেত্র হবে সম্পূর্ণ উদার। যে যখন যা পড়তে চাইবে, তাই পড়ার অধিকার থাকবে তাদের। লাইব্রেরি ইত্যাদি থাকবে ছেলেমেয়েদের জন্য সম্পূর্ণ মুক্ত। লেখাপড়ার জন্য কোনো খরচই ছাত্রছাত্রীদের লাগবে না। ছেলেমেয়ের খাওয়াদাওয়া, লেখাপড়ার সমস্ত দায়িত্ব অঞ্চলের। বর্তমান প্রজন্মের জীবন তো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যই। তাদের খাইয়ে-পরিয়ে এবং প্রচলিত জ্ঞানের ধারক ও উদ্ভাবক রূপে[৩৪] বড় করাই অঞ্চলের প্রথম কর্তব্য। প্রয়োজনে অঞ্চলের বাবা-মায়েরা না খেয়েই ছেলেমেয়েদের খাওয়াবেন।

যে ছেলেমেয়েরা কিছুতেই 'প্রচলিতে' শান্তি পায় না, উদ্ভট আচরণ করে, ক্লাসের পড়ায় মন বসে না যাদের, তাদের দিকে অত্যন্ত বেশি করেই নজর দিতে হবে। কারণ, শিবশক্তি, আবিষ্কার বা উদ্ভাবনার শক্তি, সৃজনী শক্তি (ব্রহ্মগুণ) প্রধানত তাদের ভিতরেই বাসা বাঁধে। তারা যা করতে ইচ্ছুক, তাদের স্বাধীনভাবে তাই করতে দিয়ে দূর থেকে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে। বলতে কি, এই শ্রেণীর ছেলেমেয়েরাই ভবিষ্যতের কাণ্ডারী হওয়ার যোগ্যতা রাখে। তবে মনে রাখা দরকার, বিজ্ঞানী ও পাগল দেখতে একরকম হয়। কে পাগল, আর কে শিব সেটা গভীরভাবে নজর রেখে বুঝতে হবে।

কুলাচার বা সংস্কৃতি বিষয়ে জানতে হবে। মানুষের ভিতরে নেচারের নিজস্ব স্বভাবগুলি কী কী, তা বুঝতে হবে। তদনুযায়ী নাচ, গান, খেলা ইত্যাদির সমস্ত ব্যবস্থার দিকে বেশি করে জোর দিতে হবে। এ-ব্যাপারে আমাদের উত্তরাধিকারকে 'আপডেট' করে নিতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ — কীর্তন, বাউল, মুর্শিদা, মর্শিয়ায় কী আছে, তা জেনে বুঝে নিয়ে তাকে আপডেট করে তার বিপুল প্রচলন করে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, রসে যেমন রসগোল্লা ডুবে থেকে ভাল থাকে, জীবনরসে তেমনি মানুষের মন ডুবে থাকলে ভাল থাকে। তবে যে-জীবনরস বাসী হয়ে টকে গেছে, তাকে টাটকা করার উপায়গুলি বের করে নিতে হবে। একালের মানুষ এ ক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশি নিরানন্দে বা কষ্টে রয়েছেন। তার জীবন আছে, জীবনরস নেই; জীবন তার খটখটে শুকনো। এই জীবনরস, এই ব্রহ্মরস, এই উদ্ভাবন ও সৃষ্টির আনন্দরস, এ-যে বাহ্য ধনদৌলতের চেয়ে কত মূল্যবান, এ-যে ভারতবর্ষের কত বড় অর্জন, রবীন্দ্রনাথ তা জানতেন। তাই তিনি লিখে গেছেন, 'বাহ্য ফললাভই যে চরম লাভ এ কথা সমস্ত পৃথিবী যদি মানে তবু ভারতবর্ষ যেন না মানে — বিধাতার কাছে এই বর প্রার্থনা করি।' (*ছোটো ও বড়ো*)। স্ব-স্ব-অঞ্চলের আদর্শে এই কথাটিকে সবার উপরে স্থান দিতে হবে।

১৯০৫ (সম্ভবত ১৩১২ বঙ্গাব্দ)-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে কয়েক বছরের মধ্যেই নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার পর গভীর চিন্তায় ডুবে যেতে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধীরা যে 'হিন্দুয়ানি'র উদ্বোধন ঘটাচ্ছেন সে যে দেশের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেকার স্বাভাবিক সম্পর্কটিকে নষ্ট করে দেবে, বিরোধ সৃষ্টি করবে, এবং দেশের অহিত ডেকে আনবে, সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। কিন্তু তাই বলে কি 'হিন্দুয়ানি'র পুরোটাই মন্দ? তার ভাল কোথায়, অর্জন কোথায়, মন্দই বা কোথায়, তা নিয়ে তাঁর ভাবনার অন্ত ছিল না। তাঁর আগে জন্মেছিলেন বিদ্যাসাগর এবং হিন্দুয়ানির অর্জনের দিকটার চেয়ে অবক্ষয়ের দিকটাই তাঁর চোখে পড়েছিল বেশি করে; এবং সেকারণে হিন্দুয়ানির উপর বিদ্যাসাগর ছিলেন খড়্গহস্ত। বিপরীতে ভূদেব মুখোপাধ্যায় হিন্দুয়ানির অর্জনের দিকটাই দেখেছিলেন, অবক্ষয়ের দিকটা দেখতে পাননি। রবীন্দ্রনাথ দুই দিকই দেখতে পেয়েছিলেন।

১৮ আষাঢ় ১৩১৭ থেকে ২৭ আষাঢ় ১৩১৭, এই দশটি দিন রবীন্দ্রনাথের জীবন অদ্ভুত অর্জনে সমুজ্জ্বল। এর আগেই এমন অনেক কবিতা তিনি লিখেছেন, যেখানে তাঁর নিজের (আত্মার) ভিতরে অসীম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করার সুস্পষ্ট উদ্ভাস ঘটেছে। 'প্রসাদ', 'আবর্তন' ইত্যাদি অজস্র কবিতা তার স্পষ্ট নিদর্শন। ১৮ তারিখে তিনি লিখলেন 'ভারততীর্থ' — 'হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগোরে ধীরে', যেখানে ভারতের অর্জনকে তিনি অকুণ্ঠচিত্তে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন; সারা পৃথিবীকে সেখানে 'আনতশিরে' মিলবার জন্য তিনি ডাক দিচ্ছেন। পরের দিন ১৯ তারিখেই 'দিনের সঙ্গী' কবিতায় ('যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন') তিনি লিখছেন, তাঁর 'প্রণাম' ও 'হৃদয়' তাঁর আরাধ্য ব্রহ্মের পায়ে বা হৃদয়ে পৌঁছচ্ছে না; কারণ সেই ব্রহ্মরূপ-দেবতার পা অনেক নীচে 'অপমানের তলে', 'সবহারাদের মাঝে' গিয়ে হাজির হয়েছে। ২০ তারিখে তিনি লিখলেন 'অপমানিত' — 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান'। যে-ভারতকে তাঁর তীর্থ বলে মনে হয়েছিল, পরের দিনই সেই ভারতের 'দীনের হতে দীন'দের তিনি দেখে ফেলেন, এবং তার পরদিন দেখেন তাদের 'অপমানিত' করে রাখা হয়েছে। মনটা তাঁর খারাপ হয়ে যায়। যে-ভারত নিয়ে তাঁর গর্ব ছিল — 'হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা-ওঙ্কারধ্বনি / হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণি ... হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনতশিরে ...'— সেই ভারতের সেই গর্ব করার মতো অর্জনের এমন বিশ্রী ফলিত প্রয়োগ দেখে তিনি অভিশাপ দিয়ে বসেন— 'অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান', তাও যদি না শোনো, 'মৃত্যু-মাঝে হতে হবে চিতাভস্মে সবার সমান'।

এরপর বেশ ক'দিন ভাবলেন তিনি। তাঁর ব্রহ্ম কি কেবল ভারতের অর্জনের দিকটাই দেখেছেন, অপমানিতদের দেখেননি। ২৭ তারিখে লিখলেন 'ধুলামন্দির' — 'মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি', কারণ তাঁর ব্রহ্ম রয়েছেন 'কর্মযোগে'ও। সে তত্ত্ব কীরূপ, তার বিস্তারিত বিবরণ তিনি দিয়ে গেলেন তাঁর 'কর্ম'[৩৫] নিবন্ধে, জানিয়ে দিলেন — মানুষ আজ কর্ম করে 'অভাবে', দায়ে পড়ে, মানুষের সমস্ত দুর্গতির কারণ রয়েছে সেখানে। তিনি দেখেন, অভাবের কারণে কর্ম করার রীতি থেকে মানুষকে যদি স্বভাবে বা আনন্দে কর্ম করার রীতিতে অভ্যস্ত

করে তোলা যায়, অর্থাৎ মানুষ যদি 'আনন্দে' কর্ম করে; তা হলে সে যে ফল পায় তাতে তার বাহ্যলাভ তো হয়ই, ব্রহ্মলাভও সুনিশ্চিত হয়।

কিন্তু কর্মজগতে কর্ম তো হয় মানুষে মানুষে সম্বন্ধের ভিত্তিতে; অসাম্য তো সেখানেই! একালে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে সম্বন্ধে মর্যাদার সাম্য নাই। তা না-থাকলে কিছুতেই 'আনন্দে' কর্ম করা যায় না। অর্থাৎ হাত লাগাতে হবে 'সম্বন্ধে' বা 'অপর বিষয়ক' বিদ্যায়।

মানুষে মানুষে যত প্রকার সম্বন্ধ এখন রয়েছে, তার দুটি ভাগ — সনাতন (বা তান্ত্রিক) ও বৈদিক; একালের ভাষায় যথাক্রমে 'হরাইজন্টাল রিলেশনস' ও 'ভার্টিক্যাল রিলেশনস'। সনাতন সম্বন্ধে উচ্চনীচ ভাব থাকে না, বৈদিক সম্বন্ধে উচ্চনীচ ভাব থাকে। সনাতন সম্বন্ধ আবার মূলত দুই ভাগে বিভক্ত — পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহারের সম্বন্ধ বা 'বন্ধুত্বের সম্বন্ধ' এবং পারস্পরিক সমমর্যাদার সম্বন্ধ। বৈদিক সম্বন্ধও মূলত দুই ভাগে বিভক্ত — শাসক-শাসিতের সম্বন্ধ ও নিপীড়ক-নিপীড়িতের সম্বন্ধ। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র-সহ পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে সমাজে-পরিবারে সনাতন সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু অফিস-আদালতে বৈদিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত। প্রাচ্যের দেশগুলিতে বিশেষত ভারতে, অফিসে তো বটেই, হিন্দুধর্মাবলম্বী সমাজে-পরিবারেও বৈদিক সম্বন্ধই প্রতিষ্ঠিত। এমনকী, ভারতের তান্ত্রিক দেশগুলির সমাজও এই উচ্চনীচ ভাব দ্বারা অনেকটাই কলুষিত হয়ে গেছে। ফলত আজকের পৃথিবীর কর্মজগতে কর্মে আনন্দ প্রায় নেই বললেই চলে। সামাজিক-পারিবারিক ক্ষেত্রেও আনন্দের বড় অভাব।

তবে সাম্প্রতিক বিশ্বায়নের যে ডাক দেওয়া হয়েছে, তাতে বিশ্বসমাজ নিপীড়ক-নিপীড়িতের সম্বন্ধ পেরিয়ে, শাসক-শাসিতের সম্বন্ধ পেরিয়ে, পারস্পরিক সমমর্যাদার ডাক দিয়ে ফেলেছে; অর্থাৎ সনাতন সম্বন্ধে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করছে। এখনও 'বন্ধুত্বের সম্বন্ধে'[৩৬] ঢুকে পড়ার ডাক দিতে তার বাকি। অতএব স্বভাবে বা আনন্দে কর্মে লিপ্ত হওয়ার দিন আসছে। এই মুহূর্তে কর্পোরেট পরিবারগুলির কর্মচারীদের মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পারস্পরিক সমমর্যাদার প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। প্রতিষ্ঠা ঘটছে আমাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির ভিতরেও। তা ছাড়া, তান্ত্রিক দেশগুলির বহু পরিবারে, স্বামী-স্ত্রীদের মধ্যে, প্রকৃত বন্ধুদের মধ্যে 'বন্ধুত্বের সম্বন্ধ'ও রয়েছে। তবুও এখনও অনেক পথ বাকি। আগামী দিনের সামাজিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এই কথাগুলি আমাদের মনে রাখতেই হবে। আমরা মানুষে মানুষে সম্বন্ধ কখনোই পারস্পরিক সমমর্যাদার নীচে নামতে দেব না। তারপর চেষ্টা করব পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহারের সম্বন্ধে বা বন্ধুত্বের সম্বন্ধে উন্নীত করার। তা হলেই আমরা কর্মজগতের ভিতর দিয়েই ব্রহ্মলাভের দিকে এগিয়ে যেতে পারব।

হ্যাঁ, এ অনেক বড় প্রোগ্রাম। এর জন্য সামগ্রিক চিন্তাপদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হবে। এর জন্য দেশের সংবিধান বদলাতে হবে। উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন, অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানা, নির্বাচন ব্যবস্থা, প্রশাসনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন, শিক্ষা ব্যবস্থার বিপুল পরিবর্তন — অনেক কিছুই বদলাতে হবে। সে সব আদৌ সম্ভব হবে কি?

ফিরে ফিরে ডাক দেখিরে পরাণ খুলে, ডাক ডাক ডাক ...
রবীন্দ্রসঙ্গীত

এসো ব্রাহ্মণ শুচি করি মন, ধরো হাত সবাকার

আমার উপরোক্ত প্রস্তাবিত পথেই এই সামাজিক পুনর্গঠনের কাজ করতে হবে, এমন দাবি আমি করি না। আরও অনেকের ভাবনাচিন্তা যোগ হয়ে হয়তো আরও ভাল উপায় বেরিয়ে আসবে। কিন্তু যাই উপায় বেরোক না কেন, সে যদি যথার্থ উপায় হয়, তার কোনো সহজ পথ যে কিছুতেই হতে পারবে না, তা আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি। বরং তাকে এক অসাধ্যসাধন বলেই মনে হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তা প্রকৃতপক্ষে অসাধ্য হবে না। তার জন্য মানুষকে হয়তো দুর্গম পথে চলার জন্য ডাক দিতে হবে। হিন্দুধর্মের জন্মের প্রায় ১৫০০ বছর আগে যখন আদি-ব্রাহ্মণের জন্ম হয়, তখন পৃথিবীতে মানুষের কোনো জাতি ছিল না, ব্রাহ্মণের জন্মও হয়েছিল জাতি হিসেবে নয়, জ্ঞানী-উদ্ভাবক গণনেতা হিসেবে। তাঁর উত্তরসূরি আজকের উদ্ভাবক সৃজনশীল মানুষেরা, জ্ঞানজীবী-বুদ্ধিজীবীরা। তাঁদের বর্তমান 'শরীর' কোন জাতির, সে-প্রশ্ন একালে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। সুতরাং, বলতে গেলে, আদি-ব্রাহ্মণ আজ আবার তাঁর স্বরূপে ফিরে আসছেন। এখন কি তাঁরা মানুষকে দুর্গম পথে চলার, অসাধ্যসাধনের সে-ডাক দিতে পারবেন না? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন —

> '... যাঁহারা মানুষকে অসাধ্যসাধনের উপদেশ দিয়াছেন, যাঁহাদের কথা শুনিলেই হঠাৎ মনে হয় ইহা কোনোমতেই বিশ্বাস করিবার মতো নহে, মানুষ তাঁহাদিগকেই শ্রদ্ধা করে অর্থাৎ বিশ্বাস করে। তার কারণ মহত্ত্বই মানুষের আত্মার ধর্ম; সে মুখে যাহাই বলুক, শেষকালে দেখা যায় সে বড়োকেই যথার্থ বিশ্বাস করে। সহজের উপরেই তাহার বস্তুত শ্রদ্ধা নাই; অসাধ্যসাধনাকেই সে সত্য-সাধনা বলিয়া জানে; সেই পথের পথিককেই সে সর্বোচ্চ সম্মান না দিয়া কোনোমতেই থাকিতে পারে না।
>
> যাঁহারা মানুষকে দুর্গম পথে ডাকেন, মানুষ তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করে, কেননা মানুষকে তাঁহারা শ্রদ্ধা করেন। তাঁহারা মানুষকে দীনাত্মা বলিয়া অবজ্ঞা করেন না। বাহিরে তাঁহারা মানুষের যত দুর্বলতা যত মূঢ়তাই দেখুন না কেন তবুও তাঁহারা নিশ্চয় জানেন যথার্থত মানুষ হীনশক্তি নহে — তাহার শক্তিহীনতা নিতান্তই একটা বাহিরের জিনিস; সেটাকে মায়া বলিলেই হয়। এইজন্য তাঁহারা যখন শ্রদ্ধা করিয়া মানুষকে বড়ো পথে ডাকেন তখন মানুষ আপনার মায়াকে ত্যাগ করিয়া সত্যকে চিনিতে পারে, মানুষ নিজের মাহাত্ম্য দেখিতে পায় এবং নিজের সেই সত্যস্বরূপে বিশ্বাস করিবামাত্র সে অসাধ্যসাধন করিতে পারে। ... ' [৩৭]

আবারও বলে রাখা ভাল, এটি একটি খসড়া প্রকল্প মাত্র। যাঁদের চিন্তাভাবনা আরও স্বচ্ছ, যাঁরা 'সোস্যাল-ইঞ্জিনিয়ারিং' আরও ভালো বোঝেন, তাঁদের মনকে একটুখানি নাড়া দিতে পারলেই সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে প্রকৃত কার্যকরী সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটি। সেটুকু করতে পারলেই আমার এই পরিশ্রম সার্থক হবে বলে আমি মনে করি।

টীকা ও টুকিটাকি

১. 'চালক' / সঞ্চয়িতা / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২. পৃথিবীর অন্যান্য ভাষাতেও এই ধারণার ছায়া রয়েছে। তবে আমাদের ভাষার ছায়ার তুলনায় সে-ছায়া আরও বেশি অস্পষ্ট; কারণ, তারা উত্তরাধিকার হারিয়েছে আরও বেশি।

৩. 'সম্প্রদায়' শব্দের অর্থ, 'যাহার' স্বত্বত্যাগপূর্বক দান করিয়াছে'। (দ্রষ্টব্য: বঙ্গীয় শব্দকোষ)। প্রাচীন ভারতে বৈদিক যুগের প্রাক্কালে এক-একটি জনগোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্য তাদের পরিচালক নেতাকে/নেতাদেরকে (মহর্ষিকে) জন্মসূত্রে লব্ধ তিনটি অধিকারই (নিজের উপর নিজের অধিকার, সমাজের একজন হিসেবে তার আংশিক অধিকার, ও জগতের অংশ হিসেবে তার অংশগত অধিকার) 'সম্প্রদান' করে দিয়ে 'সম্প্রদায়'-এ পরিণত হয়েছিল।

৪. ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি অনুসারে 'জনন রূপ অভীষ্ট দান করে যে' তাকেই 'জল' বলে। মহর্ষি পরিচালিত আদি সম্প্রদায় মহর্ষির নির্দেশে শস্যাদি জনন করত, তাই 'জল' পদবাচ্য; আর water-তো জনন রূপ অভীষ্ট দেয়ই, তাই জল। মনে রাখা ভাল, সবচেয়ে প্রাচীন যে-সভ্যতার সংবাদ পুরাণাদি থেকে পাওয়া যায়, তার চেহারা হল ---- মহর্ষি (এক বা একাধিক জ্ঞানী) পরিচালিত এক একটি সম্প্রদায়, যারা সম্পূর্ণ যৌথ সামাজিক নিয়মে আবদ্ধ। আর কোনো ভেদই নেই। কোনো 'ব্যক্তিগত'র জন্মই হয়নি। রাষ্ট্র নেই, পণ্য নেই ইত্যাদি। এ-বিষয়ের আরও কিছু তথ্য পাওয়া যাবে এই গ্রন্থের চতুর্থ নিবন্ধে।

৫. এ বিষয়ে লেখকের পূর্ববর্তী রচনাদিতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। সংক্ষেপে এইটুকু বলে রাখা যাক— 'আমার' বোধটিকেই 'মৎস্য' বলে। (এই গ্রন্থের তৃতীয় নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য) তা সে যৌথসমাজের উৎপাদনে লিপ্ত আশ্চর্যাচারী ফলাকাঙ্ক্ষী ঋ-ইয় বা fish হোক, আর 'আমি' 'আমি' গন্ধে 'আমিষগন্ধী' মৎস্যগন্ধী মৎস্যগন্ধ্যা ব্যক্তিমালিকই হোক; আর পুকুরের মাছই হোক, স্বভাব এক। এবং আমাদের পূর্বপুরুষেরা সেই স্বভাব দেখতে সমর্থ ছিলেন।

৬. বোয়াল-এর আগে 'রাঘব' কেন? এর অর্থ জানা যাবে 'অজ'রাজা, 'রঘু'রাজার ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ থেকে। তবে বাঙালির প্রবাদও তাকে ভোলেনি — 'আমার নাম রাজা রঘু / ভিটাতে চরাই ঘুঘু'; অর্থাৎ ইনি সর্বস্ব হরণ করতেন। রাঘব-বোয়াল সেরকমই, পুকুরের ছোট মাছেদের সবংশে ভক্ষণ করে।

৭. 'কুম্ভ' ও 'কুণ্ড' এ দুটি মূল শব্দ বিশাল অতীতকে ধারণ করে রেখেছে। 'কুম্ভে জন্ম যার' সেরকম ঋষি ছিলেন অন্তত তিনজন — বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, ও দ্রোণাচার্য। এঁরা কারা, সে বিষয়ে কিছু আলোচনা পাওয়া যাবে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় নিবন্ধে।

৮. এই মৎস্যাবতার-রূপী নগদ-নারায়ণকে আমরা অ্যাকাডেমিক শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালিরা চিনতে পারি না, চেনেন তথাকথিত মূর্খ বাঙালি জনসাধারণ, যাঁরা তর্জনীতে বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে টাকা নাচানোর মুদ্রা করেন এবং মুখে বলেন — 'নগদ-নারায়ণ'; আর, খানিকটা আন্দাজ করেছিলেন এক শ্যেনদৃষ্টি জার্মান ঋষি, যাঁর নাম কার্ল মার্কস! তাঁর ভাষায় '... modern penitent of Vishnu, the Capitalist'। দ্রষ্টব্য: The Capital. Karl Marx, Vol-1, p.560, Progress Publishers 1977

৯. যে-পাঠক আমার লেখা আগে কখনও পড়েননি, তাঁর জন্য নিবেদন এই যে, পৃথিবীর আদি ভাষা যে ক্রিয়াভিত্তিক ছিল, পরে সেই ভাষাই রূপান্তরিত হয়ে হয়ে আজকের পৃথিবীর সমস্ত ভাষাগুলিতে পরিণত হয়েছে, এ তথ্য একালের ভাষাতাত্ত্বিকরা জানেন না; যদিও তার বিশাল উত্তরাধিকার বাংলাভাষীদের রয়েছে, বঙ্গীয় শব্দকোষ গ্রন্থেও রয়েছে। 'পরমাভাষার বোধন-উদ্বোধন' ও 'বাংলাভাষা : প্রাচ্যের সম্পদ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে এ বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

১০. পদ্ম, শালুক প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদের গোড়ায় কচুর মতো একটি মূল থাকে, সেটিকে গ্রামবাংলার ভাষায় বলা হয় 'গেঁড়'। শব্দটি হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বঙ্গীয় শব্দকোষে 'গেণ্ডুকতুলা গোল মূল (bulbous root) বা 'এটে' বলে উল্লেখ করেছেন। এই 'গেঁড়' সম্পর্কে গ্রাম্যবাঙালি এতই বিজ্ঞ যে, তাঁরা কারও

বংশনাশ করাকে বলেন, 'তোর গুষ্টির গেঁড় তুলে নেব!'

১১. প্রাচীন বাংলা শব্দের মানে, রামায়ণ মহাভারত-পুরাণাদির মানে এই শব্দার্থবিধির সাহায্যে বুঝতে হয়। এ বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে লেখকের 'পরমাভাষার বোধন-উদ্বোধন' গ্রন্থে।

১২. 'সেকেলে বাঙালি' বলে যাঁদের ঠাট্টা করা হয়, তাঁরা সবাই কাহিনীটি জানেন — দুর্গার পুত্র গণেশের যখন বিয়ের লগ্ন ছিল, সেই লগ্নে তিনি বিয়ে না-করে, মাকে বলেন সেই লগ্নে ভাই কার্তিকের বিয়ে দিতে পরে গণেশের বিয়ের লগ্ন আর আসেনি। অগত্যা বেচারা গণেশকে আইবুড়ো হয়েই থাকতে হয়।

১৩. 'নিমন্ত্রণ' শব্দের অর্থ দেওয়ার সময় শ্রদ্ধেয় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বঙ্গীয় শব্দকোষ গ্রন্থে কথাটি স্পষ্ট করেছেন এইভাবে — নিমন্ত্রণ = 'আবশ্যক শ্রাদ্ধভোজনাদিতে দৌহিত্রাদির প্রবর্ত্তন বা নিয়োগ'।

১৪. এ বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে এই গ্রন্থের চতুর্থ নিবন্ধে।

১৫. আত্মানং বিদ্ধি = Gnothi seauton = Know thyself। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে যেমন 'আত্মানং বিদ্ধি' কথাটি প্রায় সর্বত্রই লেখা রয়েছে, তেমনি প্রাচীন পাশ্চাত্যও এই ধারণার উত্তরাধিকারী ছিল। সক্রেটিসেরও আগে ডেলফির মন্দিরের গায়ে লেখা ছিল — Gnothi seauton। রবি চক্রবর্তী ও কলিম খান রচিত 'বাংলাভাষা : প্রাচ্যের সম্পদ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের ১০০ পৃষ্ঠায় এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে, আর 'আত্মা' শব্দটি আসলে কী, তারও ব্যাখ্যা রয়েছে ওই গ্রন্থের ৭৯-৮৪ পৃষ্ঠায়।

১৬. বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য উপরোক্ত 'বাংলাভাষা : প্রাচ্যের সম্পদ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য। পৃ. ৭৯

১৭. মানুষে মানুষে সম্পর্ক যখন শাসক-শাসিত সম্পর্কে পরিণত হয়, তখন শাসিতই শাসকের বন্ধন বা পাশ হয়ে দাঁড়ায়। এই পারস্পরিক নির্ভরতার বিষয়টি রবীন্দ্রনাথও দেখতে পেয়েছিলেন। তাই তিনি লিখেছেন, 'প্রজাই কেবল রাজার অধীন নহে, রাজাও প্রজার অধীন।' রাজা একই কর্মের পুনরাবৃত্তিকারী 'পশু' হলে প্রজাই রাজার বন্ধন বা পাশ হয়ে দাঁড়ায়।

১৮. গান্ধী 'মহাত্মা গান্ধী' হয়ে উঠতে পেরেছিলেন ভারতীয় মননের সেই পুঁজিবিরোধী বদ্ধমূল ধারণাগুলি থেকে সমর্থনের রস সংগ্রহ করেই। তবে তিনি সনাতন বদ্ধমূল-ধারণার কয়েকটি নীতির সঙ্গে কৌশলে তঞ্চকতার আশ্রয় নিয়েছিলেন, যার জন্য পেরিয়ার, আম্বেদকর এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে দ্বিধা করেননি। তবে এ-প্রসঙ্গ এখানে আলোচনা করা যাবে না। আগ্রহী পাঠক পেরিয়ার বিষয়ক রচনাদিতে ও তামিলনাড়ুর ডিএমকে পার্টির প্রথম যুগের বইপত্র থেকে, আম্বেদকরের রচনাবলী থেকে এবং রবীন্দ্রনাথের 'চরকা' নিবন্ধটি থেকে এ-বিষয়ে বিস্তারিত সংবাদ পেয়ে যাবেন।

১৯. ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন মণি সিং। মৈমনসিংহ জেলার বিখ্যাত হাজং আন্দোলনের হোতা ছিলেন তিনি। দেশভাগের পর তিনি পূর্ববাংলায় থেকে যান, অধিকাংশ সময় জেলেই। বাংলাদেশ ঘোষিত হওয়ার পর তিনি বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টারূপে স্বীকৃতি পান। তিনি তাঁর জীবন সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন — " 'এইটা আমার লাইফের একটা মূল ঘটনা। সমস্ত ঘটনা যদি তুচ্ছ করে দেনও — আমার কাছে আমার নিজের জীবন গড়ে ওঠার ব্যাপারে এই ঘটনার গুরুত্ব কতখানি তা আমি জানি।' ... 'সেদিন কোনও বাধাকেই আমি আমল দিই নি। একটিমাত্র সম্ভাব্য বাধাকেই আমার প্রবল মনে হত। মা যদি বাধা দেন তাহলেই তো মুশকিল।' ... 'মা একদিন আমাকে বললেন, এই যে আত্মীয়স্বজনের লগে তুমি বিরুদ্ধাচরণ করতাসো — এইটা কি ভাল হইতাসে?' 'আমি মাকে কোনও শ্রেণীসংগ্রাম বোঝাবার চেষ্টা করলাম না। কারণ ... তাঁকে শ্রেণীসংগ্রাম বোঝানোর চেষ্টা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। আমি তাঁকে শুধু এই কথাই বললাম : তুমিই তো আমাদের শিখিয়েছিলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হয়, যারা গরিব তাদের সাহায্য করতে হয়। শিখিয়েছিলে নরই হচ্ছে নারায়ণ, যত্র জীব তত্র শিব। আমি তো সেই নরনারায়ণকেই সাহায্য করছি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। তোমার শিক্ষাই আমার জীবনের আদর্শ। সেইভাবেই আমি আন্দোলন শুরু করেছি। এতে সহস্র সহস্র লোকের কল্যাণ হবে। মুষ্টিমেয় কজনের অসুবিধে সত্ত্বেও সহস্র সহস্র লোকের যদি উপকার হয় তাহলে সেইটেই করা কি বাঞ্ছনীয় নয়?' 'মা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। একটি

প্রতিবাদও করলেন না।' ... 'কিন্তু এর পরে এ-ব্যাপার মা আর কোনওদিন কোনও বাধা দেন নি। আমার জন্যে তাঁর অনেক ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু মনে মনে সন্তুষ্ট না হলেও তিনি আমাকে কিছু বলেন নি।' ... 'আমার সামনে আর কোনও বাধাই থাকল না।' "

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রায় সমস্ত বড় মানুষই ভারতের 'সনাতন-ধারণা'র অতীতকে মণি সিং-এর সুরেই কৈফিয়ত দিয়েছিলেন এবং এভাবে ভারতের মাটি-মাকে নিজেদের পক্ষে নিমরাজী করিয়েছিলেন। প্রায় একই পথ নিয়েছিলেন গান্ধীও। উদ্ধৃত অংশটি '*মণি সিং-এর জীবনের একটি অধ্যায়*' শীর্ষক নিবন্ধ থেকে গৃহীত। এটি 'দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : রিপোর্টাজ সংকলন' গ্রন্থে প্রকাশিত; সম্পাদনা: অনিশ্চয় চক্রবর্তী।)

২০. *ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল* / কার্ল মার্ক্স

২১. মৎস্যাবতারের কাহিনী মৎস্যপুরাণ ছাড়াও অন্যান্য পুরাণেও কমবেশি রয়েছে। এমনকী এই উত্তরাধিকার পাশ্চাত্যেরও রয়েছে, তাঁদের বাইবেলে নোয়ার জাহাজের কাহিনীতে।

২২. বঙ্গীয় শব্দকোষ গ্রন্থে 'কচ্ছ', 'কচ্ছপ', ও 'কূর্ম্ম' শব্দে এই অর্থগুলি দেওয়া আছে — 'যাহা জলকে পরিচ্ছিন্ন করে', 'যে কচ্ছ অর্থাৎ খোলা দ্বারা আপনাকে রক্ষা করে', 'যে জলপ্রায় দেশে আপনাকে রক্ষা করে', ও 'জলে বেগ যাহার'। কচ্ছপের মধ্যে 'লুকোছাপা'র ব্যাপার থাকে (সরস্বতীর থাকে 'কচ্ছপী বীণা'), প্রয়োজনে সে তার মাথাটি উপরের খোলাটির নীচে লুকিয়ে নিতে পারে, সেখানে সে সুরক্ষিত থাকে। কচ্ছপকে উপর থেকে লাঠি দিয়ে আঘাত করলেও তার কোনো ক্ষতি হয় না। জলে সে যেমন অপ্রতিরোধ্য, তেমনি ডাঙাতেও। কেবল তাকে কোনোভাবে চিৎ করে দিলেই সে অক্ষম হয়ে পড়ে। তবে জীবনে চলার ক্ষেত্রে 'কর্ম্ম বিভাজন' করে চার পায়ের সাহায্যে সে চলে বলেই তার নাম 'কূর্ম্ম'।

২৩. মার্কস সাহেব মহা বিপদে পড়েছিলেন। মানুষের আদিম যৌথসমাজ পরবর্তী যুগের পণ্যভিত্তিক সমাজে পরিণত হল কেমন করে? তিনি জেনে গিয়েছিলেন, পণ্য উৎপাদন শ্রম বিভাজন ঘটায় ও বাড়ায়, শ্রম বিভাজন পণ্য উৎপাদন ঘটায়। আবার পণ্য প্রবাহিত হয়ে কোনো যৌথসমাজে পৌঁছলে, সেই সমাজ ভেঙে গিয়ে পণ্যভিত্তিক সমাজে পরিণতও হয়ে যায়। তিনি দেখেছিলেন প্রাচীন ইয়োরোপের সমাজগুলিকে পণ্যভিত্তিক সমাজে রূপান্তরিত করে দিয়েছিল প্রাচীন ভারতীয় পণ্য ইয়োরোপে পৌঁছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতে পণ্য উৎপাদিত হল কীভাবে? সেখানে তো বাইরে থেকে পণ্য আসার উপায় ছিল না। সেখানে পণ্য উৎপাদন আগে হয়েছিল, নাকি শ্রম বিভাজন আগে হয়েছিল। গাছ আগে না ফল আগে? তিনি যেভাবে হোক জেনেছিলেন, '**Primitive Indian community made division of labour before production of commodity.** কিন্তু কীভাবে সেই **division of labour** করেছিল, তা তিনি জানতে পারেননি। ভারত কূর্ম্ম মডেল গ্রহণ করে সেই শ্রম বিভাজন ঘটিয়েছিল। তার আগে ভারতে যে উদ্বৃত্ত উৎপন্ন লেনদেন হত, তা চলত কেবল 'স্বর্গলোকে' বা এক সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের নেতাদের মধ্যে; অর্থাৎ সম্প্রদায়ের প্রভুরা পরস্পরের মধ্যে লেনদেন করতেন। তাই আমাদের শাস্ত্রে বলে গঙ্গা (পণ্যপ্রবাহ) প্রথমে ছিলেন স্বর্গলোকে।

২৪. আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলতেই একালে আমরা বুঝি যেখানে গয়ংগচ্ছ চলতে থাকে, 'লাল ফিতার ফাঁসে' ফাইলকে আটকে। একে 'মন্দ' বলা হয়। এই মন্দভাব যে অবস্থায় থাকে তাকে বলা হয় 'মন্দর পর্ব্বত'।

২৫. তবে পুরাণ মতে এ-ছিল একার্ণব-সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলিএকার্ণব — অগ্রগতির এই ক্রমবর্ধমান চক্রের একার্ণব থেকে সত্য-ত্রেতায় নামার কাল। তাই, সেকালে দেবতাদের যেতে হয়েছিল অসুরদের ডাকার জন্য, অর্থাৎ, প্রাইভেট সেক্টরকে দৌড়তে হয়েছিল পাবলিক সেক্টরকে ডাকার জন্য। সেই হিসেবে, এখন আমরা কলি পেরিয়ে একার্ণবে উঠছি। এখন বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনার কথা সেকারণেই কারও কারও মাথায় উঁকিঝুঁকি মারছে এখন তাই পাবলিক সেক্টরকে দৌড়তে হচ্ছে প্রাইভেট সেক্টরকে ডাকার জন্য সেকালের কূর্ম্ম মডেলের ভিতর দিয়ে আমরা খণ্ডতার যুগে নেমেছিলাম, এখন তারই মাধ্যমে আমরা অখণ্ডের যুগে উত্তীর্ণ হব। তখন ছিল নামার পালা, কূর্ম্মের মাধ্যমে আমরা বিচ্ছিন্ন

হয়েছিলাম; এখন ওঠার পালা, এখন সেই কূর্মের মাধ্যমেই আমরা বিশ্বরাষ্ট্রের দিকে যাব; যাব যেখান থেকে নেমেছিলাম সেখানে নয়, তার চেয়ে অনেক উচ্চতর স্তরে। এই চক্রের বিষয়টি অন্যত্র বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছি। দ্র. 'দিশা থেকে বিদিশা' গ্রন্থের 'পরমাপ্রকৃতিতত্ত্ব'

২৬. "... এক সময়ে ভারতবর্ষে গ্রীক পারসিক শক নানা জাতির অবাধ সমাগম ও সম্মিলন ছিল। কিন্তু মনে রেখো, সে 'হিন্দু' যুগের পূর্ববর্তী কালে। হিন্দুযুগ হচ্ছে একটা প্রতিক্রিয়ার যুগ — এই যুগে ব্রাহ্মণধর্মকে সচেষ্টভাবে পাকা করে গাঁথা হয়েছিল। দুর্লঙ্ঘ্য আচারের প্রাকার তুলে তাকে দুষ্প্রবেশ্য করে তোলা হয়েছিল। ..." 'হিন্দুমুসলমান' / *কালান্তর* / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২৭. তাঁরা তাদের নামের শেষে 'রাম' ও 'বাল্মীকি' পদবি নিয়ে ভারতসমাজে চিরকালের জন্য মেথর হয়ে অস্পৃশ্য হয়ে আজও সে-শাস্তি ভোগ করে চলেছেন। গান্ধী তাঁদের 'অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ' এর জোনাকির আলো দেখিয়েছিলেন; অস্পৃশ্য মানুষ থেমে যায়নি। গেঁড় থেকে নাল বেরিয়ে শৈবাল হয়ে ভারত-সরোবরের উপরিতল ছেয়ে ফেলতে থাকে। জগজীবন 'রাম' থেকে শুরু করে কাঁশি 'রাম' পর্যন্ত, কিংবা সম্প্রতি নীতিশকুমারদের জন্ম দিয়ে সে আপন অপমানের কারণ জানতে চেয়েছে।

২৮. *ভারতে ব্রিটিশ শাসন* / কার্ল মার্কস

২৯. কীভাবে, তার বিস্তারিত বিবরণ আমি আমার 'দিশা থেকে বিদিশায়' গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে দিয়েছি।

৩০. এই অধ্যাত্মবাদ কী বস্তু তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে রবি চক্রবর্তী ও কলিম খান রচিত 'বাংলাভাষা : প্রাচ্যের সম্পদ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে। আর, শিব হলেন সমাজের উদ্ভাবক ও সৃজনশীল শক্তির আধার এবং ভৈরব হলেন শিবের অনুচর। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শিবগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ বা শিব। তিনি ইয়োরোপীয় আধুনিকতার সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে যাননি।

৩১. অথচ ১৯৬০ সালেও আমরা দেখেছি, গ্রামের বড়চাষি তাঁর বাগানে উৎপাদিত সেরা সবজি পরিবারের ভোগের জন্য রেখে দিয়ে, ঝড়তি-পড়তিগুলি বাজারে পাঠাচ্ছেন। আজকের পরিস্থিতি উলটো। ঝড়তি-পড়তিগুলি পরিবারের ভোগের জন্য রেখে বাদবাকি সবই বাজারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

৩২. 'ধুলামন্দির' / *সঞ্চয়িতা* / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৩. এ-বিষয়টি এ গ্রন্থের চতুর্থ নিবন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৩৪. এখানে 'লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করা' — এরকম কথা লিখলাম না; কারণ, যে-লেখাপড়া করলে মানুষ 'অবহিত' হয়, তাতে মানুষের 'হিত' হয় না, অব-হিত হয়; মানুষ 'পড়া অভ্যাস' করে ফেলে। 'অব' কথাটি যে ভাল কথা নয়, 'পড়া' যে অধঃপতিত হওয়া, সে কথা সবাই জানেন। কিন্তু অধ্যয়ন করলে বা 'পড়লে' মানুষ পড়ে যায় কেন, তা জানা যায় আমাদের বর্তমান স্কুল কলেজের পাঠক্রম ও পাঠব্যবস্থাদি দেখলে। এতে মানুষের মস্তিষ্ক 'কনডিশনড' হয়ে যায়, তাদের নতুন ভাবনা ভাবতে অসুবিধা হয়। স্কুল কলেজের শিক্ষায় ভাল ৩শ-(প্রচলিত জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ধারক) গড়ে তোলা গেলেও, ভাল বৃষ (নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবক) গড়ে তোলা যায় না, গেলেও তার সংখ্যা হয় প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম হয়।

৩৪. রবীন্দ্র রচনাবলী, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৮০

৩৫. 'বন্ধুত্বের সম্বন্ধ' হল পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহারের বন্ধন থাকে যে-সম্পর্কে। এ-সম্পর্ক সাম্যের চেয়েও ঊর্ধ্বে। এতে হিসেব-নিকেশও নেই। বিষয়টি ব্যাখ্যাত হয়েছে ২৭.৭.০৬ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয়তে প্রকাশিত 'বাংলার অর্থনাশ' নিবন্ধে।

৩৬. 'ততঃ কিম', রবীন্দ্র রচনাবলী, ৭ম খণ্ড।

কলকাতার 'অপর' পত্রিকার ২০০৬ পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত।

বিদর্ভের কথা : ভারত-ইতিহাসের অমৃতকথার কণিকামাত্র

কলিম খান

বিদর্ভে পা রাখার হোমওয়ার্ক

'বিদর্ভের কথা' নামটি দেখে আপনি হয়তো ভাবছেন, নিশ্চয় আমি বিদর্ভ, অর্থাৎ ভারতের মহারাষ্ট্র প্রদেশের নাগপুর অঞ্চল, ঘুরে এসেছি এবং সে-সম্পর্কেই বলব। না, আমি কখনো নাগপুর যাইনি এবং সে-বিদর্ভের কথাও আমি বলব না। যে-মহাভারতের কথা অমৃতসমান এবং তাতে যে-বিদর্ভ দেশটির কথা রয়েছে, আমি সেই বিদর্ভ দেশের কথা বলব। পাশাপাশি বলব প্রতিবেশী নিষধ দেশের কথা, বিন্ধ্যপর্বতের কথা — প্রসঙ্গক্রমে যতটুকু বলা দরকার। ভারতবাসীর মনোলোকের ভূগোলে এই ধরনের দেশ ও পর্বতগুলি সগৌরবে বিদ্যমান ছিল এবং এখনও ভারতের প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তা-সব এইভাবে লিখিত রয়েছে —

'... নিষধ রাজ্যেতে নল মহাগুণবান।
বিদর্ভেতে ভীম রাজা তাঁহার সমান।। ...
.... দেশে দেশে বার্ত্তা পেয়ে যত রাজগণ।
বিদর্ভনগরে সবে করিল গমন।। ...
.... বিদর্ভ-রাজার কন্যা দময়ন্তী নামা।
দেব যক্ষ নাগ নরে রূপে নাহি সীমা।। ...' (মহাভারত / বনপর্ব)

অবশ্য, মনোলোকের এই বিদর্ভ দেশ বাস্তবের বিদর্ভ দেশ থেকে অর্থাৎ নাগপুর অঞ্চল থেকে আলাদা কি না, সে কথা বলা আমার পক্ষে কঠিন; একমাত্র একালের বিদর্ভবাসীই সে কথা উভয় দেশকে মিলিয়ে দেখে বলতে পারবেন। তাঁর সুবিধা হল, তিনি তো বর্তমান বিদর্ভ দেশটিকে জানেনই। আর, যে-বিদর্ভ দেশের কথা ভারতবাসীর মনোলোকে ছিল, অর্থাৎ মহাভারতে যে-বিদর্ভ দেশের কথা বর্ণিত হয়েছে, তার কথা তিনি যদি-বা না-জানেন, জেনে নেবেন। তার পরে তুলনামূলক বিচার তিনি সহজেই করে নিতে পারবেন।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এই তুলনামূলক বিচারের কাজটি তাঁর মতো করে, তাঁর সময়ে বসে, সেরে রেখে গেছেন। আমরা বাঙালিরা কবিগুরুর সে-বিচারে স্বভাবতই আস্থা রাখি। তবে বিচারটি তিনি করেছিলেন অযোধ্যার ক্ষেত্রে। তাঁর মতে, 'কবি তব মনোভূমি অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো'। অর্থাৎ, কবির মনোভূমির অযোধ্যা পার্থিবভূমির অযোধ্যার চেয়ে সত্য। তার মানে, কবির মনোভূমিতে যে-সকল দেশ-নদী-পর্বত রয়েছে, সেগুলি, পার্থিবভূমিতে যে-সকল দেশ-নদী-পর্বত রয়েছে তার চেয়ে সত্য। অতএব, ভারতের মনোলোকের যে-বিদর্ভের কথা আমি বলছি, কবির মতে সে-বিদর্ভ বাস্তবের বিদর্ভের চেয়ে সত্য। এবং মনোলোকের সেই বিদর্ভ বাস্তবের বিদর্ভের মতো হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে।

তবে কিনা, অযোধ্যার কথা হোক আর বিদর্ভের কথাই হোক, কথাগুলি যে সেই সেই দেশের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত, তাতে সন্দেহ নেই। আর, সেই ইতিহাসের সন্ধানে আমরা কোনো ইতিহাসবিদ-পণ্ডিতকে অনুসরণ না-করে রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করতে চলেছি। কারণ, ভারত-ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে তথাকথিত ইতিহাসবিদ-পণ্ডিতেরা যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ, সে ব্যাপারটিও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই আমাদের দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। বলতে গেলে ইতিহাসবিদগণের সেই ব্যর্থতার কারণেই অনন্যোপায় হয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে কাব্যসৃষ্টির কাজ কিছুকালের জন্য হলেও স্থগিত রেখে নিজেকেই ভারত-ইতিহাস-চর্চায় হাত লাগাতে হয়েছিল। সে জন্যেই ভারত-ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথই আমাদের অনুসরণীয়।

ভারত-ইতিহাস চর্চা ও রবীন্দ্রনাথ

বিদর্ভের কথা রয়েছে মহাভারতে। তথাকথিত ইতিহাসবিদ-পণ্ডিতেরা কিন্তু আমাদের রামায়ণ-মহাভারতাদি গ্রন্থগুলিকে 'ইতিহাস' বলে মনে করেন না এবং তাঁদের মতে 'ভারতের কোনো লিখিত ইতিহাস নেই।'[১] ঐতিহাসিকদের এবম্প্রকার ভারত-ইতিহাস-চর্চার বহর দেখে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন — 'আধুনিক পাশ্চাত্য সংজ্ঞা অনুসারে মহাভারত ইতিহাস না হইতে পারে, কিন্তু ইহা যথার্থই ... একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিবৃত্ত।'[২]

রবীন্দ্রনাথ ওই ইতিহাসবিদ-পণ্ডিতগণকে 'কুসংস্কারগ্রস্ত' বলে মনে করতেন। তাঁদের ইতিহাস-জ্ঞানকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে তিনি লিখে গেছেন, 'ইতিহাস সকল দেশে সমান হইবেই, এ কুসংস্কার বর্জন না করিলে নয়। ... ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দফ্‌তর হইতে ... রাজবংশমালা ও জয়পরাজয়ের কাগজপত্র না পাইলে যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে হতাশ্বাস হইয়া পড়েন ... তাঁহারা ধানের ক্ষেতে বেগুন খুঁজিতে যান এবং না পাইলে মনের ক্ষোভে ধানকে শস্যের মধ্যেই গণ্য করেন না।'[২]

সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, 'পরের রচিত ইতিহাস নির্বিচারে আদ্যোপান্ত মুখস্থ করিয়া পণ্ডিত এবং পরীক্ষায় উচ্চ নম্বর রাখিয়া কৃতী হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু স্বদেশের ইতিহাস নিজেরা সংগ্রহ এবং রচনা করিবার যে উদ্‌যোগ সেই উদ্‌যোগের ফল কেবল পাণ্ডিত্য নহে। তাহাতে আমাদের দেশের মানসিক বদ্ধ জলাশয়ে স্রোতের সঞ্চার করিয়া দেয়। সেই উদ্যমে, সেই চেষ্টায় আমাদের স্বাস্থ্য — আমাদের প্রাণ।'[২]

ভারতের সেই স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য, সেই প্রাণের বিকাশের জন্য রবীন্দ্রনাথ নিজে যথাসাধ্য করেছেন। তাঁর যুগ পর্যন্ত যে-সকল ঐতিহাসিক উপাদান তাঁর হাতে পৌঁছেছিল — উদ্ধার করা প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থাদি, পরম্পরাগত স্মৃতি, সেগুলির মানে বোঝার জন্য ব্যবহারযোগ্য শব্দার্থতত্ত্ব — তা-সব ব্যবহার করেই তিনি 'ভারতের ইতিহাস', 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রভৃতি বহু নিবন্ধ রচনা করে গেছেন। কিন্তু একালের উপযোগী করে ভারতের যথার্থ ইতিহাস রচনার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যে-উপায় — ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি[৩] — তা যেমন সেকালের ঐতিহাসিকদের হাতে ছিল না, তেমনি রবীন্দ্রনাথের

হাতেও ছিল না। অগত্যা ভারতের ইতিহাসকে কেবলমাত্র 'ভাবের (action-এর) ইতিহাস' রূপে বুঝে নিয়ে তিনি অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যান; পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের কায়দায় দেশের ইতিহাসকে 'ভাবের আধারদের (actor-দের) ইতিহাস' রূপে ধরতে তিনি যাননি। তবে তাঁর এই চেষ্টা বলতে গেলে প্রায় খালি হাতে যুদ্ধ, প্রয়োজনীয় হাতিয়ার ছাড়াই। সেই কারণে, তাঁকে বহু স্থানেই বহু বিষয় উত্তরসূরিদের জন্য ছেড়ে যেতে হয়েছিল। যেমন, মহাভারতের মূলে 'জনমেজয়ের যে ইতিহাস'[৪] রয়েছে, বা 'দক্ষিণাপথের প্রথম অগ্রগামীদের মধ্যে অন্যতম ঋষি গৌতম'-এর কথা, 'দাক্ষিণাত্যের ব্রহ্মবিদ্যা'র কথা কিংবা রামচন্দ্রের 'দক্ষিণে কৃষিস্থিতিমূলক সভ্যতা ... প্রচার' বিষয়ক তাঁর অতি-অনুভবশীল সিদ্ধান্তগুলি। আরও মহত্তর কথা এই যে, তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভা সেই সম্পদকেও সঠিকভাবে চিহ্নিত করে ফেলেছিল, একালের অর্থনীতি-বিশারদেরা আজও যে-সম্পদকে খুঁজে খুঁজে হয়রান।

অনেকেই জানেন, পুঁজি আছে মানেই পুঁজও আছে,[৫] তার গন্ধ আছে, ব্যথা আছে, যন্ত্রণা আছে এবং সেই যন্ত্রণা থেকে মানুষের মুক্তি নেই। কারণ পুঁজি মানেই বিনিয়োগ, কারণ সে কিছুতেই 'অলস'-পুঁজি রূপে বসে থাকতে রাজি হয় না। আর বিনিয়োগ মানেই উদ্বৃত্ত-মূল্য, সুদ, লাভ এবং অতএব পুঁজির বৃদ্ধি, পুনরায় বিনিয়োগ, পুনরায় বৃদ্ধি। এবং এই চক্রের কোনো শেষ নেই। ঘর কেন, দেশ কেন, সারা পৃথিবীর সমস্ত জায়গা ছেড়ে দিলেও পুঁজির অবয়বকে আঁটানো অসম্ভব। ঘরের কলসিতে রাখলে কলসি ভরে যায়, পুকুরে রাখলে পুকুর, হ্রদে রাখলে হ্রদ, এমনকী সমুদ্রে রাখলে সমুদ্র ভরে যায়। এই সমস্যা নিয়ে প্রাচীন ভারত কীরকম ভুগেছিল গোটা মৎস্যপুরাণ জুড়ে সে-কাহিনীর বর্ণনা রয়েছে। আজ আমরা জানি, এক মহা-ধ্বংসের মাধ্যমেই কেবল এ-চক্রের হাত থেকে সাময়িক নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, এবং তার সবচেয়ে বড় সাক্ষী পাশ্চাত্যের অর্থনীতিবিদেরা, যাঁরা মুদ্রাস্ফীতি-জনিত সম্পদ-ধ্বংসের ভয়াবহতা নিজেরা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তারপর থেকে সেই ধ্বংসের ভয়ে সর্বদা তটস্থ থাকেন। তাই বলে সেই মহা-ধ্বংসের পর কোনো কিছু থেমে যায় না, আবার শুরু হয় গোড়া থেকে। পুঁজি-বৃদ্ধির চক্র পুনরায় চলতে শুরু করে আরেক মহা-ধ্বংসের দিকে। এ মহাভয়ঙ্কর দৈত্য মানুষেরই সন্তান, কিন্তু এর হাত থেকে মানুষের বুঝি-বা পরিত্রাণ নেই।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেখালেন, এমন বিষয়-সম্পদও থাকা সম্ভব যার বিষ নেই, যা অমৃতের মতো মানুষের কল্যাণকারী, এবং প্রাচীন ভারত সেই সম্পদেরও সাক্ষাৎ পেয়েছিল। কার্যত রবীন্দ্রনাথ বিষময় বিষয়-সম্পদ ও বিষহীন বিষয়-সম্পদ — দুরকম সম্পদকেই দেখতে পেয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, সম্পদের ভিতরে থাকা 'বৃদ্ধি'-গুণটিই যে তাকে কখনো অমৃত কখনো বিষে পরিণত করতে পারে, তাও তিনি বুঝে নিতে পেরেছিলেন। তাই তিনি লিখছেন, 'লক্ষ্মী হলেন এক, কুবের হল আর — অনেক তফাত। লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণ, সেই কল্যাণের দ্বারা ধন শ্রী লাভ করে। কুবেরের অন্তরের কথাটি হচ্ছে সংগ্রহ, সেই সংগ্রহের দ্বারা ধন বহুলত্ব লাভ করে। বহুলত্বের কোনো চরম অর্থ নেই। দুই দুগুণে চার, চার দুগুণে আট, আট দুগুণে ষোলো, অঙ্কগুলো ব্যাঙের মতো লাফিয়ে চলে — সেই

লাফের পাল্লা কেবলই লম্বা হতে থাকে। এই নিরন্তর উল্লম্ফনের ঝোঁকের মাঝখানে যে পড়ে গেছে তার রোখ চেপে যায়, রক্ত গরম হয়ে ওঠে ...।' অন্যত্র তিনি জানিয়েছেন, 'একান্ত রিক্ততাও নিরর্থক, একান্ত বহুলতাও তেমনি। ... রিক্ততাও নয়, বহুলতাও নয়', চাই পূর্ণতা; এবং লক্ষ্মীর মধ্যে তিনি সেই পূর্ণতা দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁর অসাধারণ অনুভব শক্তির জোরে 'কুবের' ও 'লক্ষ্মী' শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ না জেনেই অসীম মেধাসম্পন্ন অর্থনীতিবিদের মতো রবীন্দ্রনাথ এইরূপ গভীর সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছিলেন।

কার্যত ক্যাপিটাল বা পুঁজির বড়ো সমস্যা এই যে, মানুষের সমাজ কিছুতেই সেই দামালকে সামাল দিতে পারে না; যদিও আমাদের জীবনযাত্রায় সে অত্যন্ত উপযোগী। এক তো তার উদ্ভব রোখা যায় না, তার ওপর উদ্ভূত হয়েই সে ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে, ফুলতে থাকে, ফাঁপতে থাকে এবং তার সে-বৃদ্ধিকে কিছুতেই রোখাও যায় না। পুঁজির স্বভাব কি এমন হওয়া সম্ভব, যা মানুষকে এমন আতান্তরে ফেলে না? বরং যাকে মানুষের এখতিয়ারের ভিতর আঁটানো যায় এবং যা মানুষের উপকার করে, মঙ্গল করে? যা হাতে এলে মানুষের রোখ চাপে না, রক্ত গরম হয় না?

না, এ প্রশ্নের উত্তর আজকের পৃথিবীর অর্থশাস্ত্রবিশারদেরা কেউই জানেন না। অনন্যোপায় তাঁরা কিছু 'সাপ্রেসিভ মিজার' নিয়ে পুঁজিকে সংযত করার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যান। এ দিকে ভারতের কাছে সে-উত্তর রয়েছে বটে, কিন্তু রয়েছে তার ইতিহাসে, রয়েছে এমন ভাষায় যা ভারতীয়রাই গেছেন ভুলে। স্বভাবতই আমাদের অন্বিষ্ট আমাদের ইতিহাসে থাকা সত্ত্বেও আমরাই তার স্বাদ জানি না। যতটুকু জানি সে তার গন্ধমাত্র এবং সেটুকুও এখন পর্যন্ত উদ্ধার করে গেছেন কেবল রবীন্দ্রনাথের মতো অত্যন্ত অনুভবশীল মনীষীরা।

আগেই বলা হয়েছে, পাশ্চাত্যের পণ্ডিতেরা এবং পাশ্চাত্যের শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় পণ্ডিতেরা মনে করেন, 'ভারতের কোনো ইতিহাস নেই, অন্তত জানা কোনো ইতিহাস।' তাঁদেরকে সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের ইতিহাস আমরাই যদি 'আপডেট' করে তাঁদের দিতে না পেরে থাকি, তাঁরা কী করবেন! তবে সুখের কথা এই যে, সম্প্রতি ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি হাতে এসে যাওয়ার পর এ-কাজ আগের মতো আর দুরধিগম্য নয়। আজ আমরা চেষ্টা করলে সে ইতিহাস উদ্ধার করে ফেলতে পারি এবং সবাইকে তা পরিবেশন করে দিতে পারি। এ নিবন্ধ 'সেই চেষ্টার অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ মাত্র।

বস্তুত পুঁজি, তার নিয়ত বৃদ্ধি, উদ্বৃত্ত মূল্য, লাভ, সুদ, বিনিয়োগ, পণ্য-উৎপাদন, পণ্য-বিনিময়, দোকানদারি বা হাট-বাজারের প্রচলন — এই সব অর্থনৈতিক সত্তাগুলি ঠিক কী কী ভাবে মানুষের সমাজে জন্মলাভ করেছিল, কীভাবে তাদের বিকাশ ঘটেছে, তার যে-ইতিহাস এখন পর্যন্ত আমরা জানি তার প্রায় সবটুকুই পাশ্চাত্যের অর্জন। স্বভাবতই তাতে অনেকটাই ফাঁক থেকে গেছে। কারণ, পণ্যের প্রথম উদ্ভব, পুঁজির আদি উদ্ভব, তার বৃদ্ধিজনিত আদি সামাজিক প্রতিরোধ, পণ্যপ্রবাহের প্রথম সূত্রপাত, হাটবাজারের প্রথম প্রতিষ্ঠা, সেগুলি প্রচলনের

ঘোর প্রতিবাদী ক্রিয়াকলাপ — এ সব বিষয়ে যতটুকু যা জানত তা কেবল প্রাচ্যই জানত। কারণ এই অর্থনৈতিক সত্তাগুলি প্রাচীন-প্রাচ্যে যথেষ্ট বিকশিত হওয়ার পর তারা প্রাচীন-পাশ্চাত্য দেশে পাড়ি দিয়েছিল। বলতে কি, পুঁজির আদি উদ্ভবের জন্য যে বিপুল পরিমাণ রক্ত ঝরাতে হয়েছিল, পাশ্চাত্যকে তার প্রায় কিছুই করতে হয়নি। এগুলিকে তারা প্রায় রেডিমেড পেয়ে গিয়েছিল (যেমন পাশ্চাত্যের শিল্প-বিপ্লব-জাত অর্থনৈতিক সত্তাগুলিকে আমরাও ইংরেজের হাত থেকে প্রায় রেডিমেড পেয়ে গেছি, সেরকম)। স্বভাবতই পুঁজির আদি ইতিহাস সম্পর্কে পাশ্চাত্যের জ্ঞান অত্যন্ত কম। মার্কস সাহেব তো বলেই গেছেন, তাঁরা পাশ্চাত্যের দুনিয়ায় যখন প্রথম পুঁজির সাক্ষাৎ পাচ্ছেন, ততদিনে সে অনেকটাই সাবালক হয়ে গেছে।[৬] তবে তিনি বুঝে গিয়েছিলেন, পণ্য ও পুঁজির উদ্ভবের আদি রূপের কথা আদৌ যদি কারও জানা থাকে সে জানে প্রাচীন ভারত এবং সে কথা তিনি বহুবার বলে গেছেন। আজ আমরা জানি, মার্কস সাহেব ঠিকই বুঝেছিলেন। কারণ, ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি হাতে আসার পর আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ওই সব অর্থনৈতিক সত্তা ভারতীয় সমাজে ঠিক কী কী ভাবে উদ্ভূত হয়েছিল, ভারতসমাজে সেগুলির বিকাশ কোন পথ ধরে কোন কোন অধ্যায় পেরিয়ে কীভাবে হয়েছিল, তার ইতিহাস আমাদের পুরাণ, রামায়ণ-মহাভারতাদি গ্রন্থে সত্যই বিস্তারিতভাবে লিখে রাখা রয়েছে। কিন্তু সেগুলিকে যথার্থভাবে অনুবাদ করে নিয়ে 'আপডেট' করে নেওয়ার কাজটি এখনও বাকি। এই লেখক তাঁর গ্রন্থগুলিতে সে-চেষ্টা কিছু কিছু করেছেন বটে, তবে প্রয়োজনের তুলনায় তার পরিমাণ এখনও যথেষ্ট নয়।

তাই বলে এই নিবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে ভারতের সেই বিশাল ইতিহাসের সমগ্র এলাকা ধরে সব কিছু তুলে এনে 'আপডেট' করে প্রকাশ করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়, এবং এখানে তা করাও হচ্ছে না। আমাদের এগোতে হবে পদে পদে, এক একটি অধ্যায় ধরে ধরে। সেই সূত্রে আজ কেবল ভারত-ইতিহাসের সেই অধ্যায়টিকে 'আপডেট' করে নেওয়ার চেষ্টা করা হবে, যে-অধ্যায়ে সুদ নিষিদ্ধ করে দেওয়ার পর ভারতসমাজের একটি অংশ কীভাবে পুনরায় পুঁজিবৃদ্ধির রাস্তা বের করেছিল এবং কেমন করেই বা পণ্যবিক্রয় নিষিদ্ধ করে দেওয়ার পরও তার পুনঃপ্রচলনের চেষ্টা হয়েছিল; এবং শেষমেষ সেই চেষ্টা কেমন করে সুদীর্ঘকালের জন্য আটকে দেওয়া হয়েছিল। আর, এই তথ্য আমরা উদ্ধার করে আনব রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণাদি থেকেই অর্থাৎ ভারতের প্রকৃত লিখিত ইতিহাস থেকেই। আসুন, এবার আমরা সে বিষয়ে মনোনিবেশ করি।

বিদর্ভের পথে পথে

ভারত-ইতিহাস মতে — এ-বিদর্ভ হল সেই দেশ, যে দেশ থেকে দর্ভ বিলুপ্ত হয়ে গেছে বা বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হল, এ দেশ থেকে দর্ভ কেমন করে এবং কেন বিলুপ্ত হয়ে গেল? পাঠক বলতে পারেন — কী মুশকিল! আগে তো জানি দর্ভ জিনিসটি কী? তারপর না হয় দেখেশুনে বলা যাবে ব্যাপারটি আসলে কী!

ঠিক কথা! আগে জানা দরকার, দর্ভ জিনিসটি কী? ভারতের প্রাচীন শব্দার্থতত্ত্ব ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির সাহায্যে জানা গেল, দর্ভ হল সেই বস্তু — যাতে বিদারণ (শক্তি) শোভা পায় বা অন্তর্নিহিত থাকে। কার ভিতরে বিদারণ শক্তি অন্তর্শায়ী থাকে? খোঁজখবর নিলে জানা যায়, এ-শক্তি দর্ভে থাকে এবং সন্দর্ভেও থাকে।[৭] এই যে বিদারণ শক্তি, এ হল 'বৃদ্ধি'র কারণ। এটি ভিতরে থাকলে সত্তা তার আত্মস্বরূপের পরিধিকে বিদারিত করে বৃদ্ধি লাভ করে বা করতে পারে। যিনি সেইরূপ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অর্থ বিনিয়োগ ('বৃদ্ধ্যর্থ অর্থপ্রয়োগ') করেন, তাঁকে সেকালের ভাষায় বলা হত 'বৃদ্ধ্যাজীব' বা 'কুশীদজীবী' (= সুদখোর)। অর্থাৎ সেই বৃদ্ধিকে কুশও বলে। তার মানে এ অন্তরস্থ শক্তি আর কেউ নয়, ইনি স্বয়ং অন্তরস্থ (interst, সুদ) বা কুশ।

বঙ্গীয় শব্দকোষ রচয়িতা শ্রী হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য সরাসরি জানাচ্ছেন, দর্ভ শব্দের মানে হল 'কুশবিশেষ', 'কাশ'।[৮] কেবল তাই নয়, তিনি আরও জানাচ্ছেন — 'কোনো মুনিপুত্র কুশাঙ্কুরে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে মুনিশাপে এই দেশ কুশশূন্য ও বিদর্ভ নামে অভিহিত হয়।' আর, পৌরাণিক অভিধান সঙ্কলক শ্রী সুধীরচন্দ্র সরকার মহাশয় জানিয়েছেন, 'কুশাঘাতে কোনো এক ঋষিকুমারের এই স্থানে অকালমৃত্যু হওয়ায়, উক্ত ঋষি এদেশে আর দর্ভ জন্মাবে না বলে শাপ দেন। সেই হতে এই স্থানের নাম হয় বিদর্ভ।'

এ ছাড়াও রয়েছেন মহাপণ্ডিত চাণক্য, তাঁরও 'পদ কুশাঙ্কুরে বিদ্ধ' হয়েছিল। (সেকালে মুনিপুত্রের, ঋষিকুমারের বা পণ্ডিতের 'পদ' কুশাঙ্কুরে বিদ্ধ হত কেন? সে প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি।) তাই, ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে পণ্ডিত চাণক্য কুশের বংশ নাশ করতে করতেই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে নিয়ে বিশাল মৌর্যসাম্রাজ্য গড়ে তোলেন।

তার মানে, ভারতের ইতিহাস অনুসারে প্রাচীন ভারতে কুশ নামক তৃণটি অনেকের পায়েই ফুটেছিল এবং এমনভাবে ফুটেছিল যে, সে-ঘটনা নিতান্ত ভুলে যাওয়ার মতো তুচ্ছ ঘটনা নয়, বরং লিখে রাখার মতো ঘটনা। কুশ তো আজও আমাদের অনেকের পায়েই ফোটে, কিন্তু এই তুচ্ছ ঘটনাকে আমরা ভুলে যাই। প্রাচীন ভারতের এই কুশঘাসের পায়ে ফোটা সেরকম তুচ্ছ ব্যাপার নয়। হয়তো সেই ঘাস বা 'গ্রাস' (grass) তাঁদের গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিল, যে-কারণে সেই কুশকে সবংশে ধ্বংস করার জন্য অনেকেই অনেক কিছু করেছিলেন; এমনকী একটা গোটা দেশকেই দর্ভহীন পর্যন্ত করে দিয়েছিলেন। মনোলোকের বিদর্ভে তাই কুশ নেই। বাস্তবের বিদর্ভে অর্থাৎ নাগপুরেও কি বাস্তব-কুশ (ঘাস) জন্মায় না? কিংবা সে দেশে কি সুদপ্রথার প্রতি মানুষের স্বাভাবিক বিরাগ রয়েছে? অথবা তাঁদের মনে সুদ-ভীতির ধ্বংসাবশেষ কি এখনও দেখতে পাওয়া যায়? নাকি ঠিক উলটো? কে জানে!

যাই হোক, এই কুশ কেমন বস্তু, যার পায়ে ফোটে, সে টের পায়, বুঝলাম। কিন্তু তাই বলে কুশ পায়ে ফুটলে মানুষ মরে যায়, এ অভিজ্ঞতা আমাদের নেই। আমরা বরং জানি, পুরোহিতের অজস্র উপচারে 'কুশ' আবশ্যিক। এর 'যোক্ত্র' হয়, অর্থাৎ এর দ্বারা বন্ধন করা যায়। এমনকী 'চণ্ডী সপিণ্ডি কুশণ্ডি, তবে জানি বামনডি' — অর্থাৎ এই তিন কর্মে পটুই

প্রকৃত ব্রাহ্মণ। তার মানে, প্রকৃত ব্রাহ্মণরা কুশণ্ডি বা কুশণ্ডিকা (কুশকণ্ডিকা) কর্মটি জানতেন এবং এখনও হয়তো জানেন। তা ছাড়া 'কুশ নামক অভীষ্ট দান করে যে' সেই তো 'কুশল'! 'কুশারি' (কুশ-এর অরি?) ব্রাহ্মণের কথা কিংবা গাধির পিতা ও বিশ্বামিত্রের পিতামহ 'কুশিক' মুনির কথা তো রয়েছেই! রয়েছেন রামচন্দ্রের পুত্র কুশ, মাতা (কুশ > কুশল > কৌশল >) কৌশল্যা এবং খুড়শ্বশুর কুশধ্বজ! অথচ তা সত্ত্বেও আমরা দেখছি, বঙ্গীয় শব্দকোষ 'কুশ' ও 'কুশীদ' শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ দিতে গিয়ে আমাদের জানাচ্ছেন— 'যে কুৎসিত কার্য্যে থাকে' তাকে 'কুশ' বলে এবং 'যার দ্বারা কু-গতি হয়' তাকে 'কুশীদ' বলে।

এমন পরিস্থিতিতে আমাদের পক্ষে এ কথা কিছুতেই ভোলা চলবে না যে, 'কু' শব্দের দুরকম অর্থই হয়। প্রথম অর্থে প্রচলিতের পরিধি-বিদারণকারী সমস্ত নতুন বা আবিষ্কারমূলক কর্মই প্রচলিত-কর্তৃক 'কু' নামে নিন্দিত এবং দ্বিতীয় অর্থে প্রচলিতের সুদীর্ঘ পুনরাবৃত্তিজনিত স্থবিরতাকেও সমাজ 'কু' নামে নিন্দা করে থাকে। তার মানে, যা মন্দ সে তো 'কু'-ই, যা অতি-ভাল তাও 'কু' পদবাচ্য। এই পরস্পরবিরোধী অর্থবাচক 'কু' 'যার ভিতরে শায়িত থাকে' (= শ), তাকেই তো 'কুশ' বলে। স্বভাবতই স্ট্যাটাস-কো-বাদীরা তাকে বলতেই পারেন যে, সে 'কুৎসিত কার্য্যে থাকে'।

তবে রবীন্দ্রনাথ অন্য কথা বলেছেন। তাঁর মতে — তৃণ যদি ধান্য হবার চেষ্টা করে, সে ধান্য হতে পারে না, তৃণও থাকে না, কুশে পরিণত হয় এবং 'পরের প্রতি তাহার তীক্ষ্ণ লক্ষ নিবিষ্ট করিবার একাগ্র চেষ্টা ... (থাকে)। মোটের উপর এ কথা বলা যাইতে পারে যে, এরূপ উগ্র পরপরায়ণতা বিধাতার অভিপ্রেত নহে।'[৯] এখানে এই কথাটি স্মরণে রাখা ভাল — 'ধন' বিনিয়োগ করে যে-তৃণ উৎপাদন করতে হয় তাকে 'ধান্য' বলে এবং 'নীবি' (= বণিকের মূলধন) বিনিয়োগ করে যে-তৃণ উৎপাদন করা হয় তাকে 'নীবার' (= উড়ি-ধান) বলে। যাঁদের এ সব কথা ভাবতে অসুবিধা হচ্ছে, তাঁরা জানবেন, ভারতে তৃণশ্রেষ্ঠ বলা হত বাঁশগাছ ও তালগাছকে, এবং 'বংশ' কেবল বাঁশকেই বোঝায় না, মানুষের বংশকেও বোঝায়; আর 'তাল' এত কিছুকে বোঝায় যে তা-সব বলতে গেলে এই নিবন্ধের তাল রাখা যাবে না। তার মানে, মনোলোকের তৃণ, দর্ভ, কুশ, ধান্য, নীবার এবং বাস্তবের তৃণ, দর্ভ, কুশ, ধান্য, নীবার একই বস্তু নয়, যদিও তাদের মূল 'ভাব' এক। স্মর্তব্য যে, এই তৃণ নিয়েই আদি বিরোধের সূত্রপাত হয়েছিল বৈদিক যুগের বহু আগেই এবং শিবকে বলতে হয়েছিল — "বসালিপ্ত তৃণকেও কেউ যদি 'আমার' বলে দাবি করে, সে যত বড় মানুষই হোক আমি তাকে ধ্বংস করি, তাই আমাকে উগ্র বলে।"[১০] অর্থাৎ সেকালে সমাজের 'অবশেষ'-স্বরূপ উদ্বৃত্ত বা বসা (চর্বি) লিপ্ত তৃণও ছিল যৌথসম্পদ। আদিম যৌথ সনাতন ভারতসমাজের কোনো একজন ব্যক্তি তা দাবি করতে পারত না! করলে, আদি শিব তাকে ধ্বংস করে দিতেন। যদিও আজ আমরা জানি, পরবর্তীকালে স্বয়ং শিবই এই নীতি লঙ্ঘন করে ব্যক্তিমালিকানার বিকাশের বহু অধ্যায়েই হাত লাগিয়েছিলেন।

তা সে যাই হোক, এখন আমরা নিশ্চয় বুঝি কুশতৃণ ধান্যও নয়, নীবারও নয়। সে নিজে

থেকেই জন্মায়, 'আবর্জনা' বা 'অবশেষ'[৫] সঞ্চিত হলেই সেখান থেকে সে নিজেই জন্মায়। প্রশ্ন হল — কীভাবে জন্মায়?

সনাতন যুগ পেরিয়ে বৈদিক যুগে পা দেওয়ার পরও কিন্তু ভারতসমাজ তার অতি প্রাচীন কাল থেকে চলে আসা যৌথমালিকানাভিত্তিক অর্থনীতি থেকে দুম করে ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক অর্থনীতিতে ঢুকে পড়তে পারেনি। তার জন্য তাকে বহু কাল ধরে বহু তিতিক্ষা, বহু টানাপোড়েন, বহু রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের বহু অধ্যায় পার হতে হয়েছিল। বৈদিক যুগের অপরাহ্নে তার সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা যে-গোষ্ঠীটির মধ্যে প্রথম ব্যক্তিমালিকানার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তারা হল যক্ষ। যক্ষের দায়িত্ব ছিল যৌথ উৎপন্ন যথা নিয়মে ভাগ করে, সমাজে অবস্থান অনুসারে যার যেরকম 'পদ' বা প্রাপ্য হয় তাকে তা দিয়ে দেওয়া। কিন্তু সেভাবে দিয়েও তার এখতিয়ারে কিছু উৎপন্ন থেকে যেত 'অবশেষ' রূপে। সেই 'অবশেষ' নিয়ে সে কী করবে? 'অবশেষ' ফেলে দেওয়ার যে নিয়ম তৎকালীন সমাজে প্রচলিত ছিল, নানান যুক্তিসঙ্গত কারণে তা অযৌক্তিক বলেই প্রতিভাত হতে লাগল। যৌথভাণ্ড বা যৌথভাণ্ডার থেকে ভাগ করে দেওয়ার দায়িত্বে থাকা 'বিভাগুক' যক্ষরা ততদিনে বৈদিক যুগের অপরাহ্নে এসে পৌঁছেছেন। বৈদিক যুগের সূত্রপাতের গৌরবজনক আদর্শের খানিকটা অবক্ষয় ততদিনে ঘটে গেছে। স্বভাবতই সেই 'অবশেষ' কাউকে না কাউকে দিয়ে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত হতে থাকে।[১১] কিন্তু দেওয়া হবে কাকে? কীভাবেই বা দেওয়া যাবে?

যে-গ্রামে আমার জন্ম, সেখানে এমন কিছু কৃষিজমি ছিল, যা ছিল গ্রামের যৌথসম্পত্তি। সেই জমিতে গ্রামের সবাই পালা করে ধান চাষ করত এবং যা উৎপন্ন হত, গ্রামের নানা উৎসবাদিতে সেই ধান খরচ করা হত। কোনো বছর 'অবশেষ' থেকে গেলে, তা 'বাড়' হিসেবে দিয়ে দেওয়া হত প্রার্থীকে। 'বাড়' হল সেই নিয়ম, যাতে এক মন ধান ধার নিলে পরের মরসুমে দেড় মন ধান ফেরত দিতে হত। এবং সেই বাড়তি ধান গিয়ে জমা পড়ত পরের বছরের যৌথ উৎপন্নের ভাঁড়ারে। আদি সম্পদ ঠিক এই নিয়মেই বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল। তবে, যেহেতু তখন কারওরই ব্যক্তিগত উৎপন্ন বলে কিছু ছিল না, এই বাড়তিটুকু খাতককে দিতে হত তার ভাগে-পাওয়া পরবর্তী-মরসুমের যৌথ উৎপন্নের ভাগ থেকেই। ফলে পরবর্তী মরসুমে তাকে পুনরায় 'বাড়' নিতে হত।

আদি সম্পদের বৃদ্ধির সূত্রপাত হয়েছিল ঠিক এই ভাবেই। কুশের, সুদের বা বৃদ্ধির আদি রূপ এরকমই। এই আদি সুদ-ব্যবস্থার দুটি গুরুত্বপূর্ণ অশুভ প্রভাব পড়েছিল সেকালের সমাজে। এক — কিছু মানুষ কুশরজ্জুর বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিল। (ঋণ ও rein শব্দ দুটির ভিতরেও এই সংবাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।) দুই — ভারতসমাজে অতঃপর 'পদ' অনুসারে যার যা প্রাপ্য তাকে তার চেয়ে কম দেওয়ার কসরতের সূত্রপাত হয়ে যায়। আর, যেহেতু সেকালে সবচেয়ে উচ্চ 'পদ' (= 'যাহা পদাধিকারীকে প্রতিপালন দান করে বা পোষণ করে') ছিল পণ্ডিত ব্রাহ্মণের, কৃষ্টির (মনচাষ ও জমিচাষের) হোতা ঋষিদের এবং

মননশীলতার চর্চাকারী মুনিদের, তাদের পদানুসার প্রাপ্তি আগের মতো আর যথাযথ থাকে না। কুশ তাদের প্রাপ্তির পথের কাঁটা হয়ে দেখা দেয় অর্থাৎ তাঁদের 'পদ কুশবিদ্ধ হয়'। ফলত যক্ষরা সমাজে নিন্দনীয় হয়ে যায়! (যৌথ সম্পদ লুকিয়ে রাখত বলে 'যক্ষের ধন' বা 'যকার ধন' কথাটি গ্রামবাংলায় আজও রহস্যজনক ও নিন্দনীয়।) তাই কুশের উৎপত্তি রোধ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলত দর্ভময় দেশকে বিদর্ভ করে দেওয়ার ঘটনা ঘটে।

তা ঘটুক। কিন্তু সেটি ঘটল কীভাবে? আমাদের দেশের 'স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিবৃত্তে' সে বিষয়ে কীরূপ বয়ান রয়েছে। কীভাবেই বা তার থেকে আমরা সেই ইতিহাসকে সঠিক ভাবে বুঝে নিতে পারি? এখন তা হলে সে কথাই হোক।

বিদর্ভ ও নিষধের স্বরূপ

খুব সহজ করে বললে বলে দেওয়া যায় — বিদর্ভ হল সেই দেশ যে-দেশে সুদ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল, আর নিষধ হল সেই দেশ যে-দেশ ব্রহ্মাবর্তের পণ্যবিক্রয়-নিষেধ বা দোকানদারি-নিষেধের আইনটি মানেনি; যে-দেশ পণ্য বিক্রিবাটার প্রচলন অব্যাহত রেখেছিল। কিন্তু এভাবে 'লাখ কথার এক কথা' বলে দিলে তো চলবে না। ইতিহাসে সেই ঘটনাসমূহ কেমন করে বলা হয়েছে, সেটাই আমাদের দেখতে হবে। সুতরাং বিষয়টিকে পরিসর-সাপেক্ষে আর একটু বিস্তৃত করে নেওয়া যাক।

পুরাণাদির তথ্যানুসারে বিদর্ভ দেশটি বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। দময়ন্তী-পিতা ভীম ও রুক্মিণী-পিতা ভীষ্মক ইহার অধিপতি ছিলেন। শব্দকোষ মতে, ইহা আধুনিক 'বড় নাগপুর' বা 'বেরার' (Berar)। এর রাজধানী ছিল কুণ্ডিনগর। পুরাণমতে, ভারত ইতিহাসের তিন যুগের তিন বিখ্যাত রাজকুমারী — দময়ন্তী, লোপামুদ্রা, রুক্মিণী — ছিলেন এ-দেশেরই রাজকন্যা। পুরাণাদিতে 'নল-দময়ন্তী কথা', 'অগস্ত্য-লোপামুদ্রা সংবাদ' ও 'শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণীহরণ' নামে সেই কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। তার অতি সংক্ষিপ্ত বয়ান এরকম:

নিষধরাজ নলের সঙ্গে বিদর্ভরাজকন্যা দময়ন্তীর বিবাহ হয়। রাজা নল অশ্বচালনায় অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত ছিলেন কিন্তু অক্ষক্রীড়া জানতেন না। অক্ষক্রীড়ায় ভ্রাতা-পুষ্করের কাছে সর্বস্বান্ত হয়ে দময়ন্তীকে হারান। পরে কোশলের (সাকেত বা অযোধ্যার) রাজা ঋতুপর্ণের কাছে অক্ষক্রীড়া শিক্ষা করেন, পরিবর্তে ঋতুপর্ণকে অশ্বচালনা শেখান। সেই অক্ষক্রীড়ার মাধ্যমে পুনরায় সবকিছু ফিরে পান। (মহাভারতের বনপর্ব দ্রষ্টব্য)

লোপামুদ্রা বিদর্ভরাজকন্যা হলেও, তার পিতৃনামের উল্লেখ চোখে পড়ে না। মহর্ষি অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে সৃষ্টি করে বিদর্ভরাজকে পালন করতে দেন এবং পরে রাজার নিকট হতে সেই কন্যাকে প্রার্থনা করে বিবাহ করেন। এই অগস্ত্যই বিন্ধ্যপর্বতকে চিরকালের জন্য মাথা নত করে থাকতে বাধ্য করেন। (মহাভারতে বনপর্ব দ্রষ্টব্য)

রুক্মিণীর পিতা বিদর্ভরাজ ভীষ্মক, ভ্রাতা রুক্মী। রুক্মী শ্রীকৃষ্ণ-বিরোধী ছিলেন। রুক্মিণীকে হরণ করে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বিবাহ করেন। 'অক্ষক্রীড়ায় প্রতারণা করতে গিয়ে রুক্মী বলরাম

কর্তৃক অক্ষাঘাত প্রাপ্ত হন এবং তা হতেই নিহত হন।' প্রশ্ন হল — উপরোক্ত বয়ান থেকে আমরা কী কী জানতে পারি?

বিদর্ভরাজ ভীমের কন্যা দময়ন্তী। এই ভীম বীরসেনের পুত্র। ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির নিয়মে মহাভারতের দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম ও এই বীরসেন-পুত্র ভীমের ক্রিয়ামূলক ভিত্তিতে (মূল ভাব-এ) কোনো ভেদ নেই। দুজনই একই মূলসত্তার ধারক-বাহক। (প্রথম জন যদি ১০০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের হন, দ্বিতীয় জন ৮০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের। পার্থক্য শুধু সময়ের।) সেই সত্তাটি (ভাবটি) হল, 'পরিকল্পিত প্রচার'। সন্দেহ নেই, এই প্রচার আর্যাবর্তের নীতির বিরুদ্ধেই। এর অনিবার্য ফল যা হতে পারে তাই হয়, ভীম পড়েন তৎকালীন সমাজের দমনের মুখে। নিজের আধারশক্তি প্রজাকে (রানীকে) ছেড়ে দিতে হয় মহর্ষি দমনের হাতে। এর ফলে যে উত্তরসূরিদের জন্ম হয় তারা সবাই 'দমন' ধাতুর ফল — তিন পুত্র, দম, দন্ত, ও দমন এবং কন্যা দময়ন্তী।

শ্রদ্ধেয় পাঠক, এখানে প্রাচীন ভারতে মানুষের নাম রাখার পদ্ধতি ও সম্প্রদায়গত বিভাজন সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য জেনে নেওয়া জরুরি। আমরা যে-যুগের কথা বলছি, সে-যুগে তখনও ব্যক্তিনামের প্রচলন একালের মতো হয়নি। তখন ছিল গোষ্ঠী নাম। পদবির প্রচলন হতে তখনও বহু দেরি। তখন বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য, অরুন্ধতী, মৈত্রেয়ী, বিশ্রবা, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য, শান্তনু এমনি সব পদবিহীন নামের প্রচলন হয়েছে। এই নামগুলির এক একটির দ্বারা এক একটি গোষ্ঠীকে যেমন বোঝানো হত, সেই গোষ্ঠীর যে-কোনো ব্যক্তিকেও বোঝানো হত, এমনকী সেই গোষ্ঠীর মূল ক্রিয়া বা আদর্শকেও বোঝানো হত; একালে যেভাবে 'কংগ্রেস', 'বিজেপি', বা 'সিপিএম' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার চলে, অনেকটা সেরকম। আর ছিল পুরুষ প্রকৃতি বিভাজন। সাধারণত কোনো সত্তার বিষয়ে মানুষের মনোলোকের যে ধারণা, যা মূলত গড়ে ওঠে সত্তাটির ক্রিয়া থেকে, যাকে সত্তাটির আদর্শও বলা যায় তাকে পুংলিঙ্গ শব্দে এবং সেই ক্রিয়ার আধারকে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে চিহ্নিত করা হত। যেমন মনোলোকের যে-ইন্ডিয়া তাকে বলা হত 'ভারত' এবং ভারতের জনসাধারণকে বলা হত 'ভারতী'।[১২]

আর সম্প্রদায় বিভাজনটি হয়েছিল খুবই অদ্ভুতভাবে। একালের প্রচলিত ইতিহাসগুলিতে তার কোনো সংবাদই নেই। বলতে কি, মানুষের আদিম যৌথসমাজ ঠিক কীভাবে ভেঙে খণ্ড খণ্ড হয়েছিল, তার যথার্থ তথ্য কারও জানা নেই। তা রয়েছে একমাত্র ভারতের ইতিহাসে। তাতে দেখানো হয়েছে যে, আদিম সনাতন যুগ থেকে চলে আসা যৌথসমাজ বৈদিক যুগের সূত্রপাতে কেবল বহু সম্প্রদায়ে বিভক্তই হয়নি, আদিম যৌথসমাজের পরিচালক মহর্ষিরাও বিভাজিত হয়ে এক একটি সম্প্রদায়ের শীর্ষে পরিচালকরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে যান।[১৩] ইতিহাসের এই অধ্যায়ে যেমন কখনো কখনো সম্প্রদায়ের মহর্ষি-বদল এবং মহর্ষির সম্প্রদায়-বদল দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি দু-একটি ক্ষেত্রে সম্প্রদায়হীন-মহর্ষি কিংবা মহর্ষিহীন-সম্প্রদায়েরও সাক্ষাৎ মেলে। কেবল তাই নয়, নতুন সম্প্রদায়ের জন্ম হলে, তাকে কোন মহর্ষির পরিচালনায় দেওয়া হবে তার কমপক্ষে ৮টি উপায় (৮ প্রকার 'বিবাহ'[১৪] বা সামাজিক চুক্তি) পেরিয়ে

একদিন স্বয়ংবরের আয়োজনও শুরু হয়ে যায়। পৃথুর আবির্ভাবের পর, অর্থাৎ ভারতে পৃথিবীর আদি রাষ্ট্রের জন্মের পর মহর্ষিরা যখন সম্প্রদায়ের দেখাশোনার জন্য রাজা (একদল ক্ষত্রিয়) নিয়োগ করতে শুরু করলেন, তার পর থেকে রাজাও স্বয়ংবর-সভায় প্রার্থী হয়ে আসতে শুরু করেন। আসতে শুরু করেন দেবতারাও। তবে সে আরেক কাহিনী।

যাই হোক, তথ্য অনুসারে বিদর্ভরাজকন্যা দময়ন্তী যেমন নলের সংবাদ পেয়ে তার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন, তেমনি নিষধরাজ নলও দময়ন্তীর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তার মানে, বিদর্ভীকৃত সম্প্রদায় (দময়ন্তী) নিষধদেশের পরিচালকদের (নলের) প্রতি যেমন আকৃষ্ট হন তেমনই নিষধদেশের পরিচালকেরাও বিদর্ভীকৃত সম্প্রদায়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। প্রশ্ন হল, নল কে? দময়ন্তীর তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কারণই বা কী?

'নিষদ্যা', 'নিষণ্ণ', 'নিষধ', 'নিষাদ' প্রভৃতি শব্দের মূলে রয়েছে সামাজিক 'নিষেধ'। 'বিক্রয়ের নিমিত্ত উৎপাদিত উৎপন্ন'কে (= পণ্যকে) সেকালে বলা হত 'পাপ' (= 'পালকের পালয়িতা') এবং 'নিষদ্যা', 'নিষণ্ণ' প্রভৃতি সবই ঘোষিত হয়েছিল 'পাপের আধার' বলে। হাট, দোকান, পণ্যবিক্রয়শালা প্রভৃতি বোঝাতে তখন 'নিষণ্ণ' বা 'নিষদ্যা' শব্দ দুটি ব্যবহৃত হত, যারা ওই পণ্য-বিক্রিবাটা করত তাদের বলা হত নিষাদ, যে-দেশে এই পণ্যবিক্রয়-নীতি অনুসৃত হত তাকে বলা হত নিষধদেশ, যে-ব্যবস্থা এই নীতিকে ধারণ-পালন করত তাকে বলা হত নিষধপর্বত এবং যে-তত্ত্ব এই নীতিকে সমর্থন করত তাকে বলা হত উপনিষদ। নল ও পুষ্কর দুই ভাই (দুজন ক্ষত্রিয় বা দু-দল ক্ষত্রিয়) ছিলেন নিষধ দেশের পরিচালক। পুষ্কর পণ্য উৎপাদনের দিকটা দেখতেন, (পুষ্কর-পুষ্প-পুরোডাশ-product, কুসীদ-কুস-কুসুম প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য) এবং 'নল' (= 'বিত্তরূপ অভিষ্ট যার মাধ্যমে আসে') দেখতেন বিপণনের দিকটা। তবে এই নল অশ্বদের (একালের ভাষায় আই-এ-এস-দের) পরিচালনার কাজটি খুবই ভাল জানতেন কিন্তু অক্ষক্রীড়া (একালের ভাষায় মার্কেটিং) খুব একটা জানতেন না। দময়ন্তীর তাঁকেই ভাল লেগে যায়।

এবং এইরকম হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কেননা অর্থনীতি শাস্ত্র অনুসারে যারা 'অবশেষ' জমায়, অর্থাৎ আদি 'হোর্ডার', সুদখোরে পরিণত হতে না পারলে সে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে না। আবার সুদখোর কিছুতেই টিকে থাকতে পারে না, অন্তত কিছু পরিমাণে উৎপন্নকেও যদি 'পণ্যে' (বিক্রয়যোগ্য উৎপন্নে) পরিণত করতে না পারে। সুতরাং দময়ন্তীর যেমন নলকে দরকার ছিল, তেমনি নলেরও দময়ন্তীকেই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

তবে নল-দময়ন্তীর এই 'বিবাহ' বা পারস্পরিক চুক্তির বন্ধন অনেকেরই ভাল লাগেনি। তাদের 'ক্রোধ ও হিংসার পুত্র কলি'র আক্রোশের ফলস্বরূপ নল-দময়ন্তীকে দীর্ঘ ভোগান্তী ভুগতে হয়। রাজ্যছাড়া হতে হয়। অবশেষে 'সর্ (সম্পদ) পালক' সর্প বা নাগের (সেকালে তাদের রমরমার কারণেই তো আজকের নাগপুর![১৫]) সহায়তায় এবং ঋতুপর্ণের কাছে অক্ষক্রীড়া শিখে নিয়ে নলের পুনরায় নিজ নীতিতে সফলভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠা সম্ভব হয়।

বিষয়টির অর্থনৈতিক দিকটি পরিষ্কার করে নেওয়ার চেষ্টা করা যাক। ধর্মশাস্ত্র[১৬] অনুসারে

প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মাবর্তের বাইরে যে সমস্ত 'নিন্দিত দেশ' বা 'ম্লেচ্ছ দেশ'-এর উল্লেখ পাওয়া যায়, অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের (বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার) মতো গোটা 'দক্ষিণাপথ'ই (বা দাক্ষিণাত্যই) তার মধ্যে পড়ে, এবং বিদর্ভ ও নিষধ দুটি দেশই সেই 'দক্ষিণাপথ'-এর অন্তর্ভুক্ত। সন্দেহ নেই, দুটি দেশই ব্রহ্মাবর্তের নিয়ম লঙ্ঘন করেছিল। ব্রহ্মাবর্ত যাকে আবর্জনা নাম দিয়ে বর্জন করার নিয়ম করে রেখেছিল, এই দুটি দেশ তা মানেনি। মানেনি বলেই অবশেষকে আবর্জনা বলে ফেলে দিতে রাজি হয়নি তারা, বরং তা সংরক্ষণ করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সুদের জন্ম না দিয়ে এই সংরক্ষণ-চেষ্টা কখনোই সফল হতে পারত না, পারেনি। অর্থাৎ নিজেদের আদি সুদখোরে রূপান্তরিত না-করে এই অবশেষ-সংরক্ষণকারীরা টিকতে পারত না। আবার সুদখোররূপে টিকে থাকতে গেলে কিছু পরিমাণ উৎপন্নকে বা 'অবশেষ'কে পণ্যে রূপান্তরিত করা ছিল একান্তই আবশ্যিক। এ দিকে বিদর্ভ ছিল সেইরকম দেশ, যেখানে কুশোদ্‌গম নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেই নিষেধ অমান্য করতে পণ্যবিক্রয়কারীর মুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। ও দিকে নিষধ হল সেইরকম দেশ যা ব্রহ্মাবর্তের নিষেধ অমান্য করে ইতোমধ্যেই পণ্যবিক্রয়ের প্রচলন অব্যাহত রেখেছিল। তার মানে, একজনের কিছু উৎপন্নকে বেচতে না পারলে প্রাণ বাঁচে না, অন্যজনের কাজই ছিল ব্রহ্মাবর্তের সেকেলে পরিচালকদের নিষেধ অমান্য করে নিজেদের উদ্বৃত্ত উৎপন্ন বেচে দিয়ে প্রাণ বাঁচানো। এ অবস্থায় বিদর্ভ ও নিষধের বন্ধুত্ব হওয়াই ছিল স্বাভাবিক এবং তাই-ই হয়েছিল।

কিন্তু শেষমেষ এই পুঁজিবাদী বিকাশের চেষ্টা আরও বিকশিত হয়ে স্টেবল পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি। কারণ, কিছুদিন পরেই তাদের সেই সমস্ত চেষ্টাকেই একটি বিশেষ পরিমাপে সংযত হতে বাধ্য করা হয়েছিল এবং ভারতে ধনতন্ত্রের বিকাশকে কার্যত স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এবার তা হলে সেই ঘটনার বিবরণ শোনা হোক।

বিদর্ভকুমারী লোপামুদ্রার অগস্ত্য-প্রাপ্তি ও বিন্ধ্যপর্বতের শান্তি

লোপামুদ্রা কে? অগস্ত্যই বা কে? নাম দেখেই মনে হয়, যে-জনগোষ্ঠী মুদ্রার প্রচলন লোপ করেছিল তারাই লোপামুদ্রা। কিন্তু পৌরাণিক অভিধান ও বঙ্গীয় শব্দকোষ জানাচ্ছেন অন্য কথা। তাঁদের মতে — 'যিনি নারীগণের রূপাভিমান লোপ করেন এবং স্রষ্টার সৃষ্টিকে মুদ্রিত (চিহ্নিত) করেন', তিনিই লোপামুদ্রা। উৎপাদকের নাম তার উৎপন্নের উপরে মুদ্রিত করাকে যদি 'স্রষ্টার সৃষ্টিকে' মুদ্রিত করা বোঝায়, তা হলে মানতে হবে নল-দময়ন্তীর পরের যুগে বিদর্ভের জনসাধারণ তাঁদের পণ্যের উপর উৎপাদকের সিলমোহর লাগাতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ফলত সেকালের অন্য পণ্য-উৎপাদকেরা তাদের নিজ নিজ পণ্যে নিজ নিজ সিলমোহর লাগানোর ব্যবস্থার প্রচলন না-করায় অন্যান্য জনগোষ্ঠীর অমুদ্রিত উৎপন্নের অভিমান লোপ পাওয়াই স্বাভাবিক। একালেও, বাটা কোম্পানির ছাপ দেওয়া জুতো কি ছাপহীন জুতোর অভিমান আস্ত রাখে!

অবশ্য, অর্থনীতির নিয়মের দিক থেকে দেখলে দুটো বক্তব্যই ঠিক বলে মনে হতে

পারে। কেননা, আদি সুদখোরী পুঁজিকে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে গেলে কিছু পরিমাণে উৎপন্নকে 'পণ্যে' রূপান্তরিত করলেই চলত না, মুদ্রার প্রচলনও করতে হত। আর, নল-দময়ন্তীর সফল প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালে তাদের হাতে নিশ্চয় একদিন মুদ্রারও প্রচলন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার পরবর্তী কোনো সময়ে কোনো কারণে নিশ্চয় মুদ্রার প্রচলন বিলোপ করা হয় এবং যে-জনগোষ্ঠী তা কার্যকর করে, তার নাম হয়ে যায় লোপামুদ্রা।

তবে অগস্ত্যের কার্যকলাপ বিবেচনা করলে পণ্য-চিহ্নিতকরণের কথাটি ঠিক হোক বা না হোক, মুদ্রাবিলোপের কথাটি ঠিক বলেই মনে হয়। বঙ্গীয় শব্দকোষ 'অগস্ত্য' শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ দিয়েছেন, 'যিনি অগকে (বিন্ধ্যপর্বতকে) স্তম্ভিত করিয়াছিলেন।' সন্দেহ নেই, অগস্ত্যের জীবনের অজস্র কীর্তির মধ্যে এটিই প্রধান। তবে, তাঁর বাকি সমস্ত কার্যকলাপকে একত্রে দেখলে আমরা বুঝতে পারি, অগস্ত্য ছিলেন সেইরকম এক পরিচালক গোষ্ঠী যাঁরা পণ্যের বিকাশের (বা ব্যক্তিমালিকানার) পক্ষে ছিলেন, কিন্তু তাই বলে আর্যাবর্তের খুব বেশি বিরোধিতা করতে রাজি ছিলেন না। ভারতের ইতিহাসে যে-তিনজন 'কুম্ভজ'[১৭] মহর্ষির (বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, ও দ্রোণাচার্য্যের) কথা আমরা জানি, তাঁরা তিনজনই পণ্য ও পুঁজির পক্ষের লোক, কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের বেলায় তাঁরা বিপক্ষের হয়েই কাজ করে গেছেন। এঁদের এই দ্বৈত চরিত্রের কারণ হল, এঁরা তিনজনই কোনো না কোনো হিসেবে 'দুই-পিতা'র সন্তান। তবে দ্রোণাচার্য্য সক্রিয় ছিলেন পরবর্তী যুগে। বশিষ্ঠ ও অগস্ত্য প্রায় একই সময়ের এবং তাঁরা উভয়েই ছিলেন মিত্রাবরুণের ঔরসজাত। প্রশ্ন হল — এঁরা কারা?

বেদে যে-দেবতাদের বিষয়ে সর্বাধিক শ্লোক খরচ করা হয়েছে তাঁরা হলেন অগ্নি, ইন্দ্র ও মিত্রাবরুণ। আজ আমরা জানি অস্তিত্ব মাত্রেই অগ্নি বা তেজের (= energy-র) কোনো-না-কোনো রূপ। সেই অস্তিত্বের যখন 'আত্মোপলব্ধি' ঘটে যায় তখন তাকে ইন্দ্র বলে।[১৮] এই ইন্দ্রকেই জাতির ক্ষেত্রে জাতীয়তাবোধ, দেশের ক্ষেত্রে দেশাত্মবোধ এবং ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ বা আমিত্ববোধ বলা হয়। এই 'আমি'র সদা-সক্রিয় ভৃত্যদের তাই 'ইন্দ্রিয়' বলে। অতএব অগ্নি ও ইন্দ্রকে অনায়াসে চেনা যায়, কিন্তু মিত্রাবরুণ কে?

এই যমজ দেবতাকে চেনার সহজ উপায় হল রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হওয়া। তিনি বলছেন — "সেদিন একটি কুকুরছানাকে দেখা গেল, মাটির উপর দিয়া একটি কীট চলিতেছে দেখিয়া তাহার ভারি কৌতূহল। সে তাহাকে শুঁকিতে শুঁকিতে তাহার অনুসরণ করিয়া চলিল। যেমনি পোকাটা একটু ধড়ফড় করিয়া উঠিতেছে অমনি কুকুরশাবক চমকিয়া পিছাইয়া আসিতেছে। দেখা গেল তাহার মধ্যে নিষেধ এবং তাগিদ দুটা জিনিসই আছে। প্রাণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এই ... নবীণ প্রাণ ও প্রবীণ ভয় জীবের মধ্যে উভয়েই কাজ করিতেছে। ভয় বলিতেছে 'রোসো রোসো', প্রাণ বলিতেছে 'দেখাই যাক না'।"[১৯]

বরুণ এই 'নিষেধ'-এর দেবতা, 'রোসো রোসো'-র দেবতা, স্ট্যাটাস কো-র দেবতা; আর মিত্র হলেন 'তাগিদ'-এর দেবতা, 'দেখাই যাক না'-র দেবতা, চেঞ্জ্-এর দেবতা। তাই মিত্র বিকাশের পক্ষে, আর বরুণ স্ট্যাটাস-কো-পন্থী বা রক্ষণকামী। আর, মজা এই যে, এই দুই

দেবতা 'টু ইন-ওয়ান' হয়ে প্রতিটি জীবের ভিতরেই বিরাজ করেন, দেশেও বিরাজ করেন, জাতির চেতনার মধ্যেও বিরাজ করেন। মোটকথা প্রতিটি অস্তিত্বের সঙ্গে অগ্নি, ইন্দ্র, মিত্রাবরুণ — এই তিন দেবতার অস্তিত্ব চিরন্তন। তাই বেদে এঁদের এত স্তুতি।

অগস্ত্য সেই মিত্রাবরুণের ঔরসজাত। সুতরাং বিকল্পেও যেমন তাঁর সমর্থন থাকে, তেমনি স্ট্যাটাস-কো-র প্রতিও তাঁর সমর্থন থাকে। সেই হিসেবে পণ্যে সিলমোহর লাগানো যেমন তার সমর্থন পেতে পারে, তেমনি মুদ্রাবিলোপও তাঁর নির্দেশেই ঘটে থাকতে পারে। তবে যেভাবে তিনি লোপামুদ্রার জন্ম দিয়ে পুনরায় বিদর্ভরাজকে প্রায় ভয় দেখিয়ে লোপামুদ্রাকে 'বিবাহ' করেছেন, তাতে মুদ্রাবিলোপের কথাটিই ঠিক বলে মনে হয়। তা ছাড়া বিন্ধ্যপর্বতের সঙ্গে অগস্ত্যের ব্যবহারও এই মুদ্রাবিলোপের কথাটিকেই সমর্থন করতে চায়।

বিন্ধ্যপর্বত বিষয়ে বঙ্গীয় শব্দকোষ জানাচ্ছেন — " বিন্ধ্য হল সে-ই যে সূর্যগতিরোধ হেতু বিরুদ্ধ ধ্যান করে'। ... ইহা ভারতের মধ্যস্থ পূর্বপশ্চিমে আয়ত পর্বতশ্রেণী। ইহার উত্তর ভাগ 'আর্যাবর্ত' ও দক্ষিণভাগ 'দাক্ষিণাত্য'। 'সূর্য মেরুর ন্যায় আমার চতুর্দিকে ভ্রমণ করিবে না কেন' — এই ঈর্ষায় বিন্ধ্য দেহবৃদ্ধি করিয়া সূর্যের গতিরোধ করিতে উদ্যত হইলে আপৎ-প্রতিকারার্থ দেবতার প্রার্থনায় অগস্ত্য বিন্ধ্যের নিকটে আসিয়া দাক্ষিণাত্য গমনের পথ চাহিলেন। বিন্ধ্য অবনত হইয়া মুনির আদেশ পালন করিলে, 'আমার প্রত্যাগমন পর্যন্ত তুমি এইরূপে অবস্থান কর'— এই বলিয়া অগস্ত্য দাক্ষিণাত্যে প্রস্থান করিলেন, আর ফিরিলেন না; বিন্ধ্যও অবনত হইয়া রহিলেন, সূর্যের গতিরোধ করা হইল না।" পৌরাণিক অভিধানকার বিন্ধ্য সম্পর্কে উপরোক্ত কথাগুলি তো বলেছেনই, বাড়তি যে-কয়টি তথ্য সরবরাহ করেছেন তা হল — ক) দেবতারা বিন্ধ্যপর্বতে বিহার করেন বটে, কিন্তু দিনযাপন করেন সুমেরুপর্বতে। সেজন্য সুমেরু বিন্ধ্যের অপেক্ষা নিজেকে শ্রেষ্ঠ ও বলিষ্ঠ মনে করে। খ) অগস্ত্য ছিলেন বিন্ধ্যের গুরু, অর্থাৎ দুজনের ভিতরে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ছিল।

'বিন্ধ্য' শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ হল 'যে বিরুদ্ধ ধ্যান করে'। সেকালে বিন্ধ্য বলতে কাকে বোঝানো হত, তা জানতে পারলে আমরা নিশ্চয় বুঝতে পারব, সে কার বিরুদ্ধে কী ধ্যান করত? অতএব জানা দরকার — বিন্ধ্য কে?

ভারতের নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতিকে ইয়োরোপীয় চিন্তাশৃঙ্খলার ভিতরে আঁটানো প্রায় অসম্ভব। কারণ পাশ্চাত্যের চিন্তাশৃঙ্খলায় আর যাই হোক, নদ-নদীর কখনো বিয়েশাদি বালবাচ্চা হয় না, হতে পারে না; ইয়োরোপের 'রিভার'-এর তো স্ত্রীলিঙ্গই হয় না। কিন্তু ভারতের নদ-নদীর হয়। গঙ্গার বিয়ে হয়, বাচ্চাও হয়। ইয়োরোপের কোনো পাহাড়-পর্বতের বিয়ে হওয়া, ছেলেমেয়ে হওয়া কিংবা তাদের পক্ষে কোনো মানুষের শিষ্য হওয়া — এসব কল্পনাতীত। কিন্তু ভারতের হিমালয় (হিমালয় কন্যার আগমনেই তো দুর্গাঠাকুর, দুর্গাপুজো!) বা বিন্ধ্য প্রভৃতি পর্বতের ক্ষেত্রে তেমন হয়। স্বভাবতই এদেরকে বুঝে নিতে একালের ইয়োরোপ-প্রভাবিত আবহাওয়ায় ঘোরতর সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির নিয়মে এগোলে এসব বুঝতে খুব বেশি অসুবিধা হয় না।

'যা পর্বে পর্বে বিন্যস্ত থাকে' তাকে 'পর্বত' বলে। একালের ভাষায় একে বলা হয় 'র‍্যাঙ্ক

অ্যান্ড ফাইলে' বিন্যস্ত 'সোস্যাল অর্গানাইজেশন' বা সামাজিক সংগঠন। উদাহরণ স্বরূপ — ৩০০০ জন আনস্কিলড ওয়ার্কার বা হেল্পারের নিম্নতর পর্বের উপর ১০০০ জন ইলেকট্রিশিয়ানের একটি পর্ব বা স্তর, তার ওপর ১০০ জন সুপারভাইজারের আর একটি স্তর, তার ওপর ১০ জন ফোরম্যানের পর্ব, এবং সর্বোপরি ১ জন ইঞ্জিনিয়ার — এইভাবে ৪১১১ জন লোককে নিয়ে গড়ে উঠতে পারে একটি বিদ্যুৎব্যবস্থাপক সামাজিক সংগঠন বা পর্বত; একালের ম্যানেজমেন্টের ভাষায় 'পিরামিড'। প্রাচীন ভারতের মনোলোকে এরকম বহু পর্বত রয়েছে। এমনকী ডানা-কাটা পর্বতও রয়েছে, উড়ে বেড়াত বলে ইন্দ্র যার ডানা কেটে দিয়েছিল। এদের আচার-ব্যবহার মানুষের মতোই। কিন্তু প্রশ্ন হল — পর্বত বা সংগঠনের স্বভাব কি মানুষের মতো হতে পারে?

একসময় কলকাতায় এক প্রমোটারের পাল্লায় পড়েছিলাম। আমি তাঁকে বেআইনি কাজকর্ম থেকে বিরত থাকার কথা বোঝাতে গিয়ে সরকারের রোষের সম্পর্কে সতর্ক করছিলাম। উত্তরে বিরক্ত হয়ে তিনি বলে ওঠেন — "কী বার বার 'সরকার' 'সরকার' করছেন? সরকার মানে কী? শুকনো কাঠ, না ধোঁয়া? সরকার মানে তো কিছু লোক। তাদের মধ্যে যে-লোক আমাকে ফেস করছে, দেখতে হবে সে আমার পক্ষে না বিপক্ষে। পক্ষে না হলে, যাতে পক্ষে আসে তার ব্যবস্থা করতে হবে। মানুষ তো রে বাবা! এ ভাবে না মানে, ও ভাবে মানবে।"

এই 'মহৎ ব্যক্তি'র কাছেই আমি শিখেছিলাম, সরকার জড় বা অশরীরী কিছু হয় না। সরকার একটা পর্বত বা সিস্টেম্যাটিক অর্গানাইজেশন হলেও মানুষের সঙ্গে যখন সে সম্পর্কিত হয়, তখন সজীব প্রাণীর মতোই আচরণ করে। বৈদিক (বা আদিম সমাজতান্ত্রিক) অর্থব্যবস্থাও সেইরকম পর্বত, আদিম ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাও সেইরকম পর্বত। সেকালের বৈদিক অর্থব্যবস্থাকে সুমেরুপর্বত (কখনো-বা হিমালয় পর্বত) বলা হত, এবং উঠতি ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাকে বিন্ধ্যপর্বত বলা হত; আর সরকারি রাজকোষকে বলা হত সূর্য। আর্যাবর্তের বাইরে, বিশেষত দাক্ষিণাত্যের পুঁজিবাদী বিকাশ সেকালে সুমেরুর (বা হিমালয়ের) গর্বকে খর্ব করতে চলেছিল। ফলত, ব্যাপারটি সুমেরুর পরিচালক বেদবাদীদের স্বার্থবিরোধী হয়ে উঠেছিল। স্বভাবতই পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থাকে সংযত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। 'বিদর্ভের জনগোষ্ঠীর পরিচালকেরা' (= লোপামুদ্রার স্বামী) বা 'মহর্ষি অগস্ত্য' এই পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার (বা বিন্ধ্যপর্বতের) পরামর্শদাতাও (গুরু) ছিলেন। (একালেও তো কোনো কোনো রাজ্য সরকার কোনো কোনো বিষয়ে 'বিশেষজ্ঞ দল' নিয়োগ করে ও তার পরামর্শেই চলে! চলে না?) সেই অগস্ত্যকেই দায়িত্ব দেওয়া হয় উঠতি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বা বিন্ধ্যপর্বতকে সংযত করতে। তাঁর পরামর্শেই যখন এই অর্থব্যবস্থার ক্রমবিকাশ বা বিন্ধ্যপর্বতের উত্থান একটু একটু করে ঘটছিল, তাঁকে দিয়েই বিন্ধ্যপর্বতকে সংযত করা সহজ কাজ ছিল এবং সেটাই করা হয়েছিল। তাঁকে দিয়েই বিন্ধ্যপর্বতকে বা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থাকে মাথা নত করতে বাধ্য করা হয়, অর্থাৎ তাঁরই হস্তক্ষেপে এই ধনতন্ত্রের উত্থানকে পর্যুদস্ত করা হয়। ফলত, ভারতে পুঁজিবাদ আর বিকশিত হতে পারে না। অতঃপর ভারতের পুঁজিবাদী শক্তিগুলি বৈদিক

সমাজতন্ত্রের অচলায়নের সামনে মাথা নীচু করে দিনগত পাপক্ষয় করতে থাকে।

তবে সেই পুঁজিবাদের আর বিকাশের কোনো চেষ্টা আর কক্ষনো হয়নি, এমন নয়। পরে, রামরাজত্বের কালে, পুঁজিবাদ আরেকবার তেড়েফুঁড়ে উঠেছিল, এবং বলতে গেলে পৃথিবীর আদিম ধনতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করেই ফেলেছিল। ফিনান্স ক্যাপিটালের জন্ম হয়ে গিয়েছিল, সে ক্ষমতাও দখল করেছিল; এমনকী সমাজে কালো-টাকা বা ব্ল্যাক-মানিরও রমরমা দেখা দিয়েছিল, নগদ-নারায়ণের অবতার শ্রীকৃষ্ণ রূপে। কিন্তু ভারতসমাজ সেই সমস্ত অর্থনৈতিক বিকাশের উপর ঘোরতর নিষেধ প্রয়োগ করে সেই বিকাশকে এত কঠোরভাবে লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত করে দিয়েছিল যে, ব্রিটিশের ভারত আগমনের আগে সে আর মুখ তুলতেই সাহস করেনি। ধনতান্ত্রিক বিপ্লবের সেই যোদ্ধাদের উত্তরসূরিরা সেই দুঃখে আজও 'অষ্টমপ্রহর' 'হরে রাম, হরে কৃষ্ণ' গেয়ে কাঁদতে থাকে। তবে, ভারত-ইতিহাসের সে অন্য আরেক অধ্যায়।

খনন, খাননিক ও ভারত-ইতিহাস চর্চার খানাখন্দ

'বিদর্ভের কথা'র আর একটি অধ্যায় রুক্মিণীহরণ। কিন্তু দুটি কারণে সেই অধ্যায়ে আজ আর প্রবেশ করা যাবে না। প্রথমত, অধ্যায়টি অনেক বড় এবং সে-অধ্যায়ে প্রবেশ করতে গেলে এই নিবন্ধের অবয়বের অত্যন্ত বৃদ্ধি ঘটবে, যা অভিপ্রেত নয়। দ্বিতীয়ত, ইতিমধ্যেই বিদর্ভ বিষয়ে মূল বক্তব্যকে কমবেশি উপস্থাপন করা গেছে। আগ্রহী পাঠক হয়তো-বা মহাভারত, বঙ্গীয় শব্দকোষ ইত্যাদি গ্রন্থের সাহায্যে নিজেই বাকিটা করে ফেলতেও পারেন। তাই আপাতত নিবন্ধের উপসংহারে চলে যাওয়াই বিধেয়।

একালের ইতিহাসচর্চায় 'প্রত্নতাত্ত্বিক খনন' কথাটা প্রথমেই এসে পড়ে। কারণ, ইতিহাসচর্চা বলতে এখন যা বোঝায় তার প্রায় পুরোটাই পাশ্চাত্য থেকে শেখা। আর, পাশ্চাত্য তো স্বভাবতই দেহবাদী। পৃথিবীর মাটিটা সে আগে দেখতে পায়, মনের মাটি তার চোখে পড়ে কম। তার কাছ থেকে শিখে আমাদের রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর উত্তরসূরিরা ভারতের পার্থিবভূমি খনন করে ফেলেছেন, এখনও খনন করে চলেছেন। সেখানে ইতিহাস একেবারেই পাওয়া যাচ্ছে না, তা নয়। কিন্তু সে প্রায় উঞ্ছবৃত্তির সামিল। এ দিকে ভারত তো স্বভাবতই আত্মবাদী বা মনবাদী। এবং তার সেই মনোলোকের বিস্তারিত ও লিখিত বর্ণনা তো তার রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণাদি গ্রন্থে রয়েছেই। অথচ একালের খননকার্যে ভারতের সেই মনোলোকটাকেই এ যাবৎ বাদ দিয়ে যাওয়া হয়েছে। ভারতের সেই মনোভূমিতে যতটুকু খননকার্য এ পর্যন্ত করা হয়েছে, তার পরিমাণ অত্যন্ত কম এবং তার প্রায় সবটুকুই করে গেছেন রবীন্দ্রনাথের মতো বড় মানুষেরা। ফলে ভারতের প্রকৃত ও সম্পূর্ণ ইতিহাস এখনও আমাদের হাতে আসেনি। রবীন্দ্রনাথের সেই আরব্ধ কাজে হাত লাগানোই পঁচিশে বৈশাখে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর যথার্থ উপায়।

তবে এক্ষেত্রে একটি মহাবিভ্রাটের ঘটনা 'মন-খাননিক'দের স্মরণ রাখা ভাল। পুরাণাদির দেশ-নদী-পর্বতকে যান্ত্রিকভাবে বাস্তবের দেশ-নদী-পর্বতের সঙ্গে মেলাতে যাওয়ার বিপদ

রয়েছে। মনোলোকের ভূমি খনন করতে গিয়ে নানারকম খানায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা। ভারতের পুরাণাদি গ্রন্থে লেখা ভৌগোলিক বর্ণনা অনুসারে ভারতের ম্যাপ প্রস্তুত করতে গিয়ে ভারত-ইতিহাস চর্চার সবচেয়ে অগ্রজ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের তেত্রিশ বছরের আসুরিক পরিশ্রম সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। তাঁর সেই তেত্রিশ বছর আমাদের জানিয়ে দেয়, ভারতের মনোলোক ও পার্থিবলোক দুটি লোক পরস্পরের সমান্তরাল বটে কিন্তু সমান নয়। সমান করার চেষ্টা করে পুনরায় তেত্রিশ বছর খরচ করার প্রয়োজন নেই, সেটি আমাদের জন্য তিনিই খরচ করে গেছেন। তাই তিনি আমাদের প্রণম্য অগ্রজ। মন পবিত্র করে, সকলের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিয়ে এগোতে হয়। অসূয়াহীন পবিত্র মনই আমাদের মনোভূমি খননের প্রকৃত খাননিক।

টীকা ও টুকিটাকি

১. 'প্রাচীনকালে লেখা কোন ইতিহাস গ্রন্থ পাওয়া যায়নি। ... প্রাচীন ভারতে (গ্রীসের) হেরোডেটাস বা থুকিডিডিস, লিভি বা টাকিটাসের মত কোন প্রতিভাবান ঐতিহাসিক জন্মগ্রহণ করেননি। ... ভারতীয় সাহিত্যে কেবলমাত্র ১১৫০ খ্রিস্টাব্দে কহ্লণের লেখা রাজতরঙ্গিনী বা কাশ্মীরের ইতিবৃত্ত গ্রন্থটিকেই ইতিহাসের মর্যাদা দেওয়া যায়। ... ভারত-ইতিহাসের পক্ষে এ যুগের (৩০০ খ্রিস্টাব্দ) সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ *পেরিপ্লাস অফ দি এরিথ্রিয়ান সী* অর্থাৎ ভারত মহাসাগরে ভ্রমণ। ... বইটিকে সোনা দিয়ে ওজন করা যায় — এই মন্তব্য করে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এর অপরিসীম গুরুত্বকে চিহ্নিত করেছেন: ...' এই উদ্ধৃতিগুলি শ্রী সুনীল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা 'প্রাচীন ভারতের ইতিহাস' থেকে নেওয়া। এটি একটি কলেজপাঠ্য বই। বইটি আগাগোড়া দেখে দিয়েছেন ঐতিহাসিক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সংক্রান্ত অধিকাংশ বইই ঠিক এই ধরনের মন্তব্যে ভরা।

২. উদ্ধৃতিগুলির জন্য *ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা*, *ভারতের ইতিহাস* এবং *ঐতিহাসিক সূত্র*— রবীন্দ্রনাথের এই তিনটি নিবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৩. আজকের দুনিয়ার প্রতিটি ভাষাই বিশেষ্যভিত্তিক বা লোগোসেন্ট্রিক ধর্মাবলম্বী। এতে ভাষাটির শব্দগুলি হয় লোগোর মতো, বস্তু ও বিষয়ের গায়ে যেন তা সেঁটে রাখা হয়েছে। ফলে এতে সাধারণভাবে একটি শব্দের একটি অর্থ এবং শব্দের সঙ্গে অর্থের কোনো সম্বন্ধ থাকে না; তারা আর্বিট্রারি। তাই বিশেষ্যভিত্তিক ভাষায় শব্দের মানে খুঁজতে হয় শব্দের বাইরে। অন্য দিকে, প্রাচীন পৃথিবীর একটিই ভাষা ছিল এবং তা ছিল ক্রিয়াভিত্তিক-ধর্মাবলম্বী। সে-ভাষা থেকেই পৃথিবীর সব ভাষার জন্ম হয়েছে এবং প্রকৃতির নিয়ম মেনেই সেই ভাষাগুলি তাদের ক্রিয়াভিত্তিক-ধর্ম ত্যাগ করে ক্রমে ক্রমে বিশেষ্যভিত্তিক ভাষায় পরিণত হয়েছে। কেবলমাত্র প্রাচীন বাংলা ভাষা তার আদি ক্রিয়াভিত্তিক-ধর্ম ব্রিটিশ শাসনের আগে পর্যন্ত বেশ খানিকটা ধরে রাখতে পেরেছিল, এখনও তা কমবেশি আছে। এ ভাষায় শব্দের মানে খুঁজতে হয় শব্দের ভিতরে। এ বিষয়ে বর্তমান লেখকদ্বয়ের গ্রন্থগুলি দ্রষ্টব্য।

৪. 'হয়তো জনমেজয়ের সর্পসত্রের কথার মধ্যে একটা প্রচণ্ড প্রাচীন যুদ্ধ-ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে। ... তবু এই রাজা ইতিহাসে তো কোনো বিশেষ গৌরব লাভ করেন নাই।' *ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা*। রবীন্দ্রনাথ।

৫. ভারতবর্ষ কতখানি পুঁজিবিরোধী ছিল, 'পুঁজি' শব্দটিই তার একটি অন্যতম নিদর্শন। সেকালে খেয়েমেখে যা কিছু 'অবশেষ' থাকত, তা জমালেই যে তা সমাজদেহের ফোঁড়া হয়ে দেখা দেবে, সেকালের সমাজ পরিচালকেরা কোনোভাবে তা বুঝে গিয়েছিলেন, তাই অবশেষকে 'আবর্জনা' রূপে বর্জন করে দেওয়াই ছিল সামাজিক রীতি এবং যারা সেই আবর্জনা কুড়িয়ে নেয়ার জন্য 'আবর্জনা নিক্ষেপ স্থানে যেত' তাদের সামাজিকভাবে নিন্দা করা হত 'কিরাত' বলে। যদিও, তা সত্ত্বেও সেই আবর্জনা থেকে আদি পুঁজির উদ্ভব

রুখে রাখা যায়নি। মনে রাখা ভাল, 'অবশেষ' শব্দটির অনাবাসী ভারতীয় আত্মীয়টির নামই abscess অর্থাৎ পুঁজ-ধারক ফোড়া।

৬. 'Interest-bearing capital, or, as we may call it in its antiquated form, usurer's capital, belongs together with its twin brother, merchant's capital, to the antediluvian forms of capital, which long precede the capitalist mode of production and are to be found in the most diverse economic formation of society. ... In ancient Rome, beginning with the last years of the Republic ... merchant's capital, money-dealing capital, and usurer's capital developed to their highest point within the ancient form.' 'Pre-capitalist Relationships' – Karl Marx, *The Capital*, Vol. III, Chapter XXXVI.

৭. কথাসরিৎসাগর মতে 'গূঢ়ার্থসা প্রকাশশ্চ সারোক্তিঃ শ্রেষ্ঠতা তথা। নানার্থবত্ত্বং বেদ্যত্বং সন্দর্ভঃ কথ্যতে বুধৈঃ।' অর্থাৎ সন্দর্ভের ভিতরে গূঢ়ার্থ, নানার্থ, শ্রেষ্ঠ ও সার উক্তি নিহিত থাকে। বঙ্গীয় শব্দকোষ মতে বাংলায় 'সন্দর্ভ' মানে হল — যার ভিতরে গূঢ়ার্থ, রহস্য ও তত্ত্ব থাকে। এসব ভেতরে থাকলে সন্দর্ভ বুদ্ধি পায় কি না — পাঠক ভেবে দেখবেন। দ্রষ্টব্য শব্দ — 'কুতপ'।

৮. এই কাশের (পণ্যের) আধারকে আকাশ (marketing sphere) বলে, আর সে-আকাশে যে-পণ্যপ্রবাহ বা 'কমোডিটি ফ্লো' চলে তাকে বলে আকাশগঙ্গা বা মন্দাকিনী। প্রাচীন ভারতে সম্প্রলয়-শীর্ষে অধিষ্ঠিত মহর্ষিদের সঙ্গে অপর সম্প্রদায় শীর্ষে অধিষ্ঠিত মহর্ষিদের মধ্যে প্রথম যে-পণ্যবিনিময়ের সূত্রপাত হয়েছিল, এই আকাশগঙ্গা (বা কমোডিটি ফ্লো) সে ই। এই যে দুরকম ধারণা — একটা বাস্তবে, আর একটা মনোলোকে (বা অন্তরীক্ষে = অন্তরে ঈক্ষণ করলে যে-লোক দেখা যায়) — এ কোনো কাল্পনিক ধারণা নয়। ভারতবাসীর চিন্তাশৃঙ্খলায় এই পদ্ধতি অত্যন্ত ওতপ্রোত, এবং এর উত্তরাধিকার সেই সুদূর ঋক্‌বেদের যুগ থেকে প্রবহমান। আর, তা তৃণ-দর্ভ-কুশ-ধান্য-নীবার-দেশ-নদী-পর্বত-সমুদ্র সর্বক্ষেত্রেই প্রচলিত ছিল। একটা উদাহরণ দিয়ে দিই — ঋক্‌বেদের ১৫।৯৮।৫ নম্বর শ্লোকটি খুলে ফেলুন, দেখবেন দুরকম সমুদ্রের কথা লেখা আছে — একটি উপরে, আর একটি নীচে, একটি 'উপরিস্থিত অন্তরীক্ষের সমুদ্র', আর একটি 'পার্থিব সমুদ্র'। অপার্থিব সমুদ্রটিকে একালে আমরা এখনও 'জনসমুদ্র' বলে থাকি।

৯. *পনেরো-আনা*, বিচিত্র প্রবন্ধ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১০. বিষয়টি লেখকের *মৌলবিবাদ থেকে নিখিলের দর্শনে* গ্রন্থের ৩৫ ও ৪৬ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত করা হয়েছে। এখানে সারমর্মটুকু দেওয়া হল।

১১. আমি তখন (সম্ভবত ১৯৭০ সাল) একটি সরকারি নির্মাণ প্রকল্পের অধীন একটি ছোট নির্মাণসংস্থার দায়িত্বে। কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সিমেন্ট তখন সরকারই দিত। ভুক্তভোগীরা জানেন, মেসিনে যথাযথভাবে ঢালাইয়ের কাজ করলে ৩/৪ % সিমেন্ট বেঁচে যায়। হাজার-দুহাজার বস্তার ক্ষেত্রে সেই উদ্বৃত্ত কম নয়। তা নিয়ে তখন ভারি মুশকিলে পড়তে হত। কর্তৃপক্ষকে ফেরত দেওয়া যেত না। তা হলে নিশ্চয় কাজে যথাযথ সিমেন্ট খরচ করা হয়নি, পাছে তার এমন সন্দেহ করেন। বাউন্ডারির বাইরে নিয়ে যাওয়া চুরির পর্যায়ে পড়ত। যদিও তখন বাইরে ব্ল্যাকে সিমেন্টের অনেক দাম। অসৎ কর্মাধ্যক্ষেরা তাও সেই সিমেন্ট বাইরে বিক্রি করে দেওয়ার নানা উপায় বের করে দু-পয়সা কামিয়ে নিতেন, অথচ কর্তৃপক্ষের চোখেও সৎ থাকতে পারতেন। কেবল তাই নয়, কামিয়ে নেওয়ার লোভে উদ্বৃত্ত যাতে বাড়ে, তার জন্য কম সিমেন্ট দিয়ে কাজ করতেও তাঁদের কেউ কেউ পিছপা হতেন না। আর এ দিকে, সৎ কর্মাধ্যক্ষেরা খুবই মুশকিলে পড়তেন। তাঁরা সেই সিমেন্ট বাইরে বেচতেন না, আবার সাইট-অফিসে বাড়তি সিমেন্ট রাখতেও পারতেন না, পাছে কর্তৃপক্ষ তাঁদের চোর ভাবেন। মাঝ থেকে অসৎ লোকেরা প্রচুর টাকাও কামাতেন আবার কোম্পানির খাতায় সৎ-ও থাকতেন; আর সৎ লোকেরা কোম্পানির খাতায় অসৎ বলে প্রমাণিত হতেন, অথচ দু-পয়সা কামাতেও পারতেন না। আমি যোগ দিয়েছিলাম বোকাদের দলে, যাঁরা বস্তা বস্তা সিমেন্ট পাশের পুকুরে ফেলে জাতীয় সম্পত্তি নষ্ট করে নিজেদের মান বাঁচাতেন। যৌথসম্পত্তি উদ্বৃত্ত হলে সৎ-অক্ষর কতখানি মুশকিলে পড়েছিলেন, এভাবে নিজে ঠকে না

বুঝলে বোঝা হত না। তবুও তো আমাদের একালে বাইরে বিক্রিবাটা করা যেত, প্রাচীন ভারতে তো বিক্রিবাটার সূত্রপাতই হয়নি! উদ্বৃত্ত নিয়ে যক্ষ বেচারা যায়, তো যায় কোথায়? তার অসহায় অবস্থা একালে বসে কল্পনা করাও বেশ কঠিন।

১২. পুরাণাদিতে এর সাক্ষ্য রয়েছে। তবে, হাতের কাছে একজন জলজ্যান্ত সাক্ষী রয়েছেন, তিনি ইতিহাস বিশেষজ্ঞ শ্রী ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। যতদূর মনে পড়ে, ১৯৯৩ সালে তিনি আনন্দবাজারে চিঠি লিখে 'ভারতের জনসাধারণকে ভারতী বলা হত' বলে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন।

১৩. বিষয়টি লেখকের *জীবনদখলের গ্লোবাল প্রোগ্রাম : ম্যানেজিং ফিউচার্স* শীর্ষক নিবন্ধে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশের 'নিসর্গ' পত্রিকায়।

১৪. বিষয়টি লেখকের '... *প্রাচীন ভারতে ম্যানেজমেন্ট ও বাৎস্যায়নের কামসূত্র*' নিবন্ধে বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে লেখকের 'দিশা থেকে বিদিশায় ...' গ্রন্থে।

১৫. ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি অনুসারে 'যারা পায়ে নয়, বুকে হেঁটে দৌড়য়' এবং 'যারা সর পালন করে' তারা যথাক্রমে 'নাগ' ও 'সর্প' পদবাচ্য; তা সে reptile এবং snake-ও হতে পারে, আবার অনুৎপাদক-বিনিময়জীবী এবং মজুতদারও হতে পারে। ভাব এক, ভাবের আধার জঙ্গলের সাপও হতে পারে, সমাজের ধনবানও হতে পারে। তা না-বুঝে 'নাগ' ও 'সর্প'দের কেবলমাত্র snake ভেবে আমরা সমাজের নাগ-সর্পদেরই বাদ দিয়ে ফেলেছি। যদিও জানি, নগদ নারায়ণের ধারকই অনন্ত নাগ, যার অসংখ্য মাথা। ব্যাঙ্কে যে কোটি কোটি টাকা থাকে তার মালিক তো অসংখ্যই! বলে রাখা যাক, মার্কস সাহেব Bourgeois-দের পূর্বপুরুষদের খোঁজ করতে গিয়ে যে-Burgher-দের বা 'নাগরিক'দের পেয়েছিলেন, ভারতে তাঁরাই ছিলেন নাগ। 'নাগ' পদবিওয়ালা মানুষ আমাদের দেশে এখনও রয়েছেন। অথচ এখন আমরা নাগরিক বুঝি 'সিটিজেন' অর্থে, কিন্তু নাগ বুঝি না! এই নাগেদের রমরমা ছিল বলেই তো বিদর্ভের রাজধানী কুণ্ডিনগর। 'কুণ'-যুক্ত যত শব্দ — কুণপ, কৌণপদন্ত (= ভীষ্ম), কুণ্ড, কুণ্ডল, কুণ্ডলিনী (সাপিনী), কুণ্ডিকা (সাপুড়েদের সাপ রাখার গোল চ্যাপ্টা ঝুড়ি), কুণ্ডিন, কুণ্ডী (একালের ভাষায় নিজস্ব স্থানিব্যাগ বা অ্যাকাউন্ট যার আছে), কুণ্ডু ও কুণ্ডলিয়া (পদবিরূপে যা আজও প্রচলিত) — এগুলির অর্থসন্ধানে 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-এ ঢুকলে পাঠক নিজেই অনেকটা জেনে নিতে পারবেন।

১৬. 'দক্ষিণাপথ — ... অবন্তী ও ঋষ্য পর্বত অতিক্রম করিয়া দক্ষিণাপথে অনেকগুলি পথ গিয়াছে। এই পথে বিন্ধ্যপর্বত ও সমুদ্রগামিনী পয়োষ্ণী নদী। এই স্থলে মহর্ষিদিগের আশ্রম ও বিদর্ভদিগের পথ, ইহা কোশলের দিকে গিয়াছে। ইহার পর দক্ষিণদিকে যে দেশ, তাহার নাম দক্ষিণাপথ।' *কৃত্যকল্পদ্রুমঃ, ধর্মকাণ্ডম্*; মহেশচন্দ্র পাল কর্তৃক সঙ্কলিত। ১৩১৮ বঙ্গাব্দ।

১৭. পুরাণাদিতে 'জল' শব্দটি বহু স্থানে প্রাচীন যৌথসমাজের 'জনসাধারণ' অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। সেই জনসাধারণের মধ্যে যাঁরা কিছু না কিছু বিষয়ের ব্যক্তিমালিক, তাঁদের মৎস্য বলা হয়েছে। এর মধ্যে আবার যাঁদের ব্যক্তিমালিকানার পরিমাণ বেশি এবং নিজ নিজ সম্পদ রাখার কলসি বা কুম্ভ ছিল, তাদের বলা হত কুম্ভীর, একালে বলা হয় 'টাকার কুমীর'। সেই রকম কুম্ভে যাদের জন্ম তাদের বলা হত কুম্ভজ।

১৮. 'বাংলাভাষা : প্রাচ্যের সম্পদ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের একটি নিবন্ধে 'অগ্নি', 'ইন্দ্র' শব্দের অর্থ বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়েছে। এখানে পুনরুক্তি করার পরিসর নেই। তাই সংক্ষেপে সারা হল।

১৯. 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' / *কালান্তর* / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মহারাষ্ট্রের নাগপুরের 'খনন' পত্রিকার ২০০৬ 'রবিঠাকুর সংখ্যায়' প্রকাশিত।

এ পাঁচিল কি দুর্লঙ্ঘ্য? এই হিন্দু-মুসলিম বিভাজন?

রবি চক্রবর্তী

এক

বেশ কিছুকাল আগে খবরের কাগজে হালকা রসের একটি গল্প-টুকরো পড়েছিলাম। বয়সে অল্প-বড় দিদি মা-বাবার কাছে গল্প করছে, নিজেদের ইস্কুল নিয়ে। সে বলছে, ইস্কুলের টিচাররা মেটারনিটি লিভ নেওয়ায় তাদের লেখাপড়ায় খুব ব্যাঘাত হচ্ছে। সব শোনার পর মুচকি হেসে 'বিজ্ঞ' ছোটভাই বলল, 'আমাদের স্যারেরা কিন্তু পেটারনিটি লিভ নেয় না।'

গল্পটি আমার কখন মনে পড়ে জানেন? যখন দেখি, এক ধর্মের লোক অন্য ধর্মের খুঁত বার করছেন, আর নিজের ধর্ম নিয়ে গর্ব অনুভব করছেন। বলা বাহুল্য, এখানে ধর্ম কথাটি religion অর্থে ব্যবহার করেছি, যে অর্থে কথাটিকে ব্যবহার করে আজকের রাষ্ট্র ও মিডিয়া।

তবে ধর্ম বা religion বলতে একটা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও আমরা বুঝি।

কয়েকটি উদাহরণ দিলে আমার কথাটা স্পষ্ট হবে। শিক্ষিত হিন্দু প্রায়ই বলেন — আমাদের ধর্ম কত উদার; ধর্মবিশ্বাস নিয়ে কোনো জবরদস্তি নেই; বাইরের কাউকে হিন্দু করার চেষ্টা নেই; সকলের সঙ্গে শান্তিতে সহাবস্থান এই ধর্মের লক্ষ্য। এরই পাশে দেখো,' খ্রিস্টান বা মুসলমানের ধর্মবিশ্বাসের স্থূলতা, জবরদস্তি, আর নিজেদের দলে বাইরের মানুষকে নিয়ে আসার অবিরাম চেষ্টা। খ্রিস্টান ধর্মের বাইবেলে বলছে, ভগবান রবি থেকে শুক্র মাত্র ছয় দিনে বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করেছিলেন, সপ্তম দিন শনিবারে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। বাইবেল বলছে, প্রথম মানব-দম্পতি আদম-ইভ ঈশ্বরের নির্দেশ অমান্য করে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়েছিলেন। সেই পাপের ভাগী সকল মানবজাতি এবং কেবল যিশুর শরণ নিলেই এই পাপের থেকে ত্রাণ সম্ভব। আবার কোরান বলছে, মহম্মদ ঈশ্বরের শেষ প্রেরিত পুরুষ, এবং এমনকী ঈশ্বরের জন্য অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করায় উৎসাহ দিচ্ছে। অপরদিকে খ্রিস্টান বা মুসলমানের কাছে ঘোর আপত্তিকর লাগে হিন্দুদের বিগ্রহপূজা, উচ্চনীচ হিসাবে জাতিভেদ, এবং তার পিছনে ধর্মীয় অনুমোদন। হিন্দুর অবতার-তত্ত্বে মাছ, কচ্ছপ, শুয়োর ইত্যাদি রূপে ভগবানের এই পৃথিবীতে নেমে আসার কাহিনীও কম স্থূল বা কম হাস্যকর লাগে না অহিন্দুর চোখে।

ঈশ্বর বা চরম সত্যে পৌঁছানোর উপায় বাতলানোর দিক থেকে যত নৈকট্য থাকুক না কেন, সামাজিক ন্যায় এবং পারমার্থিক সত্য বিষয়ে এক ধর্ম আর অন্য ধর্মের মধ্যে অনেক পার্থক্য। সেই পার্থক্য ভিন্ন ভিন্ন ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে আনে নানান ভেদ, যে ভেদগুলিকে পোষণ করে যায় ক্ষমতা বা আধিপত্যকামী নানান ব্যষ্টি বা সমষ্টি-মানুষ। কালপ্রবাহে বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর মানুষের পরস্পর সম্বন্ধে অজ্ঞতা বাড়তেই থাকে, আর সৃষ্টি হতে থাকে অবিশ্বাস আর সন্দেহ। সে বিষ স্তিমিত আকারে থেকে যায় শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষের মনে। অন্য

ধর্মের লোকের সম্বন্ধে বিদ্বেষ হয়ে যায় স্বধর্মনিষ্ঠার প্রমাণ। ক্রনিক রোগের মতো ছোটখাটো সঙ্ঘাত হতেই থাকে, আর দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে ঘটে মারাত্মক ধ্বংসলীলা। বলা বাহুল্য, পার্থিব সম্পদের দখল নিয়ে লড়াই, নেপথ্যে থেকে এই সব সঙ্ঘর্ষের ইন্ধন যুগিয়ে যায়। এর ভাল উদাহরণ, হাজার বছর আগে ইয়োরোপের খ্রিস্টান রাজারা প্যালেস্তাইনের দখল নিয়ে ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেড শুরু করেছিল ওই অঞ্চলের মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধে। আজ তেলসম্পদে ধনী মধ্যপ্রাচ্যের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চলছে হত্যালীলা ও ত্রাসের রাজত্ব। এবং এক দিকে শক্তিধর রাষ্ট্রপ্রধান (মার্কিন প্রেসিডেন্ট), ধর্মগুরু (রোমের পোপ) আর অন্য দিকে নানা গুপ্ত সংগঠন (যথা আল কায়দা ইত্যাদি) স্পষ্টভাবে অথবা আকারে ইঙ্গিতে ধর্মযুদ্ধের ডাক দিয়ে চলেছে।

আজকের পরিস্থিতি হল মারাত্মক, এবং তা গোটা মানবজাতির পক্ষে। বিজ্ঞান ও টেকনোলজির ক্রমবিকাশ বিভিন্ন রাষ্ট্রের হাতে এত মারণাস্ত্র ইতিমধ্যেই তুলে দিয়েছে যে, তার পুরোটা খরচ করার দরকার হবে না, তার আগেই ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রাণের চিহ্ন পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে যাবে। আধুনিক টেলি-যোগাযোগের সুবাদে পৃথিবীর কোনো দেশই আর অন্য দেশ থেকে নিরাপদ দূরত্বে নেই, তার ওপর ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সামরিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সূত্রে নানারকম জটিল সম্পর্কজালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে গেছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ। ফলস্বরূপ সব দেশ, সব জাতিই আজ বিপন্ন। তবু কোনো বিরাম নেই অস্ত্রে শান দেওয়া আর পরস্পরের বিরুদ্ধে হুমকি প্রদর্শন ও বিষোদগারের। পৃথিবীজোড়া নানা রণাঙ্গণে (যার মধ্যে ভারত আর পাকিস্তানও আছে) যুদ্ধ তো চলেইছে, তার ওপর এসে গেছে স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে অতর্কিত এবং প্রায় সময়ই আত্মঘাতী আক্রমণের নীতি। সব থেকে প্রকাশ্যে উঠে আসা যুযুধান শিবির — শক্তিধর পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি এবং মধ্যপ্রাচ্যের জেহাদি গোষ্ঠীরা যেন পণ করেছেন, অপরপক্ষকে একেবারে নির্মূল, নিদেনপক্ষে নির্বিষ করে ছাড়বেন। দুই গোষ্ঠীর নায়করা কি এর বিধ্বংসী পরিণাম জানেন না? নাকি, তাঁরা বাঘের পিঠে সওয়ার, আর তাঁদের নিরস্ত হওয়ার উপায় নেই!

বোধ করি, সর্বনাশের কিনার থেকে সরে আসার জন্য প্রয়োজন সার্বিক উদ্যোগ — রাজনীতি, অর্থনীতি, সমরাস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সব কিছুতে অন্যায় অসম ব্যবস্থা বা জবরদস্তি প্রত্যাহার। কিন্তু সকলের চেয়ে বেশি জরুরি সংস্কৃতি বা মনের জগতের বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে মানুষের মনে সৌহার্দ্য ও প্রীতির সঞ্চার। বাংলাতে একটা কথা আছে, যদি হয় সুজন তবে তেঁতুল পাতায় দশ জন। মনের যদি মিল থাকে, তবে অনেক অভাব, অনেক কষ্ট খুব সহজে মেনে নেয় মানুষ। এ কথা বললে ভুল হবে না, রাজনীতি বা অর্থনীতির বিরোধিতাকে ভোঁতা করে দেয় মানসিক নৈকট্য। তার একটা প্রমাণ পাব ইঙ্গ-মার্কিন সম্পর্কের ইতিহাসে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে ১৭৭৬ সালে নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করে দেওয়ার পর আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও রাজনীতির নানা টানাপোড়েন সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনও তার মাতৃসম দেশ ব্রিটেনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেনি। এমন যে হয়েছে তার কারণ ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের দিক থেকে দুটি দেশের অবস্থান মোটামুটি এক থেকেছে।

তবে মনের মিলন, সাংস্কৃতিক লেনদেন ইত্যাদির কথা বলা সোজা, কিন্তু কাজটি সহজসাধ্য নয়। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর আলোকপ্রাপ্তির (Enlightenment[১]-এর) পর থেকে তিন-চারশো বছর ধরে পশ্চিমী আদর্শে বিশ্বাসী পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে যে-সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, তাকে মূলত এলিটিস্ট ও নাগরিক সংস্কৃতি বলা চলে। এই সংস্কৃতির ক্রিয়াকলাপ ব্যাপক জনসমাজের ধর্মীয় বিশ্বাস ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট নানান সংস্কারের (যথা, ক্রিসমাস ট্রি, বার্থডে কেক, সান্টাক্লাউস, কালো বিড়াল, তেরোকে অপয়া সংখ্যা ভাবা ইত্যাদির) এলাকায় পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। রুশ বিপ্লবের পর থেকে যে প্রলেতারীয় বা জনগণের (peoples') শিল্পসংস্কৃতির চর্চা হয়েছে, তাতে অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক ও সামাজিক নিপীড়নকে বিষয় করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মানুষের মনের গভীরে নিহিত ধর্মীয় বিশ্বাস ও নানান সংস্কারকে সংশোধনের ঠিকমত চেষ্টা করা হয়নি।

আর তা হবেই-বা কী করে? রেনেসাঁস-পূর্ববর্তী মধ্যযুগে মানবজীবনের সমগ্রটাকেই আলোচনার আওতায় নিয়ে আসা ছিল আকোয়াইনাস[২] প্রমুখ দার্শনিকদের চেষ্টা। কিন্তু সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের রীতিতে অংশজীবন নিয়ে চর্চাই হয়ে গেল মুখ্য মঞ্চের জ্ঞানীদের রীতি, আর ঈশ্বর, পরকাল প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হল ইংরেজ কবি-দার্শনিক কোলরিজের ভাষায় 'conspiracy of silence'[৩]। বিভিন্ন কবি, এমনকী গদ্যলেখকদের রচনায় (যথা ইংরেজ কবি টেনিসন, আর্নল্ড, গদ্যলেখক কার্লাইলের লেখায়) মানুষের মনোজীবনে faith[৪] বা বিশ্বাসের ধারা শীর্ণ হয়ে যাওয়ায় খেদের প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু কার্ল মার্কসের মতো ব্যতিক্রমী জ্ঞানী ছাড়া একসঙ্গে সমগ্র মানবজীবনকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা পশ্চিমী বিদ্যাচর্চার অঙ্গনে যেন ছেড়ে দেওয়া হল। (মার্কসের সে-চেষ্টা কতখানি সফল বা ব্যর্থ, সে-প্রসঙ্গে এখন আমি যাচ্ছি না।)

যাই হোক, গত চার-পাঁচশো বছরের জ্ঞানসাধকরা তাঁদের চর্চায় শৈথিল্য বা অবহেলা দেখিয়েছেন এমন কথা আদৌ বলছি না। জড়জগতের মাপজোক করা বিজ্ঞানের সঙ্গে তাল রেখেই যেন ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিপুল তথ্যের ভাণ্ডার তাঁরা গড়ে তুলেছেন। তবু, কিছু নিশ্চিত আলো পাওয়া গেছে, এমন বিশ্বাস আসেনি। বিভিন্ন দেশের মানুষের মনের অন্তঃসলিলা বিশ্বাসসমূহ যাদের সঙ্গে মূলগতভাবে যুক্ত বলে মনে হয়, সেই পুরাণসমূহ ও দুর্বোধ্য কল্পকাহিনীগুলি সবই সেই চর্চার বাইরে থেকে গেছে। ফলত মানুষের বহু আচরণ আর বিশ্বাসের কোনো কার্যকারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং সেই সব বিশ্বাস আর আচরণের মূল ধরেও নাড়া দেওয়া যায়নি।

দুই

কিন্তু সমগ্র চিত্রটি বোধ করি অতটা হতাশাব্যঞ্জক নয়। অন্তত তাঁদের কাছে নয়, যাঁরা পরিত্রাণের আশায় কেবল পাশ্চাত্যের মুখ চেয়ে থাকেন না। দিশারী লেখক কলিম খানের বিবিধ গ্রন্থ ও প্রবন্ধ আশ্রয় করে ইতিমধ্যে এক নতুন ভাষাতত্ত্বের অবতারণা হয়ে গিয়েছে।

এই ভাষাতত্ত্বের ভিতরে অনেকেই দেখেছেন বিপুল সম্ভাবনা (এই নিবন্ধের লেখক সেই অনেকের একজন)। পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, এবং দুনিয়াজোড়া বাঙালির বেশ কয়েকটি পত্রিকায় সে তত্ত্বের সসম্মান আবাহনও ঘটে গেছে, যার ফলে অনেক বাঙালি পাঠক জেনে গেছেন যে, ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থতত্ত্ব প্রয়োগ করে, অর্থাৎ কলিম খান প্রদর্শিত পথে পুরাণ এবং ঐতিহ্যের অনেক মর্ম উদ্ধার করা যায়। কিন্তু এই নতুন উদ্যোগ সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের অ্যাকাডেমি বা বিশ্ববিদ্যাপ্রাঙ্গণে যেন উচ্চনাদী নীরবতা। তেমনটি না হয়ে থাকলে, এই প্রবন্ধের কাজটি অবশ্যই সহজতর হত। পণ্ডিতসমাজের স্বীকৃতি যে কোনো তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে দেয় সাধারণ পাঠকের কাছে, এতে সন্দেহ কী!

অবশ্যই শুধু শব্দার্থতত্ত্ব দিয়ে বাজিমাত হতে পারে না। বৃহৎ পণ্ডিতসমাজে স্বীকৃত সকল রকম বিদ্যা থেকে উপাদান আহরণ করে তারপর তাদের সঙ্গে মেলাতে হবে নতুন শব্দার্থতত্ত্ব। সেটি করলে পর অতীতের যে ছবি ফুটে উঠছে, সেটি একান্তভাবে আশাব্যঞ্জক এবং সত্যি বলতে কি রীতিমত উদ্দীপক। আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি, এবং বুঝে পুলকিত হচ্ছি যে বাইবেল, কোরান, পুরাণ প্রভৃতি বিশাল গ্রন্থগুলি অর্থহীন গল্পের সমষ্টি বা ধর্মাচরণের ম্যানুয়্যাল-মাত্র নয়; এই সব গ্রন্থের প্রণেতারা উত্তরকালের জন্য বিপুল জ্ঞানসম্পদ রেখে গেছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি, পাঁচ-দশ হাজার বছর পিছিয়ে গেলে আমরা পৌঁছে যাই ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে সক্রিয় এবং কৃষিনির্ভর উচ্চমানের মানবসভ্যতায়। সেটি ছিল আদি এক ভূখণ্ড Pangaea[৫]-র সঙ্গে তুলনীয়, ভৌগোলিক ব্যাপ্তিতে হয়তো বিশাল, কিন্তু একটি একক, এক অখণ্ড মানবসভ্যতা। তারপর প্রকৃতির এক অমোঘ নিয়মের ক্রিয়ায় সেই সভ্যতা, ঠিক Pangaea-র মতো, ভেঙে নানান খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায়।

ঘটনা সেখানেই থেমে থাকে না। আলাদা হয়ে যাওয়া সমাজখণ্ডগুলি স্থানকালের ভেদে এক এক দেশে এক এক রকম রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে যেতে থাকে। শেষকালে এই বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যেকার ভিন্নতা এত বেশি হয়ে যায় যে, তখন মানুষের মনে হতে থাকে — দেশ আর দেশ, জাতি আর জাতির মধ্যে ভিন্নতা একেবারে মূলগত; এবং তাদের কোনো দিন মিলন হবে না, হবে বড়জোর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। কিন্তু যদি এই নতুন শব্দার্থতত্ত্বসহ সমস্ত জ্ঞানের আলো কেন্দ্রীভূত করে বিভিন্ন দেশের ঐতিহ্য ও পুরাকাহিনীর ওপর ফেলা যায়, তবে কালের হিসেবে অল্প কয়েক হাজার বছর পিছিয়ে গেলেই আমরা এক অভিন্নতাতে পৌঁছে যাব। ধর্মীয় বিশ্বাস আর আচারকে অবলম্বন করে ভিন্নমুখী যে নানান সামাজিক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, তার ধারাগুলি যদি অনুধাবন করি, তবে স্পষ্ট বুঝতে পারব একই মানবমন দেশকাল ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়েছে। একই জল যেন আকাশ থেকে পড়ে ভিন্ন ভিন্ন দিকে বয়ে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন নদী হয়েছে। পার্থক্য জলের নয়, পার্থক্য হল নদীখাতের।

সর্বদেশদর্শী আলোচনার মধ্যে দিয়ে মানবজাতির অতীতকালীন অখণ্ড মৈত্রীসমাজ সম্বন্ধে আমরা এখনই হয়তো নিশ্চিত ঐক্যমত্যে পৌঁছতে পারব না, কেননা এখনও সেই অতীতের মর্মোদ্ধার করে আপডেট করার কাজের বেশিটাই বাকি রয়েছে। তবু এই আলোচনা আমাদের

জীবনকে অনেক গ্লানি থেকে মুক্তি দেবে। বক্তব্যটিকে একটু বিশদ করার চেষ্টা করছি।

আমাদের বিশ্বাস বা আচরণ থেকে অপরের বিশ্বাস বা আচরণ অন্যরকম হলেই আমাদের অস্বস্তি হতে থাকে। এর থেকে রেহাই পেতে অপরের অন্যরকমের বিশ্বাস বা আচরণকে আমরা অর্থহীন ও হাস্যকর ভাবতে থাকি। এর ওপর যদি সেই অপরের সঙ্গে আমাদের রেষারেষি ও বিবাদ থাকে, তবে সেই বিশ্বাস ও আচরণগুলি আমাদের চোখে ঘৃণার যোগ্য মনে হতে থাকে। এই সবের পরিণতিতে অপরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ বা ঘৃণা পোষণ করাই স্বাভাবিক হয়ে যায়। কিন্তু যদি দেখা যেত যে, সঙ্গত কারণেই এক এক রকমের বিশ্বাস, এক এক ধারার আচরণ ভিন্ন ভিন্ন সমাজে গড়ে উঠেছে, তবে আমাদের পক্ষে সহজ হয়ে যেত পরস্পরের কাছে আসা এবং কালক্রমে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠা। পারস্পরিক ভেদ তখন লুপ্ত হয়ে যেত। আজ বোঝা যাচ্ছে, সকলের অতীতকে সঠিকভাবে বুঝে আপডেট করে নিতে পারলে সহজেই আমরা সেই ভেদের বিলোপ ঘটাতে পারি।

তবে নতুন ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে সব দেশের অতীতের কাহিনী ও ঐতিহ্যের মর্মোদ্ধার করে আপডেট করার চেষ্টা এখানে করব না, তার অবকাশও নেই। এই মুহূর্তে আমার প্রচেষ্টা হল — মানুষের সমাজজীবনের অতি বাহ্য একটি উপাদানের ভিন্নতা নিয়ে আলোচনা করা। এ প্রবন্ধে দেখানোর চেষ্টা করছি, কী করে এক দেশের মানুষের কাছে গোমাংস হয়ে গেল নিষিদ্ধ খাদ্য, আর অপর দিকে এক বিরাট মানবগোষ্ঠীর কাছে শূকরমাংস হয়ে গেল একেবারে নিষিদ্ধ ভোজ্য। দুই পক্ষেই দেখা যাবে নিষিদ্ধ মাংস নিয়ে ঘোরতর স্পর্শকাতরতা। এমনকী, আমাদের নিজের গোষ্ঠীর হিসেবে নিষিদ্ধ মাংস যদি অন্য মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়, তবে সে এবং তার মতো লোকেরা হয়ে যায় আমাদের কাছে সন্দেহ ও ঘৃণার পাত্র। মোট কথা, পৃথিবীর দুই অংশের মানবসমাজ খাদ্য বিষয়ে কেন এই দু রকমের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল, সেটি যদি ঠিকমত বোঝা যায়, তবে সেটি একটি কাজের মতো কাজ হবে। তা হলে অন্তত অনেক ঘৃণা ও অনেক গ্লানির বোঝা থেকে আমরা মুক্ত হই। আরও বড় করে বললে, ওইরকম হলে পর বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ উসকে দিয়ে নিজেদের কাজ হাসিল করাটা কঠিন হয়ে পড়ে কুচক্রীদের পক্ষে।

ঠিক এখানেই রয়েছে এ প্রবন্ধের এই মুহূর্তের উপযোগিতা। তবে আমার আশা, এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে আরও বৃহত্তর এলাকায় পৌঁছানো আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভিন্নমুখী সব ঐতিহ্য কী করে গড়ে উঠেছে, হয়তো-বা তার মর্মকথায় পৌঁছানোর রাস্তাও দেখতে পাব। আমরা তখন ভাল করে বুঝতে পারব, 'জগৎ জুড়িয়া আছে এক জাতি, সে জাতির নাম মানবজাতি'।

তিন

প্রথমেই আমাদের খেয়াল করা দরকার যে, মানুষ চিরকাল একরকম থাকেনি এবং এক রকমের চিন্তাভাবনাও করেনি। দু-একটা সহজ উদাহরণ আনি। আধুনিক শিক্ষাদীক্ষায় বেড়ে

ওঠা মানুষের কাছে দৃশ্যমান জীবজগৎ বাদে গোটা বিশ্বচরাচর নেহাতই জড়জগৎ। কিন্তু আদিম মানুষ পৃথিবীর সব কিছুতে প্রাণ দেখত। আধুনিক মানুষ খাদ্যাখাদ্যের বিচারে খাদ্যের ফুড-ভ্যালু বা পুষ্টিগুণকে প্রধান গুরুত্ব দেন। কিন্তু প্রাগাধুনিক মানুষের কাছে খাদ্যাখাদ্যের নিরূপণ হত অন্য নানারকম বিচারের মধ্য দিয়ে। নচেৎ খাদ্যাখাদ্য নিয়ে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের মাথাব্যথা থাকত না।

খাদ্য ও খাদক — দুই পক্ষই যদি 'প্রাণী' হয়, তবে তাদের মধ্যে প্রকৃতিদত্ত কোনো সহজাত আবেগের সম্পর্ক থাকে কি? এবং যদি থাকে, তবে সেটি কোন ক্ষেত্রে কী রকমের? প্রশ্নটি জীবনবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী এবং দার্শনিকের আলোচ্য হতে পারে। কিন্তু আমরা আধুনিক মানুষ বেঁচে আছি প্রকৃতির জীবন থেকে অনেক দূরে। সে কারণে আমাদের এখনকার ভাবনালোক থেকে বিচার শুরু করাই বোধ করি ভাল হবে। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির দিকে যদি তাকাই, তবে দেখব যে, যে সব জিনিস দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন বা ঘ্রাণের ক্ষেত্রে আমাদের ঘৃণা বা বিরূপতা আনে, সে সব জিনিস আমরা মুখে তুলতে পারি না ও চাই না। খাদক হিসেবে আমাদের আগ্রহ তাদের বেলায় বেশি, যে সব বস্তু আমাদের চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ ইত্যাদির কাছে বেশি মনোহর। বাঙালি পাঠক মিলিয়ে দেখবেন মাছ, ছানার মিষ্টি, বা ফলের নানা রকমারির মধ্যে রসনার তৃপ্তিকে কতখানি প্রভাবিত করে দর্শন বা ঘ্রাণের দিককার অনুভব।

সত্যি বলতে কি, আমরা যা কিছু খাই, তার সত্তা আমার মধ্যে এসে নতুন করে অস্তিত্ব পেয়ে যাবে, এবং আমার অস্তিত্বের সঙ্গে এক হয়ে যাবে — এমন একটা বোধ বা কল্পনা মানুষের মনে সহজেই আসা সম্ভব, এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এই বক্তব্যের সমর্থন পাই খ্রিস্টানদের একটি প্রধান অনুষ্ঠানে। এই অনুষ্ঠানটির অনেক নাম — Eucharist, Holy Communion, Mass, Lord's Supper,[৬] প্রভুভোজ বা খ্রিস্টযাগ ইত্যাদি। Holy Communion নামটিতে আমরা ইঙ্গিত পাচ্ছি সত্তার দিক থেকে কোনো না কোনো ভাবে এক হয়ে যাওয়া। খ্রিস্টানদের বিশ্বাস যে, এই অনুষ্ঠানটি পালন না করলে খ্রিস্টীয় পরিত্রাণের আমি অংশভাক হতে পারলাম না। এই অনুষ্ঠানটির মূলে আছে যিশুর জীবনের ঘটনা বলে বর্ণিত কিছু বিবরণ — যিশু ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিলেন উত্তর গোলার্ধের বসন্তকালের এক শুক্রবারে। (সেটি কোনো নির্দিষ্ট তারিখ নয়, কিন্তু সেটির গণনা চান্দ্রমাস এবং সৌর বৎসর দুইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে নির্দিষ্ট হয়।) তার আগের দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবারের সন্ধেবেলা যিশু তার অন্তরঙ্গ শিষ্যদের সঙ্গে শেষ নৈশভোজ (Last Supper) সারেন। সেই ভোজের সময় যিশু তাঁর শিষ্যদের বলেন — এই যে রুটি আমরা খাচ্ছি, এটি আমার শরীর, আর এই যে দ্রাক্ষারস তোমরা পান করছ, এটি আমার রক্ত। মানুষের আদি পুরুষ আদমের আদিপাপের গ্লানি থেকে মানুষের পরিত্রাণের জন্য আমি আত্মদান করতে চলেছি। এই আত্মদানের ফললাভের জন্য তোমরা এখন যেমন রুটি আর দ্রাক্ষারসকে আমার মাংস আর রক্ত বলে গ্রহণ করছ, তেমনই ভবিষ্যতেও তোমরা এই কাজ করে যেতে থাকবে।

মূল বাইবেলে এই ঘটনাটির বর্ণনা থাকলেও, অনেকে বলেন এটি একটি সাজানো বা বানানো কথা। এর যে-ব্যাখ্যা তাঁরা দিয়ে থাকেন সেটি এই রকমের — যিশুর শিক্ষা তাঁর স্বজাতি ইহুদিদের কাছে ছিল পরিত্যজ্য; একটি নতুন ধর্মের আকারে এই শিক্ষা প্রথম ছড়িয়ে পড়েছিল রোমক সাম্রাজ্যের গ্রীক ওরফে হেলেনিক সংস্কৃতির এলাকায়। এই গ্রীক-প্রভাবিত এলাকায় এক ধরনের তান্ত্রিক অভিচার খুব প্রচলিত ছিল। ব্যাপক প্রচলন ছিল দেবতার উদ্দেশ্যে প্রাণীকে (সাধারণত বৃষকে) উৎসর্গ করার। মন্ত্রবলে প্রাণীটিকে যেন আরাধ্য দেবতার সঙ্গে একাত্ম করে দেওয়া হত, প্রাণীটির দেহে দেবতার অধিষ্ঠান হয়ে গেছে বলে ধরে নেওয়া হত। তারপর সেই প্রাণীটিকে দেবতার উদ্দেশে বলি দিয়ে সেই প্রাণীটির মাংস ভোজন করা ছিল ধর্মাচরণের প্রধান অঙ্গ। এই রকমের Mystery Cult[৭] (ধর্মাচরণ) যেখানে ব্যাপক প্রচলিত ছিল সেই রকম অঞ্চলেই খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেছিলেন খ্রিস্টের অনুগামীরা। সুতরাং এই কথা অনেকে বলছেন যে, খ্রিস্টীয় ধর্মের প্রসারের জন্যই খ্রিস্টের জীবনকাহিনীতে রং চড়ানো হয়েছিল আর খ্রিস্টকে নিয়েই পূর্বের ধর্মের অনুরূপ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

যিশুর শেষ নৈশভোজের কাহিনী যেভাবে বাইবেলে দেওয়া আছে, সেটি কতটা সত্য, কতটা বানানো তা নির্ধারণ করা কঠিন কাজ। তবে ওই কাহিনীর সূত্র ধরে Holy Communion-এর অনুষ্ঠানটি বহুধা বিভক্ত খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী প্রচলিত আছে। এটি সম্ভব হয়েছে মানুষের মনে আদিম কাল থেকে বাহিত অন্তর্লীন সংস্কারের জন্য। এমনকী বর্তমানে হিন্দুর ধর্মাচরণের ভিতর যে পশুবলি প্রচলিত আছে, তার অনুষ্ঠানের মধ্যেও এই বক্তব্যের সমর্থন পাই। যে-প্রাণীটিকে বলি দেওয়া হয়, প্রথমে সেটিকে পূজা করে মন্ত্রের বলে দেবতার স্তরে উন্নীত করতে হয়। মন্ত্রের বয়ান থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রাণীটির অঙ্গে যেন দেবতার (শিবের বা অন্য কোনো দেবতার, যার উদ্দেশে বলি দেওয়া হচ্ছে, তাঁর) অধিষ্ঠান ঘটছে। পশুটির শিরশ্ছেদের পর প্রার্থনা থেকে বোঝা যায় উদ্দিষ্ট দেবতা (দেব বা দেবী) যেন রুধির পান করেন। তারপর বলিদত্ত পশুটির মাংস হয়ে যায় 'মহাপ্রসাদ', যেটি গ্রহণ করা ভক্তদের অবশ্য কর্তব্য। এই মাংসকে যে পরম পবিত্র মনে করা হয়, তার একটি প্রমাণ হল — উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অনেকে বলি-দেওয়া পশুর মাংস ছাড়া অন্য কোনো মাংসই খান না। এরকম মুসলিম মহিলাকেও আমি জানতাম, যিনি কোনো মাংসই খেতেন না, কিন্তু বকর-ইদের কোরবানির মাংস অবশ্যই একটিবারের জন্য হলেও খেতেন। বলিপ্রদত্ত মাংস ছাড়া অন্য যে-কোনো মাংসকে আমাদের পূর্বসূরিরা বলতেন 'বৃথা মাংস', অর্থাৎ যে-মাংস খাওয়ার মধ্যে কোনো অর্থ যেন ছিল না, অথবা যে-মাংস খাওয়া উচিত নয়।

আবার আমাদের প্রয়োজন প্রাগাধুনিক মানুষের চিন্তাভাবনাকে কল্পনা করে নেওয়ার। অতীন্দ্রিয় জগতের নিয়মে মানুষ যদি দেবতার গুণ এবং গৌরবের অংশভাক হতে পারে কোনো বিশেষ আহারের মধ্য দিয়ে, তবে একই যুক্তিতে অপদেবতা বা অশুভ শক্তির অধিষ্ঠান যে জীবের দেহে — সে অধিষ্ঠান প্রতীকীও হতে পারে — তবে সেই প্রাণীর দেহও মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ বর্জনযোগ্য। শূকরকে যে বর্জনীয় বলা হয়েছে, তার পিছনে এমন কোনো কারণ

আছে কি না, তা অনুসন্ধান করে দেখা যেতে পারে। এমন কথা মনে আসার বিশেষ কারণ এই যে, বাইবেল[৮] এবং কোরান[৯] উভয় গ্রন্থেই শূকরকে বিশেষ ঘৃণ্য প্রাণী বলা হয়েছে; কিন্তু এর সমর্থনে তেমন কোনো যুক্তি দেখানো হয়নি। বলে রাখা ভাল, এই প্রসঙ্গ আছে বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট অংশে, এবং ওল্ড টেস্টামেন্টের কিছু নিয়মের (যথা এই শূকর মাংস সম্পর্কিত নিয়মের) বন্ধন থেকে খ্রিস্টানকে ছাড় দেওয়া আছে বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট অংশে।[১০] অর্থাৎ যে-অংশটি খ্রিস্টানুগামীদের হাতেই সৃষ্ট হয়েছে।

যে-যে পশু এবং পাখিকে বধ করে তাদের মাংস খাওয়া চলে বলে ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং কোরানে বলা হয়েছে, তাদের সংখ্যা নেহাত কম নয়। এ তালিকা থেকে কেন বিশেষ উল্লেখ করে শুয়োরকে বাদ দেওয়া হল, তার তেমন কোনো যুক্তি কোথাও দেওয়া নেই। না, কোনো কারণ দেখানো নেই কেন আহার্যতালিকা থেকে বাদ যাচ্ছে শূকর মাংস। অথচ এটা নেহাত আকস্মিক ব্যাপার বলে মানাই-বা যায় কী করে? আজকে ইহুদি আর আরব মুসলিমের মধ্যে দেখছি অতিমাত্রায় তিক্ত সম্পর্ক। কিন্তু পুরাণকাহিনীর দিক থেকে দুয়ের মধ্যে নিকট জ্ঞাতিসম্পর্ক। মৌল বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ইহুদিদের সঙ্গে মুসলিম আরবদের মিল নেহাত কম নয়। আদম-ইভ-নুহ্-আব্রাহাম / ইব্রাহিম ইত্যাদিকে নিয়ে পুরাণকথা, ডেভিড / দাউদ, সলোমন / সুলেমান নিয়ে ইতিহাস — এ সব উভয়েরই ঐতিহ্যের অংশ। এমনকী ইহুদি ধর্মপ্রবক্তারাও কোরাণে 'নবী' বলে স্বীকৃত। তারপর নিরাকার ঈশ্বরের ভজনা, বিগ্রহপূজার তীব্র বিরোধিতা, এবং ত্বকচ্ছেদ (circumcision) ইত্যাদি মূল কয়েকটি জায়গায় উভয় ঐতিহ্যের এক অবস্থান। এই পরিপ্রেক্ষিতে শূকরমাংস বর্জনের নীতিকে কোনো আকস্মিক ব্যাপার বলে মনে করা বড় কঠিন।

চার

এটা সত্যিই মানুষকে ভাবিয়ে তোলে — কেন শূকরমাংস এভাবে বর্জিত হল ইহুদি ও আরব, ঘনিষ্ঠ এই দুই সেমিটিক গোষ্ঠীর কাছে; কেনই-বা এ দেশে গোমাংস ভোজন এমনভাবে নিষিদ্ধ হল? এতদিন কোনো নির্ভরযোগ্য যথার্থ ব্যাখ্যা কোথাও পাইনি। অবশেষে আজ যেন বিষয়টির উপর আলোকপাতের একটি পথ দেখতে পাচ্ছি। কলিম খান তাঁর ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির সাহায্যে ভারতীয় পুরাণের অবতারতত্ত্বের যে মর্মোদ্ধার করেছেন,[১১] তার মধ্যে যেন সেই আলো দেখতে পাচ্ছি। আশা ছিল, কেউ সেই আলোকবর্তিকা নিয়ে উপরোক্ত বিষয়ের উপর আলো ফেলে সব কিছু পরিষ্কার করে বলে দেবেন; কিন্তু কেউ তা করলেন না, করছেনও না। প্রয়োজনবোধে তারই কিছু চেষ্টা করতে চলেছি এই প্রবন্ধে।

বলতে গেলে পথিকৃৎ হিসেবে পুনরুদ্ধার-করা শব্দার্থতত্ত্বের সঙ্গে তাঁর ইতিহাসচেতনা ও দার্শনিক প্রজ্ঞা মিলিয়ে কলিম খান ভারত তথা প্রাচ্যের ঐতিহ্যের অনেক কিছুর ওপর আলো ফেলেছেন। তিনি বলেছেন যে, ক্যাপিট্যাল (capital) বা পুঁজি বলতে ইয়োরোপ যা বুঝেছে, ভারতীয় ভাষায় 'বিষ্ণু' বা 'নারায়ণ' শব্দ দিয়ে সেটুকু তো বটেই, বরং তার চেয়ে আরও

বেশি কিছু বোঝানো হয়েছে। দশাবতার তত্ত্বে ক্যাপিট্যালের বিবর্তন ও নানা রূপ গ্রহণ দেখানো আছে। কিন্তু ipse dixit (স্বয়ং তিনি বলেছেন)-এর যুক্তিতে কাউকে তা গ্রহণ করতে বলছি না। খোলা মন এবং যথোপযুক্ত মনোযোগ দিয়ে সকলকে সে ব্যাখ্যা বাজিয়ে দেখতে অনুরোধ করছি।

যে-যে কারণে কলিম খানের প্রস্তাব মতো বিষ্ণুকে ক্যাপিট্যালের সঙ্গে মেলাতে পেরেছি, সেগুলি হল এইরকম। ১) বাংলায় নগদ টাকাকে অনেক সময় 'নগদ নারায়ণ' বলা হয়। ২) পৌরাণিক ঐতিহ্য অনুযায়ী নারায়ণপত্নী লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান ধান্য, ক্রয়ক্ষমতাযুক্ত মুদ্রা প্রভৃতিতে। এও বলা হয়ে থাকে যে, 'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী'। ৩) সমাজের সবরকম উৎপাদন কর্মকে বলা হত যজ্ঞ। বিষ্ণুকে বলা হয়েছে 'যজ্ঞেশ্বর', আর শিবকে বলা হয়েছে 'যোগেশ্বর'। ৪) বিষ্ণুর পাদপদ্ম থেকে নিঃসৃত গঙ্গার গর্ভে জন্মেছে অষ্ট বসু (বা আটরকমের ঐশ্বর্য)। ৫) কার্ল মার্কস ক্যাপিটালিস্টকে বলেছেন, 'the modern penitent of Vishnu' বা 'বিষ্ণুর আধুনিক পূজারী'। ৬) বিষ্ণুকে বলা হয়েছে জগতের পালয়িতা। সমাজের উৎপাদন যজ্ঞে, অর্থাৎ মানুষের পালনে পুঁজির যে বড় ভূমিকা এ কথা বুঝতে অসুবিধে নেই। সুতরাং বিষ্ণুর সঙ্গে পুঁজির অভিন্নতা বুঝতেও অসুবিধা নেই। ৭) ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য মতে শিবের পূজা সর্বত্র এবং শিব যেন বিশেষ করে চাষের দেবতা; তা সে পার্থিব-ভূমি চাষ হোক আর মনোভূমি চাষই হোক। অপর দিকে বিষ্ণুর পূজা বিশেষভাবে লক্ষণীয় অপেক্ষাকৃত শিল্পোন্নত এবং বাণিজ্যপথ সংলগ্ন অঞ্চলে। পুঁজির সঙ্গে বিষ্ণুর অভিন্নতার কারণেই বিষ্ণুর পূজার সঙ্গে কারুশিল্পী ও বণিকের এই রকম সম্পর্ক বলে মনে হয়। ৮) যে দেশে উচ্চ মানের রসায়ন, আয়ুর্বেদ, জ্যোতির্বিদ্যা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সঙ্গীতযন্ত্রবিদ্যা, ভাষাবিজ্ঞান বিকাশ লাভ করেছিল, এবং যার সমৃদ্ধ বাণিজ্য ব্যবস্থা ছিল, সে দেশের প্রজ্ঞা সমাজে পুঁজি বা ক্যাপিটালের ক্রিয়া লক্ষ করেনি, এটা মনে করা কঠিন। বরং সে-প্রজ্ঞা সেই ক্যাপিটালকে অনেক বেশি করেই লক্ষ করেছিল; এবং করেছিল বলেই তা পুরাণে নারায়ণ রূপে বর্ণিত হয়েছে, নানান কারণে এতদিন যা আমরা বুঝে উঠতে পারিনি। ৯) 'ভগ' কথাটির মানে উৎপাদনের উপায়। ভগবান কথাটি ব্রহ্মা বা মহেশ্বর সম্বন্ধে সাধারণত ব্যবহার হয় না। এটির প্রয়োগ হয় বিষ্ণু ও তাঁর আরেক অবতার রূপ কৃষ্ণ সম্বন্ধে।

বিষ্ণু আর পুঁজি যে অভিন্ন, তা না হয় মানা গেল; কিন্তু বিষ্ণুর অবতার ব্যাপারটি কী? বলা হয়েছে, বিষ্ণুর বাস বৈকুণ্ঠপুরী গোলোকে। সেটি হল অন্তরীক্ষে; অন্তরের ইন্দ্রিয় দিয়েই সেই 'লোক'কে জানা যায়। মর্ত্যে তিনি অবতরণ করেন অর্থাৎ নেমে আসেন অবতার হিসেবে। সমাজে পুঁজিকে যত রূপে বা যত আকারে পাওয়া যায়, সবগুলিকেই মনে করা হয় বিষ্ণুর অবতার। তবে প্রধান যে ক'টি রূপ ভারতের প্রাচীনকালের তাত্ত্বিকরা বুঝেছিলেন, সেই ক'টিকে অবতার হিসেবে গণ্য এবং পূজ্য করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, অবতারদের আবির্ভাবের মধ্যে আগে-পরে জিনিসটি আছে। একালের অর্থনীতি বিশারদেরা ক্যাপিটালকে 'বণিক পুঁজি', 'সুদখোর পুঁজি', 'কর্পোরেট পুঁজি' ইত্যাদি নানা নামে চেনেন

ঠিকই, কিন্তু যতদূর জানি, মানুষের সমাজে পুঁজি সর্বপ্রথম কী রূপে আবির্ভূত হয়েছিল, তারপর কী রূপ নিয়েছিল সে সম্পর্কে তাঁরা একেবারেই অজ্ঞ। আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা চোখের উপরে সেগুলি দেখেছিলেন; সেভাবেই ঠিক পর পর অবতারদের নামগুলি সাজিয়ে গেছেন; যথা মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ ইত্যাদি। এগুলির অর্থ কলিম খান জানিয়েছেন, যথাক্রমে 'পুঁজির মালিকানার বোধ', 'পুঁজি-উদ্ভবের ভিত্তির আবির্ভাব বা শ্রম বিভাজনের প্রচলন', 'পুঁজির নিয়ত উদ্ভবের সাধারণ উপায় বা নিয়োগ-বিনিয়োগের প্রচলন', 'পুঁজির ধারকরূপে ব্যক্তিমালিকের সামাজিক আবির্ভাব' ইত্যাদি। সেই কারণে, নতুন এক অবতারের আবির্ভাব মানে আগের সকল অবতারের মরে যাওয়া নয়। তা হলে রামের সঙ্গে পরশুরামের সাক্ষাৎকার সম্ভব হত না।

এ প্রবন্ধের জন্য আমাদের প্রয়োজন বরাহ অবতারের স্বরূপটিকে অর্থাৎ 'পুঁজির নিয়ত উদ্ভবের সাধারণ উপায় বা নিয়োগ-বিনিয়োগের প্রচলন'টিকে বোঝা। তবে বিষয়টি বোঝার জন্য আবার পূর্বতন দুটি অবতারকেও একটুখানি চিনে নেওয়া প্রয়োজন।

একেবারে প্রথমে হল বিষ্ণুর বা ক্যাপিট্যালের প্রথম রূপ মৎস্য। এই মৎস্যকে বলা হয়েছে আদি অবতার। মহাভারত, মৎস্যপুরাণ-সহ অধিকাংশ পুরাণাদি গ্রন্থেই সে কাহিনী রয়েছে। এমনকী সেই কাহিনী-সংশ্লিষ্ট প্রলয়ের বর্ণনাটি প্রায় হুবহু রয়েছে বাইবেলে এবং গ্রীক পুরাণেও। 'মৎস্য' শব্দটিকে ভাঙলে যে শব্দার্থ মেলে, তা থেকে মৎস্যাবতারের চরিত্র বোঝা যায়। 'মৎ' শব্দখণ্ডটির মানে 'আমি'; এটিকে পাওয়া যায় 'মদীয়' (মৎ + ঈয়) [= আমার] শব্দে। আবার সংস্কৃত সম্বন্ধপদে ব্যবহৃত সাধারণ শব্দখণ্ড হল— 'স্য'। সুতরাং মৎস্য শব্দের অর্থ হল 'আমার'। 'আমার' এই বোধটিকে অবশ্যই পুঁজির আদি বীজ মনে করা যায়। মানুষের মনে 'আমার' বোধটিই যদি না জন্মাত, সমাজে পণ্য-পুঁজি-লেনদেন-আগ্রাসন কোনো কিছুরই আবির্ভাব হতে পারত না। বহু আদিবাসী সম্প্রদায়কে দেখা গেছে, যাদের এই বোধটিই জন্মায়নি, ফলে তাদের সমাজে পণ্য বা পুঁজির জন্মই হয়নি।

পরবর্তী অবতার কূর্ম্ম বলতে কী বোঝায়? আমাদের কূর্ম্মপুরাণে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে, রয়েছে রামায়ণে, মহাভারতেও। সামাজিক উৎপাদন যজ্ঞ চালানোর ক্ষেত্রে একবার 'একই কর্মের পুনরাবৃত্তি-মূলক' নীতি গ্রহণ করলেই শ্রম বিভাজন না করে উপায়ান্তর থাকে না, এবং তার জন্য সমাজকে ভাগ করে নিতে বাধ্য হতে হয়। সেই বাধ্যতামূলক পরিস্থিতি যখন এল, তখন ভারতসমাজ কর্মযজ্ঞের পরিচালক (ব্রাহ্মণ), পাহারাদার রক্ষক (ক্ষত্রিয়), বিলিবণ্টনকারী সংরক্ষক (বৈশ্য), ও এই তিনের সহায়তাকারী (শূদ্র) রূপে সমগ্র সমাজকে ভাগ করে নিতে বাধ্য হয়। ফলত, এতদিন মানুষের মাথায় কেবল পুঁজির আদিরূপ হিসেবে 'আমার' 'আমার' বোধটুকুই জন্মেছিল, এবার পুঁজি-উদ্ভবের ভিত্তির আবির্ভাব বা শ্রম বিভাজনের প্রচলন হয়ে গেল। সেই বিভাজনই পরবর্তীকালে আধুনিক অর্থনীতির 'শ্রম বিভাজন' রূপে পরিণত হয়েছে। পুঁজির অস্তিত্বের জন্য এইরূপ বিভাজিত সমাজ গড়ে তোলা অনিবার্য ছিল। 'আমার' বোধের আবির্ভাবের পর এই বিভাজিত সামাজিক অস্তিত্বই পুঁজির

অস্তিত্বের ভিত্তিরূপে দেখা দেয়; তাই এটিই পুঁজির আবির্ভূত দ্বিতীয় রূপ। লক্ষ্মীলাভের আশায় দেবতা ও অসুরে মিলে সমুদ্রমন্থনের কালে কূর্মের ওপর মন্থনদণ্ড রাখা হয়েছিল। এ কাহিনী এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

তৃতীয় অবতার বরাহের অর্থ আগের দুটির তুলনায় আর একটু জটিল। 'বরাহ' শব্দটির মধ্যে পাচ্ছি দুটি ধাতু, একটি বৃ (= কোনো কাজের জন্য বরণ করা), এবং আর একটি ধাতু — আ-পূর্বক হন্ ধাতু (= আঘাত করা)। সুতরাং, যাকে বরণ করে নিয়োগ করা হচ্ছে কোনো কিছুকে (কোনো ভূমিকে) আঘাত করে কিছু পাওয়ার জন্য, তাকে বরাহ বলা যায়। পুরাণের কাহিনী মতে প্রলয়কালে যখন ভূমি চলে গিয়েছিল জলের তলায়, তখন বরাহ অবতার সেখান থেকে তার 'দন্তের'[১২] (দমনের) সাহায্যে ভূমিকে উদ্ধার করে উপরে নিয়ে আসেন।

তবে বরাহ অবতার বোঝার জন্য আরও কিছু ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে। পুঁজির উদ্ভব ও বিকাশের জন্য 'আমার' বা মালিকানা বোধ (= মৎস্যাবতার) এবং শ্রমবিভাজন (কূর্মাবতার)-এর আবির্ভাবের পরই পুঁজির নিয়ত উদ্ভবের জন্য প্রয়োজন নিয়োগ-বিনিয়োগ প্রথার প্রবর্তন। একের ক্ষেত্রে / জমিতে আর একজন এসে শ্রম দিচ্ছে, এটি আদিম সমাজে ছিল অভাবনীয়। অথচ এই নিয়োগপ্রথা এলেই এমন ঘটনা ঘটে যে, শ্রম যে দিয়েছে, সে তার পুরো মূল্যটা পেল না, এবং উদ্বৃত্ত মূল্যটা নিয়োগকারীর হাতে পুঁজি হয়ে জমল। সে কারণে পুঁজির বিকাশের একটি শর্তই হল নিয়োগপ্রথার প্রবর্তন। আবার, অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণ সমাজ এক সময় রাজা বা রাষ্ট্রকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল সমাজের, অতএব পুঁজিরও, অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব সুরক্ষিত করতে। এ ক্ষেত্রে একটি বড় রকমের নিয়োজন হয়ে গেল। কিন্তু নিয়োগ প্রথা আরও আগে থেকে আছে বলে মনে করা যায়। এটি খুবই সম্ভব যে, কৃষিকাজ ভাল করে শুরু করার আগে থেকে মানুষ শূকরের পালকে দিয়ে ক্ষেত খুঁড়ে ফেলার কাজ করাতো। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বঙ্গীয় শব্দকোষ গ্রন্থে 'রদ্' শব্দটির প্রয়োগ দেখাতে একটি মাত্র বাক্য দেওয়া হয়েছে — 'রদতি ভূমিং শূকরঃ'। শূকরের দল মাটি খোঁড়ে ঘাসের বীজ ('বাজোমাথা') খাওয়ার জন্য, কিন্তু শূকরের সেই খোঁড়াখুঁড়িতে ক্ষেতের মাটি এমনভাবে খোঁড়া হয়ে যায় যে, তারপরই সেই ক্ষেতে দানা বুনে দেওয়া যায়, যা পরে শস্যরূপে দেখা দেয়। ভারতের আদিবাসীদের এ-রীতি নাকি কোথাও কোথাও এখনও চালু আছে। সব ক'টি ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে একটি বিশেষ সত্তার যেন আবির্ভাব ঘটছে; সে সত্তাটি হল 'নিয়োজিত' বা 'নিযুক্ত', যার আবির্ভাব ঘটেছে নিয়োগপ্রথার মাধ্যমে। শব্দটি যেভাবে তৈরি হয়েছে সেই সূত্রে 'বরাহ' শব্দটি এই সত্তা এবং তার সকল রকম ক্রিয়াকে বোঝাতে সক্ষম। এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় এই যে, বিষ্ণুপুরাণ বলতে গেলে শুরুই হচ্ছে বরাহ অবতারের গৌরব বর্ণনা দিয়ে।

যাই হোক, একবার নিয়োগের নীতির প্রচলন হলে সে আর থেমে থাকে না, থাকতে পারে না, প্রায় সর্বক্ষেত্রে এই নিয়োগ প্রথার প্রচলন হয়ে যায়। জনমজুর নিয়োগ থেকে শুরু করে, সম্পদ নিয়োগ (পুঁজি বিনিয়োগ) পেরিয়ে তা গিয়ে ঠেকে দেশের রাষ্ট্র নিয়োগ পর্যন্ত। রাষ্ট্রের

(বা রাজার) কাজ হয় সামাজিক ভূমিকে আঘাত করে উৎপাদনযোগ্য রাখা। যত রকমের নিযুক্ত সত্তা থাকা সম্ভব, তার মধ্যে অবশ্যই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই রাষ্ট্র; এবং সে কারণেই বরাহ নামটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য রাষ্ট্রের বেলায়। কলিম খান দেখিয়েছেন, যদিও ভারতসমাজে বরাহ অবতারের আবির্ভাবের ফলে সমাজ সুদীর্ঘ গ্লানির হাত থেকে মুক্তির পথ দেখতে পায় (যে-কারণে ভারতসমাজে বরাহগিরি নামটি আজও শ্রদ্ধেয় হয়ে রয়েছে), কিন্তু কিছুদিন পর সেই রাষ্ট্র যখন অত্যাচারী হয়ে যায়, রাষ্ট্রের কর্মচারীদের জনসাধারণ তখন অত্যন্ত ঘৃণা করতে শুরু করে এবং 'শুয়োরের বাচ্চা' শব্দটি গালাগালি হিসেবে প্রচলিত হয়ে যায়। অর্থাৎ বরাহ নামের প্রাণীটি হয়ে যায় নিযুক্তের তথা রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতীক।

যতদূর বোঝা যায়, কৃষি সভ্যতার প্রাথমিক বিকাশের পরপরই পরস্পর-সংলগ্ন মধ্যপ্রাচ্য-ভারত প্রভৃতি অঞ্চলে যে-রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, সেই রাষ্ট্রব্যবস্থার দ্বারা (বা বরাহের দন্তের দ্বারা) লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কাছে বরাহ প্রাণীটিও হয়ে যায় ঘৃণার বস্তু — 'হারাম'।

পাঁচ

কিছু পণ্ডিত আছেন, যাঁরা তাঁদের নিজেদের অবস্থান দিয়ে সমস্ত যুগের মানুষকে বিচার করে থাকেন। তাঁরা খেয়াল করেন না, যতই আমরা অতীতের দিকে যাই ততই মানুষের দৈহিক শক্তির পরিমাণ আরও বেশি বেশি দেখতে পাই। প্রাচীনকালের মানুষেরা স্থলপথে কতদূর যেতে পারত, যেত, পরস্পরের কতখানি খবর রাখত, আজ তা কল্পনা করাও বেশ কঠিন। তা ছাড়া, তখন 'আমাদের দেশ' নামক কোনো ধারণাই তো ছিল না।

সে সব না বুঝে কিছু পণ্ডিত প্রশ্ন তোলেন, ভারতীয় চিন্তায় না হয় বরাহকে নিয়োগপ্রথা তথা রাষ্ট্রের প্রতীক ভাবা হয়েছিল; কিন্তু সে রকমের চিন্তা সুদূর আরব উপদ্বীপের ইহুদি ও আরব জনগোষ্ঠীর হয়ে গেল কী করে? তাঁরা জানেন না, তৎকালের সমাজগোষ্ঠীগুলি তখনও তাদের আদি পারস্পরিক সম্পর্কের স্মৃতি বহন করত, পরস্পরের খবরই শুধু রাখত না, একই উত্তরাধিকারের অনেক কিছুই তখনও বহন করত; তার ওপর পারস্পরিক অগ্রগতির প্রভাব তো ছিলই। ফলে রাষ্ট্রের বা বরাহের প্রতি ঘৃণা কেবল ভারতসমাজের 'শুয়োরের বাচ্চা' গালিতেই স্থান পেয়েছিল এমন নয়, ভারতের বাইরের জনগোষ্ঠীগুলির মনেও বরাহের প্রতি ঘৃণা বদ্ধমূল হয়েছিল। বলতে পারেন, রাষ্ট্রকে হাতের মুঠোয় না পেয়ে শুয়োরকে ঘৃণা করার ইচ্ছা মানুষের জন্মায় কীভাবে? যে অঙ্কে সাম্রাজ্যবাদবিরোধীরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে হাতের মুঠোয় না পেয়ে তার প্রেসিডেন্টের কুশপুত্তলিকা পোড়ায়, সেই অঙ্কেই এটা সম্ভব হয়।

এ প্রসঙ্গে ইহুদি ও আরব মুসলমানদের মজ্জাগত আরও কিছু ধারণা ও আচরণের উল্লেখ করা যায়। সেগুলির মধ্যেও রয়েছে মানুষের সমাজের বৈষম্যবিরোধী বিদ্রোহী চরিত্র। ইহুদি ও মুসলিম আরব, উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে ছিল যে কোনো বিগ্রহপূজা এবং ঋণের ওপর সুদ নেওয়ার তীব্র বিরোধিতা। এ দুটি বিরোধিতা খুবই স্বাভাবিক, যেখানে পুরোহিত-শাসিত

মন্দিরকেন্দ্রিক ব্যবস্থার আধিপত্য চলছে কৃষকের ওপর, এবং এর পাশাপাশি সুদখোর শ্রেণীর দাপটও এসে গেছে। দেবতার বিগ্রহকে কেন্দ্র করেই মন্দিরতন্ত্র; সুতরাং বঞ্চিত মানুষের চোখে দেবতা ও মন্দির অভিন্ন, এবং দুটিই চূড়ান্তভাবে বর্জনীয়। এমনকী অন্যান্য কিছু বিশ্বাস ও ধারণারও একই উৎস বলে ভাবা যায়। জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলবাদ — এ দুটি তত্ত্ব পুরোহিত শ্রেণী ব্যবহার করেছে নিজেদের প্রাধান্য ও দরিদ্র কৃষকের দুর্গতির ব্যাখ্যায়। সুতরাং নিপীড়িত ও বঞ্চিত গোষ্ঠীর ভাবনায় এই তত্ত্বগুলি বর্জনীয় হওয়ার কথা এবং তাই হয়েওছে।

ছয়

হিন্দু,[১৩] অন্তত উচ্চবর্ণের হিন্দুর কাছে গোমাংস বর্জনীয় হওয়ার তত্ত্বটি কিন্তু বেশ কিছুটা জটিল। জটিল হত না, যদি এর সঙ্গে গোময় ও গোমূত্র (অনুপরিমাণ হলেও) হিন্দুর খাদ্যের অংশ না হত। যদিও গোদুগ্ধ প্রায় সব জাতির মানুষই খেয়ে থাকেন।

একথা মানতেই হবে যে বেদের ভাষ্য অনুযায়ী ঋষিরা গোমাংস ভক্ষণ করতেন। অথচ পরবর্তীকালে গোমাংস ভক্ষণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়ে গেল। যদি বলা হয়, ভারত গরম দেশ বলে শেষমেষ গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তবে ঠিক বলা হয় না। তেমনি কৃষিকর্মে গরুর সহায়তা অথবা দুগ্ধঘৃতাদির যোগান দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতার কারণে দয়ালু মানুষ গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ করেছে, তা হলেও ঠিক বলা হয় না। এগুলি যদি যথার্থ কারণ হত, তবে তন্ত্রানুসারে (ছাগবলির মতো) মহিষবলির প্রচলন থাকত না। কারণ, বলি দেওয়া পশুর মাংস 'মহাপ্রসাদ' হিসেবে গ্রহণ (অর্থাৎ 'ভোজন') করা ভক্তের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। স্পষ্টতই মহিষমাংস নিষিদ্ধ মাংস বলে গণ্য হয়নি। গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পিছনে নিশ্চয় কোনো গভীর স্তরের বোধ বা সংস্কার কাজ করেছে। সেটিকে শনাক্ত করার জন্য আমাদের বিভিন্ন রকমের তথ্য ও তত্ত্ব এবং অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হবে।

এ ক্ষেত্রে শব্দার্থতত্ত্ব থেকে কোনো সমাধানের ইঙ্গিত আসে কি না তা একবার দেখা যেতে পারে। 'গো' একটি অতি প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ এবং শব্দটি বিভিন্ন আকারে নানা ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষায় উপস্থিত আছে। গমন করা বা যাওয়া অর্থে 'গো' অথবা নিকট-উচ্চারিত শব্দ ইংরেজি, ডাচ, জার্মান প্রভৃতি টিউটন (বা জার্মানিক) গোষ্ঠীর ভাষায় নিত্য ব্যবহার হয়। আবার 'যারা যায়' বা 'গমন করে' এমন সত্তা — পৃথিবী, সূর্য, গবাদি পশু ইত্যাদি অনেক অর্থে শব্দটি সংস্কৃতে আছে। আমরা দেখছি, পৃথিবী অর্থে গ্রীক ভাষায় Gaia এবং Ge শব্দ দুইটির ব্যবহার। (ইংরেজি Geography, Geology, Geometry শব্দকয়টিকে এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়।) আবার পণ্য বা commodity যেহেতু এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যায়, সে জন্য পণ্য অর্থেও 'গো' শব্দের ব্যবহার সম্পূর্ণ যুক্তিসম্মত। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যায় যে, বাণিজ্যে যিনি বাস করেন সেই লক্ষ্মী দেবীর স্বামী বিষ্ণু / নারায়ণ (= কৃষ্ণ) হলেন পুঁজি থেকে অভিন্ন। বিষ্ণু / নারায়ণ-এর সঙ্গে 'গো' শব্দের নিত্য সন্নিবেশ। বিষ্ণুর বাসস্থান 'গো'লোকে, 'গো'স্বামী নামে অভিহিত সকল ব্যক্তিই বিষ্ণুভক্ত এবং বিষ্ণুর

কোনো অবতারের (রামের বা কৃষ্ণের) ভক্ত। কৃষ্ণের বাল্য কেটে যায় 'গো'কুলে এবং বালক কৃষ্ণ তাঁর আঙুলের ওপর ধারণ করেছিলেন 'গো'বর্ধন পর্বতকে।

ভারতবর্ষের সমাজে পণ্যবাহিতার বিলক্ষণ প্রসার যে ঘটেছিল, বিভিন্ন দিকে তার নিদর্শন পাওয়া যায়। যদিও সেকালের ভারতীয় চিন্তাবিদদের মাথায় কোনো অর্থনৈতিক দর্শনের আদৌ বিকাশ ঘটেনি, এমনটাই আমাদের বোঝানোর চেষ্টা করা হয়ে থাকে। যেন তারা পণ্য, মূল্য, বিনিময় মূল্য, পুঁজি, পণ্যপ্রবাহ এ সব কিছুই বুঝত না, কিন্তু সেগুলি সফলভাবে করত। কতখানি করত? বৌদ্ধ গ্রন্থগুলির সাক্ষ্য অনুযায়ী বুদ্ধের নীতি ও আদর্শ প্রচারে বণিকশ্রেণীর গৌরবময় ভূমিকা ছিল। খ্রিস্টাব্দের হিসাবে প্রথম কয়েক শতাব্দীতে ভারতীয় শিল্পকলায় যে অসামান্য বিকাশ ঘটেছিল, যার উজ্জ্বলতম সাক্ষ্য অজন্তা ও ইলোরায়, তার পিছনে বণিকপুঁজির অবদান অনস্বীকার্য। তবু ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে পণ্যবিরোধিতারও সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বিদ্যমান। ব্রাহ্মণ ভৃগুর হাতে ভগবান বিষ্ণুর লাঞ্ছনা সেই সত্যের প্রকাশ। এ কথাও বোধ হয় বলা যায় যে, বেদে এবং মহাভারতে দ্যূতক্রীড়াকে হেয় করে দেখানোর মধ্য দিয়েও পণ্য-মানসিকতাকে ধিক্কার জানানো হয়েছিল।

কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে ভারতের ইতিহাসে চলে আসে বণিকপুঁজির গৌরব হ্রাসের যুগ। বৌদ্ধ সংগঠন ও বৌদ্ধ আদর্শে নানাবিধ অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটির ফাঁক দিয়ে ঘটে যায় বৌদ্ধমতের পরাজয় ও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এই ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে বর্ণাশ্রম প্রথা বড় কঠোর। জন্মভিত্তিক জাতি নিরূপণ, বেদপাঠে শূদ্রের অধিকার সম্পূর্ণ হরণ, কালাপানি পারের ওপর জোরালো নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি হল এই যুগের (অর্থাৎ ঠিক হর্ষবর্ধন-পরবর্তী কালের) বিশেষ অবদান। বিশেষ লক্ষণীয় এই যে, এই যুগের সূচনাতেই গোমাংস ভক্ষণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়ে গেল। তৎকালীন মানুষের কল্পনা ও বিচার মতো গোমাংস ভক্ষণ মানেই তো পণ্যবাহী সমাজের মানসিকতা নিজের মধ্যে নিয়ে আসা।

তার মানে, মানবজাতির একটি অংশ দেখেছিল অতি-রাষ্ট্রবাদিতার ভয়াবহতা এবং অপর একটি অংশ দেখেছিল অতি-পণ্যবাদিতার ভয়াবহতা। ফলে রাষ্ট্রবাদিতা-বিরোধীরা বরাহমাংস বর্জন এবং পণ্যবাদিতা-বিরোধীরা গোমাংস বর্জন করা উচিত বলে মনে করেছিল। তাই, বহু শতাব্দী আগে ইহুদি বরাহ মাংস বর্জন করেছিল রাষ্ট্রবিরোধী মানসিকতায়। একই মানসিকতায় আরব মুসলিমও তাই করেছিল। করেছিল প্রায় সেই সময়ে, যে-সময় ভারতে গোমাংস ভক্ষণ (পণ্যবাদিতা) সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।

কেউ কেউ ভাবতে পারেন, সেকালের মানুষ কি এত গভীরে ঢুকে ভেবেচিন্তে এসব সিদ্ধান্ত নিয়েছে? হ্যাঁ, পারত। কেন পারত, কীভাবে পারত এবং পারতই যে, তার অজস্র প্রমাণ ও ব্যাখ্যা হাতে রয়েছে; তবে এখানে তা বিস্তারিত করার প্রয়োজন নাই।[১৪]

যাই হোক, অবশেষে কঠোর বর্ণাশ্রমপন্থী ভারত তার পণ্যবিরোধী মানসিকতায় গোমাংস বর্জন করল। মহিষ বলির মতো বৃষবলির ব্যবস্থা তো চলতে পারত, যেমন বৃষবলি প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত ছিল। কিন্তু না, কোনো আকারেই গোমাংস ভক্ষণের সুযোগ

রাখা হল না। বলা হল, কলিতে অর্থাৎ একালে গোমাংস ভক্ষণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

তবে একটা লক্ষণীয় জিনিস থেকে যাচ্ছে। ইহুদি ও আরব মুসলিমদের চোখে বরাহ বা শূকর প্রাণীটি সর্বাংশে ঘৃণ্য। মুসলিমদের মধ্যে এমন কথাও বলা হয় যে, 'শূকর' শব্দটি উচ্চারণ করলেই উচ্চারণকারীর শরীর পরবর্তী চল্লিশ দিন অপবিত্র হয়ে যায়। ভারতবর্ষে কিন্তু তেমন হল না। বরং বলা হল, গোমাতা মানুষের পূজা পাওয়ার যোগ্য। এই ব্যাপারটি ভারতবর্ষের মূলধারার ঐতিহ্যের সঙ্গে একেবারে খাপ খেয়ে যায়। যে শিবকে তাচ্ছিল্য এবং ঘৃণা করা হয়েছিল বেদের রচনাকালে, তাকেই দেবাদিদেব মহাদেব বলে মেনে নেওয়া হল পরবর্তীকালে সঙ্কলিত পুরাণে। তেমনই বিষ্ণুর বুকে পদাঘাত করেছেন ব্রাহ্মণ ভৃগু, বিষ্ণুর গৌরবকথা ভাগবত পাঠ পর্যন্ত নিন্দনীয় বলে গণ্য হচ্ছে; আবার সেই নারায়ণের প্রতীক শালগ্রাম শিলা সর্বক্ষণ বহন করার দায় নিজের ওপর নিয়ে নিল ব্রাহ্মণ। অথচ দুই ক্ষেত্রেই যে শিব ও বিষ্ণুকে পূজা দেওয়া হচ্ছে সেই দেবতার মূলনীতিকে (শিবের ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি-বিরোধী বা দক্ষ-বিরোধী নীতি, বিষ্ণুর ক্ষেত্রে পণ্যবাহিতার নীতি) একপাশে ঠেলে দেওয়া হল। এই রকম ব্যবস্থাকে যেমন মহান সমন্বয়নীতি বলা যায়, তেমনই এ-ও বলা যায় যে, এটি হল আসলে পরস্পর বিরোধী নীতি বা শক্তির কাউকেই নির্মূল না করেও নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ার চতুর আপোষ নীতিও বলা যায়। তবে এটা ঠিক যে, বিরোধী ভাবাদর্শগুলিকে নির্মূল করে দেওয়ার বদলে তাদের যদি নির্জীব করে রেখে দেওয়া হয়, তবে সেটা হয় কোনো পরবর্তীকালে সমন্বয়ের জন্য ডিপ ফ্রিজে (Deep Fridge-এ) তুলে রাখার মতো। এটাতে মানবসভ্যতার এগিয়ে যাওয়ার পথে সহায়তা হওয়ার কথা।

হয়তো এজন্যই গোদুগ্ধের পাশাপাশি গোবর (hard cash?) ও গোমূত্রকেও (liquid money?-কেও) রেখে দেওয়া হল পবিত্র বলে। জিনিস দুটি তো পণ্যবাহিতারই আবিষ্কার। সেকারণেই ঘোর পণ্যবিরোধী হিন্দু সভ্যতা টাকার প্রতি অজস্র ঘৃণার দর্শন প্রচার করেও, টাকা মাটি মাটি টাকা বলেও, টাকার প্রচলন অব্যাহত রাখে।

সাত

মাংস ভক্ষণের প্রসঙ্গ থেকে অতঃপর হিন্দু এবং মুসলিম ঐতিহ্যের চরিত্রগত পার্থক্যের আলোচনায় আসা যায়। তবে এর মধ্যে আরও কিছু তথ্যের অবতারণা হয়ে থাকলে ফলপ্রসূ আলোচনা সম্ভব হয়। জেনে-বুঝে এবং কিছুটা না-জেনে না-বুঝে পশ্চিমী পাণ্ডিত্য সেই দিকগুলোর ওপর আলোকপাত ঠিকমত করেনি। অর্থাৎ হয় তথ্য দেয়নি অথবা তথ্য বিকৃত করেছে। স্কুলপাঠ্য বইয়ে পর্যন্ত বলে দেওয়া হয় যে, এক হাতে কোরান আর অন্য হাতে তরবারি নিয়ে মুসলিমরা একটার পর একটা দেশ জয় করেছিল, আর সেকারণেই ইসলামের এত দ্রুত ব্যাপ্তি ঘটেছিল। অথচ বিভিন্ন দেশের নানান নিপীড়িত জনগোষ্ঠী তাদের পুরোনো সমাজব্যবস্থায় নিজেদের বাধ্যতামূলক হীনাবস্থা থেকে ত্রাণ পাওয়ার জন্য যে সাগ্রহে ইসলামের পতাকার নীচে এসেছিল, সে কথার বিশেষ উল্লেখ হয় না। বিপরীতে ঠিক তেমনই পঞ্চদশ

ও ষোড়শ শতাব্দীর বাকি পৃথিবী, বিশেষত আফ্রিকা, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ায় উপনিবেশ করার কালে কী পরিমাণ হত্যালীলা পশ্চিমী দেশের মানুষরা চালিয়েছিল, তার কথা অনেকটাই চাপা থাকে। একইভাবে মুসলমান মুর'দের হাত থেকে গোটা স্পেন দেশকে নিজেদের কবজায় আনার জন্য খ্রিস্টান ইয়োরোপ যে স্পেনে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছিল, তারও তেমন উল্লেখ থাকে না।[১৫]

আরও একটি বিষয়ে তথ্য ঠিকমত প্রকাশ না হওয়ায় মানবসভ্যতার ইতিহাস পর্যন্ত বিকৃত হয়ে যায়। স্কুলপাঠ্য বইয়ে লেখা হয় ১৪৫৩ সালে কনস্টানটিনোপল তুরস্কের সুলতানের দখলে চলে যায়। বলা হয় যে, এই আঘাতের জেরে গ্রীক-জানা পণ্ডিতরা সেখান থেকে ইটালিতে চলে যান এবং তার ফলে আবার ইয়োরোপে পুরোনো পৃথিবীর (গ্রীস ও রোমের, বিশেষত গ্রীসের) যেন রেনেসাঁস বা পুনর্জন্ম হয়। কিন্তু মধ্যযুগের কালে সভ্যতার বর্তিকা বহনে প্রাচ্যের বাগদাদ এবং স্পেনের কর্ডোভার[১৬] ইসলামপন্থীরা যে গৌরবময় ভূমিকা পালন করেন, তার উল্লেখ হয় না। অথচ মধ্যযুগের কালে প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন গ্রীস এই দুটি স্বতন্ত্র সভ্যতার বেশ কিছুটা উপাদান যে ভূমধ্যসাগর এলাকা সংলগ্ন এবং মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম সভ্যতা ইয়োরোপের হাতে তুলে দেয় এবং রেনেসাঁসের জমি তৈরি হয়। দশমিক সংখ্যাপাতন পদ্ধতি ভারত থেকে আরবের হাত ধরেই ইয়োরোপে যায় এবং সেজন্য ইয়োরোপে ওদের নাম হয়ে যায় Arabic Numeral। এমনকী আরবী অনুবাদের মাধ্যমেই পশ্চিম ইয়োরোপের দেশগুলি প্রথম প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের গ্রন্থাবলীর সাথে পরিচিত হয়েছিল। আবার মধ্যযুগের রোমান্স সাহিত্য, বিশেষ করে ত্রুবাদুর কাব্য[১৭] --- প্রথম প্রেরণা পেয়েছিল স্পেনের মুরদের সাহিত্য থেকে। মোট কথা, আদিম মানবজাতির সভ্যতা তার সমস্ত অর্জনকে সঞ্চয় করেছিল প্রাচীন ভারতের ও প্রাচীন গ্রীসের নবরূপায়িত সভ্যতার মাধ্যমে। কিন্তু এই দুই সভ্যতার অর্জনগুলিকে একত্র করে ইয়োরোপের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য যার ডাক পড়ে সে হল ইসলাম। তারা বাগদাদ ও কর্ডোভাতে পূর্বতন দুই সভ্যতার সঞ্চয়কে একত্র করে সাধ্যমত অনুবাদ করে ইয়োরোপের হাতে তুলে দেয়।

উৎপাদন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার হিসেবে আগের তুলনায় পৃথিবী আজ অনেক ছোট, অনেক সংবদ্ধ। বিশ্বরাষ্ট্রের কল্পনা আর অলীক নয়। শিল্পবাণিজ্যের দিক থেকে রাষ্ট্রীয় সীমানাগুলি অবান্তর হওয়ার পথে। অথচ আজ সারা পৃথিবী জুড়ে চলছে ছোট-মাঝারি নানা মাপের যুদ্ধ, যাদের তুলনা চলে ধিকিধিকি করে জ্বলা আগুনের সঙ্গে। ব্যাপারটি এইভাবেও দেখা যায়। অর্থনীতি বা জীবনের প্রকরণ ঠেলছে সমস্ত মানুষকে একজোট করার দিকে, কিন্তু বাগড়া দিয়ে চলেছে মানুষের রাষ্ট্রনীতি। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সহজিয়া শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের চেষ্টা মানুষকে নিজের মতো বাঁচার দিকে ঠেলছে, কিন্তু তাকে ব্যতিব্যস্ত করে দিচ্ছে পণ্যনীতির বিশায়িত রূপ। রাষ্ট্রনীতিগুলির আবার প্রধান আশ্রয় হল মানুষের ধর্মভিত্তিক সমাজচেতনা। বিশায়িত পণ্যনীতির প্রধান আশ্রয় হল মানুষের পুঁজিভিত্তিক বাজারচেতনা। স্বভাবত বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ধাপ হতে পারে এক দিকে মানুষের ধর্মভিত্তিক সমাজচেতনায় রূপান্তর

আনা, অপর দিকে মানুষের পুঁজিভিত্তিক বাজারচেতনার দিশা নির্দেশ করা। অন্য কথায় সেই চেতনাদ্বয়ের ভিতর থেকে দ্বেষ ও হিংসার বিলোপসাধন।

কিন্তু দ্বেষ ও হিংসার বিলোপসাধন উপদেশে হওয়ার নয়। এটি তখনই সম্ভব যখন মানুষ নিশ্চিত হবে যে, একই মনুষ্যচেতনা সকল মানুষের মধ্যে ক্রিয়াশীল, এবং যত রকমের ভিন্ন ধর্মবোধ আজ দেখা যাচ্ছে সে সব ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক-অর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে সঞ্জাত, কিন্তু তাদের সকলেরই বাস এক অভিন্নধর্মা মনুষ্যচেতনায়। এ বিষয়ে অনুসন্ধান চালাতে গেলে দেখতে হয়, বিভিন্ন জাতির পুরাকাহিনী ও ভাষা কী সাক্ষ্য বহন করছে। এখানে তারই কিঞ্চিৎ চেষ্টা করা হল।

যাই হোক, ১৯৪৭ সালের আগে ও পরে, হিন্দু-মুসলিম বিরোধের ফলে ভারত উপমহাদেশের অগণিত মানুষ যে অপরিসীম যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন এবং যে রক্তাক্ত অধ্যায় এখনও চলেছে, তাকে জাতির জীবনে এক চরম অভিশাপ ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। অথচ হিন্দু ও মুসলিম এই দুটি সম্প্রদায় প্রায় হাজার বছর ধরে ভারত উপমহাদেশের সকল অংশে প্রতিবেশী হিসেবে বাস করেছে, করছে। দুটি সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে অন্তত পারস্পরিক আস্থার সম্পর্ক গড়ে ওঠা ছাড়া এ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি নেই। তা ছাড়া, টাকার যেমন দুই পিঠ হয়, সমগ্র মানবসভ্যতার মৌলিক অর্জনেরও তেমনি দুটো পিঠ; দুদিকের প্রতিনিধিত্ব করে এই দুইটি ধর্মীয় ঐতিহ্য। একটিকে বাদ দিয়ে তাই অন্যটির মানে হয় না। আর, কথাটি কেউ না বুঝুন, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ যথার্থভাবেই বুঝেছিলেন।

ভাবের রূপায়ণে মূর্তির ব্যবহার, চিত্র, ভাস্কর্য, নৃত্যকলা প্রভৃতিতে হিন্দু ও ইসলামী ঐতিহ্যের বিপরীত অবস্থানের কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু হিন্দু ও মুসলিমের জীবনচর্চার ভিতরে রয়েছে আরও গভীরতর পার্থক্য। ইতিহাসের নানা কার্যকারণের সূত্রে যে ঐতিহ্যের শেষ পর্যন্ত 'হিন্দু' নামটি জুটে গেছে, তার ভিতর আছে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে মানুষের যথার্থ স্থানকে বুঝে নেওয়ার ঐকান্তিক চেষ্টা। সমস্ত জীবের মধ্যে হিন্দু পরমকে দেখেছে, সমস্ত মানুষকে বলেছে অমৃতের পুত্র; এমনকি সে বলেছে জীবই ব্রহ্ম। জগৎকারণকে একই সাথে পিতা এবং মাতা দুই হিসাবে কল্পনা করতে পারার মতো তাত্ত্বিক শক্তি ও সাহস দেখিয়েছে। কিন্তু মানবসমাজের বাস্তব সংগঠনের ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে অধিকারের সাম্য ও সহজ ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগিতা এবং পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহারের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নীতিকে সে উপেক্ষা করেছে। ফলত ভারতের ঐতিহ্যের ভিতর মানুষে মানুষে অধিকারের ভেদ এবং তারতম্যের তত্ত্ব এত প্রবল হয়ে উঠল যে, হিন্দু ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্যই হয়ে গেল নিজের অতি মহৎ আদর্শগুলিকে কার্যক্ষেত্রে না মানা।

অপর পক্ষে কল্পনা ও ভাবনার দিগন্তকে অনেক প্রসারিত না করেও, উত্তরাধিকারসূত্রে যতটুকু যা পাওয়া গিয়েছিল তারই উপর নির্ভর করে মুসলমান তার বাস্তব জীবনে মানুষে মানুষে (অন্তত নিজ ধর্মের অন্তর্ভুক্তদের মধ্যে) সাম্য ও প্রেমবন্ধনের তত্ত্বকে অনেক বেশি মর্যাদা দিয়েছে। অর্থাৎ হিন্দুর যে বিপুল অর্জন তাকে সে আদৌ বাস্তবায়িত করেনি,

মুসলমানের যতটুকু অর্জন ততটুকুকেই সে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেছে।

এইখানে এসে কেউ কেউ আপত্তি তুলতে পারেন। পৃথিবীর নানা প্রান্তে বিভিন্ন রকমের আক্রমণকারীদের মধ্যে মুসলিমদের আনুপাতিক সংখ্যাধিক্য তাঁদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকে। তাঁদের আমি তিনটি কথা স্মরণ করাতে চাই। প্রথম, আক্রমণকারীদের মধ্যে শুধু নয়, পৃথিবীর আক্রান্তদের মধ্যেও মুসলিমদের সংখ্যাধিক্য। ঘটনাটি তাৎপর্যহীন নয়, বিশেষত যখন ঘোষণা এবং ক্রিয়াকলাপের হিসেবে ইসলামি দুনিয়ার তীব্রতম সঙ্ঘাত পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে। দ্বিতীয়, মধ্যযুগে বাগদাদ এবং কর্ডোভায় সহনশীল সভ্যতার বিকাশ।[১৫] আর সবশেষে মনে করাবো স্বামী বিবেকানন্দের একটি বহুল-প্রচারিত চিঠির কথা।[১৮]

তাঁর চিঠিতে বিবেকানন্দ বলছেন, 'For our own motherland a junction of the two great systems, Hinduism and Islam – Vedanta brain and Islam body is the only hope.' এটি কোনো আর্কাইভ থেকে সম্প্রতি উদ্ধার হওয়া চিঠি নয়, এটি বহু বছর আগে থেকে স্বামী বিবেকানন্দর প্রকাশিত রচনায় স্থান পেয়েছে এবং এটি অনেকেরই জানা। কিন্তু এই উপমহাদেশের জীবনে চিঠিটির যে-অসাধারণ ভূমিকা হতে পারত, তা হতে পারেনি 'Islam body' শব্দবন্ধটির প্রকৃত অর্থ সম্যক বুঝতে না-পারার জন্য। অঘোষিত ভাবে শব্দবন্ধটির অর্থ সকলে যা করেছেন, তার মর্ম এইরকম — যে-সমন্বয় স্বামীজি চেয়েছেন, তা এই যে, মুসলমানের কায়িক শক্তি এবং সামরিক শৌর্য মেলাতে হবে হিন্দুর বৈদান্তিক বুদ্ধির সঙ্গে। অর্থাৎ কিনা হিন্দু দেবে নেতৃত্ব আর মুসলিম হবে আজ্ঞাবাহী শ্রমিক বা সৈনিক। অবশ্যম্ভাবীভাবে মুসলিমের কাছে এটি ঠেকেছে অপমানকর প্রস্তাব, আর হিন্দুও কুণ্ঠিত হয়েছে চিঠিটি নিয়ে বেশি নাড়াঘাঁটা করতে। কিন্তু বিবেকানন্দের চিন্তা কি এত স্থূল? স্থূল যে নয়, চিঠিটিতে লেখা তাঁর আগের বাক্যেই তা পরিষ্কার। সেখানে তিনি বলছেন — '... practical Advaitism, which looks upon and behaves to all mankind as one's own soul, was never developed among the Hindus. On the other hand, my experience is that if ever any religion approached to this equality in an appreciable manner, it is Islam and Islam alone.' স্পষ্টতই 'Islam body' বলতে তিনি মুসলমানদের কায়িক শক্তিকে বুঝতেন না, বুঝতেন তাঁদের অর্জনকে, তাঁদের সমাজে ও জীবনে 'practical Advaitism'-এর প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা ও অভ্যাসকে, 'practical Advaitism'-এর অন্তর্ভুক্ত 'equality' বা সাম্যের নীতি পালনের রেওয়াজকে, যে-রেওয়াজ ও অভিজ্ঞতা বিবেকানন্দের মতে বিশ্বের আর কোনো ধর্মের হাতে নেই।

এই সমস্ত কারণে এ কথা ভাবা আজ অসঙ্গত নয় যে, ভারত উপমহাদেশের হিন্দু এবং মুসলমান এই দুই সঙ্ঘর্ষপীড়িত সম্প্রদায়ের সামনে নিজেদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উপায় পুনরুদ্ধার করা ছাড়াও একটি বিরাট সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। তারা যদি নিজ নিজ অপূর্ণতার বিষয়ে সচেতন হয়ে একে অপরের কাছ থেকে মহান তত্ত্ব ও প্রয়োগ কৌশল শিখে নেয়, তবে

শুধু তারা নিজেরা সার্থক হয় তাই নয়, তারা মানবসভ্যতার কিছু জরুরি সমস্যারও সমাধান করে ফেলে এই উপমহাদেশের মাটিতে।

আট

শেষে আবার গুরুর কথাতে আসি। এটি গবেষণা প্রবন্ধ নয়। এটি একটি আলোচনা মাত্র। আমার ভাবনাচিন্তাগুলোকে একটু গোছালো আকারে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। লেখাটিকে বোধ করি essay বলে মেনে নিতেন আদি essay-লেখকরা, অর্থাৎ জীবনরসিক ফরাসি লেখক মঁতাইয়েঁ (Montaigne, 1533-1592) বা ইংরেজ দার্শনিক লেখক ফ্রান্সিস বেকন (Bacon, 1561-1626) প্রমুখ লেখকরা। সুস্থ সমাজের মানুষ হিসেবে যাঁরা বেঁচে থাকতে চান, এই লেখাটি তাঁদের মনে কিছু ভাবনার খোরাক যোগাবে, এই আশায় এই প্রবন্ধটির রচনা।

পাদটীকা

১. সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে পশ্চিমী দুনিয়ায় অর্থাৎ ইয়োরোপে সংস্কৃতি-জগতে বা ভাবনাচিন্তার জগতে যে যুগান্তর ঘটে যায়, তার নাম দেওয়া হয়েছে Enlightenment বা আলোকপ্রাপ্তি। এর পূর্ববর্তী সাংস্কৃতিক রূপান্তরটি ঘটেছিল পঞ্চদশ, ষোড়শ এবং বড়জোর সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে; এবং এটিকে সচরাচর বলা হয় রেনেসাঁস। রেনেসাঁসের কালে মানবিক ও যুক্তিবাদী বিচারের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মানবিক ও যুক্তিবাদী বিচারের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর আলোকপ্রাপ্তির কালে। আলোকপ্রাপ্তির যুগের মূলগত বিশ্বাস ছিল এই যে, জড়জগতের মাপজোক ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং তর্কশাস্ত্রসম্মত যুক্তিবাদী বিচারের মধ্যে দিয়ে মানুষ, ঈশ্বরকে এবং একদিন সমগ্র জগৎ চরাচরকে বুঝে ফেলবে।

২. টমাস আকোয়াইনাস (Aquinas — ১২২৫-১২৭৪ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন ইয়োরোপের মধ্যযুগীয় দার্শনিকদের সর্বাগ্রগণ্য। অ্যারিস্টটলের (খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২) বিচার ও খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের অসামান্য সমন্বয় ঘটিয়ে যে তত্ত্বসৌধ আকোয়াইনাস নির্মাণ করেছিলেন, ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের চোখে তার তর্কাতীত প্রামাণিকতা। মহাকবি দান্তের (১২৬০-১৩২১ খ্রিস্টাব্দ) কাব্যের দার্শনিক ভিত্তিভূমি আকোয়াইনাসের দর্শন।

৩. কোলরিজ (১৭৭২-১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দ) এই শব্দ কয়টি ব্যবহার করেছেন তাঁর Biographia Literaria গ্রন্থে। এই গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে তিনি লিখছেন, 'Whoever is acquainted with the history of philosophy during the two or three last centuries cannot but admit that there appears to have existed a sort of secret and tacit compact among the learned not to pass beyond a certain limit in speculative science. The privilege of free thought, so highly extolled, has at no time been held valid in actual practice except within this limit; and not a single stride beyond it has ever been ventured without bringing obloquy on the transgresser.'

৪. Faith কথাটির সাধারণ মানে আস্থা বা বিশ্বাস। কিন্তু কূপমণ্ডুকতার কারণে সমগ্র মধ্যযুগ ও তার পরেও দু-তিন শতাব্দী ধরে, ইয়োরোপের মানুষ ভেবেছিল যে চার্চ-নির্ধারিত খ্রিস্টীয় বিশ্বাস ও আচরণ ছাড়া আর সব ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরণ ভুল। পশ্চিমী ভাবনার জগতে Faith কথাটির মানেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল খ্রিস্টীয় বিশ্বাস। Faith-এর বৈপরীত্যে অবস্থান যুক্তিবাদী বিচার বা Reason-এর। সাধারণভাবে সেজন্যই মধ্যযুগকে বলা হয়েছে Age of Faith, এবং আলোকপ্রাপ্তির যুগকে বলা হয়েছে Age of Reason। ভূতত্ত্ববিদ্যায় একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ধারণা এই যে, সুদূর অতীতে, কমপক্ষে বিশ কোটি বছর আগে, ভূপৃষ্ঠে একটি মাত্র অতিকায় স্থলখণ্ড বা মহাদেশ ছিল, আর সেটি ঘিরে চারিদিকে ছিল একটি বিশাল জলরাশি

বা মহাসমুদ্র। পরে এই ভূখণ্ড ফাটল ধরে এবং এটি প্রথমে দুটি টুকরো হয়, এবং তারপরে কালক্রমে সেই দুটি মহাদেশও ভেঙেযায় এবং টুকরোগুলি একে অন্যের কাছ থেকে দূরে চলে যায় বা অন্যের কাছে চলে আসে। এখনও এই ধরনের স্থানবদল চলেছে, যদিও অতি মন্থর গতিতে। এই মতের সমর্থনে দেখানো হয় যে, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশকে পূর্বদিকে ঠেলে দিলে তারা ইয়োরোপ ও আফ্রিকার সঙ্গে যেন খাপে খাপে মিলে যায়। সুদূর অতীতের অতিকায় সেই একমাত্র মহাদেশকে নাম দেওয়া হয়েছে Pangaea, Pangea, বা প্যানজিয়া।

৬. বাইবেল গ্রন্থের নিউ টেস্টামেন্ট বা নূতন নিয়ম অংশের নিম্নলিখিত অংশগুলি দ্রষ্টব্য — মথি, ছাব্বিশ, ২৬-২৮; মার্ক, চোদ্দো, ২২-২৪; লুক, বাইশ, ১৯-২০; করিন্থীয় (১), এগারো, ২৩-২৬।

৭. প্রাক খ্রিস্টীয় অভিচারমূলক অনুষ্ঠান পালনকে ইংরেজিতে বলা হয় Mystery Cult। দেবতার স্থলে স্থাপিত যিশুর মাংস ও রক্ত হিসেবে কোনো কিছুকে গ্রহণ করার সংস্কার এত গভীরভাবে ইয়োরোপের মানসে ছিল যে, মধ্যযুগে ক্যাথলিক চার্চের সিদ্ধান্ত মতো প্রতি বছর একটি বিরাট পাউরুটি, যাকে বলা হত Host, তাকে নিয়ে এক বিরাট শোভাযাত্রা হত বিভিন্ন শহরে, এবং তারপর একদিন বা একাদিক্রমে তিন-চারদিন ধরে চলত শহরের রাজপথ ধরে শকটবাহিত নাট্যানুষ্ঠানের শোভাযাত্রা। প্রতিটি শকটে হত একটি নির্দিষ্ট নাটক এবং এই নাটকের পালার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মানুষের জন্য যিশুর আত্মদানের আনুপূর্বিক কাহিনীর বিস্তৃত উপস্থাপনা। এই নাটকগুলিকে বরাবর Mystery Play বলা হয়েছে।

৮. বাইবেল গ্রন্থের ওল্ড টেস্টামেন্ট বা পুরাতন নিয়ম অংশের লেবীয় পুস্তক (Leviticus)-এর একাদশ অধ্যায়ে শুচিতা নিয়ে অনেক নির্দেশনা আছে। সেখানে শূকরের মাংসভোজন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে শূকরকে অশুচি প্রাণী বলে গণ্য করতে হবে।

৯. দ্রষ্টব্য — Penguin Classics-এ প্রকাশিত কোরান গ্রন্থের N. J. Dawood কৃত অনুবাদের The Cow (পৃষ্ঠা ৩৪১) এবং Cattle (পৃষ্ঠা ৪২৭) অংশে শূকরমাংস নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

১০. দ্রষ্টব্য — নিউ টেস্টামেন্ট অংশের অন্তর্গত মার্ক, সাত, ১৫, ১৮-২০।

১১. কলিম খান রচিত *দিশা থেকে বিদিশায়* নামক গ্রন্থের "নগদ-নারায়ণ : ভারতের 'ডাস্ ক্যাপিটাল' ও পুঁজির বিশ্বরূপ দর্শন" শীর্ষক প্রবন্ধে অবতার তত্ত্বের ব্যাখ্যাটি দ্রষ্টব্য।

১২. দণ্ড (√দম + ত) = যাহার সাহায্যে দমন করা হয়।

১৩. সব হিন্দুরা গোমাংস ভক্ষণ করেন না, এমন নয়। কেরল অঞ্চলে বেশ কিছু সম্প্রদায় রয়েছেন, যাঁরা নিজেদের হিন্দুই বলেন, তাঁরা কিন্তু মুসলমানদের মতোই গোমাংস ভক্ষণ করেন। তা ছাড়া ব্রিটিশ আমলে কলকাতায় 'আধুনিক হিন্দু'দের 'বিফ-ইটার্স অ্যাসোসিয়েশন' ছিল। বহু নামজাদা মানুষ তার সদস্য ছিলেন। তবে যে হিন্দুরা গোপনে গোমাংস ভক্ষণ করেন কিংবা ভক্ষণ করে তা গোপন করেন, তাঁদের কথা আমি ধরছি না।

১৪. এ হচ্ছে সেকালের প্রায়-অখণ্ড মানুষ সম্পর্কে একালের অতি-খণ্ডিত মানুষের বিচার। মনে রাখা ভাল আজ আমরা আমাদের অতি-খণ্ডিত বিদ্যার জোরে মানবশরীরের জিনের অতি-খণ্ডিত অংশেরও আবিষ্কার করে ফেলেছি বলেই বলতে পারছি, ভাই-বোন বা নিকট-আত্মীয় ছেলেমেয়ের বিয়েশাদি হলে তাদের সন্তানের প্রতিবন্ধী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি; আর আজ থেকে প্রায় ৪৫০০ বছর আগেই সেকালের মানুষ ভাইবোনে বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। কী করে তেমন সিদ্ধান্ত তাঁদের পক্ষে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল? এরকম এই জন্য যে, সেকালের মানুষ 'সমগ্রভাবে' দেখতে পারত ভাল করে কিন্তু টুকরোকে তেমন নিখুঁতভাবে দেখবার যোগ্য হয়ে ওঠেনি; আর এখনকার বিজ্ঞানশিক্ষায় শিক্ষিত মানুষও 'সমগ্রভাবে' দেখতে পারে খুবই নগণ্য ক্ষেত্রে কিন্তু টুকরোকে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে দেখবার যোগ্য হয়ে উঠেছে। তাই সমাজে রাষ্ট্রবাদিতা ও পণ্যবাদিতার সামগ্রিক চেহারা ও তার ফলাফল তারা সমগ্রভাবে অনুভব করতে সক্ষম হয়েছিল। তারই কারণে তারা বরাহমাংস ও গোমাংস বিরোধী হয়ে উঠেছিল।

১৫. 'Throughout the Middle Ages, the Mohammedans were more civilized and more humane

than the Christians. Christians persecuted Jews, especially at times of religious excitement; the Crusades were associated with appalling pogroms.' – Bertrand Russell, *A History of Western Philosophy*, Book Two, Chapter I.

১৬. 'During the twelfth century, translators gradually increased the number of Greek books available to Western students. There were three main sources of such translations: Constantinople, Palermo, and Toledo. Of these Toledo was the most important, but the translations coming from there were often from the Arabic, not direct from the Greek.' – Ibid, Chapter XI.

১৭. 'The poetry of the troubadours ... was the starting point of modern literary lyric poetry.' (Readers Companion to World Literature) 'The sources of this poetry (= troubadour poetry) were primitive native verse flourishing among the peasant since pre-Roman times and Latin and Spanish-Arabic lyrics.' – Ibid.

১৮. পাঠকের অবগতির জন্য বিবেকানন্দের সেই চিঠিটি নীচে দেওয়া হল। এটি তিনি লিখেছিলেন নৈনিতালের মোহম্মদ সরফরাজ হোসেন-কে :

Almora
10th. June, 1898

My dear Friend,

I appreciate your letter very much and am extremely happy to learn that the Lord is silently preparing wonderful things for our motherland.

Whether we call it Vedantism or any ism, the truth is that Advaitism is the last word of relegion and thought and the only position from which one can look upon all religions and sects with love. I believe it is the religion of the future enlightened humanity. The Hindus may get the credit of arriving at it earlier than other races, they being an older race than either the Hebrew or the Arab; yet practical Advaitism, which looks upon and behaves to all mankind as one's own soul, was never developed among the Hindus.

On the other hand, my experience is that if ever any religion approached to this equality in an appreciable manner, it is Islam and Islam alone.

Therefore, I am firmly persuaded that without the help of practical Islam, theories of Vedantism, however fine and wonderful they may be, are entirely valueless to the vast mass of mankind. We want to lead mankind to the place where there is neither the Vedas, nor the Bible, nor the Koran; yet this has to be done by harmonizing the Vedas, the Bible, and the Koran. Mankind ought to be taught that religions are but the varied expressions of THE RELIGION, which is Oneness, so that each may choose the path that suits him best.

For my own motherland a junction of the two great systems, Hinduism and Islam – Vedanta brain and Islam body – is the only hope.

I see in my mind's eye the future perfect India rising out of this chaos and strife, glorious and invincible, with Vedanta brain and Islam body.

Even praying that the Lord may make of you a great instrument for the help of mankind, and especially of our poor, poor motherland.

Yours with love
Vivekananda

'রবীন্দ্রনাথ' পত্রিকার ১৭ সংখ্যায় (কলকাতা বইমেলা ২০০৭-এ) প্রকাশিত।

গণনেতা : দুর্বৃত্তকে পুনরায় শিবঠাকুর বানাবেন কীভাবে?

কলিম খান

'কে লইবে মোর কার্য?' কহে সন্ধ্যারবি

সম্প্রতি (অগস্ট ২০০৬) আমাদের লোকসভার স্পিকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় একদল বাঙালি ছেলেমেয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে অবাক হয়ে গেছেন। এদের অধিকাংশই উচ্চমাধ্যমিকের ঝকঝকে ছাত্রছাত্রী। সোমনাথবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বার্তালাপে তারা জানিয়েছে, তারা কেউই তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে পেশা হিসেবে রাজনীতি করতে চায় না। উত্তর প্রজন্মের সেরা ছেলেমেয়েরা আর সবই করতে চায়, কিন্তু রাজনীতি করতে চায় না শুনে সোমনাথবাবু মর্মাহত হয়েছেন। সত্যিই তো! দেশের সেরা ছেলেমেয়েরা সবাই যদি রাজনীতি-বিমুখ হয়ে যায়, তা হলে দেশের ভবিষ্যৎ কী হবে? তিনি ও তাঁর সহযোগীরা চলে গেলে, লোকসভায় এসে দেশ-পরিচালনার হাল ধরবে কারা? রাজনীতি করতে আসবে কেবল নষ্ট মানুষেরা! অশিক্ষিত, বান্দাবাজ, ধর্মভ্রষ্ট, দুর্নীতিগ্রস্ত, দুর্বৃত্ত, স্মাগলার, চোর-ছ্যাঁচড়েরা! তা হলে এ দেশের ভবিষ্যৎ কাদের হাতে চলে যাবে?! তিনি ভেবে কূলকিনারা পাননি।

তবে, এর আগেও ব্যাপারটি একবার পত্রপত্রিকায় এসেছিল। তখন বাবু জগজীবন রাম বেঁচে ছিলেন। আনন্দবাজার গোষ্ঠী তাঁদের 'বাৎসরিক বিতর্ক' অনুষ্ঠান তখন সবে শুরু করেছেন। তাতে 'পেশা হিসেবে রাজনীতি আর সম্মানীয় নয়' শীর্ষক বিতর্কে যোগ দিয়ে বাবুজি দুঃখ করে বলেছিলেন, রাজনীতি এখন এতই মন্দ পেশা হয়ে উঠেছে যে, এমনকী বেশ্যারাও রাজনৈতিক নেতাদের ঘৃণা করে। এ-দুঃখ নিয়েই বাবুজি গত হয়েছেন।

বছর দশেক আগে, প্রবীণ কংগ্রেস নেতা বসন্ত শাঠে, রাজনীতিতে দুর্বৃত্তদের উদ্ভব নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, কুয়োয় যা আছে তাই-ই তো বালতিতে উঠে আসবে! অর্থাৎ কিনা, জনসাধারণের মধ্যে বহু দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষ রয়েছেন, নেতা সেই জনসাধারণ থেকেই উঠে আসে; তাই স্বাভাবিক নিয়মে দেশের পরিচালকের আসনে দুর্নীতিগ্রস্ত লোকেরাও চলে আসে। অবশ্য, সেই দুর্নীতিগ্রস্ত লোকেরা যাতে দেশের মাথায় উঠে আসতে না পারে, সে-বিষয়ে কোনো পরিকল্পনা গ্রহণের কথা শাঠেজি আমাদের জানাননি।

বোঝাই যাচ্ছে, সোমনাথবাবুর দুশ্চিন্তা, বাবুজির দুঃখ ও শাঠেজির ঠাট্টা আদৌ অমূলক নয়। বাবুজি আজ নেই। সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় রয়েছেন। কিন্তু এই পরিস্থিতির মোকাবিলা কীভাবে করা হবে, তা নিয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা বিধানের কথা তাঁর মুখ থেকে আমরা শুনিনি। শুনিনি তাঁর পার্টির মুখ থেকেও, বা অন্য কোনো পার্টির মুখ থেকেও।

অথচ এ-তো নিতান্ত খুচরো সমস্যা নয়, ভেবে দেখলে এর চেয়ে জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ মৌল সমস্যা আর কিছু হতেই পারে না। অন্য সব কাজ ফেলে রেখে, সবার আগে এই সমস্যা

সমাধান করা উচিত। কেননা, কোনো মানুষের ধনসম্পদ ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে গেলেও যা ক্ষতি হয় না, মানুষটি পাগল হয়ে গেলে, অর্থাৎ তার মাথা খারাপ হয়ে গেলে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি ক্ষতি হয়; বলা ভাল, মানুষটির সর্বনাশ হয়ে যায়। তেমনই, একটি দেশ খরায় বন্যায় ডুবে গেলে, সুনামিতে তার বহু মানবসম্পদ ও ধনসম্পদ নষ্ট হয়ে গেলেও যে-ক্ষতি হয় না, দেশটির মাথা-খারাপ হয়ে গেলে তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি হয়, দেশের সর্বনাশ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন —

> '... ব্যাধি মানুষের শরীরের স্বভাব নহে তবু ব্যাধি মানুষকে ধরে। কিন্তু তখন মানুষের শরীরের প্রকৃতি ভিতরের দিক হইতে ব্যাধিকে তাড়াইবার নানাপ্রকার উপায় করিতে থাকে। যতক্ষণ মস্তিষ্ক ঠিক থাকে ততক্ষণ এই সংগ্রামে ভয় বেশি নাই কিন্তু যখন মস্তিষ্ককেই ব্যাধিশত্রু পরাভূত করে তখনই ব্যাধি সকলের চেয়ে নিদারুণ হইয়া উঠে কারণ তখন বাহিরের দিক হইতে চিকিৎসকের চেষ্টা যতই প্রবল হউক ভিতরের দিকের শ্রেষ্ঠ সহায়টি দুর্বল হইয়া পড়ে। মস্তিষ্ক যেমন শরীরে, ধর্ম তেমনি মানবসমাজে।'[১]

বলে রাখা ভাল, সেকালে আইনকে ধর্ম বলা হত। একালে সেই ধর্মের বা আইনের সৃষ্টি ও তার রক্ষণাবেক্ষণ করে দেশের আইনসভা বা লোকসভা; এখন সেটিই দেশের পরিচালক বা মস্তিষ্ক। জনসাধারণের সেরা সন্তানেরা যদি সেই দেশের মাথায় পরিচালকের আসনে উঠে না আসে, বরং মন্দ সন্তানেরা উঠে আসতে থাকে, দেশের পরিচালকের ধর্মাসন যদি ক্রমশ মন্দ-সত্তায় ভরে যায়, সে-দেশেরও মাথা খারাপ হয়ে যায়, দেশটিরও ধর্মনাশ হয়ে যায়; তখন তার সর্বনাশ ঠেকায় কার সাধ্যি! জার্মানির মাথায় পরিচালকের ধর্মাসনে উঠে পড়েছিল হিটলার ও তার সহযোগীরা, ফলত জর্মানির মাথা খারাপ হয়ে যায়। আর, তার ফলে কেবল জার্মানিরই সর্বনাশ হয়নি, সারা পৃথিবীকেই ভুগতে হয়েছিল। আজ আমাদের দেশের মস্তিষ্কে অর্থাৎ লোকসভায়-বিধানসভায় পরিচালকের ধর্মাসনে বসে আছেন মনমোহন সিংহ, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রমুখ নেতাগণ। এবং এঁদের ব্যক্তিগত সততায় খাদ নেই বলে অনেকেই বলে থাকেন। এমনকী বিরোধী পক্ষেরও এরকম কিছু নেতানেত্রী রয়েছেন। কিন্তু এই প্রজন্ম চলে গেলে তখন কী হবে? তখন দেশের ভাল ছেলেমেয়েরা যদি দেশপরিচালনার দায়িত্ব না নেয়?! এখনই যা অবস্থা, দশ-পনেরো বছর পরে তো দেশের লোকসভা বিধানসভা ভরে যাবে এমন সব নেতায়, যাদের প্রত্যেকের নামেই কোর্টে দশ-বিশটা করে ক্রিমিনাল কেস ঝুলছে। এখনই তার কমবেশি সূত্রপাত হয়ে গেছে। সেই কারণে, সোমনাথবাবু দেশের ভবিষ্যৎ পরিচালনার কথা ভেবে শঙ্কিত হয়েছেন; এবং তাঁর এই শঙ্কা আদৌ অমূলক নয়। বিষয়টি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত ভাবনার কথা।

আদি ভারতীয় গণনেতারা কেমন ছিলেন?

অনেকে জানেন, 'ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি' উদ্ধার করে তার সাহায্যে ভারতের প্রাচীন গ্রন্থাদির অর্থ পুনরুদ্ধারের কাজে আমি দীর্ঘকাল ব্যাপৃত আছি। সেই সুবাদে জানতে পারি, বৈদিক

যুগেরও আগে ভারতে গণনেতাকে 'শিব' বলা হত। তখন জনসমাজে গণনেতাদের সর্বোচ্চ সম্মান ছিল। ভারতবর্ষের যা-কিছু অর্জন — অধ্যাত্মবিদ্যা, ভাষা, সংখ্যাতত্ত্ব, নৃত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা — সব কিছুর আদিতে স্রষ্টা রূপে আমরা সেই আদি গণনেতাদের বা শিবের দেখা পাই। এই গণনেতাদের চেয়ে 'মহৎ' আর কেউই ছিলেন না। তাই এঁদের 'মহর্ষি'ও বলা হত। এঁরা 'ব্রহ্ম'গুণের অধিকারী ছিলেন। তাই এঁদের 'আদি ব্রাহ্মণ'ও বলা হয়েছে। এঁরা প্রথম যখন সমাজের শীর্ষে পরিচালকরূপে সক্রিয় হয়েছিলেন, তখনও সেই যৌথসমাজে কোনো বিভাজনই হয়নি; ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এই চার বর্ণে মানুষের বিভাজন হতে তখনও বাকি। শিবগুণসম্পন্ন এই মানুষদের বিশেষত্ব ছিল, এঁরা স্বশিক্ষিত, ব্রহ্মদ্রষ্টা[২], নতুনের স্রষ্টা, সৃজনশীল, উদ্ভাবক, আবিষ্কারক, নিজস্ব ধর্ম নিজে অর্জন করে এবং কারও অধীনতা স্বীকার না করে স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক জীবনযাত্রা অতিবাহিত করতেন। এঁরা স্বভাবতই পুরুষগুণসম্পন্ন ও প্রকৃতি-প্রেমিক। এঁরা সমাজকে ধারণ করতেন না, কিন্তু তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতেন অর্থাৎ সমাজকে রক্ষা করার, পালন-পোষণ ও সমৃদ্ধ করার পথ দেখাতেন। পরবর্তী যুগে সমাজের এই পুরুষশক্তিকে বা পথপ্রদর্শকদের ঋষভ, বৃষভ (বা শিবশক্তির বাহন 'ধর্মের ষাঁড়', নন্দীষাঁড়) বলা হত, আর প্রকৃতিশক্তিকে বলা হত অশ্ব, এবং সমাজকে বলা হত অশ্বত্থ। এই সুপ্রাচীন ধারণা ইয়োরোপ ধরে রেখেছে তাদের 'Ash Tree'-র স্মৃতিতে।

বৈদিক সমাজের সূত্রপাতের প্রাক্কালে সেই আদিম সনাতন যৌথসমাজ ভেঙে গিয়ে অজস্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, এবং এক-একটি সম্প্রদায় তাঁদের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের বা শিবস্বরূপ মানুষদের সেই সম্প্রদায়ের নেতার আসনে অভিষিক্ত করে তাঁরই পরিচালনায় জীবনযাত্রা অতিবাহিত করতে শুরু করেছিল। সম্প্রদায়ের সেই শ্রেষ্ঠ সন্তান বা 'নেতা' ছিলেন সমগ্র সম্প্রদায়ের চোখ বা 'নেত্র', তার সাহায্যেই সম্প্রদায়ভিত্তিক সেই সভ্যতা জগতের দিকে তাকিয়ে এগিয়ে চলত এবং সদাসর্বদা সেই নেত্রকে বা নেতাকে বাঁচিয়ে চলত; মানুষ যেভাবে কোনো আঘাত এলে সবার আগে চোখ বাঁচায়, সেইরকম। তখনও বর্ণবিভাজন হয়নি, রাষ্ট্র নেই, পণ্য নেই, জাতি নেই, ঈশ্বর নেই, একালে আমরা যাকে 'রিলিজিয়ন' বা 'প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম' বলি তার চিহ্নমাত্র নেই। তখন কেবল মহর্ষি (শিব বা গণনেতা) ও তাঁর পরিচালিত সম্প্রদায়; যে-সম্প্রদায়ের মানুষেরা প্রত্যেকেই তাঁদের নিজ নিজ শারীরিক, সামাজিক ও জাগতিক এই তিনটি অধিকারই[৩] তাঁদের শ্রেষ্ঠ সন্তান মহর্ষিকে 'সম্প্রদান' করে দিয়ে নিজেরা 'সম্প্রদায়ে' পরিণত হয়েছে।

আর, সেই গণনেতাদের স্বভাব ছিল এক কথায় অসাধারণ। সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে এঁদের 'মমতার বন্ধন' (ইমোশনাল বন্ডেজ) ছিল। এঁদের প্রত্যেকেরই গভীর বিশ্বাস তৈরি হয়েছিল যে, জ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) অর্জনই মানবজীবনের সর্বোৎকৃষ্ট অন্বিষ্ট এবং এঁরা 'অষ্টপাশ' থেকে মুক্ত ছিলেন।[৪] নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কল্যাণই তাঁদের জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। ধনসম্পদ, প্রতিপত্তি, অভিমান, এ সবে তাঁদের বিন্দুমাত্র মোহ ছিল না। তাই, আমাদের সেই প্রাচীন সমাজে এই শিবের এতই উচ্চ মর্যাদা ছিল যে, দেশের প্রকৃতিশক্তি এই শিবের কাছেই

বর চাইতেন, শিবের মতো বর চাইতেন। যে-কারণে আমাদের এই দেশকে 'শিবঠাকুরের দেশ' বলা হত। ... আর 'শিবের মতো মানুষ' বলতে কেমন মানুষকে বোঝায়, সেকালের লোকেরা তা স্পষ্ট জানতেন ও বুঝতেন। তার উত্তরাধিকার এখনও একালের বয়স্ক মানুষদের রয়েছে। তাঁরা কেউ কেউ এখনও কথায় কথায় বলেন, 'অমুকের মতো মানুষ হয় না, স্বয়ং শিব', কিংবা 'অমুক তো মানুষ নয়, সদাশিব।' অর্থাৎ, কেমন মানুষ হলে তাঁকে 'শিব' বলা যায়, ভারতীয়রা এখনও তাঁদের 'অব্যক্ত জ্ঞানে' তা বুঝতে পারেন। নেতা বলতে সেকালে আমরা এই শিবকেই বুঝতাম।

আর আজ? আজ নেতাকে জনসাধারণ ঘৃণা করেন। দেশের সেরা ছেলেমেয়েরা একালের গণনেতাদের বা রাজনৈতিক নেতাদের বক্তৃতা শুনে মুখ চেপে হাসে, তাঁদের সাধ্যমত এড়িয়ে চলে; যেন-বা রাজনৈতিক নেতার মতো নোংরা জীব আর হয় না! নিতান্ত প্রয়োজন বা বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়া রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন, এমন মানুষের সংখ্যা এখন খুবই কম। কেউবা এই নেতাদের দুর্বৃত্ত-মাস্তান বা ক্রিমিনাল ভাবেন এবং রীতিমত ভয় পান। গণনেতাদের প্রতি, এই ঘৃণা ও ভীতি এতদূর পর্যন্ত প্রসারিত যে, তাঁদের সম্পর্কে নিন্দামূলক অবিশ্বাস্য সব প্রবাদ ও গা-জ্বালানো খোশগল্প জনশ্রুতিতে স্থান করে নিচ্ছে। পরিস্থিতি এতই খারাপ যে, এ সময়ের প্রায় সমস্ত সংবাদপত্র ও আদালতগুলি এখন ক্রিমিনাল-গণনেতাদের নিয়েই ব্যতিব্যস্ত!

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, আমাদের সেই মহৎ সর্বমান্য চিরপ্রণম্য প্রাণের ঠাকুর গণনেতা মহেশ্বর শিব কোন ইতিহাসের পথ বেয়ে, কেমন করে এমন ঘৃণার্হ ক্রিমিনাল হয়ে গেলেন? সবচেয়ে বড় কথা, বর্তমান দুর্গতি থেকে আমাদের কি মুক্তি নেই? আমরা কি আমাদের শিবগুণসম্পন্ন মহৎ গণনেতাদের পুনরায় ফিরে পেতে পারি না? আমাদের দেশের হিরের টুকরো ছেলেমেয়েরা, জনসাধারণের শ্রেষ্ঠ সন্তানরা কেনইবা দেশ-পরিচালনার মতো মহত্তম কর্তব্যকে তাদের জীবনের স্বপ্ন রূপে আর ভাবতে চাইছে না? তাঁরা না গেলে সমাজশরীরের মস্তিষ্কে তো মন্দ-সত্তা উঠে গিয়ে বসে যাবে এবং সমাজের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটাবে? কী করলে পর আমরা সমাজশরীরের এই মস্তিষ্কবিকার ঠেকাতে পারি? কোনোভাবে কি জনসাধারণের শ্রেষ্ঠ সন্তানদেরকে শিবরূপে দেশ-পরিচালকের আসনে অভিষিক্ত করার উপায় বের করা যাবে না? কী করলে তারা এ বিষয়ে আগ্রহী হবে?

আদি গণনেতা ইতিহাসের কোন পথ বেয়ে কোথায় এসে পৌঁছেছেন?

ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির সাহায্যে বেদ-পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারতাদি পাঠের পর ভারতের যে-ইতিহাস জানতে পারা যায়, তার থেকে আমরা সেই আদি গণনেতাদের ক্রমবিবর্তনের সমগ্র ইতিহাসটাই বিস্তারিতভাবে জানতে পারি। তবে এই নিবন্ধের ছোট পরিসরে সেই বিশাল ইতিহাসে যাওয়া যাবে না। আমরা তাই সেই গণনেতার প্রথম 'অফিশিয়াল-অভিষেক'-এর উল্লেখটুকু করে বর্তমানে চলে আসব; দেখব এখন আমরা তাঁদের কী রূপে পাচ্ছি।

সবচেয়ে আদিম যে-সময়ের (খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০-র কাছাকাছি) যে-সমাজের খবর আমরা পাই, সেটি হল অজস্র জনগোষ্ঠী; যারা কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী এবং ইরাক থেকে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত সমগ্র বৃহৎ-ভারতবর্ষ জুড়ে বসবাস করছে। এই গোষ্ঠীসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক (আউটার রিলেশন) খানিকটা শিশুদের পারস্পরিক সম্পর্কের মতো, যে-শিশুদের মুখে তখনও আধো আধো বুলি; আর, ভিতরের অবস্থা — একদল পরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত এক-একটি সম্প্রদায়। আর, প্রতিটি সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরাই সেই সম্প্রদায়ের পরিচালক হত, তাদেরই সেকালের ভাষায় শিব, মহর্ষি, আদি-ব্রাহ্মণ ইত্যাদি বলা হত। পরিচালক ও সম্প্রদায়ের সম্পর্ক ছিল, খানিকটা একালের যৌথ-পরিবারের সঙ্গে সেই পরিবারের কর্তাস্বরূপ সংসার-সামলানো জ্ঞানীগুণী বড়ছেলের সম্পর্কের মতো; যে-কিনা নিজের কথা ভাববারই সময় পায় না। আর, এই সবটাই চলত খানিকটা অচেতনভাবে, অঘোষিতভাবে।

এর মধ্যেই প্রথম অঘটনটি ঘটে যায়। আজ যাকে গোবলয় বলা হয়, সেকালে যাকে 'সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর মধ্যবর্তী অঞ্চল' বলা হত, সেই অঞ্চলের সম্প্রদায়গুলি 'একই কর্মের পুনরাবৃত্তির' দক্ষনীতি গ্রহণ করে, এবং পূর্বতন শিবনীতি ত্যাগ করে। ফলত গোবলয়ে আর্যাবর্তের প্রতিষ্ঠা ঘটে যায় এবং বাকি সব দেশ ক্রমে অনার্য-দেশরূপে ঘোষিত হয়ে যায়। ভারতসমাজ তার সনাতন যুগ পেরিয়ে বৈদিক যুগে পা রাখে। এর ফলে ভারতের গোবলয়ে যে-বৈপ্লবিক পরিবর্তনগুলি ঘটে এবং পরে পরে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে, সেগুলি হল —

১. অজানা কাল থেকে চলে আসা সনাতন যুগের 'স্বভাবত' নির্বাচিত গণনেতা (মহর্ষি) বা আদি-ব্রাহ্মণ এবার নিজেদের বংশানুক্রমিক গণনেতা বলে ঘোষণা করে দেন। শ্রেষ্ঠ গণসন্তানকে 'সমাজ-পরিচালক' রূপে নির্বাচন করার স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক (ন্যাচারাল) প্রথাটি রুদ্ধ হয়ে যায়। নেতার ছেলে নেতা অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ, এই নিয়ম প্রচলিত হয়ে যায়। ফলত, সম্প্রদায়ের সদস্যরাও বংশপরম্পরায় 'সম্প্রদায়' হয়ে যায়।

২. এতকাল সম্প্রদায়ের প্রতিটি সদস্যের তিনটি অধিকারই[৩] মহর্ষিকে 'স্বভাবত' দিয়ে দেওয়া হত, সম্প্রদায়কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যার প্রয়োজন ছিল। এবার তা মহর্ষির বা ব্রাহ্মণের 'ন্যায্য-প্রাপ্য' বা অধিকাররূপে ঘোষিত হয়ে গেল। নতুন করে শাসনাধিকার দানের প্রয়োজন আর থাকল না। ব্রাহ্মণ চিরকালের জন্য তার অধিকারী হয়ে গেল।

৩. এতকাল ক্ষেত্র (জমি, নারী ইত্যাদি) পরিবর্তনশীল ছিল। এবার সম্প্রদায়ের বিশেষ এলাকাই কেবল তাদের বাসযোগ্য-চাষযোগ্য বলে সুনির্দিষ্ট হয়ে যায় না, স্ত্রীও বিশেষ পুরুষের বলে ঘোষিত হয়ে যায়। পিতৃতন্ত্রের সূত্রপাত হয়ে যায়। ....

আর্যাবর্তের এইরূপ প্রতিষ্ঠার পর, শুরু হয় বিরোধের যুগ। সম্প্রদায়গুলি মূলত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় — গোবলয়ের ভিতরের সম্প্রদায়গুলি বৈদিক এবং তার বাইরের সম্প্রদায়গুলি তান্ত্রিক। ক্রমে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রে সম্প্রদায়গুলি বিভাজিত হতে থাকে। রাষ্ট্রের জন্ম

হয়। বিরোধ বাড়তে থাকে। শুরুতে আদি-ব্রাহ্মণকে জগতের উপর সমস্ত মানুষের সমস্ত অধিকার দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেই অধিকার এক সময় কেড়ে নেওয়া হয়; পুনরায় সেই অধিকার উদ্ধার করে মহর্ষিকে 'পৃথিবী দান' করে দেওয়া হয়। মোট কথা, ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে, ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়ে অজস্র বিরোধ ঘটে এবং তার থেকে আদি গণনেতা বা ব্রাহ্মণের বৈদিক ও তান্ত্রিক এই দুটি গোষ্ঠীই ক্রমান্বয়ে অজস্র ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন --- বৈদিক ব্রাহ্মণ বা গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ, মৈথিলি-সারস্বত-কনৌজী-উৎকল, দাক্ষিণাত্য বৈদিক, পাশ্চাত্য বৈদিক, গুজরাটি-কর্নাটী-মহারাষ্ট্রীয়-অন্ধ্র-দ্রাবিড়, কুলীন-বারেন্দ্র-রাঢ়ী, শ্রোত্রীয়, কাশ্মীরী, এবং পীরালি, অগ্রদানী প্রভৃতি। ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্ররাও সেই বিরোধে জড়িয়ে পড়েন এবং ফলত তারাও অজস্র ভাগে বিভক্ত হয়ে যান। ...

আদি গণনেতাদের এই বিভাজন সত্ত্বেও একটি ক্ষেত্রে তাঁরা প্রায় সবাই একই অবস্থানে থেকে যান। তা হল — ব্রাহ্মণদের মানবজীবনের সর্বোচ্চ অন্বিষ্ট হল জ্ঞান, এই বিশ্বাসে অনড় থাকা। অর্থ-ক্ষমতা-প্রতিপত্তি-যশ ইত্যাদি সবই যেন তাঁদের কাছে 'সেকেন্ডারি'। যদিও এ কথা সত্য যে, ভারতসমাজ তার সমস্ত সম্পদ ও সমগ্র ভারতভূমি এই ব্রাহ্মণকে দান করে দিয়েছিল, তথাপি এই ব্রাহ্মণ সম্পত্তি সঞ্চয়ের দিকে খুব কিছু নজর দেননি। এমন বহু ব্রাহ্মণের ইতিহাস পাওয়া যায়, যাঁরা রাজার দেওয়া বিশাল ভূসম্পত্তি অবহেলাভরে ত্যাগ করে দেশত্যাগ করতেও দ্বিধা করেননি। অনেকে আবার মুসলমান রাজা কিংবা ব্রিটিশ রাজা, কোনো রাজার দেওয়া অন্ন স্পর্শ করেননি। এমন 'অযাচী ব্রাহ্মণ'দের কথাও জানা যায়, যাঁরা দুর্ভিক্ষের সময়ও দান গ্রহণ করেননি, যাঁদের প্রাণ বাঁচাতে স্বাধীন ভারতের সরকারকে তাঁদের ব্রাহ্মণীদের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। (পাঠক এ ক্ষেত্রে দলাই লামা, আগা খাঁ, কিংবা পোপের সম্পত্তির সঙ্গে তুলনা করে দেখতে পারেন।)

তা সে যাই হোক — মোগল যুগের আগে পর্যন্ত আমরা দেখছি, ভারতসমাজের সমস্ত ভূমির অধিকারী এই ব্রাহ্মণ এবং বলতে গেলে সমস্ত অধিবাসীর জীবনযাত্রার নিয়ন্ত্রকও এই ব্রাহ্মণ। মোগল যুগে তাঁর সেই অধিকারের খানিকটা অবনমন ঘটলেও ব্রিটিশ যুগের আগে পর্যন্ত তাঁর অবস্থান কমবেশি অক্ষতই ছিল। কেননা মোগল-পাঠান যুগের প্রাক্কালেও ব্রাহ্মণরা সম্ভবত জানতেন তাঁদের হাতে কী রয়েছে, এবং সম্ভবত সেকালের ইসলামী পণ্ডিতদেরও তাঁরা সে কথা বোঝাতে সমর্থ হন।[৫] সেকারণে তাঁদের সম্মান কমবেশি অক্ষুণ্ণই থাকে। কিন্তু তারপর আরও পাঁচশো বছর কেটে যায়। বিস্মৃতি আরও ঘটে। ব্রিটিশ যুগে এসে দেখা যায়, ব্রাহ্মণরা তাঁদের নিজেদের ইতিহাসটাই গেছেন ভুলে। ব্রিটিশকে তাঁরা বোঝাতেই পারেন না, তাঁদের হাতে ঠিক কী রয়েছে। ম্যাক্সমুলার খানিকটা গন্ধ পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু ততদিনে ইতিহাসহারা-ব্রাহ্মণ রামমোহন রায় নিজেই এই ইতিহাসহারা-ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসলেন। এলেন আর এক ব্রাহ্মণ — বিদ্যাসাগর। তিনিও ব্রাহ্মণত্বের অর্থ-খোয়ানো এই ব্রাহ্মণদের এক হাত নিলেন। তারপর এলেন ইতিহাস-খোয়ানো ব্রাহ্মণ-মার্কসবাদীরা। ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে কোনোরকম বিষোদ্গার করতেই বাকি রাখলেন না তাঁরা। তবে আদি-ব্রাহ্মণদের

হাতে কী ছিল, ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি সম্যক না-জেনেও রবীন্দ্রনাথ তার খানিকটা অনুভব করতে পেরেছিলেন, এবং তখন পর্যন্ত ব্রাহ্মণরা তাঁদের ইতিহাসের প্রায় সবকিছু ভুলে গিয়ে কোথায় এসে পৌঁছেছেন, তাও বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি লিখেছেন —

'... আসল কথা, কোনো দেশের যখন দুর্গতির দিন আসে, তখন সে মুখ্য জিনিসটাকে হারায়, অথচ গৌণটা জঞ্জাল হইয়া জায়গা জুড়িয়া বসে। তখন পাখি উড়িয়া পালায়, খাঁচা পড়িয়া থাকে। আমাদের দেশেও তাহাই ঘটিয়াছে। আমরা এখনো নানাবিধ বাঁধাবাঁধি মানিয়া চলি, অথচ তাহার পরিণামের প্রতি লক্ষ নাই। মুক্তির সাধনা আমাদের মনের মধ্যে আমাদের ইচ্ছার মধ্যে নাই, অথচ তাহার বন্ধনগুলি আমরা আপাদমস্তক বহন করিয়া বেড়াইতেছি। ইহাতে আমাদের দেশের যে মুক্তির আদর্শ, তাহা তো নষ্ট হইতেছেই, য়ুরোপের যে স্বাধীনতার আদর্শ, তাহার পথেও পদে পদে বাধা পড়িতেছে। সাত্ত্বিকতার যে পূর্ণতা তাহা ভুলিয়াছি, রাজসিকতার যে ঐশ্বর্য তাহাও দুর্লভ হইয়াছে, কেবল তামসিকতার যে নিরর্থক অভ্যাসগত বোঝা তাহাই বহন করিয়া নিজেকে অকর্মণ্য করিয়া তুলিতেছি। অতএব এখনকার দিনে আমাদের দিকে তাকাইয়া যদি কেহ বলে, ভারতবর্ষের সমাজ মানুষকে কেবল আচারে-বিচারে আটে-ঘাটে বন্ধন করিবারই ফাঁদ, তবে মনে রাগ হইতে পারে কিন্তু জবাব দেওয়া কঠিন। পুকুর যখন শুকাইয়া গেছে, তখন তাহাকে যদি কেহ গর্ত বলে, তবে তাহা আমাদের পৈতৃকসম্পত্তি হইলেও চুপ করিয়া থাকিতে হয়। আসল কথা, সরোবরের পূর্ণতা এককালে যতই সুগভীর ছিল, শুষ্ক অবস্থায় তাহার রিক্ততার গর্তটাও ততই প্রকাণ্ড হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষেও মুক্তির লক্ষ্য যে একদা কত সচেষ্ট ছিল, তাহা এখনকার দিনের নিরর্থক বাঁধাবাঁধি, অনাবশ্যক আচার-বিচারের দ্বারাই বুঝা যায়। ...'[৬]

হ্যাঁ, আমাদের রিক্ততার গর্তটা খুবই বড়। এই গর্তটার বিশাল আকার থেকেই বোঝা যায়, যখন তা স্ফটিকস্বচ্ছ জলে, ফুলে-ফুলে হাঁসে-পাখিতে-মাছে ভরা বিশাল সরোবর ছিল, সেটি কত বড় ছিল, প্রাণবন্ত ছিল। সেই সজীব সরোবরের প্রকৃত স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনন্য প্রতিভার জোরে 'অনুভব' করতে পেরেছিলেন। শুকনো গর্তটিকেই সরোবর বলে চালানোর বোকামি রবীন্দ্রনাথ করেননি। সেই কারণে রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ধরে প্রাচীন ভারতীয় মানস-ঐশ্বর্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থেকেছেন এবং সমকালে সেই ঐশ্বর্যের মৃত উত্তরাধিকারের ফলিত প্রয়োগের নিন্দা করে গেছেন।

এ দিকে ভারতের সকল নাগরিকের কাছ থেকে তাঁদের তিনটি অধিকার যাঁরা নিয়েছিলেন, ব্রিটিশ যুগে পৌঁছে তাঁরা সেই 'মহত্তম' দানের কথাই যখন ভুলে গেলেন, তখন আর তাঁদের কীই-বা করার থাকে! তাই তাঁরা নতুন পথ নিলেন। 'জ্ঞানের সর্বোৎকৃষ্টতা' বিষয়ে বিশ্বাসটি তাঁদের তখনও অটুট ছিল, যে-কারণে তাঁরা বাহ্যসম্পদ সংগ্রহে মন দেননি। এখন অতীত ভুলে তাঁরা চললেন আধুনিক জ্ঞানের সন্ধানে। আধুনিক পৃথিবীতে যা-কিছু সজীব পাওয়া যায়, তাই তাঁরা সংগ্রহ করতে লাগলেন। ফলত, ভারত স্বাধীন হওয়ার ঠিক পরবর্তীকালে আমরা দেখছি, পশ্চিমবাংলার কায়স্থ মুখ্যমন্ত্রী বাদে ভারতের সমস্ত প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীই

ব্রাহ্মণ। কেবল তাই নয়, ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতায়, শিক্ষায়, আদালতে, সরকারি প্রশাসনের প্রায় সমস্ত উচ্চপদে আপন-ইতিহাসহারা এই ব্রাহ্মণই আসীন। এবং এখনও পশ্চিমবাংলায় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, সূর্যকান্ত মিশ্র, সুভাষ চক্রবর্তী, এবং লোকসভার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় — এঁরা সবাই সেই ইতিহাসহারা কিন্তু আধুনিক ব্রাহ্মণই বটে। অথচ জনসংখ্যায় জাতি রূপে ব্রাহ্মণের পরিমাণ অত্যন্ত কম; সেই হিসেবে সমাজের উপরিতলে এঁদের অনুপাত অনেক অনেক বেশি। আর সেটি হবে নাই বা কেন! পৃথিবীর যে-কয়টি জাতি — পশ্চিম এশিয়ার ইহুদি, উত্তর-পূর্ব এশিয়ার মান্দারিন, মধ্য এশিয়ার মুতাজিলা, এবং ভারতের ব্রাহ্মণ — বিশ্বের জনসংখ্যায় এঁদের প্রত্যেকের অংশ অতি সামান্য, অথচ বিশ্বসমাজের উপরিতলে এঁদের অনুপাত অনেক অনেক বেশি। এবং একটিই তার কারণ। কলম তরোয়ালের চেয়ে শক্তিধর, জ্ঞানই মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট অন্বিষ্ট — এই আদি বিশ্বাস এখনও এঁদের রক্তে, ভিনে, পারিবারিক আচারে-অভ্যাসে আজও কমবেশি প্রবাহিত।

কিন্তু তাই বলে তাঁরা সবাই এখন আর 'আদি-গণনেতা'র বা 'আদি-ব্রাহ্মণের' আধুনিক ভূমিকায় দেশ-পরিচালনা করতে যান না, কেউ কেউ যান। এখনকার গণনেতাদের অনেকেই অন্য বিভিন্ন জনগোষ্ঠী থেকে আসেন। কাজেই এখনকার গণনেতাদের ভিতরে 'জাতিতে ব্রাহ্মণ' ছাড়াও বিভিন্ন জাতির মানুষজন রয়েছেন। হতে পারে, তাঁরা নিজ নিজ জনগোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠ সন্তান। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, যে-ব্রাহ্মণেরা এখনও গণনেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, তাঁরা আদি গণনেতার বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারী। সেই 'গণনেতাগিরি'র উত্তরাধিকারের কথা তাঁরা নিজেরা ভুলে গেলেও, তাঁদের অভ্যাসে-আচারে সেই উত্তরাধিকারের কিছু কিছু কণা এখনও থেকে গেছে। কখনও তা রিক্ত-সরোবরের গর্তের পক্ষে সক্রিয় হয়, কখনো-বা সজীব-সরোবরের স্বাভাবিক অভ্যাসের উত্তরাধিকারেই সক্রিয় হয়। তাই একালে এই ব্রাহ্মণকে গণনেতা-রূপে সক্রিয় হতে যখন দেখি, তখন বহু ক্ষেত্রে তাঁকে বিস্মৃত-ব্রাহ্মণত্ব বা অন্য কোনো প্রকার রিক্ত-গর্তের মৌলবাদী চিন্তার মিথ্যা গৌরবের পক্ষে চিৎকার করতে দেখি; অথবা কখনো তাঁকেই দেখি, বিস্মৃত-অতীতকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করে দেশী বিদেশী যে-কোনো সজীবতাকে সাধ্যমত আত্মস্থ করে নিয়ে একেবারে নতুন কথা বলতে। ফলে, এঁদের ভিতরে মন্দ ও ভাল, দুরকম গুণাগুণই দেখতে পাওয়া যায়।

অতএব দেখা যাচ্ছে, আদি গণনেতা মহর্ষির উত্তরাধিকারীরা অতীত ভুলে 'পৃথিবীর মালিকানা' হারিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছেন এবং অনেকেই শিবগুণ হারিয়ে ফেলেছেন। এঁদেরই কেউ কেউ এখনও নতুন করে গণসম্মতি নিয়ে পুনরায় গণনেতার আসনে বসেন। তাঁদের কেউ কেউ নস্টালজিয়ায় ভোগেন, কেউ-বা নতুন অর্জন করে নিয়ে সৃজনশীল ভাল কাজও করেন। কিন্তু একালের যে-গণনেতাদের সঙ্গে তাঁরা একত্রে কাজ করেন, তাঁদের কেউ কেউ এখন ক্রিমিনাল পদবাচ্য হয়ে গেছেন। ফলে গণনেতার সমগ্র সত্তাটির গায়ে বা একালের শিবঠাকুরের গায়ে কলঙ্ক লেগে গেছে, একালের শিব ক্রিমিনাল পদবাচ্য হয়ে গেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল — তা সম্ভব হল কেমন করে?

একালের শিবঠাকুরকে ক্রিমিনাল বানানো হল কেমন করে?

এই দুষ্কর্মটি আমরা করেছি প্রধানত চারটি উপায়ে। ১) ভারতের মানসলোকে ইয়োরোপীয় দর্শনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে; ২) ইয়োরোপ থেকে আনা গোপন আনডকুমেন্টেড ভোটপ্রথার মাধ্যমে; ৩) ইয়োরোপ থেকে আনা পার্টি বা দল-প্রথার মাধ্যমে; ৪) ইয়োরোপ থেকে আনা শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে। আরও কিছু খুচরো উপায়ও ব্যবহার করা হয়েছে, তবে সে-প্রসঙ্গে আজ আমরা যাব না।

১) ইয়োরোপীয় দর্শন

প্রত্যেক মানুষের একটি না একটি দর্শন থাকেই, তা সে যত মূর্খই হোক। আমাদেরও ছিল — অধ্যাত্মবিদ্যা। সে-ছিল সর্বদর্শনের পিতামহ। কিন্তু তার মর্ম তো আমরাই ভুলে গিয়েছিলাম। বুদ্ধি খাটিয়ে 'অধ্যাত্মবিদ্যা'র মানে করেছিলাম 'religious study'। এর পেছনে বাধ্যবাধকতাও ছিল। যে ভাষায় অধ্যাত্মবিদ্যার সবকথা লিখে রেখেছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষেরা, সে ভাষা বুঝবার কৌশলই ভুলে গিয়েছিলাম। রবীন্দ্রনাথ আপন প্রতিভাবলে সেই অধ্যাত্মবিদ্যাকে আত্মস্থ করে সে বিষয়ে লিখে গেলেন বটে, কিন্তু লিখতে বাধ্য হলেন এমন সব শব্দের সাহায্যে, যেগুলির অর্থ একালের মানুষ ভুলে গেছেন। যেমন — আত্মা, পরমাত্মা, পাশ, অমৃত, ব্রহ্ম, মোক্ষ ইত্যাদি। সেই অধ্যাত্মবিদ্যার তুলনায় দর্শন তো নিম্নস্তরের জ্ঞান। তাই, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোনো বইতে 'ভারতীয় দর্শন' 'আমাদের দর্শন' বা 'প্রাচ্য দর্শন' এরকম কোনো রচনাই লেখেননি; কিন্তু অজস্র প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখে গেছেন 'অধ্যাত্মবিদ্যা', 'আত্মা', 'মানুষের ধর্ম', 'ধর্মের অধিকার' ইত্যাদি নামে, এবং এ-'ধর্ম' ঈশ্বরভিত্তিক রিলিজিয়নকে বোঝায় না। স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের সে-লেখাগুলি দুর্বোধ্য থেকে গেছে। ফলত, ইয়োরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত 'কনডিশনড্' মানুষেরা ইয়োরোপীয় দর্শনকেই বসিয়ে দিলেন ভারতের অ্যাকাডেমিগুলির মর্যাদার আসনে। কিনা, দর্শন দুই প্রকার — ভাববাদ ও বস্তুবাদ! মানুষের জীবনের সঙ্গে তার যে-ওতপ্রোত সম্পর্ক সেটাই কেটে দেওয়া হল।[৭]

অবশ্য বহুকালক্রমাগত পরম্পরাগত 'আধ্যাত্মিক' ('রিলিজিয়াস' নয়) শিক্ষা আমাদের সমাজে তারপরও ছিল। কিন্তু সমাজে শাসক হয়ে দেখা দিলেন অ্যাকাডেমিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথের উত্তর প্রজন্ম। আমাদের অতীত-শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটাই তাঁরা তাঁদের চিন্তা থেকে বাদ দিয়ে দিলেন। তা হল — মানুষের অস্তিত্বের তিন ভাগ হল মন, এক ভাগ মাত্র দেহ। কোনো মতে খাদ্য-বস্ত্র-আবাসের ব্যবস্থাটুকু হয়ে গেলেই মানুষ মনের খোরাক চায়। আর সেই চাওয়াটাই মানুষের অস্তিত্বের পক্ষে সবচেয়ে বড় চাওয়া। মন-মাঝিই (মানবমনটিই) যদি না-বাঁচে তো তার নৌকা (মানবশরীর) বাঁচিয়ে রেখে কী লাভ! পাখির জন্য খাঁচা, না খাঁচার জন্য পাখি? তবে হ্যাঁ, নৌকাটিকে (মানবশরীরকে) টিকিয়ে রাখতে না পারলে, মাঝিসুদ্ধ নৌকা ডুবে যায়।

ইয়োরোপ শেখাল — মন-মাঝি আবার কী বস্তু! নৌকাটাই আসল, যা দেখা যায়, সেটিই

বস্তু। মন দেখা যায় না। নৌকাটি টিকে থাকলেই সব থাকবে। ইয়োরোপ সোনার নৌকা বানানোর প্রতিযোগিতায় সবাইকে নেমে পড়তে বলল। আমরাও সেই প্রতিযোগিতায় নেমে পড়লাম। আমাদের পুরুষানুক্রমে অভ্যস্ত পথ থেকেই সরে গেলাম। আমরা শরীরের সেবাদাস হয়ে গেলাম।

এমতাবস্থায় যা হতে পারে, তাই হল। গণনেতা নির্বাচনের সময় আমরা দেখতে লাগলাম, কে আমাদের নৌকার সমৃদ্ধির কথা বলছে, আমাদের ভাত-কাপড়ের কথা বলছে। আমাদের মনের কথা কেউ বললে, আমরা তাঁকে পাত্তা পর্যন্ত দিলাম না। ফলত যিনি ব্রহ্মগুণসম্পন্ন হন, ব্রহ্মবিহারী হন; সেরকম শিবত্ববান-প্রার্থী কেউ থাকলেও তিনি অচিরে দেখতে পেলেন তাঁর কথা বিকোচ্ছে না। একমাত্র নীচে নেমে, পচা শরীর ও সেই শরীরের সুখের কথা বললে তবে লোকে তাঁর কথা শুনছে। অগত্যা শিবের নিম্নশিব হওয়ার রাস্তাটি ক্রমশ খুলে যেতে লাগল।

২) ইয়োরোপীয় ভোটপ্রথা

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হল। কিন্তু এই গণতন্ত্র তো আমাদের নিজস্ব নয়, একে আমরা আনলাম ইয়োরোপ থেকে। ইতিহাস ভুলে যাওয়ার ফলে জানলামই না যে, এই স্ব-শাসন প্রক্রিয়াটিই মানুষের আদি স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া, এবং ভারত শিবঠাকুরের জন্ম দিয়ে অতি প্রাচীনকালেই তা প্রয়োগ করতে শিখে গিয়েছিল। কিন্তু আমাদের সেই আদি গণনেতারা বৈদিক যুগের সূত্রপাতের পর 'বংশানুক্রমিক পুনরাবৃত্তি'র নীতি ঘোষণা করে চিরকালের জন্য নির্বাচিত হয়ে গিয়েছিলেন; মিলিটারি শাসকদের মতো পুনরায় আমাদের নির্বাচনের তোয়াক্কা করেননি। এবং তার ফলে সেই আদি কালে আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাঁদের যে-সর্বাধিকার[২] সম্প্রদান করে বসেছিলেন, তা সেই আদি গণনেতাদের হাতেই থেকে গিয়েছিল। স্বাধীনতা লাভের পর দেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সেই সর্বাধিকার বিনা ঘোষণায় ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়। তাঁরা তা জানতেও পারেননি, তাই বিরোধিতাও করেননি, কারণ তাঁরা তো ভুলেই গিয়েছিলেন কী ছিল তাঁদের হাতে। যাই হোক, এর ফলে এখন আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের পুনরায় দেশ-পরিচালনার জন্য নির্বাচিত করতে পারি। এমন হতেই পারে যে, সেই শ্রেষ্ঠ সন্তানদের ভিতর একালের বামুনের ছেলেও থাকতে পারে। থাকতে পারে অন্য যে কেউ।

কিন্তু নির্বাচন-প্রক্রিয়াটিও তো আমরা এনেছি ইয়োরোপ থেকে। আর সেই প্রক্রিয়াটি এক কথায় সর্বনাশা। তার সর্বনাশা নিয়মটি হল, ভোটের (বা লিখিত সমর্থনের) মাধ্যমে গণ-সন্তানের জন্ম দিয়ে তার মা-জনতা আত্মগোপন করবে, কুন্তীর মতো। গণসন্তান যেন জানতে না-পারে কে কে তাঁকে (শক্তি দিয়ে সমর্থন দিয়ে) ভোট দিয়ে জন্ম দান করেছেন। আবার গণমাতার কাছেও যেন কোনো লিখিত প্রমাণপত্র না থাকে, কে তাঁর সমর্থন নিয়েছেন। এরকম একটি ভয়ানক সর্বনাশা নিয়ম কীভাবে প্রচলিত হয়ে গেল, তা ভাবতেও অবাক লাগে।

এর অনিবার্য ফল হয়েছে মারাত্মক। গণমাতার সঙ্গে গণসন্তানের রবীন্দ্রকথিত 'মমতার বন্ধন' বা 'ইমোশনাল বন্ডেজ'-এর সম্বন্ধটিই কেটে দেওয়া হল। অথচ ভারতের আদি গণসন্তান শিবের জন্মের ক্ষেত্রে 'মমতার বন্ধন'টি ছিল এক নম্বর শর্ত। তখন প্রকাশ্যে মৌখিক সমর্থনের রীতি ছিল, এবং লোকে অসত্যভাষণ করত না। (বহু পরে এথেন্সেও এই জিনিস দেখা যায়।) এরকম সরাসরি নির্বাচনের ফলে গণসন্তানের সঙ্গে জনগণের আবেগের বন্ধন থাকে। গোপন ও ডকুমেন্টহীন ভোটের মাধ্যমে সেই 'আবেগের বন্ধন' কেটে দেওয়া হল। ফলে গণসন্তান ও মা-জনতার সম্পর্ক হয়ে যায় কর্ণ-কুন্তী সংবাদের এক আধুনিক কাহিনী। বিপদে পড়লে, না গণনেতা তাঁর ভোটারের কাছে গিয়ে তাঁর বিপদের কথা বলতে পারেন; না কোনো ভোটার বিপদে পড়ে গণনেতার কাছে গিয়ে তাঁর বিপদের কথা বলতে পারেন; কারণ কারও কাছেই তো সমর্থন লেনদেনের কোনো ডকুমেন্ট নেই। 'তোমাকেই সর্বাধিকার দিয়েছিলাম' বললে কে বিশ্বাস করবে? 'আপনারাই তো আমাকে নির্বাচিত করে ওই কাজটি করতে বলেছিলেন, সেটি করতে গিয়েই তো ফ্যাসাদে পড়েছি'— একথা বললেই বা গণনেতার কথা শুনছে কে? ডকুমেন্ট কই? ভারতীয় ভাষায় বললে, এই গোপন-ভোট প্রক্রিয়া মহামায়ার সঙ্গে তাঁর সন্তানের নাড়ির সম্বন্ধটিই কেটে দিল। ফলে না মা পেল সন্তানসুখ, না সন্তান পেল মাতৃস্নেহ। অনাথ শিশুর নষ্ট হয়ে যাওয়াই এইরূপ 'অফিশিয়ালি' নির্বাচিত গণসন্তানের একমাত্র ভবিতব্য হয়ে গেল।

তা ছাড়া হবে নাই বা কেন! 'অফিশিয়ালি' নির্বাচিত গণনেতাকে এমনভাবে নির্বাচন করা হয়, যেন ভোটার নিজের নাম গোপন করে আন্ডারওয়ার্ল্ডের খুনিকে সুপারি দিচ্ছে — যাও, তোমাকে আমরা আমাদের সমাজশাসনের ক্ষমতা দিলাম, স্বর্গসুখ ভোগের অধিকার দিলাম, ব্ল্যাংক-চেক দিলাম; পরিবর্তে তুমি আমাদের অহিতবিনাশের জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিয়ে দিয়ো। (কারণ, অহিতগুলি ভয়ঙ্কর, তাদের আমরা ভয় পাই, আমরা নিজেরা তাদের বিনাশ করব কী, তাদের বিনাশ করতে চেয়েছি এ কথা বলতেই ভয় পাই এবং আমরা এতই কাপুরুষ যে, আমরাই তোমাকে অহিতবিনাশ করতে বলেছি, সে কথা অহিতগুলি যেন জানতে না পারে; তাই আমাদের পরিচয় পর্যন্ত তোমাকে দিই না! তুমি কিন্তু সৎ থেকো।) কথার খেলাপ কোরো না। লঙ্কায় গিয়ে রাবণ হোয়ো না। অর্থাৎ, গণনেতা তার নিজের পরিবার-পরিজনকে ভুলে আমাদের অহিতবিনাশের জন্য জীবন দেবে, প্রাণ দেবে; কিন্তু সে বিপদে পড়লে আমরা তাঁর জন্য কুটোটি নাড়ব না, এমনকী আমরা তাঁকে আমাদের পরিচয়টুকুও দেব না, কেবল সুখভোগের লোভ দেখাব। আবদারই বটে!

ফল যা হওয়ার তাই হল। গণসন্তানের সামনে ক্রিমিনাল হওয়ার রাস্তাটি হাট করে খুলে দেওয়া হল। কাকে ভোট দিয়েছি, সে কথা যদি প্রকাশ্যে বলতে না-পারি, গণসম্মতি লেনদেনের ডকুমেন্ট যদি দু পক্ষের কারও কাছেই না থাকে, দেশনেতার জন্মদানকালেই তো পাপটা হয়ে গেল। এইবার সেই দেশনেতা যদি পরবর্তী পাপগুলি করে, তাকে দোষ দিয়ে কী লাভ। সত্যগোপনের সূত্রপাত তো আমিই করেছি। নন-ট্রান্সপারেন্সির সূত্রপাত তো আমিই করেছি।

এবার সমগ্র প্রশাসনে যদি অস্বচ্ছতা দেখা দেয়, তার দোষ কার? চালাকির দ্বারা কি ভাল কাজ হতে পারে? এখনও, একালের এই 'অফিশিয়ালি' নির্বাচিত সমস্ত গণনেতা যে সব্বাই সম্পূর্ণ ক্রিমিনাল হয়ে যাননি, তার জন্যই তাঁদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

৩) পার্টি বা দল প্রথা

ইয়োরোপীয় বদবুদ্ধিগুলির মধ্যে আর একটি সর্বনাশা বস্তু হল এই পার্টি-প্রথা। গণসন্তান তাঁর কাজের জন্য তাঁর মাতা-জনগণকে কৈফিয়ত দেন। কিন্তু পার্টিনেতা কাউকে কৈফিয়ত দেন না। অতি সৎ পার্টিনেতার পক্ষেও অসৎ হওয়ার সমস্ত পথই খোলা থাকে। তাঁর কাজের বিচার করবে কে? যাঁদের তিনি বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করেন, শাসন করেন, চালনা করেন, নির্দেশ দেন, পার্টির সেই বশংবদ সদস্যরা? তাঁরা কৈফিয়ত তলব করলেও তাতে নির্বাচকদের ভালমন্দের ইতর-বিশেষ হওয়ার কোনো কারণ নেই। তা ছাড়া, স্বশাসনের জন্য ভোটার নিজের অধিকার ভোটপ্রার্থীকে দেন। যা-কিছু সম্পর্ক, তা নির্বাচক ও প্রার্থীর মধ্যেকার সম্পর্ক; মায়ের সঙ্গে ছেলের সম্পর্ক। এর মধ্যে তৃতীয় পক্ষ আসে কেন? এলে ক্ষতি বই লাভের কি কোনো সম্ভাবনা থাকে? আমরা জানি, মা-ছেলের বা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি ঢুকলেই সমস্যা তৈরি হয়, দু-পক্ষের জীবনেই অন্ধকার নেমে আসার পথ খুলে যায়। পার্টি যদি অতি সৎ মানুষদেরও হয়, নির্বাচক ও নির্বাচিতের সম্বন্ধের ভিতরে যে-জায়গাটায় পার্টি পা রাখে, সেই জায়গাটিতে পার্টির দখল কোনো কারণে একটুখানি শিথিল হয়ে গেলেই সেই ফাঁকা জায়গায় ঢুকে পড়ে ধূর্ত ফড়ে-দালাল। অচিরে দেখতে পাওয়া যায়, কোনো টাকার কুমীরের কাছে নিজের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে গণনেতা বিক্রি হয়ে গেছেন। আর যদি তিনি খুবই সৎ গণনেতা হন, মা-ছেলের সম্বন্ধের ভিতরে ওই ফাঁকটুকু রাখার খেসারত তাঁকে দিতে হয় কোনো না কোনো ফ্যাসাদে পড়ে।

তা ছাড়া, গণসন্তানকে এমনিতেই সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা ও নির্বাচকদের প্রতি দায়বদ্ধতা, এই দুটি দায়বদ্ধতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হয়। কেননা, নির্বাচকদের প্রতি দায়বদ্ধতা তিনি মাথা পেতে নিয়েছেন, সে তাঁর নিজস্ব দায়। আর সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা হল আসলে সমগ্র দেশের মোট জনগণের যে-সমাজ, তার প্রতি দায়বদ্ধতারই একটি রূপ। অনেক সময়ই নির্বাচিত গণনেতার নিজস্ব আঞ্চলিক (কনস্টিটুয়েন্সির প্রতি) দায়বদ্ধতার সঙ্গে সাংবিধানিক দায়বদ্ধতার টক্কর লেগে যায়। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তাঁকে এই ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হয়। প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধনের চেষ্টা করতে হয়। অর্থাৎ তাঁর 'লয়ালটি' এমনিতেই দ্বিখণ্ডিত — আঞ্চলিক লয়ালটি ও টোটাল লয়ালটি। এর মধ্যে যদি আবার দলের প্রতি লয়ালটি ঢুকে যায়, তাহলে সেই গণসন্তান যায় কোথায়! তা ছাড়া, দল কে? তার সঙ্গে জনসাধারণের সম্পর্ক কী? সে সম্পর্কের বন্ধন কোথায়? বন্ধনহীন কোনো সম্বন্ধ এই পৃথিবীতে হয় না। অথচ গণসন্তানের সঙ্গে গণমাতার দ্বৈতাদ্বৈত সম্বন্ধে 'পক্ষ' না হয়েও দল নাক গলায়! ভারতের শাসকদের বিগত ৫০ বছরের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, দলের জন্যই কোনো কোনো গণসন্তান ক্রিমিনালের খাতায় নাম লিখিয়েছেন।

৪) ইয়োরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থা

ইয়োরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থার মডেল ভারতে এনে অ্যাকাডেমিগুলি গড়ে উঠল। এমন ধারণা তৈরি করা হল যে, এই অ্যাকাডেমিগুলিতে লেখাপড়া না-শিখলে কেউ মানুষ হয় না। এই ভুল বিশ্বাসে ভারতসমাজ ক্রমে বিশ্বাসী হয়ে উঠল। যদিও, গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথ বিষয়টি বুঝে গিয়েছিলেন, এবং তাঁরা এই ভুল বিশ্বাসের তীব্র বিরোধিতা করে গেছেন। গান্ধী পরিষ্কার বলে দিলেন, (ইস্কুল-কলেজে গিয়ে) 'লেখাপড়া না-শিখলে জীবন বৃথা, এটা একটা কুসংস্কার মাত্র।' আর, রবীন্দ্রনাথ তো কোনোদিন ইস্কুলেই গেলেন না। আজ আমরা সবাই জানি, ভারতের 'শিক্ষিত মানুষ'দের যদি কোনো তালিকা তৈরি করা হয়, তার এক নম্বরে রবীন্দ্রনাথের নাম লিখলে ভুল হবে না। চোখের সামনে সেই রবীন্দ্রনাথ থাকা সত্ত্বেও, আমরা আমাদের সব ছেলেমেয়েকে বাধ্যতামূলকভাবে ইস্কুলে পাঠিয়ে স্বশিক্ষিত মানুষের (শিবের) উৎপত্তির পথটিই কেটে দিয়েছি। অথচ দেখা দরকার ছিল, যারা ইস্কুলে গিয়ে কিছুতেই 'কনডিশনড্' হতে চাইছে না, তারা ইস্কুল-কলেজে না-পড়তে চায়, নাই পড়ুক, তারা নিজেরা নিজেদের পছন্দ মতো স্বশিক্ষিত হয়ে উঠুক — সমাজে এই কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে রাখা উচিত ছিল। কেননা, প্রচলিত শিক্ষা দুরকম ছেলেমেয়েদের ভাল লাগার কথা নয় — যারা এই অ্যাকাডেমিক শিক্ষার চেয়ে উচ্চতর মানসিকতা নিয়ে জন্মেছে, এবং যারা এই শিক্ষার চেয়ে অতি নিম্ন মানসিকতা নিয়ে জন্মেছে। এরা দু-দলই তাই প্রচলিত শিক্ষায় নিজেদের 'কনডিশনড্' বা অভ্যস্ত করতে পারে না। এই অতি-নিম্ন মানের ছেলেমেয়েদের জন্য সমাজ উচ্চতর মনের ছেলেমেয়েদের বা শিবসম্ভবদেরও বধ করতে শুরু করে দিল; তাদের স্বশিক্ষিত হওয়ার রাস্তা ছেড়ে দিল না। রবীন্দ্রনাথের বাবা 'মহর্ষি' ছিলেন। তিনি তাঁর ছেলে ইস্কুলে যায়নি বলে কিছুই মনে করেননি। তাঁকে স্বশিক্ষিত হওয়ার সমস্ত সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু একালের গোটা বাঙালি সমাজ? একালের বাঙালি অভিভাবকেরা প্রায় আদাজল খেয়ে শিবসম্ভবদের উৎপত্তিই রুখে দিয়েছেন। মানুষের স্বশিক্ষিত হওয়ার পথটিই তাঁরা বন্ধ করে দিয়েছেন। তাঁরা অনিচ্ছুক ছেলেমেয়েদেরও ঘাড়ে ধরে অ্যাকাডেমির খাঁচায় পুরে দেন। তাও বেগড়বাঁই করলে নিয়ে যান মানসিক ডাক্তারের কাছে। আর মানসিক ডাক্তারও চিকিৎসা করতে লেগে যায়। যদিও ওই শিবসম্ভব-ছেলেদের অভিভাবক এবং ওই ডাক্তারকেই ডাক্তার দেখানোর প্রয়োজন বেশি।

কার্যত, মানুষের জীবনযাত্রা অতিবাহিত করার জন্য যে-পরিমাণ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, তা অ্যাকাডেমির আয়ত্তে নাই। অ্যাকাডেমি কেবলমাত্র 'ব্যক্ত-জ্ঞানের' (explicit knowledge-এর) কারবার করে এবং আজ পর্যন্ত 'প্রয়োজনীয় জ্ঞানের' যে-অংশটুকু ব্যক্ত-জ্ঞানে রূপান্তরিত করা গেছে, তার পরিমাণ অতি অল্প, এবং কিছুতেই পাঁচ শতাংশের বেশি নয়। সেটুকু নিয়েই অ্যাকাডেমির সমস্ত কারবার। যে-বিশাল পরিমাণ অব্যক্ত-জ্ঞান (tacit knowledge) মানুষ প্রকৃতিগতভাবে অর্জন করে তার সাহায্যে জীবনযাত্রা অতিবাহিত করে, সেই অংশে অ্যাকাডেমি আজও সম্পূর্ণ অন্ধ। যে উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্রছাত্রীরা রাজনীতি করতে চান না বলে জানিয়েছেন, তাঁরা কীভাবে জানলেন একালের গণনেতা হওয়া ভাল

নয়? জানলেন ওই অব্যক্ত-জ্ঞানের সাহায্যেই। তারই সাহায্যে তরুণ-তরুণীরা বুঝে যান, এই লোকটি ভাল, ওই লোকটি বিপজ্জনক। এবং সবচেয়ে মূর্খ মানুষও টের পেয়ে যায়, গ্রাম উদ্ধার করতে আসা নকশালদের বা 'স্বনির্ভরতা গোষ্ঠী'র কে ভাল আর কেইবা মন্দ। এই অব্যক্ত-জ্ঞানের অঙ্ক অ্যাকাডেমির কোনো স্ট্রিমেই শেখানোর ব্যবস্থা নেই। অথচ এই অঙ্কটি যে সমাজে খুবই সক্রিয়, ছাত্রছাত্রীদের সিদ্ধান্তই তার প্রমাণ। এরকম কত সিদ্ধান্ত যে মানুষ দিন-প্রতিদিন তার অব্যক্ত-জ্ঞানের সাহায্যে নিয়ে থাকে, তার হিসেব নেই।

প্রকৃতপক্ষে উত্তরসূরির শিক্ষার ক্ষেত্রে বৃষোৎপত্তির (শিবোৎপত্তির) পথ রুদ্ধ করে দিয়ে 'বিশ্বাণ্ড ছিন্ন'[৮] করে মানবসমাজকে 'বলদ'[৯] বানানোর বিদ্যাটি আবিষ্কার করা হয়েছিল ভারতেই। এর ফলে সৃজনশীল, উদ্ভাবক, আবিষ্কারক, স্বশিক্ষিত মানুষের উদ্ভবের পথটি কণ্টকাকীর্ণ হয়ে যায়। আধুনিক ভারত সেই ইতিহাস ভুলে গিয়ে ইয়োরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে অ্যাকাডেমির মাধ্যমে চালু করে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। এর ফলে ভারতে এখন শিবোৎপত্তি যতটুকু যা হয়, তা হয় ঘুরপথে, হয় কর্মজগতে, হয় রাজনীতি ক্ষেত্রে। অবশ্য সেই শিবেরা প্রায়শই আত্মস্বরূপ পূর্ণরূপে বুঝতে পারেন না; এবং সর্বোপরি সেই শিবদের সাধারণত সামাজিক সম্মান দেওয়া হয় না।

এঁরা রবীন্দ্রনাথের মতো একেবারেই ইস্কুল-কলেজে যান না, তা নয়। যান, হয়তো মাঝপথে ছেড়ে দেন, কিংবা কোনো একটি বিশেষ স্ট্রিমে দু-চারটি ডিগ্রিও সংগ্রহ করেন। কিন্তু বাস্তবে যখন সক্রিয় হন, তখন অ্যাকাডেমির বিদ্যাটি হয় ভুলেই যান কিংবা তাকে একেবারেই গুরুত্ব দেন না। নতুন করে স্বশিক্ষিত হতে থাকেন। এঁদের কেউ কেউ রাজনীতি ক্ষেত্রেও আসেন। একই ধারায় রবীন্দ্রনাথ রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু অশিবের দৌরাত্ম্য দেখে তিনি ১৯০৬ সালে রাজনীতি ক্ষেত্র ত্যাগ করেন। যিনি অ্যাকাডেমিতে অর্থনীতির চার পাঁচটি ডিগ্রি কামিয়ে এসেছেন, তিনি অর্থমন্ত্রী হলে, প্রচলিতকে ধরে রাখতে ভালই পারবেন সন্দেহ নাই; কিন্তু নতুন সৃজনশীল সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রায়শই ইতস্তত করবেন। কেননা অ্যাকাডেমিক বিদ্যা মানুষকে 'কনডিশনড' করে দেয়। অ্যাকাডেমি তাই ভাল অশ্ব (আমলা) তৈরি করতে পারে, সমাজের ধারকশক্তি বা প্রকৃতিশক্তি তৈরি করতে পারে, কিন্তু বৃষ (পথপ্রদর্শক-নেতা) তৈরি করতে পারে না। বৃষ হয় স্বশিক্ষিত। তার 'কনডিশনড' হলে চলে না। ইয়োরোপীয় শিক্ষা আমাদের বৃষ তৈরির পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। ফলে আমাদের অশ্ব আছে, কিন্তু পথপ্রদর্শক বৃষ নেই। মোট কথা, ইয়োরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের সমাজে শিশু-শিবদের মেরে ফেলার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করেছে।

ভারতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠ সন্তানকে, আমাদের সমাজকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, নির্বাচিত করার সুযোগ ফিরে পেয়েছি। কিন্তু ইয়োরোপের এই চার পাপ আমাদের সমস্ত সদিচ্ছাকেই ধ্বংস করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তবে এখনও সময় আছে। অবিলম্বে ওই চার পাপকে স্খালন করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

প্রাণের ঠাকুর শিবঠাকুর কোন পথে ফিরে আসবেন?

যে-পথে গণনেতাকে ক্রিমিনাল বানানো হয়েছে, যে-পথে তাঁদের শিবত্ব নাশ করা হয়েছে, সেই পথ ধরেই শিবঠাকুর ফিরবেন।

অধ্যাত্মবিদ্যায় মানুষকে অত্যন্ত বড় করে দেখা হয়। বলা হয়, সে পৃথিবীর চেয়েও বড়। সে নেহাত যদি ছোট ছোট দাবি করে বসে, দুমুঠো অন্ন, পরণের পরিধান চেয়ে বসে, সে তার সাময়িক সমস্যা মাত্র। শেষ বিচারে সে ওসব কিছুই চায় না, সে তার মনের শান্তি চায়, তৃপ্তি চায়, ব্রহ্মলাভ করতে চায়; কিন্তু বোঝো না যে সে আসলে ওইগুলিই চায়। তাই বলে তাকে সে সব না দিয়ে, অমৃত না দিয়ে, বোকার মতো সে তেলেভাজা চাইছে বলে তাকে তাই সরবরাহ করার কথা যেন আমাদের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা না ভাবেন। আমাদের শ্রেষ্ঠ সন্তান যেন 'মানুষকে দুর্গম পথে ডাকেন ... মানুষকে শ্রদ্ধা করেন। ... মানুষকে দীনাত্মা বলিয়া অবজ্ঞা না করেন।' কারণ 'বাহিরে ... মানুষের যত দুর্বলতা যত মূঢ়তাই' দেখা যাক, 'তবুও ... যথার্থত মানুষ হীনশক্তি নহে — তাহার শক্তিহীনতা নিতান্তই একটা বাহিরের জিনিস; সেটাকে মায়া বলিলেই হয়।' এই জন্য তাঁরা যেন, 'শ্রদ্ধা করিয়া মানুষকে বড়ো পথে ডাকেন', যাতে 'মানুষ সত্যকে চিনিতে পারে, মানুষ নিজের মাহাত্ম্য দেখিতে পায় এবং নিজের সেই সত্যস্বরূপে বিশ্বাস' করতে পারে। আমাদের যে-গণসন্তান এইভাবে আমাদের দেখবেন, তাঁকেই আমরা আমাদের পরিচালকের দায়িত্ব দেব। তাতে নিম্নশিব আর নিম্ন থাকতেই পারবেন না।

হ্যাঁ, আমাদের শ্রেষ্ঠ সন্তানকে আমরা আমাদের সমাজ-পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত করতে চাই। এবং তার সঙ্গে কোনো চাতুরি করতে চাই না। এমন ব্যবস্থা করতে চাই, আমরা কে কে তাকে সমর্থন করি, তার ডকুমেন্টেড-এভিডেন্স যেন তার কাছে থাকে; এবং সেও যে আমাদের সমর্থন নিয়েছে, তার ডকুমেন্টেড-এভিডেন্স যেন আমাদের কাছেও থাকে। পরস্পরের বিপদে আমরা যেন পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে যেতে পারি।

আর সেই ডকুমেন্টেড এভিডেন্সের পথটিও এমন কিছু কঠিন নয়। ভোটপত্রের তিনটি ভাগ থাকবে এবং তিনটিতেই প্রিজাইডিং অফিসার সই করবেন, ভোটার সই করবেন বা টিপ দেবেন, আর সই করবেন প্রার্থীর প্রতিনিধি। একটি অংশ যাবে প্রিজাইডিং অফিসারের কাছে, একটি যাবে প্রার্থীর প্রতিনিধির কাছে, আর একটি থাকবে ভোটারের হাতে। নির্বাচন কমিশন, গণনেতা ও ভোটার, তিন পক্ষের হাতেই থাকবে গণসম্মতির ডকুমেন্টেড-এভিডেন্স। গণসন্তানের জন্মদানকালে এরকম স্বচ্ছতা যদি থাকে, সমাজের সর্বস্তরেই স্বচ্ছতা ফিরে আসবে।

এই প্রথাটির প্রচলন যদি আমরা করতে পারি, তা এমন এক বিশাল সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়ে দেবে, যার সঙ্গে কেবলমাত্র হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণের তুলনাই করা যেতে পারে; পার্থক্য এই যে, হাইড্রোজেন বোমা ধ্বংসাত্মক, এই ভোটবোমা ঠিক তার বিপরীতভাবে সৃজনাত্মক। এই প্রথার প্রচলন ঘটাতে পারলে, ক্রমান্বয়ে সমগ্র সমাজব্যবস্থাই স্বচ্ছ হয়ে

উঠবে। দুর্নীতি হিংসা প্রভৃতি নিজে থেকেই একটু একটু করে সরে যাবে। গণতন্ত্রে মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিজে থেকেই ঘটে যেতে থাকবে। গণতন্ত্রের বহু ত্রুটিবিচ্যুতিই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আমলাতন্ত্র, প্রশাসন প্রভৃতি গণতন্ত্রের অনুচরগুলি স্বচ্ছ হয়ে যাবে।

অর্থাৎ কিনা, গণসন্তানের জন্মের ক্ষেত্রেও আমাদের 'বার্থ সার্টিফিকেট' চাই এবং তা মা ও ছেলে উভয়ের কাছেই যেন থাকে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এখন যে 'বার্থ-সার্টিফিকেট' লিখে দেন — 'অমুক ব্যক্তি অমুক নির্বাচন-ক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত'— সেটি একটি গেটপাস মাত্র। তাতে গণসম্মতির স্বচ্ছ স্বাক্ষর নেই, নির্বাচিত গণসন্তানও যে সেই সম্মতি গ্রহণ করেছেন, তার প্রমাণপত্রও নেই। এটি দিয়ে কেবল রাষ্ট্রভাণ্ডারের গেটে ঢোকা যায়, রাজকোষের সামনে বসে থাকা তীর্থের কাকেদের সাথী হয়ে উঞ্ছবৃত্তি করা যায়। এতে গণসন্তান তাঁর শিবস্বরূপ মহত্তম গৌরব পান না।

পার্টিপ্রথা হয়তো একটা থাকতে হবে, তবে সে একালের পার্টির মতো নয়। মনে রাখতে হবে, পার্টির জন্ম হয়েছিল মহর্ষি-পদবাচ্য বাহ্যসম্পদ-বিতৃষ্ণ মানুষকে ডেকে নিয়ে এসে তাঁকে দেশনেতা বানানোর অনুঘটকের কাজ করার জন্য। সে প্রয়োজন যতদিন থাকবে ততদিন কোনো না কোনো প্রকারের অনুঘটক লাগবে। কিন্তু নির্বাচকদের সঙ্গে নির্বাচিতের যে প্রেমবন্ধন, তার ভিতরে সে-অনুঘটক-পার্টি নাক গলাতে পারবে না। প্রার্থীকে নির্বাচনের আগেই ঘোষণা করতে হবে, তাঁর লয়ালটি কেবল তাঁর জনক নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতিই থাকবে, আর কারও প্রতিই নয়। টোটাল লয়ালটির সঙ্গে সামঞ্জস্যের ভারসাম্য করতে গিয়েও আঞ্চলিক লয়ালটিকেই তিনি সর্বদা গুরুত্ব দেবেন এবং আর কোনো লয়ালটিকেই তিনি এই সম্বন্ধের ভিতরে ঢুকতে দেবেন না।

শিক্ষাবিষয়ক চতুর্থ পথটির প্রসঙ্গে আমি পরে আসছি।

হ্যাঁ, এমন কোনো কোনো নির্বাচন ক্ষেত্র থাকতেই পারে, যেখানে প্রকাশ্য-ভোট অনেক মানুষের বিপদের কারণ হতে পারে। যিনি নেতা নির্বাচিত হলেন, তিনি তো জেনে যাবেন কারা তাঁকে ভোট দেননি। তিনি যদি প্রতিশোধাত্মক কিছু করেন? ঠিকই। এই জন্য একটি রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন সেই নেতাকে যাঁরা ভোট দেননি, তাঁদের ১০ শতাংশ যদি সেই নেতার বিরুদ্ধে একত্রে সই করে 'প্রতিশোধাত্মক' ব্যবহারের অভিযোগ আনেন, তখনই কমিশন বসে যাবে, ২০ শতাংশ যদি অভিযোগ আনেন নেতাকে তৎক্ষণাৎ জবাবদিহি করতে হবে, এবং ৩০ শতাংশ যদি অভিযোগ আনেন নেতার পদচ্যুতি ঘটবে। তবে এ সব কিছুরই হয়তো দরকার পড়বে না। মহামায়ার প্রেমকে আমি যতদূর বুঝেছি, একজন গণনেতা একবার সরাসরি তাঁর জন্মদাতা জনসাধারণের প্রেম পেলেই তিনি প্রায় দেবতা হয়ে ওঠেন, তাঁর স্বভাবই বদলে যায়; তিনি শিব হয়ে যান।

এই প্রথা প্রচলনের আর একটি অসুবিধা হল 'কনস্টিটুয়েন্সি' বা নির্বাচন ক্ষেত্রের এলাকা। আজকাল এটি খুবই বড়। তাই বলে গান্ধীর গ্রামসমাজের মতো ছোট হলেও তা আজকের প্রয়োজন মেটাবে না। নির্বাচন ক্ষেত্র, আমার বিচারে, একালের ৫/৭ টি পঞ্চায়েতের অঞ্চল

হলেই ঠিক হবে। এগুলি হবে এক-একটি 'স্বনির্ভর স্বশাসিত অঞ্চল'।[১০] এরই থাকবে একজন করে গণনেতা ও গণনেত্রী। এর পর থেকে রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত যতগুলি উচ্চতর স্তর হবে, তাদের সকলের নির্বাচন হবে অপ্রত্যক্ষ। অঞ্চলগুলির নির্বাচিত নেতা-নেত্রীরাই জেলা পরিষদ, বিধানসভা, ও লোকসভার নেতানেত্রীদের নির্বাচন করবেন। লোকসভা থেকে জেলা পরিষদ পর্যন্ত সমস্ত স্তরের নেতা-নেত্রীরাই আঞ্চলিক নেতানেত্রীর কাছে কৈফিয়ত-যোগ্য হবেন। আর আঞ্চলিক নেতা-নেত্রী তাঁর নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে কৈফিয়ত-যোগ্য হবেন।

তবে এখনই তো এরকম সম্ভব হচ্ছে না। এখন যেমন আছে, তেমন অবস্থাতেই শুরু করতে হবে। যেমন কাঠামো রয়েছে, তেমন কাঠামোতেই ডকুমেন্টেড-ভোটপ্রথার প্রচলন করে দিতে হবে। তারপর সংবিধান সংশোধন করে উপরোক্তভাবে কাঠামোটি বদলে নিতে হবে।

শিক্ষার বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ। কেমন মানুষকে আমরা আমাদের সমাজকে ধরে রাখার জন্য, পালন-পোষণ করার জন্য নিয়োগ করব; কেমন মানুষকেই বা এই সমাজকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিয়োগ করব, সে বিষয়ে ইয়োরোপের কোনো বিশেষ নীতি বা পথনির্দেশিকা নেই। ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায়, এ বিষয়ে কমবেশি স্পষ্ট পথনির্দেশিকা রয়েছে। সেকালে ভারতের অ্যাকাডেমিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষকে বলা হত অশ্ব, এঁরাই থাকতেন সমাজবৃক্ষে বা অশ্বত্থবৃক্ষে। অর্থাৎ সমাজশাসনের পুরো আমলাতন্ত্রটি গড়ে উঠবে এই সব অশ্বদের দিয়ে। এঁরাই সমাজ রথচক্র টেনে নিয়ে চলবেন। কেননা, এঁরা অশ্ (Ash বা ছাই অর্থাৎ জগতের ছাই, মানে, এ-যাবৎ অর্জিত সমাজের সমস্ত জ্ঞানের সার) বহন করেন, তাই তাঁদের অশ্ব বলে। একালে তাঁদের বলা হয় 'সোনার ছেলে'। এঁরা আধারশক্তি বা প্রকৃতিশক্তি, অর্থাৎ সমাজপরিচালনার 'বেটার হাফ'। কিন্তু পথ যাঁরা দেখিয়ে নিয়ে চলবেন, আত্মরক্ষা কোন পথে, সমৃদ্ধি কোন পথে, মানসমুক্তি কোন পথে, সে সব যাঁরা দেখিয়ে দেবেন, তাঁরা কিন্তু ছাই বহন করেন না, মাখেন। তাঁরা জগতের জ্ঞান হজম করেন, আত্মস্থ করেন, নতুন জ্ঞান অর্জন করেন, 'সৃজনশীলতা বর্ষণ করেন' (= 'বৃষ'), তাঁরা শিব, জগতের ছাই মাখা তাঁদের ধর্ম। তাই তাঁরা ধর্মের ষাঁড়; ছাইগাদা দেখতে পেলে শিং দিয়ে পা দিয়ে ছাই উড়িয়ে মাখা তাদের স্বভাব; দুনিয়ার কোনো শক্তিকে সে তার মালিক বলে মনে করে না। কাউকে শাসন করতে বা কারও দ্বারা শাসিত হতে তার বিন্দুমাত্র প্রবৃত্তি থাকে না। এঁরা স্বভাবতই বাহ্যসম্পদ-বিতৃষ্ণ। একালের ভাষায় এঁদের বলা হয় হিরের টুকরো ছেলে। হিরের মতো এঁদের অন্তর স্বচ্ছ, জ্ঞানের আলো যেখানে ঢুকে বহুগুণিত হয়ে ঠিকরে দশদিকে ছড়িয়ে পড়ে।[১১] এঁদের মধ্যে আবার সেই হিরের টুকরোই সেরা, যার কোনো রং হয় না, লাল-গেরুয়া-তেরঙা কোনো রং থাকলে, হিরে বিশেষজ্ঞদের মতে, সে-হিরে নিম্ন মানের।

হ্যাঁ, আমাদের অ্যাকাডেমি গড়বে অশ্বদের, সোনার ছেলেদের; আর সমাজ হিরের টুকরো ছেলেদের গড়ে উঠবার অবকাশটুকু রাখবে, সে-পথ বন্ধ করে দেবে না বা কণ্টকাকীর্ণ করে রাখবে না; যাতে তারা স্বশিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে। প্রথমত, সমাজের চিরাচরিত কথকতা, গান-গল্প, নৃত্যগীত, ইত্যাদির ভিতর দিয়েই আগের কালে বড় হয়ে উঠত সমাজের শিশুরা।

অ্যাকাডেমির যে আদি রূপ, টোল ইত্যাদি, তাতে যার ইচ্ছে হত যেত, না গেলে তা যেমন লজ্জার বিষয় ছিল না, তেমনই সমাজও তাকে দূর-ছাই করত না। এরই মধ্যে যে ছেলে নিজেকে অত্যন্ত স্বশিক্ষিত করে তুলতে পারত, সমাজের চিরাচরিত জ্ঞানের এলাকার বাইরেও হাত বাড়াতে পারত, প্রচলিতের ঊর্ধ্বসীমা লঙ্ঘন করে নতুন জ্ঞান ও ধর্ম অর্জন করতে পারত, সমাজ তাকে গণনেতার বা শিবের মর্যাদা দিয়ে বসত। একালেও শিবোৎপত্তির সেইরকম পথ খুলে রাখতে হবে।

আমাদের পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেস কমিউনিস্ট প্রভৃতি সব দলেরই এমন বহু নেতা ছিলেন এবং এখনও কমবেশি আছেন, যাঁরা নিজের মাটি থেকে কমবেশি এভাবেই উঠে এসেছেন। স্কুল-কলেজের বিদ্যা নেই, থাকলেও তা তাঁদের বিশেষ কাজে লাগেনি। তাঁরা সাধ্যমত স্বশিক্ষিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যেভাবে তাঁর পুত্রের মানসবিকাশের রাস্তা খুলে রেখেছিলেন এবং সাধ্যমত তাঁকে স্বশিক্ষিত হতে সহায়তা করেছিলেন, একালের সমাজকেও তার হিরের টুকরো ছেলে গড়বার সমস্ত পথই খোলা রাখতে হবে এবং সাধ্যমত তাঁদের গড়ে ওঠার পথে, স্বশিক্ষিত হয়ে ওঠার পথে সহায়তা করতে হবে। পরে তাঁদের মধ্যেই কেউ গণনেতা হতে পারেন, কেউ-বা কর্মজগতের যেখানে যেখানে পথপ্রদর্শকদের প্রয়োজন সেখানে গিয়ে হাত লাগাতে পারেন।

সমস্যাও আছে। অ্যাকাডেমির সুশিক্ষিত ছেলেদের শিক্ষা মাপার একটি উপায় রয়েছে, তাদের সার্টিফিকেট। কিন্তু এই স্বশিক্ষিত ছেলেদের শিক্ষা মাপার কোনো সুনির্দিষ্ট উপায় নেই। সে উপায় খুঁজে বের করতে হবে। সোনার ছেলে আর হিরের টুকরো ছেলেদের সমন্বয়ের কথাও মনে রাখতে হবে। ভোলা চলবে না যে, যিনি মহামায়ার গণসন্তানরূপে ক্ষমতায় এসেছেন, সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে বড় কেউ নেই।

যাই হোক, এই চারটি পথেই আমরা আমাদের গণনেতা নামক সত্তাটিকে পুনরায় প্রাণের ঠাকুর শিবঠাকুর হিসেবে ফিরে পেতে পারি বলেই আমার মনে হয়।

এর ফলে সার্বিকভাবে যে পরিবেশ তৈরি হয়ে যাবে, তাতে কাউকে কিছু বলতেই হবে না; দেখা যাবে ঝকঝকে ছেলেমেয়েরা নিজেরাই এগিয়ে আসছে দেশ পরিচালনার কাজে, কেউ অশ্বরূপে কেউ-বা ঋষভরূপে, অর্থাৎ একালীন মহর্ষি রূপে।

ফিরে ফিরে ডাক দেখিরে পরাণ খুলে, ডাক ডাক ডাক ...

আমাদের সমাজের মস্তিষ্ক ব্যাধিগ্রস্ত হতে চলেছে। এ যে কতবড় বিপদ তা আশাকরি পাঠক অনুমান করতে পারছেন। তাই বলে হতাশ হয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। যাঁরা এখনই গণনেতার আসনে রয়েছেন, এই সমস্যা যাঁদের চোখে পড়ে গেছে, তাঁদেরই সর্বাগ্রে উদ্যোগ নিতে হবে। আমার উপরোক্ত প্রস্তাবিত পথেই এই সামাজিক বিকৃতির সুরাহা করতে হবে, এমন দাবি আমি করি না। আরও অনেকের ভাবনাচিন্তা যোগ হয়ে হয়তো আরও ভাল উপায় বেরিয়ে আসবে। কিন্তু যাই উপায় বেরোক না কেন, সে যদি যথার্থ উপায় হয়, তার

কোনো সহজ পথ যে কিছুতেই হতে পারবে না, তা আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি। বরং তাকে এক অসাধ্যসাধন বলেই মনে হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তা প্রকৃতপক্ষে অসাধ্য হবে না। তার জন্য মানুষকে হয়তো দুর্গম পথে চলার জন্য ডাক দিতে হবে। আজকের সৎ গণনেতারা কি সে-ডাক দিতে পারবেন না? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন —

> '... যাঁহারা মানুষকে অসাধ্যসাধনের উপদেশ দিয়াছেন, যাঁহাদের কথা শুনিলেই হঠাৎ মনে হয় ইহা কোনোমতেই বিশ্বাস করিবার মতো নহে, মানুষ তাঁহাদিগকেই শ্রদ্ধা করে অর্থাৎ বিশ্বাস করে। তার কারণ মহত্ত্বই মানুষের আত্মার ধর্ম; সে মুখে যাহাই বলুক, শেষকালে দেখা যায় সে বড়োকেই যথার্থ বিশ্বাস করে। সহজের উপরেই তাহার বস্তুত শ্রদ্ধা নাই; অসাধ্যসাধনাকেই সে সত্য-সাধনা বলিয়া জানে; সেই পথের পথিককেই সে সর্বোচ্চ সম্মান না দিয়া কোনোমতেই থাকিতে পারে না।
>
> যাঁহারা মানুষকে দুর্গম পথে ডাকেন, মানুষ তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করে, কেননা মানুষকে তাঁহারা শ্রদ্ধা করেন। তাঁহারা মানুষকে দীনাত্মা বলিয়া অবজ্ঞা করেন না। বাহিরে তাঁহারা মানুষের যত দুর্বলতা যত মূঢ়তাই দেখুন না কেন তবুও তাঁহারা নিশ্চয় জানেন যথার্থত মানুষ হীনশক্তি নহে — তাহার শক্তিহীনতা নিতান্তই একটা বাহিরের জিনিস; সেটাকে মায়া বলিলেই হয়। এইজন্য তাঁহারা যখন শ্রদ্ধা করিয়া মানুষকে বড়ো পথে ডাকেন তখন মানুষ আপনার মায়াকে ত্যাগ করিয়া সত্যকে চিনিতে পারে, মানুষ নিজের মাহাত্ম্য দেখিতে পায় এবং নিজের সেই সত্যস্বরূপে বিশ্বাস করিবামাত্র সে অসাধ্যসাধন করিতে পারে। ... '[১২]

টীকা ও টুকিটাকি

১. *ধর্মের অধিকার* / রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড।

২. 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' কথাটি ভারতে প্রবাদরূপে প্রচলিত। 'ব্রহ্ম' শব্দটির অর্থ জানা না-থাকায় এটিকে এখন বাজে কথা ভাবা হয়। 'ব্রহ্ম' শব্দটির অর্থ জানতে পারলে বোঝা যায়, এটি বিজ্ঞানসম্মত সত্য। আমরা যে দৃশ্য বিশাল জগৎটিকে দেখি, তার পিছনে রয়েছে অদৃশ্য এক বিশাল অনবচ্ছিন্ন নিয়মের জগৎ; কার্যত সেই নিয়মের জগৎটিই আমাদের এই দৃশ্যজগৎকে নিয়ন্ত্রণ করে, বস্তুর চেহারা কখন কেমন হবে তা ঠিক করে দেয়। সেই নিয়মের একটি করে কণা দেখেছিলেন নিউটন, আইনস্টাইন, দেখেছিলেন প্রথম যিনি চকমকি থেকে আগুন জ্বালিয়েছিলেন কিংবা প্রথম বাঁশিতে সুর তুলেছিলেন। আর, এই ব্রহ্ম তো সমুদ্রের জলের মতো অনবচ্ছিন্ন, এক কণাতেই সমগ্র সমুদ্রের নোনতা স্বাদ পাওয়া যায়। যে তা পায় তাকে বলা হয় ব্রহ্মদ্রষ্টা। শেষ নিবন্ধে এই বিষয়টিকে বিস্তারিত করা হয়েছে।

৩. মানুষ জন্মসূত্রে তিনটি অধিকার এবং তদনুসার তিনটি কর্তব্যের দায় পেয়ে থাকে। (এক) নিজের উপর নিজের অধিকার; (দুই) সমাজের একজন সদস্য হিসেবে সমাজের সব কিছুর উপর তার অংশগত অধিকার, এবং (তিন) জগতের একজন সন্তারূপে জগতের উপর তার অংশগত অধিকার। কার্যত মানুষের সমস্ত অধিকার ও কর্তব্য এই তিন শ্রেণীতে পড়ে। প্রাচীন ভারতের সম্প্রদায়গুলি মহর্ষিকে যা 'সম্প্রদান' করে দিয়েছিল, তাতে এই সব অধিকারই তাঁকে দিয়ে দেওয়া হয়ে যায়। ফলে মহর্ষিরা তাঁদের নেতৃত্বে পরিচালিত সকল মানুষের সব কিছুর মালিক হয়ে যান। ভারতে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সেই মহর্ষির উত্তরসূরি ব্রাহ্মণের কাছ থেকে সেই প্রদত্ত অধিকারসমূহ, উভয়পক্ষ ইতিহাস ভুলে যাওয়ায়, বিনা ঘোষণাতেই কেড়ে নিয়েছে। সেই কারণেই ভারতবাসীর হাতে তার তিনটি অধিকারই ফিরে এসেছে। তার জোরেই এখন সে পুনরায় গণনেতা নির্বাচন করতে পারে। আর, প্রার্থীরা সেই অধিকারের কিয়দংশ প্রার্থনা করেন তাঁদের

কর্মসূচির মাধ্যমে। তাই বর্তমানে কর্মসূচির মাধ্যমে বিশেষ কিছু কাজ করার অধিকার ভোটপ্রার্থী চেয়ে থাকেন। কিন্তু তা প্রায়শই ধোঁয়াশায় ভরা। আমেরিকার অধিবাসীরা কি প্রেসিডেন্ট বুশকে ইরাক আক্রমণ করবার অধিকার দিয়েছিল? আকাশ বাতাসকে দূষিত করার অধিকার কি আমরা আমাদের ভোটপ্রার্থীদের দিই? প্রকৃতি আমাদেরকে আত্মহত্যার অধিকার দিয়েছেন, সমাজ-পরিচালকেরা আমাদের সেই অধিকার কেড়ে নেয় কীসের জোরে? আমরা ভোট দেওয়ার সময় আমাদের জীবনের উপর এই জোর খাটানোর অধিকার কি তাঁদের দিয়েছি? এ সব প্রসঙ্গে যাঁরা সংবিধানের দোহাই পাড়েন, তাঁদের জানা থাকা উচিত, ভোটদাতা জনগণের দ্বারা স্বীকৃত না হলে, সংবিধানের গতি আঁস্তাকুড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের প্রদত্ত অধিকারের সীমা তাঁরা লঙ্ঘন করেন। আবার, এ কথাও ঠিক, সমাজ পরিচালনার সময় এমন বহু অধিকার তাঁদের প্রয়োজন হয়, যা আগে বলে-কয়ে নেওয়া হয়নি।

৪. 'অষ্টপাশ' হল আট রকম বন্ধন। শিবস্বরূপ গণনেতারা সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য এই আটরকম বন্ধন অনায়াসে ছিন্ন করতে পারতেন। এগুলি হল --- ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, সন্দেহ, মান, অপমান, জাতি, ও শীল।

৫. মুসলিম জ্ঞানতপস্বী কিছু মহান মানুষদেরও আমি দেখেছি। এঁরা ভারি অদ্ভুত চরিত্রের। ভারতীয় মনীষা ও ইয়োরোপীয় মনীষার মধ্যবর্তী দেশ যেন এই জ্ঞানতপস্বীরা। ইয়োরোপের প্লেটো যেমন এঁদের কাছে 'আফলাতুন' নামে বোধ্য হয়ে যান, তেমনি ভারতের পাটিগণিতও এঁদের কাছে বোধ্য হয়ে যায়। এঁরা তাই ভারতকেও বুঝতেন, ইয়োরোপকেও বুঝতেন। হয়তো সেকারণেই পরবর্তীকালের ব্রিটিশ শাসকরা সেই রহস্যটি বুঝতে পেরে ভারতের 'শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক দপ্তর'গুলির কাজকর্মে এই মুসলিম পণ্ডিতদেরই অধিক পরিমাণে নিয়োগ করতেন। এই ট্র্যাডিশন ভারতের স্বাধীনতা লাভের ২০/২৫ বছর পর পর্যন্ত একইভাবে চলেছে। সমস্ত শিক্ষামন্ত্রী ও তাঁদের সেক্রেটারির দায়িত্বে মুসলিম পণ্ডিতদেরই বসানো হয়েছে। কালচারাল বিভাগের উচ্চতম প্রশাসনেও দেখা গেছে মুসলিম পণ্ডিতদের।

৬. ততঃ কিম / রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড।

৭. এ বিষয়ে আমাদের লেখা 'বাংলাভাষা : প্রাচ্যের সম্পদ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

৮. যাঁরা টিভিতে মহাভারত দেখেছেন, তাঁরা দেখে থাকবেন, শুরুতেই একটি থালায় দুটি অণ্ডকোষ পড়ে রয়েছে আলতোভাবে। বিশ্বের অণ্ড ছিন্ন করে নিলে বিশ্বও বলদ হয়ে যাবে। সেকালের পণ্ডিতেরা এ সব বুঝতেন। আর বিশ্বসমাজের অণ্ডকোষ হল তার উদ্ভাবকেরা। শিবগুণসম্পন্ন মানুষদের তাড়াতে পারলে সে কাজটি হয়ে যায়। এককালে তাই করা হয়েছিল। তাই বাংলায় প্রবাদ রয়েছে— 'শিব পালাল মক্কায়'।

৯. 'বল দান করে যে' তাকে 'বলদ' বলে। ষাঁড়ের অণ্ডকোষ বা সৃজনশীলতা ছেঁটে দিলে, সে বলদানকারী বলদে পরিণত হয়। তখন সে কোম্পানির সেবায় দিন কাটায়, কোম্পানির দেওয়া ঘাসজল খায়, তারই গোয়ালে থাকে। ধর্মের ষাঁড় কিন্তু কোনো মালিক স্বীকার করে না, সে স্বাভাবিক-প্রাকৃতিকভাবে জীবন কাটায়, কারও গোয়ালে থাকে না। বিষয়টিকে বিস্তারিত করে গল্পাকারে লেখা হয়েছিল, 'বৃষোৎসর্গ' নামে। আগ্রহী পাঠকপাঠিকার কথা ভেবে এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে গল্পটি পুনর্মুদ্রিত হল।

১০. এই গ্রন্থের প্রথম নিবন্ধে 'স্বনির্ভর স্বতন্ত্র অঞ্চল' বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। তাই পুনরুক্তি অবান্তর।

১১. লেখকের 'হিরোর হাইটটাই প্রবলেম' শীর্ষক নিবন্ধের প্রথম অধ্যায়ে এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নিবন্ধটি সঙ্কলিত হয়েছে লেখকের 'এনলাইটেনমেন্ট টু ইমোশনাল বন্ডেজ : জ্যোতি থেকে মমতায়' নামক গ্রন্থে।

১২. ততঃ কিম্/রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড।

কলকাতার 'এবং' পত্রিকার ২০০৬ পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত।

মাতৃভাষারূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে

রবি চক্রবর্তী

১. নিজ ভূমে বাস, তবু পরবাসী

আমার পরিচিত একাধিক কৃতবিদ্য ব্যক্তির দুঃখ, তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের আগ্রহ নেই বাংলাচর্চার। তাঁদের বাড়ির বুককেস বা আলমারিতে রাখা আছে বাংলা সাহিত্যের সম্ভার, শেল্‌ফ বা টেবিলেও বাংলা পত্রপত্রিকা। কিন্তু এ সব পড়ার লোক কোথায়? তাঁদের ছেলে বা বউমা যদি বা বাংলা বই পত্রিকার পাতা ওলটান, নাতি-নাতনীরা ফিরে তাকায় না এই সব বই বা পত্রিকার দিকে। অথচ এই তরুণ প্রজন্ম যে গ্রন্থবিমুখ, এমন নয়। ইংরেজি বই বা পত্রিকা তারা আগ্রহ নিয়ে পড়ে, পড়ে না তারা বাংলা।

তবে এই তরুণ-তরুণীদের দোষ দিতে পারেন না কেউ। শৈশবেই এদের পাঠানো হয়েছিল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। সেই পরিবেশে স্বাভাবিক ভাবে তাদের মন সরে গিয়েছিল বাংলা থেকে ইংরেজির দিকে। তার ওপর রয়েছে তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা। পদে পদে তারা জেনেছে — বৃহত্তর জীবনে, কি লেখাপড়া, কি জীবিকার্জনে, সবখানে সাফল্যের চাবিকাঠি হল ইংরেজিতে ভাল দখল। এ অবস্থায় বাংলা চর্চার দিকে মন যাবে কেন? শুধু দেশের প্রতি কর্তব্যপালনের জন্য? উপরন্তু তরুণ প্রজন্ম তো বলতেই পারে, বাংলার তুলনায় পশ্চিমের ইংরেজি, ফরাসি প্রভৃতি সংস্কৃতির বিশাল ব্যাপ্তি। আর, বাংলায় কি এমন কিছু পাওয়ার আছে, যা ইংরেজিতে পাওয়া যায় না?

অবশ্যই উপরের প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া যায়নি। ঠিক উত্তর তো জানা নেই আপনার। যে শিক্ষায় আপনারা বেড়ে উঠেছেন, সেখানেই রয়েছে ত্রুটি। বঙ্গসংস্কৃতি হিসেবে যে সংস্কৃতিকে আপনি ভালবেসেছেন, সে তো গত দুশো বছরের সংস্কৃতি। সে-সংস্কৃতির অনেকটাই পশ্চিমের থেকে ধার-করা আলো, অন্য কথায় পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুকরণ এবং অনুসরণের ফসল। আর যে-অংশটি তা নয়, তার খোঁজই আপনার তেমন করে নেওয়া হয়ে ওঠেনি। সে-সংস্কৃতির কিছুটা রয়ে গেছে প্রধানত রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে, রয়ে গেছে সাধারণ বাঙালির ভাষায়, বাঙালির আচার-অনুষ্ঠানে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির সেই অংশটি আপনিই এড়িয়ে গেছেন ধোঁয়াটে বলে, অথবা উপনিষদের প্রভাব ইত্যাদি ব্যাখ্যা দিয়ে। আর, সাধারণ বাঙালির ভাষায় কী আছে, কী আছে তার আচার-অনুষ্ঠানে, সেসব না দেখেছে বাঙালির ইয়োরোপ-প্রভাবিত আজকের অ্যাকাডেমি, না দেখেছেন আপনি। আর, সাধারণ বাঙালিও তার খবর রাখেন না, যদিও উত্তরাধিকার সূত্রে তা বহন করে নিয়ে চলেছেন আজও।

কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশের সংস্কৃতির বা বঙ্গসংস্কৃতির অনন্যতা আপনি নিজে কেন নিশ্চিতভাবে বুঝলেন না, তার কারণ কী — এ বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে, আমাদের বিচারের এলাকাকে আবশ্যিক ভাবেই বাড়িয়ে নিতে হয়। এবং এই বিষয়ে প্রথম কথা এই

কর্মসূচির মাধ্যমে। তাই বর্তমানে কর্মসূচির মধ্যমে বিশেষ কিছু কাজ করার অধিকার ভোটপ্রার্থী চেয়ে থাকেন। কিন্তু তা প্রায়শই ধোঁয়াশায় ভরা। আমেরিকার অধিবাসীরা কি প্রেসিডেন্ট বুশকে ইরাক আক্রমণ করবার অধিকার দিয়েছিল? আকাশ বাতাসকে দূষিত করার অধিকার কি আমরা আমাদের ভোটপ্রার্থীদের দিই? প্রকৃতি আমাদেরকে আত্মহত্যার অধিকার দিয়েছেন, সমাজ-পরিচালকেরা আমাদের সেই অধিকার কেড়ে নেয় কীসের জোরে? আমরা ভোট দেওয়ার সময় আমাদের জীবনের উপর এই জোর খাটানোর অধিকার কি তাঁদের দিয়েছি? এ সব প্রসঙ্গে যাঁরা সংবিধানের দোহাই পাড়েন, তাঁদের জানা থাকা উচিত, ভোটদাতা জনগণের দ্বারা স্বীকৃত না হলে, সংবিধানের গতি আঁস্তাকুড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের প্রদত্ত অধিকারের সীমা তাঁরা লঙ্ঘন করেন। আবার, এ কথাও ঠিক, সমাজ পরিচালনার সময় এমন বহু অধিকার তাঁদের প্রয়োজন হয়, যা আগে বলে-কয়ে নেওয়া হয়নি।

৪. 'অষ্টপাশ' হল আট রকম বন্ধন। শিবস্বরূপ গণনেতারা সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য এই আটরকম বন্ধন অনায়াসে ছিন্ন করতে পারতেন। এগুলি হল — ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, সন্দেহ, মান, অপমান, জাতি, ও শীল।

৫. মুসলিম জ্ঞানতপস্বী কিছু মহান মানুষদেরও আমি দেখেছি। এঁরা ভারি অদ্ভুত চরিত্রের। ভারতীয় মনীষা ও ইয়োরোপীয় মনীষার মধ্যবর্তী দেশ যেন এই জ্ঞানতপস্বীরা। ইয়োরোপের প্লেটো যেমন এঁদের কাছে 'আফলাতুন' নামে বোধ্য হয়ে যান, তেমনি ভারতের পাটিগণিতও এঁদের কাছে বোধ্য হয়ে যায়। এঁরা তাই ভারতকেও বুঝতেন, ইয়োরোপকেও বুঝতেন। হয়তো সেকারণেই পরবর্তীকালের ব্রিটিশ শাসকরা সেই রহস্যটি বুঝতে পেরে ভারতের 'শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক দপ্তর'গুলির কাজকর্মে এই মুসলিম পণ্ডিতদেরই অধিক পরিমাণে নিয়োগ করতেন। এই ট্র্যাডিশন ভারতের স্বাধীনতা লাভের ২০/২৫ বছর পর পর্যন্ত একইভাবে চলেছে। সমস্ত শিক্ষামন্ত্রী ও তাঁদের সেক্রেটারির দায়িত্বে মুসলিম পণ্ডিতদেরই বসানো হয়েছে। কালচারাল বিভাগের উচ্চতম প্রশাসনেও দেখা গেছে মুসলিম পণ্ডিতদের।

৬. ততঃ কিম / রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড।

৭. এ বিষয়ে আমাদের লেখা 'বাংলাভাষা : প্রাচ্যের সম্পদ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

৮. যাঁরা টিভিতে মহাভারত দেখেছেন, তাঁরা দেখে থাকবেন, শুরুতেই একটি থালায় দুটি অণ্ডকোষ পড়ে রয়েছে আলতোভাবে। বিশ্বের অণ্ড ছিন্ন করে নিলে বিশ্বও বলদ হয়ে যাবে। সেকালের পণ্ডিতেরা এ সব বুঝতেন। আর বিশ্বসমাজের অণ্ডকোষ হল তার উদ্ভাবকেরা। শিবগুণসম্পন্ন মানুষদের তাড়াতে পারলে সে কাজটি হয়ে যায়। এককালে তাই করা হয়েছিল। তাই বাংলায় প্রবাদ রয়েছে— 'শিব পালাল মক্কায়'।

৯. 'বল দান করে যে' তাকে 'বলদ' বলে। ষাঁড়ের অণ্ডকোষ বা সৃজনশীলতা ছেঁটে দিলে, সে বলদানকারী বলদে পরিণত হয়। তখন সে কোম্পানির সেবায় দিন কাটায়, কোম্পানির দেওয়া ঘাসজল খায়, তারই গোয়ালে থাকে। ধর্মের ষাঁড় কিন্তু কোনো মালিক স্বীকার করে না, সে স্বাভাবিক-প্রাকৃতিকভাবে জীবন কাটায়, কারও গোয়ালে থাকে না। বিষয়টিকে বিস্তারিত করে গল্পাকারে লেখা হয়েছিল, 'বৃষোৎসর্গ' নামে। আগ্রহী পাঠকপাঠিকার কথা ভেবে এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে গল্পটি পুনর্মুদ্রিত হল।

১০. এই গ্রন্থের প্রথম নিবন্ধে 'স্বনির্ভর স্বতন্ত্র অঞ্চল' বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। তাই পুনরুক্তি অবান্তর।

১১. লেখকের 'হিরোর হাইটটাই প্রবলেম' শীর্ষক নিবন্ধের প্রথম অধ্যায়ে এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নিবন্ধটি সঙ্কলিত হয়েছে লেখকের 'এনলাইটেনমেন্ট টু ইমোশনাল বন্ডেজ : জ্যোতি থেকে মমতায়' নামক গ্রন্থে।

১২. ততঃ কিম/রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড।

কলকাতার 'এবং' পত্রিকার ২০০৬ পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত।

মাতৃভাষারূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে

রবি চক্রবর্তী

১. নিজ ভূমে বাস, তবু পরবাসী

আমার পরিচিত একাধিক কৃতবিদ্য ব্যক্তির দুঃখ, তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের আগ্রহ নেই বাংলাচর্চার। তাঁদের বাড়ির বুককেস বা আলমারিতে রাখা আছে বাংলা সাহিত্যের সম্ভার, শেল্‌ফ বা টেবিলেও বাংলা পত্রপত্রিকা। কিন্তু এ সব পড়ার লোক কোথায়? তাঁদের ছেলে বা বউমা যদি বা বাংলা বই পত্রিকার পাতা ওলটান, নাতি-নাতনীরা ফিরে তাকায় না এই সব বই বা পত্রিকার দিকে। অথচ এই তরুণ প্রজন্ম যে গ্রন্থবিমুখ, এমন নয়। ইংরেজি বই বা পত্রিকা তারা আগ্রহ নিয়ে পড়ে, পড়ে না তারা বাংলা।

তবে এই তরুণ-তরুণীদের দোষ দিতে পারেন না কেউ। শৈশবেই এদের পাঠানো হয়েছিল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। সেই পরিবেশে স্বাভাবিক ভাবে তাদের মন সরে গিয়েছিল বাংলা থেকে ইংরেজির দিকে। তার ওপর রয়েছে তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা। পদে পদে তারা জেনেছে — বৃহত্তর জীবনে, কি লেখাপড়া, কি জীবিকার্জনে, সবখানে সাফল্যের চাবিকাঠি হল ইংরেজিতে ভাল দখল। এ অবস্থায় বাংলা চর্চার দিকে মন যাবে কেন? শুধু দেশের প্রতি কর্তব্যপালনের জন্য? উপরন্তু তরুণ প্রজন্ম তো বলতেই পারে, বাংলার তুলনায় পশ্চিমের ইংরেজি, ফরাসি প্রভৃতি সংস্কৃতির বিশাল ব্যাপ্তি। আর, বাংলায় কি এমন কিছু পাওয়ার আছে, যা ইংরেজিতে পাওয়া যায় না?

অবশ্যই উপরের প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া যায়নি। ঠিক উত্তর তো জানা নেই আপনার। যে শিক্ষায় আপনারা বেড়ে উঠেছেন, সেখানেই রয়েছে ত্রুটি। বঙ্গসংস্কৃতি হিসেবে যে সংস্কৃতিকে আপনি ভালবেসেছেন, সে তো গত দুশো বছরের সংস্কৃতি। সে-সংস্কৃতির অনেকটাই পশ্চিমের থেকে ধার-করা আলো, অন্য কথায় পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুকরণ এবং অনুসরণের ফসল। আর যে-অংশটি তা নয়, তার খোঁজই আপনার তেমন করে নেওয়া হয়ে ওঠেনি। সে-সংস্কৃতির কিছুটা রয়ে গেছে প্রধানত রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে, রয়ে গেছে সাধারণ বাঙালির ভাষায়, বাঙালির আচার-অনুষ্ঠানে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির সেই অংশটি আপনিই এড়িয়ে গেছেন ধোঁয়াটে বলে, অথবা উপনিষদের প্রভাব ইত্যাদি ব্যাখ্যা দিয়ে। আর, সাধারণ বাঙালির ভাষায় কী আছে, কী আছে তার আচার-অনুষ্ঠানে, সেসব না দেখেছে বাঙালির ইয়োরোপ-প্রভাবিত আজকের অ্যাকাডেমি, না দেখেছেন আপনি। আর, সাধারণ বাঙালিও তার খবর রাখেন না, যদিও উত্তরাধিকার সূত্রে তা বহন করে নিয়ে চলেছেন আজও।

কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশের সংস্কৃতির বা বঙ্গসংস্কৃতির অনন্যতা আপনি নিজে কেন নিশ্চিতভাবে বুঝালেন না, তার কারণ কী — এ বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে, আমাদের বিচারের এলাকাকে আবশ্যিক ভাবেই বাড়িয়ে নিতে হয়। এবং এই বিষয়ে প্রথম কথা এই

যে একটা সভ্যতা বা সংস্কৃতির মধ্যে অনেক রকমের কলা, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি থাকে। কিন্তু সেই সভ্যতার মর্মমূলে যদি যেতে হয়, তবে যেতে হয় তার বিশ্ববীক্ষায়; যেমন কিনা কোনো ব্যক্তির ভিতরের সত্য বুঝতে হলে যেতে হয় সেই মানুষের ভাবনাচিন্তার গভীরে। দু-একটি উদাহরণ দিয়ে বক্তব্যটি স্পষ্ট করার চেষ্টা করছি।

প্রাচীন গ্রীসের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের মধ্যে যে আড়ম্বরহীন ঋজুতা ও সুষমা, তার পিছনে অবশ্যই রয়েছে একটি বিশেষ বিশ্ববীক্ষা বা জীবনবোধ। কিন্তু সেই বিশেষ বিশ্ববীক্ষা বা জীবনবোধ আমরা কোথায় খোঁজ করব? অবশ্যই প্রাচীন গ্রীসের কাব্য, সাহিত্য ও দর্শনে। সেজন্য তাদের কাব্য ও সাহিত্যের মধ্যে যে রচনাশৈলী ফুটে উঠেছে, সেটিকে ভাল করে অনুধাবন করতে হয়; উপরন্তু বুঝতে হয়, কী মানসিকতা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়ে আছে তাদের অর্থাৎ প্রাচীন গ্রীকদের গদ্যরচনা, ইতিহাস ও দর্শন জাতীয় নানান রচনার মধ্যে। গ্রীকরা নিজেরা কী ভাবত সেটা জানাটাই আমাদের অন্তিম লক্ষ্য, এমন অবশ্য নয়; কিন্তু সেটা না জানলে কোনোক্রমেই সম্যক আলোচনা হয় না। অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন অ্যারিস্টটলের Catharsis তত্ত্ব নিয়ে কত হিমশিম খেতে হয় গ্রীকভাষায় শব্দটির কতটা ব্যাপ্তি ছিল সে সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা না থাকায়। ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে আলোচনায় Hubris[১], Hamartia[২], Sophrosyne[৩], Nemesis[৪] এ ধারণাগুলির গুরুত্বও কম নয়। এ জন্যই গ্রীক ট্র্যাজেডি বা গ্রীক দর্শন সম্বন্ধে সুষ্ঠু আলোচনার স্বার্থে প্রাচীন গ্রীক ভাষায় কিছুটা ব্যুৎপত্তির প্রয়োজন। যে কোনো সভ্যতাকে বুঝতে গেলে, সেই সভ্যতার আধার ছিল যে-ভাষা, অর্থাৎ যে-ভাষাকে অবলম্বন করে সে-সভ্যতা আত্মপ্রকাশ করেছিল, সেই ভাষায় অধিকার অর্জন করে তবে সেই সভ্যতাকে ঠিক বোঝা যায়। কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশের বেলায় কী জিনিস ঘটল? পশ্চিমী পণ্ডিতরা, প্রধানত যাদের কাছে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত আমরা আধুনিক ভারতীয়রা পাঠ নিয়েছি সকল বিদ্যার ক্ষেত্রে, তাঁরা কি ভারত-সংস্কৃতির ওপর সুবিচার করেছেন? না, তাঁরা তা করেননি। অথবা এ কথা বলাই ভাল যে, তাঁরা তা করতে পারেননি। আমরা ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালিরা তা করিনি। কিন্তু কোন কার্যকারণে এমন জিনিস ঘটল?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমাদের হাজার বছর পিছিয়ে গিয়ে নিজেদের দিকে দেখা শুরু করতে হয়। একাদশ শতাব্দীতে মহান ইরানী পণ্ডিত আল বিরুনি (৯৭৩-১০৪৮ খ্রিস্টাব্দ) সংস্কৃতভাষা সম্বন্ধে দুটি গুরুতর অভিযোগ এনেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, বহুরকমের সমৃদ্ধি সত্ত্বেও এই ভাষার বড় ত্রুটি এই যে, এই ভাষায় একদিকে একটি শব্দ দিয়ে বহু জিনিসকে বোঝানো হয়, আবার অন্যদিকে একই জিনিস বোঝানোর জন্য বহু বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার হয়। দ্বিতীয় অভিযোগ সত্যি হলে বুঝতে হবে, এ-ভাষায় বহু অপ্রয়োজনীয় শব্দ আছে। কিন্তু প্রথম অভিযোগটি আরও গুরুতর। এটি যথার্থ হলে বুঝতে হবে, এই ভাষায় রচিত গ্রন্থের মর্মোদ্ধার সুকঠিন কাজ। উপরন্তু শব্দার্থের ক্ষেত্রে এমন নৈরাজ্যের কারণে এই ভাষায় কোনো বড় সৃষ্টি সম্ভব নয়। অথচ ঋগ্বেদ সহ পুরাণাদি ও রামায়ণ-মহাভারতের মতো বড় সৃষ্টি তো এই ভাষায় বহু আগেই হয়েছে! কী করে হল?

না, সে প্রশ্নের উত্তর জানার চেষ্টা করা হল না। আল বিরুনির আনা অভিযোগের কোনো নিষ্পত্তি হল না; সে কাজ মুলতুবি রইল শতাব্দীর পর শতাব্দী। এই পরিস্থিতির মধ্যেই পশ্চিমী দেশের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল পৃথিবীর দিকে দিকে; আমাদের দেশেও। সেই সূত্রে পশ্চিমের পণ্ডিতরাও এলেন এ-প্রাঙ্গণে, আর নিজেদের মতো করে বোঝার চেষ্টা করলেন ভারতীয় উপমহাদেশের সাহিত্য-ইতিহাস-সংস্কৃতিকে। আমাদের কিছু কিছু পণ্ডিতদের সহযোগিতা অবশ্য তাঁরা পেলেন, কিন্তু তাতে খুব কিছু লাভ হল না। প্রথমত তাঁদের সহযোগী এদেশীয় পণ্ডিতরা ততদিনে নিজেদের ঐতিহ্যকে পুরো না বুঝে, তার বোঝাটাই বহন করে চলছিলেন; আল বিরুনির অভিযোগের নিরসন তাঁরা করতে পারেননি। তার ওপর পশ্চিমী পণ্ডিতরা তাঁদের বিদ্যাচর্চার অভ্যস্ত ছকের মধ্যে বিচরণ করতে চাইবেন, এটাই ছিল স্বাভাবিক। প্রসঙ্গভেদে শব্দার্থের ভিন্নতা হওয়ার সম্ভাবনাকে তাঁরা বিচারের মধ্যেই আনলেন না; সব শব্দের মধ্যে বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার দ্যোতনাটা যে সবচেয়ে প্রধান কাজ, এ কথা তাঁরা বুঝলেন না। এর ওপর পশ্চিমী Mythology সম্বন্ধে তাঁদের চর্চা যতদূর এগিয়েছিল, তার ভিত্তিতে তাঁরা এদেশের বেদ-পুরাণাদির ব্যাখ্যা দিতে লাগলেন। বেদ-পুরাণাদির কাহিনীগুলি সামাজিক ইতিহাসেরও বয়ান হতে পারে, সে সম্ভাবনা তাঁদের মনেই এল না। অথচ নানাবিধ পুরাণকাহিনীর বহু পাত্রপাত্রীর নামের মধ্যেই নির্দেশ আছে, কাহিনীগুলি কী জাতীয় সামাজিক সত্যের উপস্থাপনা করছে। পুরাণাদির কাহিনীর পাত্রপাত্রীদের সুস্পষ্ট ব্যঞ্জনাবাহী নামগুলির সঙ্গে তাদের আচরণগুলির যে যথেষ্ট সঙ্গতি আছে, এ সত্যটি তাঁরা ধরতেই পারলেন না। একবার দেখুন না — ধৃতরাষ্ট্র, বিভীষণ, যুধিষ্ঠির, রতি, মদন, শিব — এই নামগুলির সঙ্গে তাদের আচরণগুলির কতখানি মিল পাওয়া যায়! আবার দেখুন, দুর্যোধন, দুঃশাসন — এগুলো কি কখনো পিতৃদত্ত নাম হয়? উপরন্তু, পুরাণাদিতে এমন কথা বলা আছে যে, দক্ষ, ব্যাসদেব প্রভৃতি চরিত্র বারে বারে জন্মাবে, এবং দেখানো হচ্ছে যে, বশিষ্ঠমুনি পিতা-পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে পৌরোহিত্য করেই যাচ্ছেন। অথচ পুরাণের বিভিন্ন চরিত্রকে 'ঐতিহাসিক ব্যক্তি' মনে করে তাদের কাল নিরূপণের চেষ্টায় কত না পণ্ডশ্রম করেছেন আমাদের দেশের জিজ্ঞাসু গবেষকরা। যদিও সবচেয়ে সহজে যা করা যেতে পারত, তা হল সেগুলিকে 'ব্যক্তি' না-ভেবে 'সামাজিক সত্তা' ভেবে নেওয়া; আর সেটা করার মতো জ্ঞান তখনকার ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের ছিল। কেননা, ইয়োরোপের মধ্যযুগের Morality নাটকে নানান বিমূর্ত সত্তাকে চরিত্র হিসাবে আনা হত। পঞ্চদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ইংরেজি নাটক *Everyman*-এর প্রধান চরিত্র Everyman (= যে কোনো মানুষ) বাদে অন্যান্য অনেক চরিত্রের মধ্যে কয়েকটি হল Death, Fellowship (= সঙ্গীসাথী), Kindred (= জ্ঞাতিবর্গ), Good Deeds, Knowledge (= সত্যাসত্য জ্ঞান), Confession (= পাপস্খালনের জন্য নির্ভেজাল স্বীকারোক্তি), Strength, Discretion (= বিচক্ষণতা), Beauty ইত্যাদি। (নাটকটির প্রতিপাদ্য এই যে, মানুষের জীবননাট্যে Knowledge, Confession প্রভৃতির সদর্থক ভূমিকা থাকলেও, ঈশ্বরের আদালতে মানুষের বিচার হয় তার Good Deeds-এর ভিত্তিতে। অথচ সেরকম সত্তাদের সঙ্গে সাদৃশ্য

খুঁজে এদেশের অতীতের সত্যান্বেষণ শুরু হল না। শাসকের গর্বে তাঁরা সেভাবে ভাবতেই পারলেন না। তাঁরা বুঝিবা ভাবলেন, শাসিতের সংস্কৃতিতে অত উচ্চমার্গের ভাবনা থাকবে কী করে! সম্ভবত এই ছিল তাঁদের বিশ্বাস।

মোটকথা, এদেশে পশ্চিমী লেখাপড়ার সূত্রপাত হয়ে যাওয়ার পর, বেদ-পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারতাদির ভিতর যে ভাবসম্পদ নিহিত আছে, তা ধরতে পারার যে অক্ষমতা আগে থেকেই ছিল, তা ক্রমে বেড়েই চলল। কিন্তু তার থেকেও বড় ক্ষতি হল এই যে, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি বাংলাভাষার সৃজনশীল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। প্রাচীন ভারতীয় ভাষা থেকে পাওয়া উত্তরাধিকারের জোরে বাংলাভাষার ক্ষমতা ছিল অসীম — অনেক আপাত বিভিন্ন বস্তু বা সত্তাকে একই নামে চিহ্নিত করা যেত; সমস্ত সত্তাকে দেখা হত বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার আধার হিসেবে এবং সে জন্যই বাইরের দিকের পার্থক্য সত্ত্বেও একই নামে বহু আপাত পৃথক সত্তার উল্লেখ করা যেত। এক 'কর' শব্দ দিয়ে বোঝান যেত মানুষের হাত, দেয় খাজনা, সূর্যের আলো, হাতির শুঁড় প্রভৃতি। 'পদ' শব্দ দিয়ে আবার অনেক কিছু বোঝান যেত (এ বিষয়ে আলোচনা প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে আছে।) দুঃখের বিষয়, প্রথম সহস্রাব্দের মধ্যভাগ, অর্থাৎ গুপ্তযুগ, হর্ষবর্ধনের কাল পার হয়ে সংস্কৃত ভাষার এই রীতি তার গৌরব হারিয়ে ফেলে। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর *'বঙ্গীয় শব্দকোষ'*-এ দেওয়া বিভিন্ন শব্দের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের উদাহরণ থেকে বোঝা যাবে, কাল যত এগিয়েছে, ততই কমে গেছে এক শব্দের আপাত বিভিন্ন নানা অর্থে ব্যবহার। সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির ধারা ক্ষীণ হয়ে আসে, এবং ভাষার সম্বন্ধে মানুষের সচেতনতার মানও নেমে যায়। ফলে আলবিরুনীর পূর্বোক্ত অভিযোগের নিরাকরণ সম্ভব হয়নি। কিন্তু ভাষাব্যবহারের সে রীতি হারিয়ে যায় না। মধ্যযুগে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে পাঠান রাজত্বের ছত্রছায়ায় তা নবজীবন লাভ করে বাংলাভাষায়, সেই রীতি অনুসরণ করেই সেকালের বাংলাভাষা জন্ম দিয়েছিল বিশাল মঙ্গলকাব্যের, বৈষ্ণবসাহিত্যের, আউল-বাউল সাহিত্যের এবং সর্বোপরি বাংলা রামায়ণ-মহাভারতের। তবে মানতেই হবে, ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে পৌঁছে বাংলাভাষায় এ রীতির অনেকটাই হয়ে পড়েছিল অভ্যাসগত এবং বাংলাভাষীর তরফে তাত্ত্বিক সচেতনতা ততদিনে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

তবুও চেষ্টা থাকলে সেই অবস্থা থেকেও মানবজাতির এই মহত্তম অর্জনকে তখনই উদ্ধার করা যেত, যদি ইয়োরোপের শাসকসুলভ-দৃষ্টিভঙ্গি সংশ্লিষ্ট পণ্ডিতদের দৃষ্টিকে কলুষিত করে না দিত। কারণ বাংলাভাষায় তখনও পর্যন্ত সবকিছু কমবেশি জীবন্তই ছিল। ছিল বাঙালির নিত্যনৈমিত্তিক ভাষাব্যবহারে, বাঙালির দৃষ্টিভঙ্গিতে। এখনও তো প্রায় সেই অবস্থা থেকেই আমরা (কলিম খান ও আমি) আমাদের সেই মহত্তম অর্জন সাধ্যমতো পুনরুদ্ধার করছি।[৫] পার্থক্য শুধু এই যে, তখনকার পণ্ডিত বিশ্বাস করে ফেলেছিলেন, ইয়োরোপের চেয়ে কোনো বিষয়েই বেশি কেউ জানে না, জানতে পারে না; আমাদের কারও উপরই সেরকম কোনো অন্ধ বিশ্বাস নেই। চেষ্টা করলে বাঙালির সেই অর্জনকে যে-কেউ চিহ্নিত করতে পারেন।

আলোচনার পরবর্তী পর্যায়ে যাওয়ার আগে কিছু অন্য কথায় বোধ করি যাওয়া দরকার। বাংলার সম্পদ দেখাতে গিয়ে মাঝেমধ্যে সংস্কৃতের উল্লেখ করেছি। আজকের পরিস্থিতির কারণে হয়তো অনেকের এটা অসংগত ঠেকছে। বিশেষ করে, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ — বাংলা ভাষার দুই ভুবনেই এখন সরকারি পণ্ডিতদের একান্ত চেষ্টা সংস্কৃত থেকে বাংলাকে আরও দূরে সরিয়ে নেওয়ার; এবং তার প্রভাব অল্পবিস্তর আপনাদের ওপর থাকবে। দু জায়গাতেই এই চেষ্টার মূলে আছে হিন্দুত্বের ভূত দেখা এবং হিন্দুত্বের সঙ্গে সংস্কৃতকে মিলিয়ে দেখার অভ্যাস। তফাৎটা এইখানে — বাংলাদেশে আছে আরবি-ফার্সি দিয়ে শূন্যতা পূরণের কল্পনা, আর পশ্চিমবাংলার অবস্থা আরও বিপজ্জনক; তাঁরাও বাংলাভাষার মূলে সংস্কৃতকে সক্রিয় থাকতে দিতে চান না, কিন্তু যাবেন কোথায় তাও জানেন না, ফলত তাঁদের এক দিশেহারা অবস্থা। তবে এই সংস্কৃত-উচ্ছেদ-আগ্রহীদের মনে করিয়ে দিতে চাই — মাইকেল-এর 'হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব' কবিতাটির কথা। মাইকেল বলছেন, তিনি মণিজালে পূর্ণ মাতৃভাষা পেয়ে গেছেন এবং তিনি তাতে সুখী। ভেবে দেখবেন, এটি গ্রামবাংলার বাংলা ভাষা বা কাব্য নয়, এবং কোনো মতে তা হতে পারে না। মাইকেলের কাছে বাংলা আর সংস্কৃতের ঐশ্বর্য যেন যৌথ সম্পদ। এবং এর মূলে রয়েছে ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি, যা কিনা সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার প্রায় প্রতিটি শব্দের মূলে আজও সক্রিয়। তাই, এর পর থেকে নিবন্ধে বাংলা-সংস্কৃত ঐশ্বর্য বোঝাতে 'আমাদের ক্রিয়াভিত্তিক (বাংলা বা সংস্কৃত) ভাষা' শব্দটি ব্যবহার করব, এই দুই ভাষার মিলিত রাজ্যকে বোঝাবার জন্য।

২. বাংলাভাষার সম্পদ

আমাদের বাংলাভাষার সম্পদস্বরূপ তার মহত্তম অর্জন রয়েছে তার শব্দ তৈরির নিয়মে। সে-নিয়মের কথা এখন থাক, কেবল উদাহরণ দিয়ে দেখাব সেই সূত্রে আমরা কী পেয়েছি। **পদ** শব্দটি দিয়েই foot, position, বাক্যের ভিতরের শব্দ, কবিতার পঙ্‌ক্তি, কবিতা, এমনকি রন্ধনের dish পর্যন্ত বোঝানোর মধ্যে কোনো অসঙ্গতি কোনোদিন বাংলাভাষীর চোখে পড়ত না এবং বলা যায়, এখনও এদেশের বাঙালি সমাজের মধ্যে চলাফেরা করেন এমন বাঙালির চোখে পড়ে না; (একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখিয়ে দেওয়া যায়, এখানে শব্দ সৃজনের ক্ষেত্রে কোনো মূলগত ত্রুটি নেই।[৬]) অথবা *সিদ্ধডিম* আর *সিদ্ধপুরুষ* নিয়েও কোনো অস্বস্তি বোধ করেন না বাংলাভাষীরা; যদিও এমন হওয়ার কারণ জানেন না আধুনিক বাঙালিরা প্রায় কেউই।

কিন্তু মনের দিক থেকে আগের শব্দার্থতত্ত্ব থেকে চ্যুত হয়ে যাওয়ার ফলে ইংরেজি-লেখাপড়া-শেখা বাঙালি প্রতিটি বাংলা শব্দের সমর্থন খুঁজতে লাগলেন ইংরেজিতে। **ধর্ম** শব্দটি হয়ে গেল Religion-এর প্রতিশব্দ, **অর্থ** শব্দটি হল Money বা Meaning-এর, **পদ** শব্দটি প্রতিশব্দ হল foot বা position-এর। Religion, Money/Meaning, Foot/Position ইত্যাদি ছাপিয়ে আরও অনেক কিছু বোঝানোর যে-ক্ষমতা ছিল যথাক্রমে ধর্ম, অর্থ, পদ

ইত্যাদি শব্দের, সে-ক্ষমতা কার্যক্ষেত্রে এই শব্দগুলি হারিয়ে ফেলল। অগণিত শব্দের ক্ষেত্রে এমন ঘটায় সমগ্রভাবে বাংলা শব্দভাণ্ডারের ব্যাপকভাবে অর্থহানি ঘটে গেল; এবং বহুক্ষেত্রে সূক্ষ্ম ও মারাত্মকভাবে। **ভাব** শব্দটিকে যখন idea বা urge-এর সমার্থক করা হয়, **প্রকৃতি**কে nature-এর, **আকাশ**কে sky-এর, **বস্তু**কে matter-এর, **যুক্তি**কে reason বা argument-এর (এরকম অগুনতি উদাহরণ দেওয়া যায়); তখন সমগ্রভাবে আমাদের চিন্তাকাঠামোই পঙ্গু হয়ে যায়।[৭]

এই রকম করে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি বেশি করে আশ্রয় খুঁজল ইংরেজি ভাষায়, কোথাও দাঁড়ানোর একটি নিশ্চিত জায়গা পাবার আশায়। তার নিজস্ব যে অর্জন ছিল, শ্রেণীগতভাবে মধ্যযুগের ব্রাহ্মণ তাকে অনাদর করলেও পাঠানরাজা তাকে যথেষ্ট সম্মান দিয়েছিলেন। কিন্তু ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ এসে তার আকাশটাকেই অস্বীকার করে বসল। কিন্তু মাথার উপরে আকাশটাতো চাই! আর, ভাষা-সংস্কৃতি-দর্শনই তো মানুষের মাথার উপরের প্রকৃত ছাদ, তার আকাশ![৮] দেশের শাসক যদি সেই আকাশকে দেখতে না-পেয়ে অস্বীকার করে, শাসিতের মাথায় তার 'আকাশ ভেঙে পড়ে'। সে দিশাহারা হয়ে যায়। এই অবস্থাতেই প্রায় একশো বছর কাটিয়ে দিশাহারা বাঙালি একদিন বিদ্যাসাগর রামমোহনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিল, নিজস্ব সংস্কৃতির আকাশটি যদি আমাদের সুরক্ষা দিতে না পারে, তবে বরং ইয়োরোপের 'আধুনিকতা'র আকাশটিই দিক। শিক্ষিত বাঙালিদের মাথা থেকে বাঙালির নিজস্ব পরম্পরাগত আকাশটি সরে গিয়ে তার স্থানে দেখা দিল ইয়োরোপীয় আকাশের ছায়া। এর পর থেকে বাঙালির নিজস্ব আকাশের স্থান হল গ্রামবাংলায়, তথাকথিত অশিক্ষিতদের মধ্যে, ক্ষয়িষ্ণু হয়েও সেখানেই টিকে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে লাগল সে। কার্যত আমাদের ভাষা-সংস্কৃতি থেকে ইয়োরোপের ভাষা-সংস্কৃতির বড় পার্থক্য এই যে, আমাদের শব্দসমূহে ইঙ্গিত থাকে যত ক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে, হচ্ছে বা হবে, তাদের দিকে; পশ্চিমী ভাষায় শব্দের উদ্দেশ্য হল ক্রিয়ার কর্তা কর্ম প্রভৃতিকে সুস্থিত এবং বাহ্য রূপে সুনির্দিষ্ট সত্তার অধিকারী হিসাবে দেখানো। এই প্রবন্ধেই কিছু পরে আলোচনা প্রসঙ্গে দেখানো হয়েছে, পাশ্চাত্যের কয়েকটি ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষায়[৯] আমাদের 'লোক' শব্দটির জ্ঞাতি শব্দগুলি ভাবগত বিশ্লেষণের ফলে কত বিভিন্ন আকার পেয়েছে; এবং তার ফলে lux, look, locus, logos প্রভৃতি শব্দ পরস্পর সম্পর্কহীন বলে মনে হয়েছে পাশ্চাত্যের ভাষাবিজ্ঞানীর কাছে। সেই রকম অঙ্গার-এর জ্ঞাতি শব্দ বিশ্লিষ্ট হয়ে anger এবং hunger এই রকম সম্পর্কহীন দুইটি পৃথক শব্দ হিসেবে স্থান পেয়েছে ইংরেজি ভাষায়।

এর ফল হল মারাত্মক। শিক্ষিত বাঙালির মাথার উপর সক্রিয় হল ইয়োরোপের আকাশ, সেই শিক্ষিত বাঙালি হল তার জাতির পথপ্রদর্শক পরিচালক, যে-জাতির মাথার উপরের আকাশটাই ভিন্ন স্বভাবের। তার ভাষায়, অভ্যাসে, রক্তে পরম্পরাগত আকাশের তলায় বাস করবার আচরণ পুরো মাত্রায় সক্রিয়। শুরু হল ইয়োরোপের আকাশ কর্তৃক বাংলাভাষীর মনোলোকের আকাশ দখলের লড়াই।

বাংলা শব্দসমূহের যে ব্যাপ্তি ও দ্যোতনক্ষমতা ছিল, যদিও তার অনেকটাই অব্যবহৃত হয়ে পড়ে থাকত, আধুনিকতার সূত্রপাতের পর এবার তা বলতে গেলে এক কোপেই হারিয়ে গেল। বাংলা হয়ে গেল যেন একটি রক্তাল্পতাগ্রস্ত ভাষা। ধাতুর আগে উপসর্গ ও পরে প্রত্যয় জুড়ে যে-বিশাল শব্দরাজ্য বাংলায় সৃষ্টি করা যায়, সেখানে সৃজনশীল ভাবে বিচরণ করার অধিকার হারিয়ে ফেলল আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি। এমনকি তার মনে হতে লাগল, আমার ভাষা দরিদ্র, ইংরেজির তুলনায় শব্দসম্ভারে অনেক হীন। সত্যি কথাটা এই, এইরকমের হীনম্মন্যতা নিয়েই পশ্চিমের সংস্কৃতিজগতে প্রবেশ ঘটছে আমাদের এযুগের বাংলাভাষীদের।

কিন্তু সত্যিই কি আপনার-আমার ভাষা দরিদ্র বা হীন?

এই প্রশ্নের আলোচনার সূচনায় ভাষাসম্পদ বললে আসলে কী বোঝাতে পারে তার দিকে একটু নজর দেওয়া প্রয়োজন। কোনো বিশেষ ভাষার অভিধানে কত শব্দ দেখানো আছে, তা দিয়ে নিশ্চয় এ প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। ভাষায় যে সম্পদ আছে, তা দিয়ে ঐ ভাষাভাষীদের কতটা সুবিধা হচ্ছে ভাবপ্রকাশ ও ভাববিনিময়ের ক্ষেত্রে, সেটিই আসল বিচার্য। এ প্রসঙ্গে আর একটি জিনিসও মনে রাখতে হয়। যে-শব্দগুলি চোখে-দেখা, কানে-শোনা ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিসকে সূচিত করে, তাদের নামের বেলায় আমাদের দাবি একটাই — শব্দগুলি যেন আমাদের পক্ষে সহজে ব্যবহারযোগ্য হয়। কিন্তু যে শব্দগুলি নানান বিমূর্ত ভাবকে ব্যক্ত করে, তাদের একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। তারা আমাদের ভাবনাচিন্তার সহায়ক এবং উদ্দীপক হতে পারে, আবার তারা আমাদের প্রকৃত ভাবনাচিন্তার অন্তরায়ও হতে পারে। বুঝবার সুবিধার জন্য একটি পশ্চিমী উদাহরণই টানা যাক। বাংলা আমাদের জননী হলেও, ইংরেজিই যে এখন আমাদের পালিকা-মা! ইয়োরোপের আকাশের তলাতেই যে আমরা আধুনিক বাঙালিরা বড়ো হয়ে উঠেছি। সুতরাং একবার ইংরেজি, ফরাসি ও জারমান ভাষার পরিভাষার দিকে নজর দেওয়া যাক।

মাটি, জল, হাওয়া প্রভৃতি জড়জগতের জিনিস, সুদূর অতীত থেকে চলে-আসা পারিবারিক সম্পর্ক, এমনকি সপ্তাহের সাতদিন ইত্যাদির বেলায় যেসব নাম ইংরেজিতে পাই, সেগুলি ইংরেজির জ্ঞাতি-ভাষাসমূহে (অর্থাৎ ডাচ, জারমান, ড্যানিশ প্রমুখ জারমানিক ভাষায়) ব্যবহৃত শব্দসমূহের অনুরূপ। কিন্তু উচ্চাঙ্গের মানসিক চর্চার ক্ষেত্রে, নানান ঐতিহাসিক কারণে ইংরেজি শব্দভাণ্ডারের চরিত্র অন্যরকম। সেই এলাকায় ইংরেজির শব্দভাণ্ডার ল্যাটিন, ল্যাটিন-উদ্ভূতা ফরাসি, অথবা (সরাসরি কিংবা ঘুরপথে) গ্রীক থেকে ধার-করা। এই রকমের শব্দভাণ্ডার ইংরেজি বা এমনকি ফরাসির পক্ষেও শুভ হয়েছিল, তা বলা চলে না। কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে এ প্রসঙ্গে। ইংরেজ বা ফরাসি কোনো Barmaid (পানশালার পরিচারিকা)-কে যদি জিজ্ঞেস করা যায়, Constellation অথবা Conscience বললে কী জাতের জিনিস বোঝাতে পারে, তবে কোনো সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যাবে না। অথচ ঠিক এক পর্যায়ের কোনো জারমান নারীকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় Gestirn (= Constellation) অথবা Gewissen (= Conscience) শব্দের কী রকমের মানে হতে পারে, তবে সঠিকের ধারে-

কাছে আসে এমন উত্তর পাওয়ারই সম্ভাবনা। কেননা Stern (নক্ষত্র), Wissen (= know) হল জারমান ভাষায় নিত্যব্যবহৃত শব্দ, এবং সমষ্টিগত ব্যাপ্তি বোঝাতে Ge নিত্যব্যবহৃত উপসর্গ। এমন অবস্থা রাতারাতি হয়নি। রেনেসাঁস এবং পরবর্তীকালে ইংরেজ যেখানে তত্ত্বালোচনার ক্ষেত্রে ল্যাটিন (এবং গ্রীক) থেকে অনর্গল শব্দ আমদানি করতে লাগল, জারমানরা প্রথমে তা করলেও অল্প পরেই স্বাবলম্বনের রাস্তা ধরল। অর্থাৎ নিজের ভাষার উপাদান নিয়ে পরিভাষা তৈরি করে নিতে লাগল। ফলে দর্শন ও বিজ্ঞানের পরিভাষা জারমানের কাছে অনেক স্বচ্ছ, যে সম্পদটি ইংরেজের ঘটল না। ফরাসির ভাগ্যও এদিক থেকে বিশেষ ভাল না; ল্যাটিন-জাত ভাষা হলেও ফরাসিভাষার মধ্যে ল্যাটিনের যথেষ্ট সৃজনশীল উপস্থিতি নেই। অষ্টাদশ, ঊনবিংশ, এমনকি বিংশ শতাব্দীতেও উচ্চাঙ্গের তত্ত্বের সৃষ্টি ও বিকাশের ক্ষেত্রে ইংরেজ বা ফরাসির তুলনায় জারমানরা যে অনেক বেশি কৃতী, তার মূলে আছে তাদের পরিভাষার স্বচ্ছতা ও সহজ ব্যবহারযোগ্যতা। স্মরণ করা যায় যে, কান্ট হেগেল মার্কস আইনস্টাইন ফ্রয়েড — সকলেই তাঁদের অসামান্য মৌলিকতার বনিয়াদ সৃষ্টি করেছিলেন জারমান ভাষায়। পাণ্ডিত্য, স্বচ্ছ দৃষ্টি, প্রজ্ঞা ও সৃজনশীলতার একত্র সম্মিলনে সমগ্র ইংরেজি সাহিত্যে যাঁর জুড়ি নেই, সেই কোলরিজ বলেছিলেন — তাঁর জানা মোট দুটি ভাষায় গভীর আলোচনা করা যায়, একটি গ্রীক, আর একটি জারমান।

যাই হোক, ইংরেজির তুলনায় বাংলাভাষা হীন কি না, এটিই আমাদের আলোচ্য। সেই প্রসঙ্গে ফিরে আসছি।

ব্যাকরণ, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন — প্রথমেই কয়েকটি অতি প্রচলিত শব্দ নিচ্ছি। অল্প চেষ্টাতেই বোঝা যায়, ইংরেজি প্রতিশব্দ — যেগুলি আবার গ্রীক বা ল্যাটিন থেকে আসা সাধারণ ইয়োরোপীয় উত্তরাধিকার — তাদের তুলনায় বাংলা শব্দগুলি কত বেশি যথাযথ এবং ব্যাপক। Grammar বললে বোঝায় খোদাই করে বা আঁচড় টেনে লেখালিখি সংক্রান্ত বিদ্যা; সেখানে ব্যাকরণ শব্দটিতে বোঝায় ভাষাকে বিশেষ আকারে এনে তার বিশ্লেষণ। Literature বললে বোঝাতে পারে letters বা বর্ণ সংক্রান্ত কিছু, বা বর্ণাকারে লিখিত কিছু ভাষা; আর সাহিত্য শব্দ থেকে বোঝা যায় এটি মানুষকে মানুষের নিকটে আনে। তেমনি History (= histor বা জ্ঞানী লোকের জ্ঞান), অথবা philosophy (= Sophia বা প্রজ্ঞার প্রতি আকর্ষণ) শব্দের পাশে কত বেশি যথাযথ ও সমৃদ্ধ ইতিহাস (ইতি হ আস = এইরূপ ছিল) বা দর্শন শব্দটি। আর, আমাদের 'অধ্যাত্মবিদ্যা'কে বোঝানোর মতো কোনো শব্দই নেই ইংরেজিতে। তাছাড়া, পশ্চিমের শব্দগুলির তাৎপর্য খুঁজতে হয় অভিধানে, বা বেশির ভাগ মানুষ ঐ শব্দ দিয়ে কী বুঝছে তার থেকে অনুমানে। আর বাংলা বা সংস্কৃত শব্দের তাৎপর্য তার উপাদান থেকেই পরিস্ফুট।

এরকম অনেক পারিভাষিক শব্দ দেওয়া যায়, যেখানে আমাদের ভারতীয় শব্দ পশ্চিমী শব্দের তুলনায় অনেক বেশি সমৃদ্ধ। Status-এর জ্ঞাতি State শব্দটিতে বোঝায় যা দাঁড়িয়ে আছে, আর **রাষ্ট্র** বললে বোঝায় যার সাহায্যে 'রাজ' (= রাজ্যশাসন) করা যায় (✓রাজ্ +

৪) যেমন মননের জন্য **মন্ত্র**, শাসনের জন্য **শাস্ত্র**, পান বা পালনের জন্য **পাত্র**, সেইরকম। Truth শব্দের জ্ঞাতি truth-এর আদি মানে চুক্তিতে বিশ্বস্ততা অথবা কথা রাখা, আর **সত্য** বলতে বোঝায় সৎ (অর্থাৎ যা আছে, যা বিদ্যমান)-এর গুণ বা তার প্রতি আকর্ষণ বা নিষ্ঠা।

পশ্চিমের ভাষাগুলির শব্দভাণ্ডারের বড় অংশই নানা ঘটনা-সমাবেশের ফলে ভাষার মধ্যে জায়গা পেয়েছে। রাজকোষকে Exchequer, পার্লামেন্টের সভাপতিকে Speaker, ফটোকপিকে Xerox, সামাজিক বর্জনকে Boycott; এমনকি মহান নাট্যসৃষ্টিকে Tragedy (ছাগগীতি) — সর্বত্র এই তাৎক্ষণিকতার মনোভাব ফুটে ওঠে। আর আমাদের দেশের পরিভাষার সর্বত্রই প্রতিটি সত্তাকে তার ক্রিয়ার পরিচয়ে চিহ্নিত করার চেষ্টা। এ প্রসঙ্গে বিশেষ সত্যকথা এই যে, ক্রিয়াভিত্তিকতা যদি ভাষার সাধারণ চরিত্র না হত, তবে শুধু পরিভাষার শব্দে এই বৈশিষ্ট্য দেখা যেত না। ভাষার সাধারণ শব্দই তো বারেবারে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে পারিভাষিক শব্দ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে যায়।

ক্রিয়াভিত্তিকতাই আমাদের দেশের প্রাচীন ভাষার শব্দার্থতত্ত্বের মূল নীতি। কলিম খান-এর ভাষাতাত্ত্বিক উদ্যোগের গৌরব ঠিক এইখানে, এই শব্দার্থতত্ত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠায়। তিনি দেখালেন, প্রতিটি প্রাতিপদিক (বা বিশেষ্য শব্দ) কোনো ধাতু (বা ক্রিয়ার নাম) অবলম্বন করে সৃষ্টি হয়েছে — যাস্কমুনির এই প্রাচীন তত্ত্বটি একটি ব্যাকরণের কেতাবি তত্ত্ব মাত্র নয়। এ তত্ত্বটিকে যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে ভাষাবিচারে এগোলে পর, আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্য ও ঐতিহ্যের নানা রহস্য একটার পর একটা উন্মোচিত হতে থাকে। আর সেই সঙ্গেই বোঝা যায়, আমাদের ভাষার কী বিপুল শক্তি, আর কী সম্পদ ধরা আছে নিছক ভাষাটির মধ্যে।

মোটকথা, আমাদের শব্দসম্ভার যে ইংরেজি বা পশ্চিমী শব্দসম্ভারের তুলনায় অনেক বেশি যথাযথ এবং ব্যাপক, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এর কারণ, আমাদের বাক্য নির্মাণের কৃৎকৌশল — বিস্তার, স্বল্প উপকরণে অধিক কার্যসিদ্ধির ক্ষমতা, উদ্ভাবনী সৃজনশীলতা, স্বচ্ছতা এবং অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞাদৃষ্টি। এই সব ক'টি গুণের মূলে আছে আমাদের ভাষায় শব্দগঠন ও শব্দ-ব্যবহারে ক্রিয়াভিত্তিকতার নীতি। এই নীতি পালনের মধ্যে কোনো জটিলতা নেই। ধাতুর সংখ্যা ইংরেজি verb-এর সংখ্যার তুলনায় অনেক অনেক কম। কিন্তু প্রয়োজন মতো ধাতুর শেষে আসে প্রত্যয় আর বিভক্তি এবং আগে বসে যায় উপসর্গ। সেই প্রত্যয়-বিভক্তি-উপসর্গের সংখ্যাই বা কত? সব মিলিয়ে দাঁড়ায় প্রায় ৩২০টি মূল ধাতু, তার ৭ বিভক্তি, ৩ বচন, প্রায় ২০০ প্রত্যয় ও ২০টি উপসর্গ। লিঙ্গ সন্ধি সমাসের কথা বাদ দিয়ে দিলেও কত শব্দের প্রজনন-ক্ষমতা ধরে আমাদের এই ভাষা? ৩২০ × ৭ × ৩ × ২০০ × ২০ = ২৬৮৮০০০০। এত বেশি অবশ্য হয় না, কারণ প্রত্যয়-উপসর্গ সর্বত্র ব্যবহৃত হয় না। সংখ্যাটি তাই খানিকটা কমে যায়। তা সত্ত্বেও তা ইংরেজির তুলনায় বহু গুণ বেশি। অর্থাৎ আমাদের ভাষায় দৃশ্যত এই স্বল্প উপকরণের সাহায্যে, নানারকম সংযোজনের জোরে, অর্থের এক বিশাল এলাকায় আমাদের দখল কায়েম হয়ে যেত। ভাষার এই নীতি চালু রাখার জন্য প্রয়োজন হত পরিলক্ষিত জগতের যাবতীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার চরিত্র বিচার — যার ফলে বহু

অসদৃশ প্রাণী বা বস্তুর মধ্যে ক্রিয়াগত সমধর্মিতা সহজেই চোখে এসে যেত। ফলে বিশাল এলাকার যাবতীয় ক্রিয়ার যথাযথ বর্ণনা দেওয়া যেত। ভাষার উদ্ভাবনী সৃজনশীলতা অব্যাহত থাকত। এবং অবশ্যই শব্দসম্ভারের স্বচ্ছতা মানুষকে দিতে পারত ভাব ও চিন্তার জগতে বিরাট মুক্তি।

এই বক্তব্যের সমর্থনে কৃ (= কর্ = করা) ধাতু থেকে তৈরি বাংলায় নিত্যব্যবহার্য কিছু শব্দ তুলে ধরছি : আবিষ্কার, পুরস্কার, তিরস্কার, বহিষ্কার, পরিষ্কার, সংস্কার, আকার, প্রকার, বিকার, উপকার, অপকার, অধিকার, সৎকার, চমৎকার, ধিক্কার, ন্যক্কার, অহঙ্কার, অলঙ্কার, স্বীকার, অঙ্গীকার, চিৎকার, ফুৎকার ইত্যাদি। আকৃতি, বিকৃতি, প্রকৃতি কিংবা কর্তব্য, করণীয়, কৃতার্থ ... এসব এখন থাক। তালিকাটি আরও অনেক বড় করা যায় স্বচ্ছন্দেই। তবে লক্ষণীয় এই যে শব্দগুলি এদের ইংরেজি প্রতিশব্দসমূহের তুলনায় কত বেশি সুসংবদ্ধ, স্বচ্ছ, সহজবোধ্য, এবং সহজে ব্যবহারযোগ্য; অথচ শব্দগুলি একই ক্রিয়াজাত বলে তাদের পৃথক শব্দ হিসেবে ধরা হয় না, যদিও একেবারে পৃথক ভাব বা বস্তুকে তারা শনাক্ত করে। বিপরীতে ইংরেজি প্রতিশব্দগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কহীন, এবং সেকারণেই গুনতিতে সংখ্যায় বেশি। বলে রাখা যাক, **-কার**-এর আগে যে শব্দখণ্ডটি জোড়া আছে, তারা ভাষার নানান ক্ষেত্রে এত ব্যবহৃত হয় যে, বাংলাভাষী সহজেই শব্দটির অর্থ অনুমান করে নিতে পারেন। পরিশেষে আপনাদের মনে করাই যে, শেষকালের -কার-এর বদলে -কর, -কর্, -কারণ, -কারক, -কৃত -কৃতি ইত্যাদি যোগ করে আরও কত কত নিত্যপ্রয়োজনীয় শব্দ বাংলায় ব্যবহার হয়, তার হিসাব করে নিন। এর পরেও বাংলা শব্দের সংখ্যা কম কেন? দশগুচ্ছ আঙুরকে দশটি ফল বলে ধরলে এবং তার সঙ্গে একশোটি কুলকে তুলনা করলে আঙুরের সংখ্যা কম তো হবেই। তাই ইংরেজির তুলনায় বাংলা শব্দের সংখ্যা কম।

এখন স্বল্প কয়েকটি ধাতু দিয়ে দেখাতে চেষ্টা করব, কত কম উপকরণের সাহায্যে কত বেশি ভাব আমাদের ভাষায় প্রকাশ করা হয়। ধরা যাক, কোনো একটি সম্মেলনের ব্যবস্থা হচ্ছে। প্রস্তুতিপর্বে এমন বাক্য যে কেউ লিখতে পারেন :

> প্রায় এক ***যুগ*** পরে যে সম্মেলনের ***উদ্যোগ*** (= উৎ + যোগ) নেওয়া হয়েছে, সেখানে কত লোক ***যোগ*** দিচ্ছেন, কত ***আয়োজন*** করতে হবে, এবং ***যোগ্যতা*** অনুযায়ী কত লোককে কাজে ***নিযুক্ত*** করার ***প্রয়োজন*** হবে, সে বিষয়ে এখন ***যুক্তি*** পরামর্শ হচ্ছে এবং নানারকম ***যোগাযোগ*** চলছে।

লক্ষ্য করুন, মাঝারি দৈর্ঘ্যের এই বাক্যে ✓যুজ্ ধাতু থেকে তৈরি শব্দ কতবার ব্যবহৃত হয়েছে; বাক্যটির ইংরেজি অনুবাদ করে দেখুন, দেখবেন পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কহীন ক'টি ইংরেজি noun বা verb root-এর সাহায্য নিতে হয়, সেটিও একবার মিলিয়ে দেখুন। যে কোনো রকমের যোগ ঘটলে, জুড়ে (= যুড়ে) দেওয়া, যুতে দেওয়া, বা যুক্ত হওয়ার অথবা যুক্ত করার ব্যাপার হলেই — তা সে জড়বস্তু-প্রাণী বা কোনোরকমের ভাব, যাই হোক না কেন — ✓যুজ্ ধাতুটির ব্যবহার সম্ভব। অর্থাৎ যদি বিভিন্ন কাজের মধ্যে কোনো মূলগত

ঐক্য থাকে, তবে একটি ধাতু দিয়েই অনেক বিভিন্ন কাজকে বোঝানো যাবে। সেই ঐক্যটি বুঝে নিয়ে ধাতু এবং ক্রিয়াপদের সৃষ্টি এবং ব্যবহারেই বাংলা (বা সংস্কৃত) ভাষার কৃতিত্ব। ধরা যাক ✓মন ধাতুটি (= মনে করা)। এই ধাতু থেকে নিষ্পন্ন শব্দগুলি কত ভিন্ন কাজকে সূচিত করে, কিন্তু একটি মূলগত ঐক্যের জোরে উপসর্গটির সাহায্যে স্পষ্ট অর্থের সৃষ্টি হয় প্রতিটি ক্ষেত্রে : প্রমাণ (= proof), অনুমান (= guess, infer), সম্মান (= honour), উপমান (= simile?), অভিমান (?), অপমান (?), বিমান (= বিশেষ মান, যেটা উঁচুতে অধিষ্ঠানেই সম্ভব)। দিশানির্দেশ বা ✓দিশ্ ধাতু থেকেও কী শৃঙ্খলার সঙ্গে তৈরি হচ্ছে এই সব শব্দ : দেশ, প্রদেশ, উদ্দেশ, নির্দেশ, আদেশ, সন্দেশ (= news), উপদেশ ...।

তাৎপর্যময় নতুন শব্দসৃষ্টিতে উপসর্গ (prefix) এবং প্রত্যয় (suffix)-এর ভূমিকা কম নয়। শুধু উৎ (= উপরের অভিমুখে) উপসর্গের সাহায্যে তৈরি শব্দাবলীর কিছু নমুনা দিচ্ছি : উদাহরণ (= উৎ + আহরণ), উদ্দেশ্য, উত্থাপন (= উৎ + স্থাপন), উদয় (= উৎ + অয় = উপরে আসা), উদ্যোগ (= উৎ + যোগ), উদ্যম (= উৎ + যম), উত্তেজনা, উৎপাত, উচ্ছ্বাস (= উৎ + শ্বাস), উৎসর্গ (= উৎ + সর্গ), উল্লেখ, উদ্ভিদ (= যা উপরের দিকে ভেদ করে ওঠে), উৎপত্তি ইত্যাদি। প্রত্যয়ের উপযোগিতা দেখানোর জন্য মাত্র দুটি প্রত্যয়ের ব্যবহার থেকে কিছু উদাহরণ উল্লেখ করছি। যার সাহায্যে কোনো ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, সেই বস্তু বা সত্তাটি চিহ্নিত হয় ধাতুর সঙ্গে 'ত্র' প্রত্যয় ব্যবহার করে; যথা মন্ত্র (মন্ + ত্র), যন্ত্র (নিয়ন্ত্রণ বা নিয়ম বা যম্ + ত্র), পাত্র (পান / পালন = পা + ত্র), শাস্ত্র (শাস্ + ত্র), রাষ্ট্র (রাজ্ + ত্র), নেত্র (নী + ত্র = যা কাছে নিয়ে আসে)। আবার, শব্দের শেষে -র এর অবস্থান থেকে বুঝি কোনো গুণের উপস্থিতি ঘটেছে, যথা ভঙ্গুর, স্থবির, স্থির, ছিদ্র (যেখানে ছেদনকার্য সম্ভব), বিদুর (জ্ঞানী, <✓বিদ্), মেদুর, কম্প্র, নম্র (✓নম্ = নত হওয়া), ধীর ইত্যাদি।

বাংলাভাষার মূলে সংস্কৃত ভাষার যে ঐশ্বর্য রয়েছে, তার সম্বন্ধে যাঁরা খোঁজখবর রাখেন, তাঁদের পক্ষে এত উদাহরণ অপ্রয়োজনীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁরা তা আদৌ জানেন না, তাঁদের কথা ভেবেই এই উদাহরণ কয়টি দিতে হল। কারণ, আমি নিজেকে দিয়েই বুঝি। আমরা এ-যুগের লেখাপড়ায় শিক্ষিত বাঙালিরা ইংরেজি ভাষার ছটায় মুগ্ধ, এবং আমাদের অভ্যাস হ'ল আমাদের ভাষাকে ইংরেজির তুলনায় শক্তিহীন মনে করা। মানসিক চর্চার বেলায় আমরা দাঁড়ানোর মতো শক্ত জায়গা খুঁজি ইংরেজির ভাবনার জগতে। আর ওদের নানান term বা প্রত্যয়বাহী শব্দের প্রতিশব্দ খুঁজতে আসি বাংলায়। তারপর ওদের শব্দের — appearance, reality, matter, nature, substance, dialectics, capital, epic, discourse প্রভৃতির — যথাযথ প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় খুঁজে না পেয়ে ভাবতে থাকি আমাদের ভাষাতেই আছে খামতি। এ সম্ভাবনাটা খতিয়ে দেখি না যে, ওদের ভাষা এবং আমাদের ভাষা, দুই ভাষাতে ছক সাজানোর পদ্ধতি (= discourse) তো আলাদা হতে পারে। আমরা ভুলে যাই ইংরেজির তথাকথিত বিশাল শব্দভাণ্ডার (যথা, হঠাৎ-মনে-আসা কিছু নমুনা উদাহরণ — Xerox, Sandwich, Cardigan, Bunkum, Juggernaut, Speaker,

Boloney, Mollycoddle, Mishmash, Hunky-dory, Scribble, Stagger ইত্যাদি ইত্যাদি) গড়ে উঠেছে একটা বিশেষ নীতিতে — তা হল, ভাবগত বনিয়াদকে গুরুত্ব না দিয়ে, তাৎক্ষণিক সুবিধার ভিত্তিতে প্রায় নির্বিচারে শব্দ তৈরি ও শব্দ আমদানি। ইংরেজিতে গড়ে উঠেছে স্বয়ংভর, অসংলগ্ন, ও অসম্পৃক্ত শব্দের বিপুল সমাবেশ।[১০] তার ওপর দুই শতাব্দীর বেশি কাল ধরে বিশ্বরাজনীতিতে ইঙ্গ-মার্কিন দাপটের ছায়ায় ইংরেজি ভাষার অবিরাম ঢক্কানিনাদ এবং বাণিজ্য, উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যের সুবাদে ইংরেজির ক্রমান্বয় প্রসার, সব মিলিয়ে সৃষ্টি হয়েছে ইংরেজি ভাষার অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্বের কিংবদন্তী। নিজস্ব সৃজনশীলতার গুণে রবীন্দ্রনাথ (এবং তাঁর আগে মাইকেল ও বঙ্কিম) অবশ্যই বুঝেছিলেন সংস্কৃতপুষ্ট বাংলার শক্তি। কিন্তু এই শক্তির কোনো সহজ যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা তাঁরা দিয়ে যেতে পারেননি; সময় তার পক্ষে অনুকূল ছিল না বলে। রবীন্দ্রনাথ যে ভাল করেই উপলব্ধি করেছিলেন সংস্কৃত ভাষা থেকে আসা উপাদানের অসীম গুরুত্ব, তার অকাট্য প্রমাণ হল এই যে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' গ্রন্থটির সৃষ্টির মূলে আছে রবীন্দ্রনাথের অকৃপণ প্রেরণা।

এই প্রসঙ্গে এ কথাও মানতে হবে যে — বঙ্গভূমিতে বাংলাকে বিদ্যাচর্চার বাহন করাতে রবীন্দ্রনাথের যে বিপুল সমর্থন ছিল, তার মূলে আছে দেশের সকল মানুষকে নিয়ে মুক্তির সাধনা এবং আধুনিক বিদ্যাচর্চার আঙিনায় দাঁড়ানোর ঐকান্তিক আগ্রহ। সেখানে বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে কোনো তত্ত্বঘোষণা ছিল না। তা যদি থাকত, তা হলে ইংরেজির তুলনায় বাংলার শব্দভাণ্ডারের দৈন্যের কল্পনা ক'রে তা নিয়ে খেদ করতেন না ভাষাচার্য সুনীতিকুমার, তাঁর পরিণত বয়সের সৃষ্টি 'ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' গ্রন্থে।[১১] এ বিষয়ে একেবারে কঠিন সত্য এই যে, বাংলা তথা সংস্কৃতের শব্দভাণ্ডারের ক্রিয়াভিত্তিক উৎপত্তিকে যথোচিত গুরুত্ব না দিলে বাংলা এবং সংস্কৃতের বিপুল কার্যকারিতাকে কিছুতে উপলব্ধি করা যায় না। উল্টো পক্ষে সেই পদ্ধতি নিয়ে এগোলে — যে-কাজ পশ্চিমবঙ্গের অ্যাকাডেমির চোখে taboo লেখক কলিম খান গত দুই দশক ধরে করেছেন, করছেন — বহু যুগ ধরে আগলে রাখা 'যক্ষের ধন' যেন চলে আসে আমাদের সকলের হাতের মুঠোয়।

আরও কিছু কথা আপনাদের মনে করিয়ে দিয়ে ভাবের বাহন হিসেবে আমাদের 'ক্রিয়াভিত্তিক বাংলাভাষা'র অসামান্যতার প্রসঙ্গে ইতি টানব। বিশ্বসংসারের চলমানতা বা পরিবর্তনশীলতার তত্ত্ব আমাদের ভাষার ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট। জগৎ, সংসার, চরাচর — এই শব্দ তিনটির মধ্যে গতির দ্যোতনা মাঝারি শিক্ষিত বাঙালিও অনুভব করেন। এর পাশে world, universe, cosmos ইত্যাদি শব্দে এমন কিছু ভাব খুঁজে পাওয়া যায় না। এই চলমান বিশ্বে যে কোনো রকমের অস্তিত্বের মধ্যে আবর্তন যে আছে, তার স্বীকৃতি রয়েছে আবর্তন, পরিবর্তন, বর্তমান, বৃত্তি, বার্তা (= যা ঘটছে তার খবর) প্রভৃতি শব্দে, এমনকি বেঁচে-বর্তে থাকার মতো গ্রাম্য শব্দমেল-এর মধ্যেও। ইংরেজি লেখক Time, the Refreshing River নামে বই লিখলে, ফরাসি পরিচালক The River নামে ছবি তুললে আমরা তার মধ্যে মনীষার প্রকাশ দেখি, কিন্তু আমাদের ভাষায় এইরকম ধারার কল্পনা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা তো

চারিদিকে ছড়ানো। জগৎসংসার, চরাচর ছেড়ে একবার গঙ্গার কথাটিই ভাবুন না কেন। শ্রেষ্ঠ ধারা গঙ্গা (✓গম্ + গ + আ = নিত্যগমনশীলতা) এবং তার নানা রকমের মাহাত্ম্য বর্ণনার মধ্যে তার পরিচয় পাই।[১২] ওদের দেশের ভাষায়, ঈশ্বরপুত্র (Son of God) মানবকায়া পরিগ্রহণ (incarnation) করেন। আমাদের ভাষায় ঈশ্বর **অবতীর্ণ** হন ধরার মধ্যে বা ধারায় **অবতরণ** করেন, তাই আমরা পাই ঈশ্বরের **অবতার**। নানা ক্ষেত্রেই আমরা উত্তরণের কথা ভাবি — পরীক্ষায় **উত্তীর্ণ** হই, **রসোত্তীর্ণ** সাহিত্যের কথা ভাবি। বিদ্যার **তীর্থে সতীর্থ** পাই, সম্পদের **বিতরণকে** মর্যাদা দিই। **সচরাচর** আমরা কাজকর্মের যে চৌহদ্দির মধ্যে **বিচরণ** করি, সেটি হল **আচার**। সেই রীতিনীতির সীমা লঙ্ঘন করা বা অতিক্রম করা হল **অত্যাচার**। একটু জানা থাকলে, আর একটু ভাবলে পরই আমাদের ভাষা প্রাণময় হয়ে ওঠে। কোনো কিছু হওয়া বা হওনের জন্য আছে ✓ভূ ধাতু, যার থেকে নিষ্পন্ন হচ্ছে ভব, ভাব, ভাবনা, সম্ভাবনা, ভূমি, ভূত, ভূতি, বিভূতি ইত্যাদি। যেটা মনের মধ্যে আসছে সেটাকে **ভাব** বলা যায়, আর হওয়ার প্রত্যাশা সত্ত্বেও কিছু না-হওয়াটা হল **অভাব**। যেখানে কিছু হচ্ছে সেটি **ভূমি** (✓ভূ + মি); সুতরাং কোনো কথা বলার প্রস্তুতি হল **ভূমিকা**। আবার দেখুন হৃদ্ (হৃ + দ) শব্দটি, কত যথাযথ; হৃদ হল সে, যে হরণ (✓হৃ) করে, এবং দান (✓দা > দ) করে। সেভাবে শব্দটি heart এবং centre দুইকেই বোঝায়; আর ইংরেজিতে heart যদি centre-কে বোঝায় তবে তা কেবল তুলনা হিসেবে। কিন্তু আমাদের ভাষা বোঝায় সরাসরি, একেবারে তার কার্যকারিতার উল্লেখ করে। মোট কথা আমাদের ভাষার ভাবপ্রকাশের ক্ষমতার যে উদাহরণ দেওয়া যায়, তার যেন সীমা নেই!

আমাদের ভাষার ভিতর প্রজ্ঞাদৃষ্টি যে কতটা সক্রিয়, তার আরও কিছু দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। আমাদের ভাষায় *ক্ষমতা*-র সঙ্গে *ক্ষমা*-র, *শ্বাস*-এর সঙ্গে *বিশ্বাস*-এর, *স্বচ্ছ* (= সু + অচ্ছ) -র (অর্থাৎ transparent-এর) সঙ্গে *'আচ্ছা'*-র, *আকাশ*-এর সঙ্গে *প্রকাশ* প্রভৃতির শব্দগত নৈকট্য বিস্ময়কর। ক্ষমতা না থাকলে ক্ষমার অর্থ হয় না। বিশ্বাসের অভাবে শ্বাসগ্রহণ অর্থাৎ প্রাণধারণ হয় না, স্বচ্ছতার অভাবে সন্তোষ ('আচ্ছা' বলে যা আমরা প্রকাশ করি) আসে না, আকাশ না পেলে কোনো কিছুর প্রকাশ হয় না — এ সবই যেন জানা। এই শব্দগুলির ইংরেজি প্রতিশব্দগুলি যদি মিলিয়ে দেখেন, দেখবেন সেখানে কোনো রকমের সংলগ্নতাই খুঁজে পাবেন না। আমাদের **বাসী** শব্দটি দেখিয়ে দেয়, এক বাসস্থানে 'বাসী' হয়ে গেলে বা আটকে গেলেই চলিষ্ণু মানুষ তার টাটকা, সতেজ ভাব হারিয়ে ফেলে। আবার কোনো কিছুকে রেখে দেওয়া বা রক্ষণ করা মানেই তার শক্তিকে নষ্ট করে দেওয়া। অত্যন্ত সংগত কারণেই রক্ষা আর রাক্ষস শব্দের ধ্বনিগত নৈকট্য।

আমাদের ভাষা থেকে এত উদাহরণ দেওয়ার আর একটি কারণ আছে। দেশের ভাষাকে উপেক্ষা করেও স্বাদেশিকতার কল্পনা বা চেষ্টা সম্ভব। ইংরেজির মধ্যে দিয়েই ভারতকে বুঝে নেবো, এমন চিন্তা অনেক ভারতীয়ের মনেই উঁকি মারে। তাঁদের মনে হয়, এ কাজটি করতে

পারলে এক ঢিলে দু পাখি মারা যাবে; ভারত আয়ত্তে থাকবে, আবার দুনিয়াদারিও চলতে থাকবে। তাঁরা ভাবেন, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য — বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি সব দরকারি বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ তো হয়েই গেছে! অতএব ইংরেজির মধ্যে দিয়ে ভারতকে বুঝতে অসুবিধে হবে কেন? এ রকম চিন্তা বিরাট সংখ্যক পদস্থ মানুষের মাথায় নিশ্চয় খেলে। না হলে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-নিবেদিতা বা অরবিন্দের নামে এত ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুল গজিয়ে ওঠে কেন? যাঁদের অবশ্য কোনো ভারতীয় ভাষাই জানা নেই, তাঁদের পক্ষে ইংরেজি অনুবাদে পড়ে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু ভাবপ্রকাশের আকাশটাই বদলে দিলে অনুবাদের মধ্যে দিয়ে কতটুকু বোঝা যাবে? এমনিতেই অনুষঙ্গগত কারণে ভাষান্তর ঘটলে শব্দের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা হারিয়ে যায়। etiquette বা রাজনীতি সংক্রান্ত বহু বিশেষ শব্দ এই কারণেই ফরাসি থেকে টেনে আনতে হয় : যথা raison d'etre, avant-garde, coup d'etat, protocol, encore, viva voce, laissez-faire, bourgeois ইত্যাদি। তার ওপর ক্রিয়াভিত্তিক হওয়ার কারণে বাংলা বা সংস্কৃত শব্দের পশ্চিমী ভাষায় অনুবাদ বিশেষ কঠিন। অর্থ, ধর্ম, পদ, অধিকার, ক্ষেত্র, ভাব, যোগ, যোগী, সম্পদ, বিষয়, বিষয়ী, সমাধি, সাধনা, সিদ্ধিলাভ, পক্ষ, পুরুষ, প্রকৃতি ... প্রভৃতি শব্দের এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম তাৎপর্য। সে কারণে অনুবাদ করতে গেলে পদে পদে ভ্রান্তির সম্ভাবনা। এবং সেই ভুল হয়েছেও অতি বিশাল মাত্রায়।

সন্দেহ নেই, বাংলাভাষা সংস্কৃতভাষা থেকে অনেক ব্যাপারে সরে এসেছে। বলতে কি, সংস্কৃতভাষা তার প্রাণসম্পদ হারিয়ে ফেলেছে হিন্দুযুগের সূত্রপাতের (৭৫০ খ্রিস্টাব্দের) আগেই, কিন্তু মধ্যযুগের (১২০০ খ্রিস্টাব্দ পরবর্তী) বাংলায় তা নবজীবন লাভ করে কৃত্তিবাস-কাশীরাম-বৈষ্ণবসাহিত্য-মঙ্গলকাব্যের হাত ধরে। তাই, বাংলার মধ্যে অনেক কিছু আছে, যা ধরে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার অর্থের জগতে সহজেই প্রবেশ করা যায়, এবং যেগুলি এখনও বাংলাভাষায় ফল ধরানোর ক্ষমতা রাখে। এ অবস্থায় ইংরেজি ভাষা সম্বল করে আমাদের দেশকে বুঝে নেবো — এই ইংলিশ-মিডিয়ামী হিন্দুত্বের আত্মাভিমান কোনো কাজের কথা নয়। যাঁর বাংলা ভাষায় পা রাখার ক্ষমতা আছে, তাঁর পক্ষে এটা নেহাৎই আত্মঘাতী পরিকল্পনা।

বাংলা ভাষার দৈন্য সম্বন্ধে আমাদের ইত্যাকার কল্পনা কতটা অসার তা দেখানোর জন্য আর একটি প্রসঙ্গ আনছি। আমাদের ভাষার মূল থেকে আমরা যত বিচ্ছিন্ন হই, তত আমাদের প্রবণতা বাড়ে ইংরেজির মাপে বাংলা শব্দের অর্থকে ছেঁটে নেওয়ার। আর, তার পর ভাবতে থাকি যে, আমাদের বাংলাভাষা শব্দসম্ভারের সংখ্যার দিক থেকে দীন। কিছু উদাহরণ দিচ্ছি। আমরা discover-এর বাংলা করলাম আবিষ্কার, কিন্তু invent-এর বেলায় অতি যথাযথ এবং আরও ব্যাপক শব্দ **উদ্ভাবন** আমাদের মনে পড়ল না। ফলে invent-এরও বাংলা করলাম আবিষ্কার, আর মনে মনে বাংলা ভাষার খুঁত ধরলাম। 'দৈব বনাম পুরুষকার' (যে-পুরুষকার স্ত্রীলোকেরও থাকে) — এই শব্দসমষ্টি আমাদের মনেই এল না। আর, **অর্থ** বললে লক্ষ্য, অভীষ্ট প্রভৃতি বুঝায় তাও মনে করলাম না। ফলে sense of values-এর বাংলা

করলাম 'মূল্যবোধ'; অথচ এর থেকে অনেক ভাল প্রতিশব্দ হত **পুরুষার্থ বিচার**। ব্যুৎপত্তি (√সূ + ত্র) থেকে তো বটেই, এমনকি প্রয়োগ থেকেও বোঝা যায় যে formula-র চেয়ে **সূত্র** অনেক ব্যাপক শব্দ। secular-এর চেয়ে 'ঐহিকতাবাদী' বেশি সঠিক শব্দ, কিন্তু আমরা চালু করে দিয়েছি পঙ্গু 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি। medium of instruction-এর বাংলা করি 'শিক্ষার মাধ্যম', কিন্তু 'শিক্ষার বাহন' হত অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ, এবং রবীন্দ্রনাথ এই শব্দটিই ব্যবহার করতেন। মনে পড়ছে, এক বাংলার অধ্যাপক দুঃখ করছিলেন — বাংলায় শব্দের বড় অভাব; handsome, pretty, beautiful, nice — সকলেরই প্রতিশব্দ দিতে হয় 'সুন্দর'। তাঁর মনে পড়ে না সুষমামণ্ডিত, লাবণ্যময়, নয়নাভিরাম, মনোমোহন, মনোমুগ্ধকর, চিত্তরঞ্জন, কান্ত, সুশোভন, দীপ্ত, শ্রীযুক্ত, শ্রীল, শ্লীল, রুচির ইত্যাদি এরকম অগণিত শব্দের কথা, যাদের প্রতিশব্দ ইংরেজিতেই পাওয়া কঠিন। ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ যতটা আয়াসসাধ্য, বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন।

৩. বাংলার দিগ্‌দর্শন ক্ষমতা

ইংরেজি তথা পশ্চিম দেশের ভাষার তুলনামূলক খামতির কথা বলছিলাম। এ কথা কিন্তু বলিনি যে, ওদের সাহিত্য দীনতাগ্রস্ত। বরং বহু শতাব্দী ধরে যে-সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ হয়ে চলেছে ওদের সাহিত্যে, তার তুলনা অন্যত্র দেখতে পাই না। ৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইয়োরোপের যে সাহিত্য, তার তুলনা সমকালীন বিশ্বসাহিত্যে বিরল। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের হয়তো কিছুটা তুলনা চলে তার সঙ্গে। মনুষ্যজীবনে সার্থকতা কোথায়, তার অন্বেষণে নিরলসভাবে তৎপর গ্রীক ট্র্যাজেডি, দান্তের কাব্য, শেক্সপীয়রের নাটক প্রভৃতি। দীর্ঘকাল ধরে যে খণ্ডবাদী ভাবনা — সব কিছুকে আলাদা করে দেখার অভ্যাস — মানুষের চেতনাকে আকার দিয়ে আসছে পৃথিবীর সব দেশে, তাকে অনেকবার ছাড়িয়ে উঠেছেন ওদের দেশের কবি, শিল্পী প্রভৃতি। ইংরেজ কবি ব্লেক (১৭৫৭-১৮২৭) পারতেন, অন্তত কল্পনায়, 'to see the universe in a grain of sand'। কোলরিজ বলতে পেরেছিলেন 'We receive but what we give / And in our life alone does Nature live.'।[১৩] ওয়ার্ডসওয়ার্থ নিজের অভিজ্ঞতায় জেনেছিলেন — এবং পরে তাকে কবিতায় প্রকাশ করতে পেরেছিলেন — ভাবের অতলে তলিয়ে গিয়ে ভাবসমাধিতে পৌঁছে যাওয়ার কথা। আধুনিক জীবনের রিক্ততা যেমন তিনি দেখেছিলেন, তেমনি তাঁর কবিদৃষ্টিতে দেখেছিলেন চরাচরকে উদ্ভাসিত করে আছে 'the light that never was, on sea or land'।[১৪] শেক্সপীয়র বলতে পেরেছিলেন, 'We are such stuff / As dreams are made on and our little life / Is rounded with a sleep'।[১৫] পাশ্চাত্যের কবিদের গৌরব এই যে, তাঁরা ত্রুটিপূর্ণ ভাষা দিয়েই উচ্চ মানের সত্য প্রকাশ করে গিয়েছেন। আর আমাদের দেশের বেলায় কী হয়েছে?. ৭৫০ খ্রিস্টাব্দের আগে যা সৃষ্টি হয়েছিল, সেগুলি অর্থবিস্মৃতির কারণে আজ মৃত, এমনকি মধ্যযুগে বাংলায় যে-বিপুল সৃষ্টির বান ডেকেছিল, তাও অর্থ হারিয়ে মৃতপ্রায় হয়ে রয়েছে।

অথচ আমাদের ভারতীয় পূর্বপুরুষদের হাতে অতি সমৃদ্ধ ভাষা তৈরি হয়ে গিয়েছিল খ্রিস্টজন্মের আগেই। সে পর্যায়ের সৃষ্টিগুলিকে — যথা বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদিকে আমরা এখন আর ঠিক বুঝে উঠতে পারি না, এমনকি বুঝতে পারছি না মধ্যযুগের বাংলা সৃষ্টিগুলিকেও। ইতিহাসের মারে সেই সমৃদ্ধ ভাষার যথেষ্ট ব্যবহার হয়ে উঠল না আমাদের দেশে। এই ভাষার শক্ত বনিয়াদের মূল কথাটা (সর্বস্তরে ক্রিয়াভিত্তিক শব্দগঠন) যেন ভুলেই গেল দেশের মানুষ। না হলে আল বিরুনির অভিযোগ সম্ভব হল কী করে?

আর একটি কথাও এখানে প্রাসঙ্গিক। বিশ্বভাষা আবির্ভাবের পথে ইংরেজি ভাষার সম্ভাব্য ভূমিকা কী হতে পারে, তা নিয়ে কোনো বক্তব্য রাখছি না। কোনো ভাষার বিস্তার নির্ভর করে, সেই ভাষা যারা ব্যবহার করে তাদের প্রতিপত্তির ওপর। ব্যবহারকারীর সংখ্যা হিসেবে ১৬০০ সালেও ফরাসি, জরমান, স্প্যানিশ — প্রতিটি ভাষা ছিল ইংরেজির চেয়ে এগিয়ে। অথচ ১৯০০ সালে এদের মধ্যে ইংরেজি চলে এল এক নম্বরে। প্রতিপত্তির সূত্রেই ইংরেজি আজ বিশ্বভাষা-মঞ্চে প্রথম আসনে, সেই একই সূত্রে কোনোদিন তা নেমেও যেতে পারে। এখন তা নিয়ে অনুমানভিত্তিক আলোচনা নিরর্থক।

কিন্তু চিন্তার বাহন হিসেবে ভাষার গুরুত্বের বিচার একটু অন্য রকমের। তাতে ভাষাটি কে ব্যবহার করছেন, তার চেয়ে সেই ভাষার ভিতরে মানবজাতির অর্জন কতখানি রয়েছে সেই সত্যের বিচার হয়। প্রথম শতাব্দীতে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে গ্রীক ভাষা আর (রোমের ভাষা) ল্যাটিনের সমান গুরুত্ব যেন। সেই দুই ভাষার উত্তরাধিকারীদের বর্তমানের অবস্থান কোথায়? ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল, ইতালি, রুমানিয়া, গোটা ল্যাটিন আমেরিকা — এ সবই এখন ল্যাটিন-উদ্ভূত ভাষাদের এলাকা। আর গ্রীক-উদ্ভূত ভাষার এলাকা শুধু আজকের গ্রীস দেশ! তবু শিল্প, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির দুনিয়ায় পথনির্দেশ পেতে আজকের মানুষ ল্যাটিনের চেয়ে অনেক বেশি করে যায় গ্রীক ভাষায় ও সাহিত্যে।

এবার মূল আলোচনায় ফেরা যাক। ক্রিয়াভিত্তিক বাংলা ভাষার চলনসই জ্ঞানও যদি থাকে, ইংরেজি তথা পশ্চিমী ভাষা ও সংস্কৃতির অনেক জটিলতার সমাধান আমাদের উদ্যোগেই হয়ে যায়। আপনাদের জানা থাকতে পারে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় সংস্কৃত ভাষার আবিষ্কার কী উদ্দীপনা এনেছিল ইয়োরোপের, বিশেষ করে জার্মানির পণ্ডিতদের জগতে। পশ্চিমের রাজনৈতিক স্বার্থ ও মজ্জাগত কুসংস্কার সেই আলোড়নকে নিষ্প্রভ করে দেওয়ার চেষ্টা কম করেনি। তবু ভাষাবিজ্ঞানের জগতে সকল পণ্ডিত প্রায় একবাক্যে ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞানের অসামান্য উৎকর্ষ স্বীকার করেছেন। বিংশ শতাব্দীর দিকপাল ভাষাবিজ্ঞানী Leonard Bloomfield বলেছেন, পাণিনি ব্যাকরণ হল 'one of the greatest monuments of human intelligence'। Bloomfield-এর নিজের তাত্ত্বিক সৃষ্টিকে অনেক ভাষাবিজ্ঞানী বলেছেন 'Paninian in method and inspiration'। R. H. Robins তাঁর *A Short History of Linguistics* গ্রন্থে বলেছেন, 'In phonetics

and in certain aspects of grammar Indian theory and practice was definitely in advance of anything achived in Europe or elsewhere before contact had been made with Indian work' (অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীতে)।[১৬] ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞানের কয়েকটি দিক ছিল সহজে চোখে পড়ার মতো। তার একটি হল alphabet বা বর্ণমালার মধ্যে বর্ণগুলিকে বিভিন্ন বর্গ বা শ্রেণী হিসেবে ভাগ করা এবং সমগ্র বর্ণমালাকে একটি বৈজ্ঞানিক ক্রম অনুসারে বিন্যস্ত করা। এর সঙ্গে তুলনায় পশ্চিমের সকল বর্ণমালা একেবারে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো বর্ণসমষ্টি। সকল ভাষাপণ্ডিতেরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন যে, ভারতীয় ব্যাকরণের কারক, সমাস প্রভৃতি তত্ত্বের কাছে এখনও অনেক কিছু শেখবার আছে। ক্রিয়ার দিক থেকে বিচার করায় ভারতীয় ব্যাকরণের কারকতত্ত্ব পশ্চিমী ব্যাকরণের (বিশেষ্যের আকার এবং বাক্যের মধ্যে অবস্থানের উপর নির্ভর) case-তত্ত্বের থেকে অনেক উঁচু মানের। সে রকম, সমাসের বিচারে ভারতীয় সূক্ষ্মতা আসলে উচ্চাঙ্গ চিন্তারই প্রস্তুতি।

বলে রাখা ভালো, এই পণ্ডিতেরা এখনও পর্যন্ত আমাদের ক্রিয়াভিত্তিক শব্দগঠন পদ্ধতি ও ক্রিয়াভিত্তিক ভাষার খবর পর্যন্ত জানেন না। তাঁরা আমাদের যাস্কমুনির নাম শোনেননি, কিংবা তাঁর 'নিরুক্ত' গ্রন্থটির কথা জানেন না, এমন নয়। কিন্তু গ্রন্থটির অর্থই তাঁরা বুঝতে পারেননি, কিংবা বলা ভালো, একেবারেই ভুল বুঝেছেন। অথচ এই 'নিরুক্ত'ই মানবজাতির শব্দার্থতত্ত্বের সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ। সেই শব্দার্থতত্ত্ব যখন তাঁরা বুঝতেই পারলেন না, তখন সেই শব্দার্থতত্ত্ব অনুসরণ করে লেখা বেদ-পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারতের অর্থও বুঝতে পারলেন না তাঁরা, ফলে সমগ্র ইয়োরোপই তা বুঝতে পারল না। সবই তাঁদের কাছে মনে হল রূপকথার রাজ্য, Mythology! আমাদের ভাষাতত্ত্বের মূল অর্জনটিই তাঁদের হাতে গেল না, ফলে গেল না আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্বের কথাও এবং সর্বোপরি তাঁদের সেই না-বোঝা দিয়েই তাঁরা শিক্ষিত বাঙালিদেরও কলুষিত করে দিলেন। আমরা নিজেদের আকাশ ছেড়ে তাঁদের মনোলোকের আকাশের তলায় গিয়ে আমাদের নিজেদের অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম।

অথচ একেবারে বিপরীত ফলও ফলতে পারত। আমাদের ভাষার ক্রিয়াভিত্তিকতার তত্ত্ব যদি তাঁরা বুঝতে পারতেন, তাহলে তা দিয়ে তাঁরা কেবল আমাদেরই বুঝতে পারতেন, এমন নয়; অনেক ভালোভাবে বুঝতে পারতেন তাঁদের নিজেদের বর্তমান ও অতীতটাকেও। কেননা, আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেই ক্রিয়াভিত্তিকতার তত্ত্ব দিয়ে পশ্চিমের ভাষাচর্চা ও ইতিহাসের অনেক অসম্পূর্ণতার ওপর আলো ফেলা যায়।

ভাষার ক্ষেত্রে বুঝতে পারি যে, প্রকৃত প্রস্তাবে সমার্থক শব্দ কোনো ভাষায় থাকে না। তথাকথিত সমার্থক শব্দ চালু হয় একই সত্তার আধারে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া বোঝানোর জন্য। সচেতন মানুষের উদ্যোগে 'সংস্কৃত' হয়ে যাওয়ায় আমাদের দেশের ভাষায় সেই সব শব্দের উৎপত্তি উদ্ধার করা যায়; কিন্তু অন্য ভাষাগুলি সেই সব উৎপত্তি ভুলে গেছে। তথাকথিত সমার্থক শব্দদের স্বাতন্ত্র্যকে তারা মনে রাখে প্রয়োগক্ষেত্রের অনুষঙ্গের জোরে। অশ্বের গতি

বোঝাতে ইংরেজিতে চারটি স্বতন্ত্র শব্দ ব্যবহার হয় — amble, trot, canter, gallop। কিন্তু তারা কেউ কারও সমার্থক নয়। আমাদের ক্রিয়াভিত্তিক (বাংলা-সংস্কৃত) ভাষায় যেসব সমার্থক তুল্য শব্দ পাই, তারা স্পষ্টতই ভিন্ন ক্রিয়ার হিসাবে তৈরি। নেহাৎই নমুনা হিসেবে কয়েকটি শব্দগুচ্ছ তুলে ধরছি : পৃথিবী, বসুমতী, ধরিত্রী ইত্যাদি; সূর্য, রবি, তপন, দিবাকর, অর্ক প্রভৃতি; নারী, মানবী, স্ত্রী, কামিনী, ললনা ইত্যাদি; অগ্নি, অনল, হুতাশন প্রভৃতি। এই শব্দগুলি ভাঙলে পরই বোঝা যায়, কোথায় কোন ক্রিয়ার উল্লেখ হচ্ছে। আগেই বলেছি, আমাদের এই শব্দার্থতত্ত্ব এখনও বিশ্বের হাতে পৌঁছোয়নি, পৌঁছোয়নি পাণিনি-পূর্ববর্তী আদি শব্দার্থতাত্ত্বিক রচনা (নিরুক্ত)-টি। কারণ যাস্কমুনির নিরুক্ত এতদিন কেউই সঠিক ভাবে বুঝতে পারেননি। আমাদের এই শব্দার্থতত্ত্ব পশ্চিমী ভাষাগুলিকে তো বটেই, এমনকি তাদের অলঙ্কারশাস্ত্রের অনেক কিছুকে নতুন আলোয় উদ্ভাসিত করে দেওয়ার যোগ্যতা ধরে। Metaphor, Metonymy — দুটি ক্ষেত্রেই দেখি কোনো বস্তু বা সত্তাকে তার প্রচলিত নাম থেকে সরিয়ে এনে অন্য বস্তুর বা সত্তার সঙ্গে জুড়ে দেখা হয়। পাঠক বা শ্রোতা এইরকম অলঙ্কারের ব্যবহারে কীরকম আনন্দ বা তৃপ্তি পান? প্রকৃতপক্ষে তা হল অনেকটা এইরকম: Metaphor-এর বেলায় বাইরের দিক থেকে দুটি ভিন্ন রকমের বস্তু বা সত্তার ক্রিয়াগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা, আর Metonymy-র বেলায় ক্রিয়া এবং ক্রিয়ার আধারের অভেদ আনার চেষ্টা। অর্থাৎ বস্তু বা সত্তার ভিতরের ক্রিয়াটির দিকে নজর তাঁদের পড়েছে, আর তার ব্যাখ্যা খুঁজেছেন তাঁরা তাঁদের অলঙ্কারশাস্ত্রের সহায়তা নিয়ে। তবে কিনা, এ চেষ্টা তো কার্যত উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মানবজাতির আদি ক্রিয়াভিত্তিক শব্দকে প্রাণে মেরে দিয়ে তার পর তাকে জীবন্ত করে তোলার জন্য শবসাধনা — মড়ার হাত-পায়ে স্প্রিং লাগিয়ে তাকে সচল করে দেখানোর জাদুকরী চেষ্টা। সেই চেষ্টাকেই তাঁরা বড় গলায় ঘোষণা করেন — Metaphor is the soul of poetry। দোষ তাঁদের নয়। দোষ তাঁদের উপর ইতিহাসের যে মার পড়েছে, তার। বরং তাঁদের গৌরব এই যে, আদি মানবজাতির ভাষার ক্রিয়াভিত্তিক স্বভাবের অধিকাংশ উত্তরাধিকার হারিয়েও তাঁরা নিজেদের একান্ত চেষ্টায় দেখে ফেলেছেন শব্দের ভিতরে প্রাণ ছিল এবং এখনও তার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে, সব ভাষাই আসলে 'metaphoric'।

দু একটি সহজ উদাহরণের সাহায্য নেওয়া যায় উপরের বক্তব্যকে স্পষ্ট করার জন্য। কোনো কথা বা কাজের জন্য প্রস্তুতিকে ইংরেজিতে বলা হয় groundwork, আর এ যুগে প্রচলিত প্রতীকী বাংলায় বলা হয় 'জমি তৈরি করা'। এখানে একটা জিনিস (প্রস্তুতি) বোঝাতে অপর একটি জিনিসের (ground বা জমির) নাম ব্যবহার হচ্ছে। এটিকে বলে Metaphor। কিন্তু ক্রিয়াভিত্তিক রীতিতে ✓ভূ ধাতু (= হওয়া) ব্যবহার করে হয় ভূমি (= যেখানে কিছু হয় বা গজায়), তারপর ✓কৃ ধাতু (= করা) এনে হয় 'ভূমিকা'। এখানে কোনো শব্দকে 'স্থানান্তরে নেওয়া' (= Metaphor) হল না। পশ্চিমে ক্রিয়াভিত্তিক ভাষা ব্যবহারের রীতি বহু শতাব্দী আগেই অন্তর্হিত হয়েছিল, অথচ ক্রিয়াগত সাদৃশ্য বা ঐক্য বোঝানর প্রয়োজন ও

থেকে যায়, সেজন্য ওদের ভাষায় Metaphor করতে হয়। আবার, He is my despair. She is my love. The pen is mightier than the sword. প্রভৃতি ইংরেজি বাক্যে দেখা যাচ্ছে Metonymy। এখানে কোনো আবেগ বা ক্রিয়ার আধার ও আধেয়র অভিন্নতাকে বোঝানর চেষ্টা হয়েছে। সেজন্য একটি গুণ বা বস্তুকে বোঝাতে তার সংলগ্ন কোনো বস্তু বা গুণের নাম ব্যবহার হয়েছে। আমাদের ভাষায় কিন্তু 'ধর্ম' বললে ধর্ম এবং ধর্ম অনুযায়ী আচরণ, 'দান' বললে দেওয়া ক্রিয়া এবং যা দেওয়া হল — দুইই অতি স্বাভাবিক ভাবে বোঝা যায় (তোমার বাবু তো বহু কিছুই *দান* করলেন, তুমি কী *দান* পেলে?)। প্রাপ্তি, লাভ, দয়া — এ রকম অগুনতি শব্দ এখনও বাংলায় এইভাবে দুরকম অর্থ বুঝিয়ে থাকে। কোথাও কোনো নামের স্থানচ্যুতি ঘটে না, কোনো Metonymy হয় না।

একইভাবে, ইংরেজি ভাষার অনেক বৈশিষ্ট্যকে গভীরতর তাৎপর্যে বোঝা যায় ক্রিয়াভিত্তিক ভাষার প্রেক্ষিতে। ইংরেজির past tense এবং past participle-এ যা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়, সেই -d, -ed, -t এর মধ্যে আমরা দেখতে পাই -ক্ত প্রত্যয়ের জ্ঞাতি। সংস্কৃতের সঙ্গে ইংরেজি একই ভাষা-পরিবার, যথা ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষা-পরিবারের সদস্য হওয়ার সুবাদে, দুইয়ের মধ্যে আমরা অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করি। একটি ছোট মিলের কথা উল্লেখ করছি। সংস্কৃত শব্দের শেষে -ইন্ (যথা যার ভিতরে গুণ আছে = গুণ + ইন্ = গুণিন্; কামিন্ = কামী; গামিন্ = গামী; প্রার্থিন = প্রার্থী ইত্যাদি) ইংরেজি in শব্দের সঙ্গে এক তাৎপর্যের। তবে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় হল, ইংরেজি group verb-এর জনপ্রিয়তা। সংস্কৃতে ধাতুর আগে উপসর্গ যোগ করার উপায়ে কম উপকরণে বেশি ভাব স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রকাশ করা যায়। ইংরেজিতে ঠিক সেই কাজ হয় group verb দিয়ে। abolish, compensate, dominate, dwindle, aggravate ইত্যাদিতে অস্বচ্ছ এবং দীর্ঘ শব্দের ব্যবহার এযুগের গতিবাদী ইঙ্গ-মার্কিনের 'না-পসন্দ'। go, make, cut, set, run, put, give, take, hit প্রভৃতি একাক্ষরী (monosyllabic) verb-এর পরে off, up, out, in, at, to প্রভৃতিকে অনুসর্গ হিসাবে ব্যবহার করায় আধুনিক ইংরেজিভাষী পায় সহজিয়া ভাষা-ব্যবহারের আনন্দ। তবে সংস্কৃততে উপসর্গ আসে আগে, প্রত্যয় আসে পরে — সেই পদ্ধতিতে সংস্কৃততে যথাযথ ভাবপ্রকাশের সুযোগ অনেক বেশি। উপরন্তু উপসর্গ আর প্রত্যয় যোগ বিষয়ে এক সুশৃঙ্খল ও বিশাল ব্যবস্থা রয়েছে সংস্কৃতের ব্যাকরণে। তাই, ইংরেজি ভাষার জগতে অধিকার কায়েম করতে আমাদের ক্রিয়াভিত্তিক ভাষার জ্ঞান অবশ্যই সাহায্য করে।

এক ভাষা পরিবারের সদস্য হওয়ায় ইংরেজির বহু শব্দের জ্ঞাতিশব্দকে পাওয়া যায় বাংলার মধ্যে, এ কথা আপনাদের জানা। যেখানে তাদের সাদৃশ্য অতি স্পষ্ট, সেখানে তাদের উল্লেখের কোনো প্রয়োজন নেই। যেখানে রয়েছে আবছা সাদৃশ্য, সেখানে বোধ হয় কিছু শব্দের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে : যথা, flow, প্লব; rota, রথ; cycle, kuklos, চক্র; diction, দিশ্; yoke, যুগ; rein, ঋণ; right, ঋত; rich, ঋচ্; anger, অঙ্গার; pour, পূর্ণ; womb, অম্বা; tax, তক্ষণ ইত্যাদি আরও অনেক শব্দ। কিন্তু বেশ কিছু শব্দ ও শব্দন্যাস

(phrase) আছে ইংরেজিতে, যাদের গহনলোকে প্রবেশ সম্ভব হয় কেবলমাত্র আমাদের ভাষার ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থতত্ত্বের রাস্তায়, (যে পথে কাটাই ও বাঁধাইয়ের কাজে আজ ছয়-সাত বছর আমি কলিম খান-এর সহব্রতী)। কিছু উদাহরণ দিলে বক্তব্যটি স্পষ্ট হবে।

পশ্চিমী ভাষাবিজ্ঞান অনুসারে, ইংরেজি জরমান প্রমুখ জরমানিক বা টিউটনিক ভাষাগোষ্ঠীর এলাকায় and একটি ভূঁইফোড় শব্দ। আমরা কিন্তু শব্দটির জ্ঞাতি পাচ্ছি আমাদের ভাষার 'অণ্ড' শব্দে, 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' অনুসারে যার মানে হল 'যাহার দ্বারা অবয়ব সংযোগপ্রাপ্ত হয়'। আন্ডা (= egg), অণ্ডকোষ, এবং and শব্দটি — সব কিছুর যোগসূত্র ধরিয়ে দিচ্ছে আমাদের অভিধান। শুধু তাই নয়, ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায় শব্দের শেষে 'র'-এর অবস্থান প্রায়ই বিশেষ কোনো গুণের উপস্থিতি নির্দেশ করে। এই নিয়মের প্রয়োগেই বোঝা যাবে কেন গ্রীক ভাষায় পুরুষ বা male অর্থে Andro শব্দের ব্যবহার হয়। প্রকৃত ঘটনা এই যে, আদি ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষায় কোন শব্দ কী ভাবে গঠিত হল; বা কী ভাবে শব্দগঠন হয়, অন্যান্য দেশ তা ভুলে গেছে, কিন্তু তার স্মৃতি বহন করছে আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতি। যে কারণে 'নেহাৎ প্রথার মধ্যে মানবভাষার উৎপত্তি' — এ তত্ত্ব ভারতীয় উপমহাদেশের ঐতিহ্যে বিশেষ আমল পেতে পারে না।

বঙ্গীয় শব্দকোষে লিঙ্গ শব্দের একটি ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ দিচ্ছে — 'জ্ঞান সাধনের উপায়'। এটি জানলে পর বুঝি কেন ল্যাটিনের lingua শব্দ (যার থেকে language, linguistics ইত্যাদি কয়েকটি শব্দ নিষ্পন্ন) দিয়ে বোঝানো হবে মানুষের ভাষাকে (এবং ভাষার যেখানে উদ্ভব সেই জিহ্বাকে)। কিংবা দেখুন invest কথাটিকে। আমাদের দেশে কোনো ব্যক্তিকে দায়িত্ব, ক্ষমতা ও মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে গেলে তার সাথে চাদর বা কিছু আবরণ দিয়ে তাকে বরণ (< = ✓বৃ) করে নিতে হয় — সে বধূ, জামাতা, পুরোহিত, সভাপতি, প্রধান অতিথি যাই হোক না কেন। কোনো ব্যক্তিকে ক্ষমতা অর্পণ করলে ইংরেজিতে গায়ে vest বা জামা চড়ানো বা invest somebody with authority কেন বলা হয়, তা ভাল করে বোঝা যায় আমাদের বরণ কথাটির সূত্রে। পশ্চিমী ভাষার অনেক উপাদানকে পশ্চিমী পণ্ডিতরা ব্যাখ্যা করে দেন সাদৃশ্য বা metaphor-এর তত্ত্ব দিয়ে। কিন্তু আমাদের ভাষায় শব্দরাই ধরিয়ে দেয় কী বোঝানো হচ্ছে। আমাদের ভাষায় যে প্রক্রিয়াটি হল পিতার পদে অধিষ্ঠিত হওয়া', সেটি ওদের ভাষায় metaphor হয়ে বজায় থাকছে 'step into the shoes of his father' আকারে। কুমারীর কৌমার্যহরণ অর্থে deflower শব্দটি কেন ব্যবহার হয়, সেটি বুঝতে পারি, যখন জানি যে আমাদের দেশে কোনো কুমারী ঋতুমতী (অর্থাৎ বিবাহযোগ্যা) হলে বলা হত, এবং এখনও গ্রামের লোকে বলে থাকেন, 'অমুক মেয়েটি পুষ্পবতী হয়েছে'। সেই কথাটি সাধারণের ভাষায় 'বিয়ের ফুল ফুটেছে' আকারে এখনও কথায় কথায় বলা হয়ে থাকে।

ওদের দেশের বহু শব্দের ব্যাখ্যা আমাদের দেশের জ্ঞানসম্পদ দিয়েই সম্ভব। Bull in a china shop — এই শব্দন্যাসের নিশ্চয় metaphor হিসেবে অর্থ করা যায়। কিন্তু, অনেক

ভাল ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারি। চীনামাটির শিল্পে প্রায়শই দেখি দক্ষতার পরাকাষ্ঠা; সেই দক্ষতা আসে শ্রমবিভাজনে, অর্থাৎ বারে বারে এক কাজ করে যাওয়ায়। অথচ পুনরাবৃত্তির একঘেঁয়েমি হল মানবপ্রকৃতি বিরোধী : স্বভাবতই দক্ষতার নীতির বিরোধী হলেন মানুষের আদিদেব শিব, যাঁর আবির্ভাব ঘটে দক্ষতার নীতিতে চালিত সামাজিক কর্মযজ্ঞকে ভণ্ডুল করার জন্য। আর শিবের বাহন এবং প্রতীক দুইই হল বৃষ বা bull। সুতরাং bull in a china shop শিবের আক্রমণে দক্ষযজ্ঞ পণ্ড হওয়ার স্মৃতি বহন করছে। এরকম bullshit-এও পাই 'ষাঁড়ের গোবর', যা কিনা আমাদের কোনো কাজে লাগে না।

শব্দের অর্থগত পূর্ণতার স্মৃতিকে আমাদের ভাষাই বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। এর খুব ভাল উদাহরণ হল 'লোক' শব্দটি। এই শব্দখণ্ডটি দিয়ে তৈরি আমাদের ভাষার নানান শব্দকে আদের পশ্চিমী, বিশেষ করে ইংরেজি প্রতিশব্দ সমেত নীচে তুলে ধরছি।

লোক : man
লোক : sphere; ল্যাটিন locus (= স্থান) যার থেকে local, location
আলোক : light, ল্যাটিন lux (উচ্চারণ লুক্স)
লোক : look
লোকন/লোচন : eye
আলোকন/আলোচন : discuss, throw light; ল্যাটিন loquere (যার থেকে eloquent, loquacity, obloquy); গ্রীক logos (যার থেকে logic এবং -logy)

locus, lux, loquere, logos, look — এদের ভিতর জ্ঞাতিত্ব পশ্চিমী পণ্ডিতরা সন্দেহ করেন না। কিন্তু ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থতত্ত্ব এদের ভিতরকার যোগসূত্র আমাদের দেখিয়ে দেয়। যিনি দেখছেন, যাকে তিনি দেখছেন, যার সাহায্যে তিনি দেখছেন এবং দেখা কাজটি — সব মিলেই তো এক অখণ্ডতা। আমরা কেউ ভাবব না যে বিভিন্ন ভাষা থেকে টুকরো অর্থগুলি এনে আমাদের দেশে জোড়া হয়েছিল। বরং মানুষের পূর্বপুরুষের অখণ্ড বোধই কেউ পেয়েছে খণ্ডভাবে, কেউ পেয়েছে অখণ্ডভাবেই; কোনো দেশের ভাষায় সেই বোধ রয়েছে টুকরো টুকরো হয়ে, কোথাও-বা রয়েছে খানিকটা অখণ্ডভাবেই — এটা ভাবাই যুক্তিসংগত। আমাদের সৌভাগ্য যে, আমরা বাংলাভাষীরা অখণ্ডের উত্তরাধিকারী।

ভাষার ক্ষেত্রে যেমন, তেমন পশ্চিমী পুরাণ ও ঐতিহ্যের অনেক কিছু বোধগম্য হয় আমাদের ঐতিহ্য বোঝার পর। ভারতের ব্রাহ্মণের মাথায় যে-শিখা দেখি, সে শিখা আসলে মাথার ভিতর বাহিত জ্ঞানের অগ্নিশিখার সূচক তথা বহিরঙ্গ সহযোগী। জ্ঞানের এই শিখা বহন যিনি শুরু করেছিলেন, তিনি আদিদেব আদি-শিখা-বহনকারী শিব, ইন্দ্র প্রমুখ দেবতাদের সঙ্গে যাঁর মৌল বিরোধিতা। এদিকে দেখুন গ্রীক পুরাণ কী বলছে। Olympus পাহাড়বাসী Zeus প্রমুখ দেবতাদের অগ্রজ Titan-দের অন্যতম Prometheus মানবকল্যাণের জন্য স্বর্গ

থেকে চুরি করে আনেন আগুন। আর সেই মানবহিতৈষী মহৎ কাজের জন্য প্রমিথিউস নিত্য নিপীড়িত দেবরাজ Zeus-এর হাতে। আবার শিবের সঙ্গে তাঁর বাহন বৃষের অচ্ছেদ্য বন্ধন বা অভিন্নতা যদি মনে রাখি, তবে বুঝব গ্রীক পুরাণের 'মন্দ' রাজা Minos-এর সন্তান কেন বৃষদেহী, কেন চতুর Zeus-কে বারে বারে বৃষের আকার নিতে হত বিভিন্ন প্রকৃতিরূপা বা নারীর সঙ্গে মিলিত হতে, আর কেনই বা আজও বৃষের সঙ্গে লড়াই ইয়োরোপে, বিশেষত স্পেন দেশে, ritual-তুল্য অতি প্রিয় বিনোদন। আবার পশ্চিমের গ্রীসীয়, স্ক্যান্ডিনেভীয়, কেলটীয় পুরাণে অশ্ব, অশ্বমানব (আমাদের কিম্পুরুষ ও কিন্নর) প্রভৃতি নিয়ে যে সব উপকথা আছে তাদেরও বেশি করে বোঝা যায় আমাদের ঐতিহ্যের অশ্বমেধ, এমনকি — পাঠক বিস্মিত হবেন না — অশ্বত্থবৃক্ষের পূজা ইত্যাদির সম্যক ব্যাখ্যার আলোয়।[১৭]

একটি চরম বিস্ময়ের কথা বলি। নাচ আর গান সহযোগে বিনোদনের যোগান দেওয়ার জন্য গ্রীক নাটকে Chorus-কে রাখা হয়নি, এটি আগে থেকেই বুঝতাম। তবে আমাদের 'কুরু' শব্দের সঙ্গে গ্রীক Chorus-এর সমত্ব (পুরু-র সঙ্গে Porus-এর যেমন সমত্ব) যখন আমার নজরে এল, তখন এক ঝলকে বুঝে গেলাম গ্রীক নাটকে Chorus-এর প্রকৃত ভূমিকা। আমাদের দেশে যুদ্ধের ক্ষেত্র বলা হয়েছে কুরুক্ষেত্রকে। কেননা, সেখানেই 'কী করা উচিত' (মা কুরু = করিয়ো না, করা উচিত নয়) অর্থাৎ কর্তব্য কী তার নিরূপণ হয়। বুঝলাম, Chorus কেন কর্তব্য আর অকর্তব্যের তর্কটাকে নাটকের আগাগোড়া জীইয়ে রাখে।

এ কথা আশা করি সকলে মানবেন যে, আমাদের শিক্ষিত সমাজের বড় অংশের নজর আজ পশ্চিমমুখী। আমাদের বিশ্বাস, চলতি জগতের কেন্দ্র রয়েছে পশ্চিমে; সেখানে অধিকার কায়েম করতে আমরা সদাই উন্মুখ। এ অবস্থায় আমাদের ক্রিয়াভিত্তিক (বাংলা-সংস্কৃত) ভাষায় অধিকার অর্জনের চেষ্টায় পশ্চিমী জগতে আপনার দখল কমবে না বাড়বে, আপনার মনে উঠবেই এ প্রশ্ন। এ কারণে পশ্চিমী দুনিয়ার প্রসঙ্গ টেনে এনেছি বারে বার। আলোচনায় দেখাতে চেষ্টা করেছি, ক্রিয়াভিত্তিক (বাংলা-সংস্কৃত) ভাষার জ্ঞান ভাল সহায়তা করবে ঐ জগৎকে বুঝতে। এই জ্ঞান আপনার দিগন্তকে অনেক দিকেই বাড়িয়ে দেয়।

প্রথমত, যে আলোচনা করেছি, তাতে নিশ্চয় দেখেছেন, ক্রিয়াভিত্তিকতায় গেলে বাংলা ভাষা কত জীবন্ত হয়ে ওঠে আপনার, আমার এবং সকলের ব্যবহারে। দ্বিতীয়ত, ইংরেজির মাপে বাংলাকে ছেঁটে নেওয়ার অভ্যাস ছাড়ার পর, আপনার যে চোখ খুলবে, তার সঙ্গে একটু ক্রিয়াভিত্তিক বিশ্লেষণ মেলালে আপনি স্বদেশের মানুষের মনের সঙ্গে বেশি করে যুক্ত হতে পারবেন। আপনি যে কত শব্দ ব্যবহার করতে পারবেন তার সামান্য কিছু নমুনা এখানে দিচ্ছি : যথা, বিন্দুবিসর্গ (= বিন্দুতে আরম্ভ থেকে বিসর্গতে শেষ পর্যন্ত), হস্তীমূর্খ (= বড় রকমের মূর্খ), পূর্বাশ্রমের নাম (= ব্রহ্মচারী, গৃহী, অথবা বানপ্রস্থী অবস্থার নাম), দিকপাল / দিগ্‌গজ (= এক এক দিকের পালনকারী), জাতধম্মো (= জাতি বা birth অনুযায়ী ধর্ম বা পেশা), পারানির কড়ি (= সংসারনদী বা ভবনদী পার হওয়ার জন্য মাঝিকে দেয় পয়সা),

অপদার্থ (= পদ বা position-এর যোগ্যতাহীন), দায়সারা (দেয় পড়ে আইনের এলাকায়, দায় পড়ে আদি সমাজের ন্যায়ের এলাকায়। অতএব দায়সারা = অবহেলায় করা)। এরকম অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়, যেগুলি অতীতকে না বুঝে তার বোঝা বয়ে বেড়ানো টুলো পণ্ডিতেরা দেখতে বা দেখাতে পারেননি, আর ইংরেজির মাপে যাঁরা বাংলা পড়েন, তাঁদেরও নজর এড়িয়ে গেছে।

তৃতীয়ত, ক্রিয়াভিত্তিকতার পথে এগোলে আমাদের প্রাচীন গ্রন্থাদির মধ্যে পাওয়া যাবে মাত্র একটি দৃষ্টিভঙ্গী বা জীবনদর্শন, তা নয়; সেখানে ধরা আছে সমাজ-বিবর্তনের দীর্ঘকালের ইতিহাস। সে ইতিহাসে স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের নাম থাকে না, সেখানে থাকে সত্তার নাম, যেমন দেখি রবীন্দ্রনাথের লেখায় 'বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্বরী দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে।' আমরা দেখতে পাই বিষ্ণু বা নারায়ণের দশাবতারের কাহিনীর মধ্যে পুঁজির বিবর্তনের ইতিহাস। লক্ষ্য করবেন যে বাঙালির মুখের কথার মধ্যে ধরা আছে নগদ নারায়ণের নাম, ধান্য বা মুদ্রার মধ্যে নারায়ণ-পত্নী লক্ষ্মীর অবস্থান। আরও খেয়াল করবেন যে সংস্কৃত ভাষা না-শিখে তখন কেবল ইংরেজিতে পাওয়া যায় এমন জিনিস পড়েই ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিদেশী মনীষী কার্ল মার্কস পুঁজিপতিকে বলেছিলেন 'the modern penitent of Vishnu'। সেই রীতিতে ভাষাবিচারে কিঞ্চিৎ রপ্ত হলে দেখবেন নদী বললে শুধু জলধারা বা river বোঝায় না, নদ শব্দটিও নিছক ব্যাকরণের চাহিদা মেটানোর জন্য তৈরি শব্দ নয়। নদনদী বললে বোঝায় মানুষকে ন (= বিত্তন বা সম্পদ) দান করে এমন জ্ঞানধারা বা কর্মধারা। ব্যুৎপত্তি অনুসারে গঙ্গা বললে বোঝায় নিত্যগমনশীলতা; অতএব অবাধ পণ্যপ্রবাহ সহ যে-কোনো পর্যায়ের অবাধ ধারাকে বোঝাতে গঙ্গা শব্দ ব্যবহার করা যায়। মনে করিয়ে দিই, শান্তনুর ঔরসে গঙ্গার গর্ভে জন্মাচ্ছে অষ্টবসু, এবং বসু মানে সম্পদ, যে কারণে পৃথিবী হল বসুমতী, বসুন্ধরা, বা বসুধা। পুরাণের সব কাহিনীর মধ্যেই পাব সামাজিক সত্য এবং অন্য নানা স্তরের সত্য। ঠিক পথে পুরাণের চর্চায় কিছুটা এগোলে অনেক কিছু ধরা যায়।

পুরাণের ভাষায় সূর্যবংশ মানে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় পুঁজির সমর্থক, আর চন্দ্রবংশ বললে বোঝায় ব্যক্তিগত পুঁজির সমর্থক। দেবতার বর মানে বিশেষ (সামাজিক) শক্তির হাতে নির্বাচন বা বরণ, যার মানে এক সঙ্গে বেশ কিছু দায়িত্ব ও ক্ষমতা লাভ। সে রকম ধনু মানে হল law। অতএব হরধনু, ইন্দ্রধনু, রামধনু বললে বোঝায় যথাক্রমে হর (বা মহাদেব), ইন্দ্র, এবং রামের আইন। লক্ষ্য করবেন রামধনুই সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে মানুষকে। দেবাসুরের মিলিতভাবে সমুদ্রমন্থন মানে রাষ্ট্রীয় পুঁজি (অসুর) আর ব্যক্তিগত পুঁজি (দেবতা) — দুই মিলিতভাবে জনগণ (সমুদ্র) কে দিয়ে ধন (= লক্ষ্মী) উৎপাদন করছে। ব্যক্তিপুঁজির সঙ্গে মিলিয়ে দেখবেন, সমুদ্রমন্থন কালে শত চাতুরী করছে দেবতারা। এবং দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচের তরফেই কি কম চাতুরী!

৪. এখন তবে কী?

আমার অনেক অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও একটি জিনিস এতক্ষণ ধরে আপনাদের হাতে তুলে দিতে চেষ্টা করেছি। তা হল আমাদের ভাষা এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে যুক্তিগ্রাহ্য কিছু তত্ত্ব ও তথ্য। আশা করি, আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির অনন্যতা তথা আজকের দিনে এর উপযোগিতা নিয়ে আপনার মনে সংশয় থাকলে তা কিছুটা কেটে যাবে এবং বিশ্বাস থাকলে তা দৃঢ়তর হবে। আপনার মনে আগ্রহ হবে দেশের মানসলোক অর্থাৎ দেশের বহুযুগ লালিত সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ স্থাপন করার এবং সেই সংযোগকে বাড়িয়ে নেওয়ার। এর ফলে মনের দিক থেকে আপনি তৃপ্ত হবেন, এবং নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়ে থাকার দুঃখে আপনাকে ভুগতে হবে না। আর যেটা বোধ হয় আরও বড় কথা, আপনার পরবর্তী প্রজন্মের কাছে দেশের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে এমন কিছু তথ্য ও তত্ত্ব তুলে ধরতে পারবেন, যাতে তারা দেশের সঙ্গে মানসিক তথা সাংস্কৃতিক যোগ রাখতে নিজে থেকে আগ্রহী হয়। দেশের সম্বন্ধে জ্ঞান, সেই জ্ঞানকে বাড়িয়ে নেওয়ার উপায় জানা, এবং সেই জ্ঞান থেকে আপনার বর্তমান জীবনে ইন্ধন আনার মত বিচারবুদ্ধি — এই হবে আপনার ও আপনার দেশের অতীত ও বর্তমানের মধ্যে প্রকৃত সেতু, যে সেতু আপনাকে শুধু অতীতের সঙ্গে যুক্ত করবে, তাই নয়; এ সেতু সদাই প্রসারিত থাকবে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে।

একথা স্পষ্ট যে ক্রিয়াভিত্তিক (বাংলা-সংস্কৃত) ভাষাকে বোঝার জন্য চাই ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থতত্ত্ব আর সেই তত্ত্বের প্রয়োগকে যাচাই করে নেওয়ার জন্য আমাদের ক্রিয়াভিত্তিক (বাংলা-সংস্কৃত) ভাষার চর্চা। কিন্তু তারপর? একেবারে প্রথমেই আসে বিচ্ছিন্ন শব্দসমূহের প্রকৃত অর্থ উদ্ধার করা, আর তার পরই আসে পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির কাহিনীগুলির মর্মার্থ উদ্ধার করা। এই দুটি কাজে হাত লাগানো বিপুল পরিমাণে বাকি আছে, এবং এর প্রতি পদক্ষেপে নানান অন্তরায়। সত্যি বলতে কি, আমাদের যত প্রাচীন গ্রন্থ তার প্রতিটিকে ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থতত্ত্বের আলোয় নতুন করে অনুবাদ করে দেওয়ার প্রয়োজন। এটি আমাদের কাছে মানবসভ্যতার দাবী। এতদিন যে অনুবাদ চলছিল, তা প্রায় সম্পূর্ণতই ভুল। যেমন জ্যোতিষশাস্ত্রের রাহু কেতুকে আক্ষরিক অর্থে দুটি monster বলে কল্পনা করা হত। এবং এই কারণেই আলবিরুনী খেদ করেছিলেন, যে, হিন্দুস্থানের বিজ্ঞানীদের অসামান্য তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে আজগুবি গল্প মিশিয়ে দেওয়ার দুর্বুদ্ধি যে কেন হয়! এখানেও আলবিরুনীর অভিযোগের নিষ্পত্তি করা জরুরি কাজ। তার ওপর আমাদের পুরাণকাহিনী তথা ভাষা থেকে আমরা বহু বিষয়ে দিশা খুঁজে পাব। কোন কোন পর্যায় পার হয়ে মানবসমাজ আজকের অধঃপতিত অবস্থায় এসেছে, অর্থাৎ কী কী ধাপ বেয়ে সমাজের অবতরণ ঘটেছে সে বিষয়ে তথ্য জানা থাকলে, উত্তরণের পথের হদিশ মিলবে, এমন আশা করা যায়। যে শব্দার্থতত্ত্বের চাবি দিয়ে আমাদের ভাষাসম্পদের অল্প কিছুটা উদ্‌ঘাটন করলাম, তা দিয়ে অনেক বিদ্যাতেই নতুন সৃষ্টি সম্ভব হবে এবং সভ্যতার রূপান্তরে তারা পরিণতি পাবে। আমরা দাঁড়িয়ে আছি যুগসন্ধির মাহেন্দ্রক্ষণে।

পাদটীকা

৯ Hubris = সাফল্যজাত বেপরোয়া ভাব, insolence of triumph।
Hamartia = tragic error, ট্র্যাজেডি-সংঘটক সীমালঙ্ঘন।

১০ Sophrosyne = অপ্রমাদী ন্যায়াচরণ।

১১ Nemesis = প্রত্যাবৃত্ত ন্যায়দণ্ড।

১২ এ বিষয়ে আমাদের বেশ কয়েকটি গ্রন্থ ও অনেকগুলি নিবন্ধ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী পাঠক তা দেখে নিতে পারেন।

১৩ জল, নীর, বা কর (= tax) দানকারীকে বলা হয় যথাক্রমে জলদ, নীরদ, করদ। আবার 'প' সূচীত করে পান / পানকারী অথবা পালন / পালনকারীকে। সেই সূত্রে 'ভূ' ও 'নৃ' পালনকারী যথাক্রমে ভূপ এবং নৃপ, আর মধুপানকারী হল মধুপ। সুতরাং যে বা যাহা পান / পালন দান করে, তাকেই পদ বলা যায়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা নীচের ৭ নম্বর পাদটীকায় উল্লেখিত গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে রয়েছে।

১৭ কলিম খান ও আমার লেখা যৌথ গ্রন্থ 'বাংলাভাষা : প্রাচ্যের সম্পদ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১৮ কাশ-এর, অর্থাৎ আমরা যত কথা বলি তার, আধার হল আকাশ। মানুষের চিন্তার সকল প্র'কাশ' গিয়ে গড়ে তোলে মানবমনের আকাশ বা চিদাকাশ। এককথায় একে সংস্কৃতিও বলা যায়। এই 'আকাশ' তাই দৃশ্য sky-টিকে যেমন বোঝায়, তেমনি মানুষের মনোলোকের আচ্ছাদনটিকেও বোঝায়। এবং বলতে কি, সেকালে প্রধানত সেই চিদাকাশকে বোঝাতেই বাংলায় 'আকাশ' শব্দের ব্যবহার হত। আর সেজন্যই আজও 'আকাশ ভেঙে পড়া' শব্দবন্ধটি বাংলাভাষায় নির্বিবাদে প্রচলিত আছে। কারণ, মূর্খেও জানে, sky কখনো মানুষের মাথায় ভেঙে পড়ে না। যেটা কখনো কখনো ভেঙে পড়ে, সেটা মানুষের চিদাকাশ। বলে রাখা ভালো, ইসলাম যখন এদেশে আসে তখন আমাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েনি, কারণ তাঁরা আমাদের একই আকাশের অন্য দিগন্তের বাসিন্দা ছিল; তাই তারাও আমাদের বুঝতে খুব বেশি অসুবিধা বোধ করেনি, আমাদেরও অসুবিধা হয়নি। কিন্তু ইয়োরোপ ছিল ইসলামী আকাশের শেষ দিগন্তের বাসিন্দা। তাকে আরব-প্রভাবিত ইসলাম খানিকটা বুঝলেও, আমাদের বাংলাভাষী হিন্দু-মুসলিমের পক্ষে সে ছিল একেবারেই অন্য জগতের লোক। তাই সেও যেমন আমাদের বুঝতে পারেনি, আমাদের নিজস্ব আকাশের তলায় বাস করে আমাদের পক্ষেও তাকে বোঝা দুঃসাধ্য ছিল। একমাত্র উপায় ছিল আমাদের নিজেদের আকাশটিকেই জলাঞ্জলি দেওয়া। রামমোহনের হাত ধরে আধুনিক বাঙালি তাই করেছিল।

১৯ ভাষাগোষ্ঠীগুলির মধ্যে সব থেকে বেশি চর্চা হয়েছে ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর। এই গোষ্ঠীর বিখ্যাত সদস্যদের মধ্যে ধরা হয় অতীত কালের গ্রীক, ল্যাটিন, সংস্কৃত, ও প্রাচীন ইরানীয় বা পারসীক এবং বর্তমান কালের ইংরেজি, ফরাসি, রুশ, জার্মান, ইতালীয়, স্প্যানিশ, পর্তুগীজ প্রভৃতি ইয়োরোপীয়, এবং বাংলা, হিন্দি, গুজরাতি প্রভৃতি ভারতীয়, এবং ফারসি, পশতু প্রভৃতি। আরবী, হিব্রু, চীনা, তিব্বতী, জাপানী প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভাষা এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা নানা বিভিন্ন গোষ্ঠীর সদস্য।

২০ পরিস্থিতিটি অনেকটা মুদ্রাস্ফীতির মতন। বাজারে বেশি মুদ্রা বা note ছাড়া আছে; কিন্তু তাদের ক্রয়ক্ষমতা ক্ষীয়মান।

২১ দ্রষ্টব্য : ঐ গ্রন্থের রূপতত্ত্ব অংশে ৩.০৯২ [৩]

২২ উপরোক্ত *'বাংলাভাষা : প্রাচ্যের সম্পদ ও রবীন্দ্রনাথ'* গ্রন্থটিতে এ বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে।

২৩ Dejection; an Ode

২৪ Elegiac Stanzas, suggested by a Picture of Peele Castle.

২৫ *Tempest* IV.i.148

২৬ Robins ওই গ্রন্থে বলেছেন, 'What is most remarkable about Indian phonetic work is its manifest superiority in conception and execution as compared with anything produced

in the West or elsewhere before the Indian contribution had become known there. In general one may say that Henry Sweet takes over where the Indian phonetic treatises leave off,' *A Short History of Linguistics*; Chapter six : R. H. Robins.

১৭. দ্র. 'ভাষাতত্ত্বের নতুন দিগন্ত ও প্রকল্পিত আর্য-আগমনতত্ত্ব' / *বাংলাভাষা : প্রাচ্যের সম্পদ ও রবীন্দ্রনাথ* / কলিম খান ও রবি চক্রবর্তী।

(রবি চক্রবর্তী লিখিত 'সেতু বাঁধবেন কী করে এবং কী ভাবে?' শীর্ষক একটি নিবন্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাভাষীদের 'অগ্রবীজ' পত্রিকার ২০০৭ এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশের জন্য প্রেরিত হয়। অজ্ঞাত কারণে নিবন্ধটি কিঞ্চিৎ সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়; তাতে প্রতিপাদ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। সেই কারণে, পরে, মূল নিবন্ধটিকে কেবলমাত্র প্রবাসীদের উদ্দেশে না-রেখে সার্বজনীন করে নিয়ে, কয়েকটি ব্যাখ্যা যোগ করে এবং নিবন্ধের শীর্ষক পরিবর্তন করে তা কলকাতার 'অপর' পত্রিকার ২০০৭ পূজা সংখ্যায় নবরূপে পুনঃপ্রকাশ করা হয়। এখানে 'অপর'-এ প্রকাশিত নিবন্ধটিই অবিকল রাখা হল।)

বিশ্বায়নের মূল সমস্যা — দৈব না পুরুষকার?

রবি চক্রবর্তী কলিম খান

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন / সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে —

ঘটনাটি ২০০০ সালের। কলকাতার উপকণ্ঠে একটি গার্লস স্কুলের নবম শ্রেণীর ক্লাসঘরে ঢুকে দিদিমণি দেখলেন, বোর্ডে বিশ্রী ছবি আঁকা রয়েছে। ছাত্রীদের কাছে জানতে চাইলেন, ছবিটা কে এঁকেছে। সবাই চুপ। তিনি বললেন, 'উঠে দাঁড়িয়ে নিজের নাম বলতে পারছ না! সামান্য সৎসাহসটুকু নেই তোমাদের? এত কাপুরুষ তোমরা!'

এক ছাত্রী পিছন থেকে ফুট কাটল, 'আমরা তো পুরুষই নই দিদিমণি, কাপুরুষ হব কেমন করে!'

কলকলিয়ে হেসে উঠল সবাই। দিদিমণি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'চুপ করো! আমি বলছি সৎসাহসের কথা। সেটুকুও নেই তোমাদের! কেমন মানুষ তোমরা?'

'মেয়েমানুষ, দিদিমণি।' — আরেক ছাত্রী নীচের দিকে মুখ করে বলে বসল।

দিদিমণি থ! বুঝলেন, সমস্যাটা বোর্ডে বিশ্রী ছবি আঁকায় যত না রয়েছে, তার চেয়ে বেশি রয়েছে বাংলাভাষায়। কিন্তু সে-সমস্যার কী সমাধান করবেন তিনি? কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি ক্লাসের পড়ায় মন দিলেন।

বাংলাভাষী ছেলেমেয়েদের সামনে এই যে সমস্যা, আমাদের অ্যাকাডেমিগুলির হাতে তার সমাধান নেই। কারণ, বাংলাভাষার শব্দার্থতত্ত্বকে তাঁরা বুঝেছেন পাশ্চাত্যের ভাষাতাত্ত্বিকদের চশমা পরে। ফলে, যে 'পুরুষ' শব্দের মূল অর্থ ছিল 'পুর উষ্ (use) করে যে', এবং সে কারণেই সেই 'পুরুষ' শব্দে, 'পিঠায় (পুরোডাশে) পুর দেয় যে' তাকে যেমন বোঝানো যেত, তেমনই 'স্ত্রীক্ষেত্রে বীর্য নিষেক করে যে' তাকেও বোঝাত; এমনকী ছাত্রছাত্রীদের মাথায় জ্ঞানের পুর যিনি দেন, সেই শিক্ষক-শিক্ষিকাকেও বোঝানো হত, বোঝানো যেত 'পুর-এ বাসকারী' 'পুরুষ'-সহ সর্ব প্রকারের সমাজ-পরিচালকদের; সে পরিচালক নর হতে পারেন, নারীও হতে পারেন। কিন্তু ইংরেজির চশমা লাগানোর ফলে 'পুরুষ' মানে হয়ে গেছে শুধুমাত্র male, যেন তার gender-টিই একমাত্র কথা। ও দিকে কাপুরুষ হয়ে গেছে coward, প্রথম পুরুষ হয়েছে third person, উত্তম পুরুষ first person, পুরুষোত্তম excellent man, পুরুষানুক্রম হয়ে গেছে generation। একইভাবে পুরুষার্থ, পুরুষপুঙ্গব, সুপুরুষ, বীরপুরুষ, মহাপুরুষ, পুরুষোচিত, পৌরুষেয়, অপৌরুষেয়, পুরুষসূক্ত, পুরুষকার, পুরুষত্ব, পুরুষসিংহ, পুরুষেন্দ্র, পুরুষক, পুরুষনাগ, পুরুষরতন, পুরুষালি, পুরুষমেধ, পুরুষাঙ্গ ... ইত্যাদি শব্দের যে ইংরেজি পরিবর্ত শব্দগুলি করা হয়েছে, সেগুলি পরস্পর থেকে একেবারেই আলাদা চরিত্রের। generation-এর সঙ্গে coward-এর কোনো সম্পর্কই নেই, কিন্তু আমাদের

'পুরুষানুক্রম'-এর সঙ্গে 'কাপুরুষ'-এর সম্পর্ক সুস্পষ্ট; দুটি শব্দের ভিতরেই 'পুরুষ' কথাটি রয়েছে। বাংলা শব্দের এই যে আঙুরের থোকার মতো চরিত্র, তার ফলে এক 'পুরুষ'কে জানলেই সব 'পুরুষ'কে কমবেশি জানা যায়। ইংরেজি শব্দ সেরকম নয়, সে যেন পাথরকুচির এক-একটা টুকরোর মতো নিষ্প্রাণ এবং আলাদা আলাদা। ইংরেজির প্রত্যেকটি শব্দকে তাই পৃথকভাবে বুঝতে হয় ও মনে রাখতে হয়।

সেই ইংরেজির অত্যন্ত প্রভাবের কারণে আজকাল আমরা, স্কুল-কলেজে পড়া শিক্ষিত বাঙালিরা, বাংলা শব্দকেও ইংরেজির মতো পৃথক পৃথক করে বুঝি। কিন্তু আমাদের ছেলেমেয়েরা, যারা এখনও ইংরেজির দ্বারা সম্পূর্ণ কনডিশনড্ হয়ে যায়নি, বাংলাভাষার স্বাভাবিক উত্তরাধিকার থেকেই তারা বুঝতে পারে, 'পুরুষ'-এর সঙ্গে 'কাপুরুষ'-এর কোথায় জানি একটা সম্পর্ক রয়েছে। তাই 'পুরুষ'কে কেবলমাত্র male বলে বুঝে নিয়ে তারা ঘোরতর সমস্যায় পড়ে যায় — কাপুরুষ, পুরুষকার, পুরুষার্থ ... ইত্যাদি শব্দ নর ও নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই যে প্রযুক্ত হয়ে থাকে, সেই কথাটি বাদ পড়ে যাচ্ছে দেখে তারা নানারকম প্রশ্ন তোলে। যেন-বা মেয়েদের কেউই কাপুরুষ হয় না, কেবল ছেলেদেরই কেউ কেউ কাপুরুষ হয়, যেন-বা মেয়েদের পুরুষকার বলে কোনো বস্তু হয় না, কেবল ছেলেদেরই হয়! ... ছেলেমেয়েরা তো আপত্তি করবেই!

সত্যিই এ এক অনিবার্য সমস্যা। বাংলাভাষী মেয়েদের মহলে এরকম কত সমস্যা যে নিত্য উঁকি দেয়, তার ইয়ত্তা নেই। এর সবচেয়ে বড় কারণ হল, উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা যে বাংলাভাষা পেয়েছি, ইংরেজির অত্যন্ত প্রভাবে আমাদের অ্যাকাডেমিক জগৎ থেকে সে বাংলাভাষা প্রায় বিতাড়িত। তার স্থান হয়েছে বাংলাভাষী মেয়েদের ভাষায়, গ্রামবাংলায়, আর বাংলাভাষার বিভিন্ন প্রান্তিক বাংলাভাষীদের ভাষাব্যবহারে। ইচ্ছে করলে একবার খোঁজ নিয়ে দেখুন — 'আঙুল ফুলে কলাগাছ', 'আঙুল বাঁকিয়ে ঘি তোলা', 'চোখের মাথা খাওয়া', 'চোখের চামড়া থাকা না-থাকা', 'মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া', 'জেনে বা দেখে আকাশ থেকে পড়া', 'ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া', 'ঘোড়ার ডিম পাওয়া' ... এই ধরনের অজস্র বাগ্‌ধারা কারা বেশি ব্যবহার করেন? কিংবা 'পুরুষকার', 'দৈব', 'তর্পণ', 'পিতৃগণ', 'পিতৃলোক', 'দেবলোক', 'ব্রহ্মলোক', 'কামধেনু', 'কল্পতরু', 'সপ্তর্ষি', 'মহর্ষি' — এই রকম অজস্র তথাকথিত 'পৌরাণিক' বা সেকেলে বাংলা শব্দ কারা এখনও তাঁদের কথাবার্তায় ব্যবহার করেন? তেমন বাংলাভাষীর সংখ্যা কোথায় কত? এ নিয়ে কোনো পৃথক সমীক্ষা এখনও হয়নি। আমরা বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষা নিয়ে যতটুকু খোঁজখবর করেছি, তাতেই অবাক হয়েছি। দেখেছি, এই সংখ্যাটি কলকাতা, ঢাকা প্রভৃতি শহরাঞ্চলে ও বাংলাভাষা চর্চার কেন্দ্রীয় অ্যাকাডেমিগুলিতে পাওয়া যায় সবচেয়ে কম, হয়তো-বা শূন্যের কাছাকাছি। আর, যত প্রান্তিক এলাকায় যাওয়া যায়, তত দেখা যায় সংখ্যাটি বাড়ছে এবং সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় বিভিন্ন প্রান্তিক এলাকার 'সেকেলে' বাংলাভাষীর ও মেয়েদের ভাষায়। অর্থাৎ কিনা, আমাদের বাংলাভাষায় বিশ্বমানবের শ্রেষ্ঠ অর্জনের যে উত্তরাধিকার মণিমুক্তোর মতো

ছড়িয়ে রয়েছে, তা রয়েছে এঁদেরই মুখের ভাষায়। বাংলা রামায়ণ-মহাভারত, বৈষ্ণবসাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, হিন্দু-মুসলিম পদকর্তাদের পদাবলী কিংবা বাংলায় অনূদিত পুরাণাদিতে বা শব্দকোষগুলিতে তা যথেষ্ট পরিমাণে থাকলেও সে হল মৃত উত্তরাধিকার; সজীব নয়। সজীব উত্তরাধিকার যা কিছু রয়েছে, তা রয়েছে এই সব তথাকথিত প্রান্তিকদের হাতেই। আর, এ যে কত মূল্যবান সম্পদ, তা বলে শেষ করা যায় না। বিগত 'সাহিত্য ৯৪' সংখ্যায় তার যৎসামান্য উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।[১] আজ সেইরকম কিছু মূল্যবান সম্পদের কথা বলব, যা বাংলাভাষী পাঠককে বিশ্বের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সাহায্য করবে বলে মনে হয়। আমাদের এ-দাবি যথার্থ কি না, পাঠক বিচার করে দেখুন।

রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে,/ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে —

পূর্বপুরুষদের স্মরণ করার যে-সমস্ত রীতি-রেওয়াজ একালের সমাজে প্রচলিত আছে, সেগুলির বিষয়ে খোঁজখবর নিতে গেলে অবাক হতে হয়। পূর্বপুরুষকে স্মরণ করতে হয় কেন, কীভাবে করতে হয়, করলে কী হয় — সে সব প্রশ্নের কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা তথাকথিত ভাববাদী, বস্তুবাদী, যুক্তিবাদী, আস্তিক, নাস্তিক, কারও কাছে পাওয়া যায় না। আমরা জানি, মৃত মানুষ কিছু দেন না, গ্রহণও করেন না। তাসত্ত্বেও সব্বাই, এমনকী মার্কসবাদীরাও কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ না-দেখিয়েই পূর্বজদের স্মরণ করার চিরাচরিত প্রথাটি নিজেদের মতো করে মান্য করে থাকেন!

আমাদের যৌক্তিক বুদ্ধিজীবীদের এবম্বিধ অযৌক্তিক আচরণের কারণ কী, আমরা জানি না। সে সবের মধ্যে না গিয়ে আমরা বরং মানুষের অতীতচারণের বহুকালক্রমাগত ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথাগুলির দিকে তাকানোর সিদ্ধান্ত করি। সেখানে দেখি, সব ধর্মেই বিগতকে স্মরণ করার প্রথাটি নানাভাবে রয়েছে — জন্মাষ্টমী, বুদ্ধপূর্ণিমা, ক্রিসমাস, শহীদ-স্মরণ, ফতেহা-দোয়াজ্-দাহাম, সবেবরাত, লেনিন জন্মবার্ষিকী ... ইত্যাদি ইত্যাদি তার অজস্র উদাহরণের কয়েকটি। কিন্তু কেন পূর্বপুরুষকে স্মরণ করতে হয়, তার কোনো সদুত্তর এই সব প্রথামান্যকারীদের কাছে পাওয়া যায় না। প্রত্যেকেই নিজের মতো করে একটা ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন, যা স্বাভাবিক বুদ্ধির বিচার-বিবেচনার কোনো-না-কোনো পরীক্ষায় আটকে যায়। এরই মধ্যে একদিন অকস্মাৎ আমাদের চোখে পড়ে — মানুষের প্রাচীনতম ধর্মে বিগতকে স্মরণ করার এমন একটি সূত্র রয়েছে, যা সর্বজনগ্রাহ্য এবং বিজ্ঞানসম্মতও বটে। যাদের কম-বুদ্ধির আদিম মানুষ বলে আমরা সভ্যতার গর্বে খানিকটা করুণার চোখে দেখি, তাঁদের এমন যুক্তিসঙ্গত উপলব্ধি দেখে আমরা অবাক হয়ে যাই।

ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির সাহায্যে বেদ-পুরাণাদির যতটা অর্থ এখন পর্যন্ত নিষ্কাশন করা গেছে, তাতে দেখা যায়, একালের ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান-খ্রিস্টান-কবীরপন্থী-নানকপন্থী-বৈষ্ণব-উপজাতি ইত্যাদি সমস্ত মানুষের আদি পুরুষেরা, বৈদিক ধর্মের সূত্রপাতেরও আগে, যে-ধর্ম পালন করতেন তার নাম সনাতন ধর্ম। যতদূর বোঝা যায়,

তখনই পূর্বপুরুষকে স্মরণ করার প্রথাটির প্রবর্তন হয়। এই প্রথাটিকে সেকালের মানুষেরা 'পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন' বা 'তর্পণ' বলতেন। কিন্তু 'পিতৃলোকের' মানেই এখন কেউ জানে না, পুরো কথাটির মানে তাই কিছুতেই বোঝা যায় না। তা ছাড়া, সে-তর্পণও অবিকল নেই! কেননা সেই সনাতন সমাজ বিভাজিত হয়ে বৈদিক ও তান্ত্রিক সমাজে পরিণত হয়ে গেলে, দেখা যায়, সেই তর্পণের উত্তরাধিকার বহন করছেন কেবল সামবেদীরা। তারপরে আরও বিভিন্ন ধর্মে মানুষ বিভাজিত হতে থাকে। তর্পণের উত্তরাধিকারও খণ্ড খণ্ড হয় এবং তার নানা অংশ নানাভাবে নানা ধর্মের মানুষের মাধ্যমে বাহিত হতে থাকে। বৈদিক ও বৌদ্ধযুগের গোধূলিলগ্নের ভয়াবহ চেহারা দেখে বিরক্ত ভারতসমাজ ৭৫০ খ্রিস্টাব্দের পর ডেকে আনে তার মৃত পিতামহ-সমান আদি সনাতন ধর্মকে এবং অবক্ষয়প্রাপ্ত বৌদ্ধধর্মের বিপরীতে 'সনাতন হিন্দুধর্ম'[২] নাম দিয়ে নতুন ধর্মের সূত্রপাত করে দেয়। বর্তমানে অন্য কোনো ধর্মে সেই আদি তর্পণের উত্তরাধিকার সম্পূর্ণভাবে নেই, তবে 'সনাতন হিন্দুধর্মে' রয়েছে। হিন্দুধর্মের পুরোহিতগণকে ধন্যবাদ, তাঁরা সেকালের সামবেদীগণের তর্পণের প্রাচীন উত্তরাধিকারটিকে আক্ষরিক অর্থে আজও যথেষ্ট পরিমাণে ধরে রেখেছেন, যদিও তার মূলগত অর্থটি তাঁরাও গেছেন ভুলে। আজ, ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি হাতে এসে যাওয়ায়, তার সাহায্যে আমরা সেই তর্পণের প্রকৃত অর্থটিও বুঝে নিতে পারি।

অর্থাৎ কিনা, আজকের প্রায় সকল বিশ্ববাসীর প্রাচীন পুরুষেরা তাঁদের পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করতেন। কিন্তু আজ আমরা সেই তর্পণের প্রকৃত অর্থ ভুলে গেছি। কেউই জানেন না, কেন শুধুমাত্র সামবেদীগণের তর্পণ মন্ত্র হিন্দু পুরোহিতগণের হাতে এখনও প্রচলিত আছে; কেন ঋক্‌বেদী-যজুর্বেদী-অথর্ববেদী ও তান্ত্রিকজ গোষ্ঠীগুলির ওইরকম তর্পণ নেই; কেন সাবিত্রী মন্ত্র ও গায়ত্রী মন্ত্রে তফাত নেই; কেনই-বা যে-তেরোটি তর্পণমন্ত্রের প্রচলন রয়েছে, তার কয়েকটি মন্ত্রের নামই বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, অথচ মন্ত্রগুলি রয়েছে; কেনই-বা একটি গুরুত্বপূর্ণ তর্পণ মন্ত্রের নাম 'রামতর্পণ' ...। এরকম অজস্র। সুখের কথা, ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির সাহায্যে এসব এখন আর দুর্বোধ্য নয়। তবে এই সমস্ত কথার আলোচনা এই পরিসরে সম্ভব নয়, বারান্তরে তার চেষ্টা করা যেতে পারে। আপাতত কাজের কথায় আসা যাক।

পিতৃপুরুষের 'তর্পণ' বিষয়ে হিন্দু পুরোহিতগণের 'সামবেদীয়' 'কর্মপদ্ধতি'তে বলা হয় — 'জলদান দ্বারা পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধনের নাম তর্পণ। দ্বিজাতিগণের (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) ও শূদ্রগণের তর্পণব্যবস্থা বেদ ও পুরাণে আছে। আজকাল বৈদিক তর্পণ কেউই করেন না। সেই জন্য কেবল পৌরাণিক তর্পণের ব্যবস্থাই ...'[৩] একালে প্রচলিত। জেনে রাখা দরকার, পুরাণে কমবেশি সর্বজাতির স্বীকৃতি রয়েছে বলে, বেদবাদীদের কখনো কখনো পুরাণের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে দেখা যায়।

এখন এই 'জলদান দ্বারা পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধনের নাম তর্পণ' কথাটির প্রকৃত অর্থ কী, সে কথা জানার চেষ্টা করলেই আমরা প্রকৃত তথ্যটি পেয়ে যেতে পারি। তবে, তার আগে

পুরোহিতগণের মন্ত্র, তর্পণ ইত্যাদি এবং তৎসংশ্লিষ্ট আচারগুলি আসলে কী, সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা দরকার। নইলে এর কিছুই বোঝা যাবে না।

বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে পিকনিকে যাবেন। একটি খাতায় লিখে নিলেন কে কে যাবে, চাঁদা কত হবে, কী রান্না হবে, কার কী দায়িত্ব ইত্যাদি। এ-খাতাটি কিন্তু পিকনিক নয়, পিকনিকের নকশা, এই নকশার ফলিত প্রয়োগেই সঙ্ঘটিত হবে পিকনিক। নিরক্ষর ব্যক্তির কাছে খাতাটি অর্থহীন, দুর্বোধ্য; কিন্তু পিকনিক সকলের কাছে সম্পূর্ণ বোধ্য। আমাদের সমস্ত কর্মকাণ্ডের এরকম নকশা হয়। তাতে কর্মকাণ্ডের সারাৎসার বিভিন্ন কোডের সাহায্যে ধরে রাখা থাকে; পিকনিকের নকশা যেমন আপনি ধরে রেখেছেন বাংলা বা ইংরেজি ভাষার কোডে।

আমাদের সরকারের বাৎসরিক পরিকল্পনার কাগজপত্রও ওই পিকনিকের খাতারই উচ্চতর রূপ, আর সরকার দেশ জুড়ে সারা বছর ধরে যে-কর্মকাণ্ড চালান, সেই কর্মযজ্ঞই হল পিকনিকের উচ্চতর রূপ। প্রথমটি যদি বিল্ডিংয়ের নকশা বা ড্রয়িং-ডিজাইন হয়, দ্বিতীয়টি তবে তদনুসারে তৈরি করা বিল্ডিং। এখন কথা হল — সেকালে, যখন লেখাপড়া দূর-অস্ত, নাচ-গানের মাধ্যমে ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়ার রীতি থেকে মানুষ সামান্য এগিয়েছে,[৪] শ্রুতি-স্মৃতি সবেমাত্র সক্রিয় হয়েছে, তখন সামাজিক কর্মকাণ্ডের, সার্বজনীন ভোজ, বিয়েশাদি, নেতা-নিয়োগের সমারোহ — এ সবের ব্যবস্থা হত কেমন করে? তাঁরা তো আর খাতার পাতা নিয়ে লিস্ট করতে বসতেন না। কী করতেন তাঁরা?

ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির সাহায্যে পুরাণাদির পাঠ থেকে আমরা জানতে পারছি, রাজপুরোহিত যজ্ঞ করে মন্ত্র ও আচারসমূহের মাধ্যমে জানিয়ে দিতেন রাজ্যের বাৎসরিক পরিকল্পনা কীরূপ হবে; তাঁর সে কোড বা 'ড্রয়িং-ডিজাইন' বুঝতেন রাজা ও তাঁর পারিষদেরা; তদনুযায়ী তাঁরা সারা বছরের সামাজিক উৎপাদন কর্মযজ্ঞ চালাতেন।[৫] সাধারণ মানুষ পুরোহিতের ওই যজ্ঞ দেখে বিশেষ কিছু বুঝতে পারতেন না, কিন্তু সারা বছর ধরে যে-সকল কর্মকাণ্ড চলত তা ভালভাবেই দেখতেন ও বুঝতেন এবং তাতে অংশগ্রহণ করতেন। যজ্ঞকুণ্ড ও নানা আচারের কোডের মাধ্যমেই তখন বাৎসরিক রাজ্য যোজনার প্রকাশ ঘটাতে হত সমাজ-পরিচালকদের। সেখান থেকে এখনকার তিন হাজার পৃষ্ঠার 'রাষ্ট্রীয় বাৎসরিক পরিকল্পনা' লেখার যুগে পৌঁছতে আমাদের তিন হাজার বছর খরচ হয়ে গেছে। দুটি ঘটনার দূরত্ব তীর-ধনুক থেকে ইন্টারকন্টিনেন্টাল মিসাইলের দূরত্বের সমান ও সমান্তরাল।

তর্পণ ওইরকম ড্রয়িং বা কোড, যা কিনা একালের সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য আদি ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায় প্রকল্পিত। তাই তার দৃশ্য চেহারা একরকম এবং তার ফলিত প্রয়োগ আর একরকম। দৃশ্য চেহারাটি সবাই দেখতে পান, জানেন, অনেকে তা আচরণও করে থাকেন; জলে দাঁড়িয়ে তর্পণ করতে অনেককেই আমরা দেখি। কিন্তু ফলিত প্রয়োগটি বলে না-দিলে বোঝা প্রায় অসম্ভব। সেটি হল, নিজের ও পরিবারের সকলের শারীরিক তৃপ্তির জন্য নিত্য নিত্য পেটের খোরাক জোগান দেওয়া। এটিই ফলিত নিত্য পিতৃ-তর্পণ। এ-কাজ আমরা সবাই করি, নিজের ও পরিবারের রুটি-রুজির জন্য জানপ্রাণ দিই।

কিন্তু এতে পিতৃতর্পণ হল কোথায়? 'পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন' হল কোথায়?

হল এইভাবে। পিতা কে? যিনি পিতৃতর্পণ করছেন, তিনিই তাঁর পিতা। কীভাবে? কারণ, 'পুত্ররূপে জন্মে লোক ভার্যার উদরে'[৬]— এ আমাদের প্রাচীন বিশ্বাস। ইয়োরোপেরও, মধ্যপ্রাচ্যেরও এই বিশ্বাস ছিল। এ বিশ্বাস দুনিয়ার সব মানুষ নিশ্চয় পেয়েছিল সেই আদি 'একসমাজ' থেকে যেখান থেকে বিভাজিত হয়ে তারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। তাছাড়া, ছেলে তো প্রায়শ বাপের মতোই দেখতে হয়! আপনার অস্তিত্বেই আপনার পিতার অস্তিত্ব। এই 'পিতৃ' আপনার মাধ্যমে, আপনার পুত্রের মাধ্যমে, তার পুত্রের মাধ্যমে চির প্রবহমান এক 'পিতৃলোক' গড়ে তোলেন। এই পিতৃলোক অবশ্যই অন্তরীক্ষে, অর্থাৎ অন্তরে ঈক্ষণ করলে (দেখলে) যাকে দেখা যায়। সেই 'পিতৃলোকে' থেকে যান আপনার সকল পূর্বসূরি 'পিতৃগণ'।[৭] অতএব আপনার শরীরটিকে বাঁচিয়ে রাখতে না-পারলে, তাকে তৃপ্ত না করলে এই পিতৃপ্রবাহটিই স্তব্ধ হয়ে যাবে। পিতৃপ্রবাহ থেকেই আপনি আপনার অস্তিত্বটি পেয়েছেন, পিতৃদেহের এই উত্তরাধিকার বহনই 'পিতৃঋণ', যা প্রত্যেক মানুষকে শোধ করতে হয় নিজের শরীর বাঁচিয়ে এবং সন্তান উৎপাদন করে। তার ফলেই পিতৃপ্রবাহে বেগ সঞ্চারিত হয়, যথার্থ পিতৃতর্পণ করা হয়। তিল-জল দিয়ে মৃত-আত্মার তর্পণের মূলগত অর্থ এই। মৃত-আত্মা যে কিছুই খেতে বা গ্রহণ করতে পারে না, সেটা বোঝার মতো বুদ্ধি, যাঁরা শূন্যের উদ্ভাবন ও সংস্কৃতের মতো ভাষা আবিষ্কার করেছিলেন, আমাদের সেই পূর্বপুরুষদের ছিল। অতএব, তিলজল দিয়ে তর্পণ করা হল প্রকৃত তর্পণের ড্রয়িংমাত্র, নিজের ও পরিবারের ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর করার জন্য খাদ্যাদির ব্যবস্থা করা হল সেই তর্পণের ফলিত প্রয়োগ।

ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি অনুসারে 'যে কর্ম (কারও) তৃপ্তি সাধনের জন্য করা হয়' তাকে তর্পণ বলে। অতৃপ্তি যেখানে সেখানেই এই তর্পণ। অতৃপ্তি কোথায়? সমাজের প্রতিটি মানুষের শরীরে আর মনে। তাই, শাস্ত্রমতে তর্পণ মূলত দুই প্রকার — প্রধানতর্পণ ও অঙ্গতর্পণ। নিজের শরীরের জন্য বা পিতৃলোকের পিতৃগণের জন্য আপনি যে-কর্মোৎপন্ন বা আয় খরচ করেন, সেটি প্রধানতর্পণ; এবং সমাজশরীরের (অঙ্গের) অন্যদের দেওয়ার জন্য, রাষ্ট্রকে দেওয়ার জন্য, বিক্রির জন্য যে-কর্মোৎপন্ন বা আয় খরচ করেন সেটি অঙ্গতর্পণ। এই দুই প্রকারের তর্পণই (নিত্যকর্ম, নৈমিত্তিক-কর্ম, কাম্যকর্ম) তিন প্রকার কর্মের দ্বারা করা হয়ে থাকে। দুরকম তর্পণেরই তাই তিনটি করে উপবিভাগ রয়েছে : নিত্য-তর্পণ, নৈমিত্তিক-তর্পণ, ও কাম্য-তর্পণ। নিত্য-তর্পণ হল, যে-তর্পণ আপনাকে রোজই করতে হয় (খাদ্যগ্রহণাদি); নৈমিত্তিক-তর্পণ হল, যে-তর্পণ আপনাকে (সরকার, কোম্পানি বা অন্য) কারও নিমিত্ত করতে হয়, বদলে আপনি প্রায়শই মজুরি বা বেতন পেয়ে যান; এবং কাম্য তর্পণ হল (ঈশ্বরসেবা, দেশসেবা, জনসেবা, জ্ঞানচর্চা, সংস্কৃতিচর্চা ইত্যাদির জন্য ব্যয়), যে-তর্পণ আপনি করতে পারেন, না-ও করতে পারেন; তবে করলে ফললাভ — অমরত্ব! কীভাবে?

যে জন্মায় সে মরে। মানুষও মরে। প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম। তা হলে, আমাদের দেশের বাতাসে 'আত্মা অমর' বলে এত গুঞ্জন কেন? এর কারণ হল, ব্যক্তিমানুষের শরীরের মৃত্যু

হলেই সে সম্পূর্ণ মরে যায় না, তা 'নাস্তিকের মৃত্যুচিন্তা'[৮] নিয়ে আধুনিক যুক্তিবাদীরা যতই বাগাড়ম্বর করুন না কেন। শরীরের মৃত্যু হলেও মানুষ অবশ্যই বেঁচে থাকে, বেঁচে থাকতে পারে; অমর হতে পারে, হতে পারে ততদিনের জন্য যতদিন মহামানব বেঁচে থাকে।[৯] আদিম মানব থেকে শেষ মানব পর্যন্ত মানুষের যে-সমগ্র সত্তা, রবীন্দ্রনাথ যাকে 'মহামানব' নামে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন, সেই মহামানব যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন ব্যক্তিমানুষ চেষ্টা করলে বিজ্ঞানসম্মতভাবেই অমর হতে পারে। কী প্রকারে?

তিন প্রকারে। প্রথমত জীবৎকালের শরীরজাত পুত্রের মাধ্যমে থেকে যায় তার শরীরের নবরূপায়িত 'পিতৃ' অস্তিত্ব; দ্বিতীয়ত তার জীবৎকালের শ্রমজাত পণ্যাদির মাধ্যমে থেকে যায় তার 'দৈব' অস্তিত্ব; তৃতীয়ত তার জীবৎকালের মানসজাত বা মনচাষের ফলস্বরূপ থেকে যায় তার 'ঋষি' অস্তিত্ব।

তার মানে, প্রথমত, মানুষ তার সন্তানের ভিতর বেঁচে থেকে যাচ্ছেই, একালের জিন-বিজ্ঞানও সে কথা সপ্রমাণ করে দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, একজন মানুষের বানানো হাঁড়িকুড়ি-টেবিলচেয়ার-কলামূলা-যন্ত্রপাতির ভিতরে যে-শ্রম ও মেধা থেকে গেল, সে তো সেই মানুষটিরই। অর্থনীতিশাস্ত্রীরা পণ্যের fetishism[১০] বিস্তর ঘেঁটে দেখেছেন, শ্রম একবার উৎপন্নের ভিতরে ঢুকে গেলে তাকে বড়জোর ধ্বংস করা যেতে পারে, কিন্তু কিছুতেই ফেরত নেওয়া যায় না। সেই শ্রমদানকারী-মানুষটি মরে গেলে, সে যে-সকল পণ্য বানিয়েছিল, সেগুলো থেকে মানুষটির শ্রম ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরে এসে তার সঙ্গে শ্মশানে বা কবরে যাওয়ার তোড়জোড় করে না; থেকে যায় উৎপন্নটির ভিতরেই যতদিন সেই উৎপন্নটি 'রসাতলে' না যায় ততদিন। অর্থাৎ মানুষের শরীর ও মন শ্রম ও মেধারূপে তার বানানো উৎপন্নের ভেতর অবশ্যই থেকে যায়। তৃতীয়ত, যিনি আগুন আবিষ্কার করেছিলেন, শূন্যের আবিষ্কার করেছিলেন, কিংবা অভিকর্ষ তত্ত্বটি আবিষ্কার করেছিলেন, তা তো থেকেই গেছে, এবং অবশ্যই ততদিন বেঁচে থাকবে পৃথিবীতে, মানুষ নামক জীবটি যতদিন বেঁচে থাকবে। আর, আপনি যে জ্ঞানবীজটি আপনার ছাত্রদের মাথায় ঢুকিয়ে দিলেন, কিংবা যে কৃৎকৌশলটি চাষিদের শিখিয়ে দিলেন, সেটি তো থেকেই যাবে। তাকে ফেরত নেওয়ার কোনো উপায় নেই। অর্থাৎ মানুষের মনের উদ্ভাবিত জিনিসের ভিতরে সেই মন অবশ্যই থেকে যায়, মানুষটির মৃত্যুর পরও।

মানুষ তাই মরেও মরে না। তার শরীরজাত, শরীর ও মনের যৌথতা-জাত, ও তার মনজাত অর্থাৎ যথাক্রমে পুত্র, শ্রমজাত উৎপন্ন, ও সাংস্কৃতিক উৎপন্ন — এই তিন সত্তার মাধ্যমে মানুষ বেঁচে থেকে যায়। শরীরের মৃত্যুর পর মহামানবের জীবৎকাল পর্যন্ত মানুষ এভাবে অবশ্যই বেঁচে থাকে; বেঁচে থাকে পিতৃপরম্পরায়, দৈবপরম্পরায়, ঋষিপরম্পরায়। আর সেই পরম্পরাটি রক্ষা করা হয় পিতৃতর্পণের মাধ্যমে পিতৃঋণ শোধ করে; দেবতর্পণের মাধ্যমে দেবঋণ শোধ করে; এবং ঋষিতর্পণের মাধ্যমে ঋষিঋণ শোধ করে। তাই, সামবেদীয় তর্পণে 'পিতৃতর্পণ', 'দেবতর্পণ' ও 'ঋষিতর্পণ' আবশ্যিক কর্তব্যরূপে অন্তর্ভুক্ত।

আসলে মানুষ জন্মায় তিন উত্তরাধিকার নিয়ে — পিতার শরীরের উত্তরাধিকার বা

পিতৃঋণ; পূর্বতন প্রজন্ম পর্যন্ত সমাজের উৎপাদিত বাহ্যসম্পদের উত্তরাধিকার (ঘটিবাটি থেকে ইন্টারনেট, পূর্বতন সমাজ যা বানিয়ে রেখেছে, যার মাঝখানে সে জন্মায়) বা দেবঋণ; এবং পূর্বতন প্রজন্ম পর্যন্ত মানুষের অর্জিত জ্ঞানের উত্তরাধিকার (সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার) বা ঋষিঋণ। নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মের সাহায্যে পিতার দেওয়া নিজদেহের সেবা করে ও সন্তান উৎপাদন করে পিতৃপ্রবাহ অব্যাহত রেখে আমরা পিতৃঋণ শোধ করে থাকি; একেই সেকালের কোডে পিতৃতর্পণ বলা হত। নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য কর্মের সাহায্যে পূর্বতন প্রজন্ম পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে আসা উৎপন্ন-সম্ভারের ভোগ, রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃদ্ধি ঘটিয়ে বাহ্যসম্পদের প্রবাহ বা দেবপ্রবাহ অব্যাহত রেখে আমরা দেবঋণ শোধ করে থাকি; একেই সেকালের কোডে দেবতর্পণ বলা হত। আর শুধুমাত্র কাম্য কর্মের সাহায্যে পূর্বতন প্রজন্ম পর্যন্ত আগত জ্ঞানসম্ভারের উপভোগ, রক্ষণাবেক্ষণ ও নতুন জ্ঞান অর্জন করে নতুন সাংস্কৃতিক উৎপাদনের মাধ্যমে তার বৃদ্ধি ঘটিয়ে ঋষিপ্রবাহ অব্যাহত রেখে আমরা ঋষিঋণ শোধ করে থাকি; একেই ঋষিতর্পণ বলা হত। এই ঋষিপ্রবাহ বা জ্ঞানপ্রবাহের কথা এবং দেবপ্রবাহের কথা রবীন্দ্রনাথও জানতেন এবং বুঝতেন। তাই তিনি বলেছেন, '... আমার যতটুকু সাধ্য, এই প্রবাহের পথকে আগে ঠেলিয়া দিতে হইবে। ইহার জ্ঞানের ভাণ্ডারে আমার সাধ্যমত জ্ঞান, ইহার কর্মের চক্রে আমার সাধ্যমত বেগ সঞ্চার করিয়া দিতে হইবে।'[১১] পিতৃপ্রবাহের কথাটি তিনি এ ক্ষেত্রে আর পৃথকভাবে বলেননি। বলেছেন অন্যত্র।

তাই, সন্তানবান মানুষ মাত্রেই তাঁর পিতৃলোকে পিতৃগণের সঙ্গে অমর হয়ে থেকে যান; উৎপাদনশীল সৃষ্টিশীল মানুষেরা দেবলোকে অমর হয়ে থেকে যান, জ্ঞানচর্চাকারী ও নবজ্ঞানস্রষ্টা মানুষেরা ঋষিলোকে অমর হয়ে থেকে যান। যেমন, সত্যজিৎ রায় তাঁর পুত্রের মাধ্যমে তাঁর পিতৃলোকে অমর হয়ে আছেন; তাঁর উৎপাদিত বিনিময়যোগ্য চলচ্চিত্র-গ্রন্থাদির মাধ্যমে দেবলোকে অমর হয়ে আছেন; তাঁর চিত্রে, চলচ্চিত্রে ও সাহিত্য-শিল্পে উদ্ভাবনমূলক সৃষ্টির মাধ্যমে ঋষিলোকে অমর হয়ে আছেন। এই তিনটি প্রবাহের যেটি ব্যাহত হবে, সেই প্রবাহে তাঁর অমরত্ব আর থাকবে না।

অতএব বোঝা যাচ্ছে, আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁদের ধারণাকে এই সরল সূত্রে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন — মানবপ্রজাতির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে, তার জন্য বাহ্যসম্পদের ধারাও অব্যাহত রাখতে হবে, এবং এই দুটি কাজ ঠিকঠাক যাতে চলে তার জন্য অর্জিত জ্ঞানের ধারাটিকেও অব্যাহত রাখতে হবে। এই তিনটি প্রবাহকে অব্যাহত রাখার কাজই মানুষের অস্তিত্বের পক্ষে আবশ্যিক কাজ। কিন্তু এই তিন ধারায় মানবজাতির প্রবাহকে বুঝবার 'সমগ্র' জ্ঞান আজ বহু খণ্ডে বিভাজিত। লোকে তা সব ভুলে গিয়ে অতি খণ্ডভাবে পূর্বপুরুষকে স্মরণ করার নিতান্ত পৌত্তলিক মানসিকতায় আজকাল পূর্বপুরুষকে স্মরণ করে থাকে। পূর্বপুরুষকে স্মরণ করার ব্যাপারে ঋষিপ্রবাহ অব্যাহত রাখাই যে তাঁদের মনের মূলগত ইচ্ছা, সে কথা এখন স্পষ্ট বোঝা যায়।

ইংরেজ ভারতে আসার পর, আমরা আমাদের উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ ভাষা, ভাষায় ধরে

রাখা দর্শন, ইতিহাস সবই অব্যবহারে অনেকটাই খুইয়েছি। যা আছে, তার উপরে প্রচুর ধূলা পড়ে অব্যবহার্য হয়ে রয়েছে। তার ওপর সমগ্রকে ক্রিয়ারূপে, প্রবাহরূপে বোঝার বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারটাই আমরা হারিয়ে ফেলেছি। পিতৃপ্রবাহ, দেবপ্রবাহ, ও জ্ঞানপ্রবাহকে আমরা এখন খণ্ড খণ্ড করে পাথরকুচির মতো বুঝি, ইংরেজের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মেলানোর সুবিধার জন্য। ফল হয়েছে এই যে, আজ আমরা মানুষের 'অমরত্বে' বিশ্বাস করি না, পিতৃলোককে চিনতে পারি না, তর্পণ বলতে কেবল জলে দাঁড়িয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে অঞ্জলিতে জল নিয়ে ফেলি, তার ফলিত প্রয়োগ জীবনে করলেও সেটি যে ফলিত তর্পণই করছি — সে সব কথা ভুলে গেছি। যে-বাহ্যসম্পদের প্রবাহকে দেবপ্রবাহরূপে এখন সুস্পষ্ট চিনতে পারি, পূর্বসূরিদের পরিশ্রমে তৈরি হওয়া সেই বাহ্যসম্পদ ভোগ করেই যে আমাদের প্রত্যেকের শারীরিক বাড়বৃদ্ধি ঘটেছে এবং তার ফলেই যে প্রত্যেক মানুষেরই কিছু দেবঋণ হয়ে থাকে, তাকেও এখন সুস্পষ্ট চিনতে পারছি। এগুলির উপর থেকে ধূলা সাফ করে এগুলিকে আরও ব্যবহার্যরূপে বুঝে নেওয়া দরকার।

পুরুষকার : ক্ষেত্র না পেলে যার অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়

ঋষিতর্পণ কথাটির মূল অর্থ হল নিজ নিজ মানবজমিনে সোনা ফলানো বা মনচাষ করা। জমিন শব্দটির অর্থ ভূমি। ভূ (হওয়া) ধাতু থেকে তৈরি ভূমি শব্দের স্বাভাবিক অর্থ 'যেখানে কিছু হয়'। তার জন্য সম্মুখস্থ সমস্যার ও কৌতূহলের বীজ নিজের সেই মনোভূতিে পুঁততে হয়, এবং পূর্বতন ঋষিপ্রবাহ থেকে জ্ঞানের সার ও জল এনে সেই মানবজমিনে দিতে হয়। উৎপাদিত হয় নতুন জ্ঞান, নতুন সাংস্কৃতিক ফসল। এই মনচাষের সেরা ফসলকে বলা যায় 'প্রকৃতির সম্পর্কের নিয়মকে জেনে ফেলা' বা ব্রহ্মলাভ করা। ঋষিলোককে তাই ব্রহ্মলোকও বলা হয়। ভূতল ও আপেলের মধ্যেকার সম্পর্কের নিয়মকে জেনে ফেলেছিলেন নিউটন, তাঁর ব্রহ্মলাভ ঘটেছিল। ভাব ও শব্দের, অসীম ও সীমার মধ্যেকার সম্পর্কের নিয়মকে জেনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁরও ব্রহ্মলাভ ঘটেছিল। তাই তাঁরা ব্রহ্মলোকে বা ঋষিলোকে অমর হয়ে আছেন।

ঋষি কথাটির সরল অর্থ হল 'যিনি ঋষ্ করেন' বা চাষ করেন অর্থাৎ চাষি। তাঁর এই 'ঋষ্' থেকে 'রস' ও 'রসদ'-এর উৎপত্তি হয়। তিনি ভূ-জমিন ও মানবজমিন এই উভয় জমিনে চাষ করে ফসল ফলান। এর মধ্যে যিনি মানবজমিনে ফসল ফলান, তাঁর গৌরব বেশি। পরবর্তীকালে কেবলমাত্র এই মনচাষাদেরই ঋষি বলা হত। এঁদের মধ্যে যাঁরা মহান ফসল ফলাতেন, তাঁদের বলা হত মহর্ষি। এই ঋষি যে ফসল ফলান, সেটি 'ঋচ' (riches) বা রিক্থ, পরবর্তীকালে যাকে নাম দেওয়া হয় রসদ। আর প্রকৃতির যে-নিয়ম মেনে যে কৌশলে তিনি সে ফসল ফলান তাকে বলা হত ঋক, ঋকমন্ত্র, পরবর্তীকালে যাকে বলা হত 'রস'। পরের যুগে এই ঋক বা রসের চর্চাই কোনো কোনো পরিবারের 'কুলাচার' হয়ে যায়, ইয়োরোপ যার উত্তরাধিকার পায় 'কুলটুর' বা 'কালচার' রূপে। ইংরেজ ভারতে আসার পর এ দেশের পণ্ডিতেরা সেই কালচার-এর পরিবর্ত শব্দ করেন 'কৃষ্টি'। রবীন্দ্রনাথও তাই করতেন

শুরুতে। একদিন সুনীতিবাবু তাঁকে জানান যে, আমাদের মারাঠিরা এ ক্ষেত্রে 'সংস্কৃতি' শব্দটি ব্যবহার করেন। রবীন্দ্রনাথের তা ভাল লেগে যায়। তারপর থেকে আমাদের বাংলাভাষাতেও 'রস' বোঝাতে 'সংস্কৃতি' শব্দটি প্রচলিত হয়ে আসছে। তবে সেটিকে 'প্রবাহ' রূপে বুঝতে হয়, সে কথা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ বুঝেছিলেন বলে মনে হয় না।

ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি অনুসারে 'রস' ও 'সংস্কৃতি' আসলে একই জিনিস; দুটোই জন্মায় 'কৃতি' থেকে। শব্দ দুটির উত্তরাধিকার পৃথিবীর সব জাতির কম-বেশি রয়েছে। আমাদের 'রসাধিপতি' স্বয়ং শিব এবং 'রসরাজ' শ্রীকৃষ্ণ। রস রয়েছে আমাদের 'রসনা'য়, জীবনে, কাব্যে। ... আরবের 'রসদ' ও 'রসুল' (হজরত মহম্মদ) সেই একই আদিভাষার মধ্যপ্রাচ্যের নিজস্ব উত্তরাধিকার। ইয়োরোপের উত্তরাধিকার রয়েছে তাদের 'রসন' (ration = রসদ, সৈন্যদের বরাদ্দ), 'রসন-অল-ইতি' (rationality), 'ঋষণ' (reason) প্রভৃতি শব্দে। চাইলে, এ বিষয়ে আরও অনেক উদাহরণ হাজির করা যেতে পারে। ...

এই ঋষিপ্রবাহে বেগ সঞ্চারের কাজে শ্রেষ্ঠ ঋষিদের সেকালে মহর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি বলা হত; আর যাঁরা বাহ্যসম্পদের প্রবাহে বা দেবপ্রবাহে বেগ সঞ্চারের কাজে লিপ্ত থাকতেন তাঁদের বলা হত দেবর্ষি। একালে মহর্ষিদের আবিষ্কারক, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, মনীষী, তাপস, সাধক, গ্রেট ম্যান, কবিগুরু, মহান দেশনেতা ইত্যাদি নানা নামে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। তাঁদের কীর্তিকলাপের মূলে যে চেষ্টা তাকে সেকালে বলা হত পুরুষকার, একালে তার কোনো পৃথক নামকরণ করা যায়নি। কথাটি অবশ্য খুব কঠিন নয়। অহম্ করা (আমি আমি করা) যেমন অহংকার, তেমনই পুরুষ করা (পুর উষ্ করা) হল পুরুষকার, কিংবা বলা ভাল, পুর-দাতা যা করে তা-ই পুরুষকার। ('আর পুর কথাটির মানে হল 'পালন-পোষণ-বিকাশসাধন রহে যাহাতে' এবং উষ্ করা মানে হল উচ্চতর স্তরে এমনভাবে উন্নীত করা, যাতে পূর্বতন পরিস্থিতি না থাকে।)

তার মানে, বাহ্যসম্পদ প্রবাহের বেলায় প্রবাহটির শরীর দেখা যায়। আগের বীজ থেকে পরের ফসল ফলে বটে, কিন্তু তার জন্য মানুষের চেষ্টা লাগে। বহু ক্ষেত্রে নতুন করেই সম্পদটিকে বানাতে হয়। অর্থাৎ কিনা, বাহ্যসম্পদের প্রবাহে সম্পদ থেকেই সম্পদ জন্মায় এবং সে জননের হোতা উদ্গাতা সবই মানুষ। সে সেই প্রবাহকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে চলে। কিন্তু মানসসম্পদের বেলায় তেমন হয় না। সে ক্ষেত্রে উত্তর প্রজন্মের মাথায় পূর্বতন জ্ঞানপ্রবাহ ঢুকিয়ে দিতে হয়, তারা সেটিকে লালন-পালন-বিকাশসাধন করে তার পরবর্তী প্রজন্মের মাথায় ঢুকিয়ে দেয়। অর্থাৎ কিনা, জ্ঞানপ্রবাহ মানুষের মস্তিষ্ক-পরম্পরায় প্রবাহিত হয়। আর অন্যের মাথায় জ্ঞান-পুর ঢুকিয়ে দেওয়ার এই কাজটি যে করে তাকে পুরুষ বলে। সমাজের নানা ক্ষেত্রে এই পুরুষ সর্বদা সক্রিয় থাকেন। তবে ক্ষেত্র না থাকলে পুরুষের পুরুষগিরি চলে না। তাই সে সম্পূর্ণতই ক্ষেত্র-নির্ভর। পুরুষটি যদি নর হয়, ক্ষেত্র হয় নারী; পুরুষটি যদি শিক্ষক-শিক্ষিকা হয়, ক্ষেত্র হয় ছাত্রছাত্রী; পুরুষটি যদি কোম্পানির পরিচালক হন, ক্ষেত্র হয় সেই কোম্পানির কর্মচারীরা; যদি দেশনেতা হন, ক্ষেত্র হয় তার দেশবাসী।

ইংরেজি শিক্ষিতরা এত কথা বুঝতে যাননি, তাই পুরুষকারকে তাঁরা human endeavour, valour, vigour, spirit ইত্যাদি শব্দে বোঝানোর চেষ্টা করে থাকেন। আজ আমরা জানি, পুরুষকারের মূলে থাকে প্রকৃতির প্রতি পুরুষের আকর্ষণ বা প্রেম, যার থেকে এক সময় তার হয়ে যায় ব্রহ্মলাভ; অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়ম বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ, যাকে পুর হিসেবে সমাজের বাকি মানুষদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া যায় এবং তাঁরাও সেই জ্ঞানরস লাভ তাঁদের 'জীবনযাত্রা'পথে সামনে এগিয়ে চলেন, 'রসে-বশে' থেকে সুখে-তৃপ্তিতে জীবন কাটান। এই পুরুষকারই ঋষিপ্রবাহের গতিবৃদ্ধির মূল শক্তি এবং সেই শক্তি সে পায় বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি তার আকর্ষণের আবেগ থেকে। সেই কারণে পুরুষকার শুধুমাত্র ঋষিপ্রবাহেরই গতিদানকারী নয়, সর্বপ্রবাহেরই বেগসঞ্চারের কারক। তার সাহায্য ছাড়া দেবপ্রবাহও এগোতে পারে না। সে জন্যেই শাস্ত্রে বলেছে — 'পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিধ্যতি'।

তাই ঋষিপ্রবাহে বেগ সঞ্চার করার কাজটিই মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কারণ, ঋষিলোকের অগ্রগতি শুধুমাত্র ঋষিপ্রবাহকে এগিয়ে নিয়ে যায় না, বাকি সমস্ত প্রবাহে একই সঙ্গে বেগ সঞ্চারে সাহায্য করে। আমাদের জ্ঞানলোকের সমস্ত স্রষ্টা, যাঁরা অঙ্ক বিজ্ঞান সাহিত্য ইতিহাস সঙ্গীত ইত্যাদি মানসলোকের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা প্রকারের আবিষ্কার ও সৃজন করে এই প্রবাহে বেগ সঞ্চার করে গেছেন, সে সব একত্রে এই ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে। ঋষিতর্পণ তাই মহামানবকে এগিয়ে যেতে সর্বাধিক সহায়তা করে। তাই এই তর্পণ সমস্ত তর্পণের শ্রেষ্ঠ। দু-দশ শতাংশ মানুষের সন্তান না জন্মালে কিংবা দু-দশ শতাংশ মানুষ সামাজিক উৎপন্নে হাত না লাগালেও বিশ্বমানবের খুব একটা ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না, কিন্তু ঋষিপ্রবাহে বা জ্ঞানপ্রবাহে সামান্যতম বিঘ্ন ঘটলে বিশ্বমানবের অগ্রগতি দারুণভাবে ব্যাহত হয়। মানুষের মাথা খারাপ হয়ে গেলে, সেই উন্মাদ-অবস্থাকে যেমন মানুষটির জীবনের সর্বোচ্চ ক্ষতি বলে মনে করা হয়, তেমনি সমাজের ঋষিপ্রবাহে বিঘ্ন ঘটলে তার ফল সমাজের পক্ষে সবচেয়ে ক্ষতিকারক হয়; সমাজের মাথা খারাপ হয়ে যায়। তখন সে-সমাজের অগ্রগতির সমস্ত চেষ্টাই দারুণভাবে বিঘ্নিত হতে থাকে। সমাজ তার সামনে চলার পথ দেখতে পায় না।

বিগত সাম্রাজ্যবাদী যুগে পূর্বতন শিল্পবিপ্লবের কারণে বাহ্যসম্পদের বা দেবপ্রবাহের অত্যন্ত বাড়বৃদ্ধি ঘটেছিল, দৈব প্রবল হয়েছিল। আজকের বিশ্বায়নের বর্তমান কালখণ্ডে তা আরও প্রবল হয়েছে। ঋষিপ্রবাহকে যাঁরা এগিয়ে নিয়ে চলেন, তাঁদের দেবপ্রবাহের সেবাদাসে পরিণত করা হয়েছে। আজকের বিজ্ঞান, অঙ্ক, ইতিহাস, ভাষাজ্ঞান, প্রযুক্তিজ্ঞান সর্বপ্রকারের ঋষিপ্রবাহ দেবপ্রবাহের সেবায় নিয়োজিত। জ্ঞানীগুণী মানুষেরা পণ্য-উৎপাদকের কাছে পেটের দায়ে চাকরি করছেন। সমাজকে এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে পথ দেখানোর যে-কাজ ঋষিপ্রবাহ করত, সেখান থেকে সে আজ বিচ্যুত। এর ফলে এক দিকে যেমন বিশুদ্ধ জ্ঞানের চর্চা আজ রীতিমত বিপর্যস্ত, অন্য দিকে আজকের বিশ্বায়নী সভ্যতাকে সামনের দিকে পথ দেখানোর কেউ নেই। এ যেন এক অত্যন্ত দ্রুতগামী অন্ধ ঘোড়ার পিঠে বিশ্বের মানুষ সওয়ার হয়েছেন, যে নিজে তো মরবেই, তার সওয়ারিদেরও মারবে। এক ভয়ানক পরিস্থিতি!

কিন্তু ঋষিপ্রবাহের বা পুরুষকারের এই দুর্দশা অকস্মাৎ হয়নি। এর কারণ রয়েছে, তার অক্ষমতায়। কেবল পুরুষকার হল আসলে এক খঞ্জ কিন্তু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শক্তি। দুনিয়াকে এ খুবই ভাল করে দেখতে পারে, বুঝতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু তার জন্য দুনিয়াকে বদলে নিতে হলে, সে-কাজটি এ নিজে করতে পারে না। কারণ পুরুষকার পরিচালিত ঋষিপ্রবাহ হল জ্ঞানপ্রবাহ-মাত্র, এবং বাস্তব সত্য হল এমনকী বিশুদ্ধ জ্ঞানেও কুটোটি পর্যন্ত নড়ে না। তার জন্য কর্মযজ্ঞে নামতে হয়, যে-কর্মযজ্ঞ অতীতে চলত রক্ষদের হাতে; কিন্তু সব কিছু রক্ষা করব, সব মানুষকে রক্ষা করব বলে যে-রক্ষ দাবি করে থাকে, সেই রক্ষকই একদিন ভক্ষক (রাক্ষস) হয়ে যায়। সেই কারণে কর্মযজ্ঞ চলে যায় বিনিময়জীবী দেবতাদের হাতে। সেই কর্মযজ্ঞে ঋষিরা দেন জ্ঞানশক্তি আর দেবতারা যোগান কর্মশক্তি। এই কর্মযজ্ঞের উৎপন্নের তাই দুটো ভাগ — জ্ঞানফল (অভিজ্ঞতা, রস) ও কর্মফল (পণ্য, রসদ)। জ্ঞানফল নেন ঋষিরা, কর্মফল নেন দেবতারা। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে মানুষ মাত্রেই একটি দেহ ও একটি মনের মালিক। ফলে দেহের খোরাকের জন্য ঋষিকে দেবতার মুখাপেক্ষী হতে হয়, এবং মনের খোরাকের জন্য দেবতাকে ঋষির মুখাপেক্ষী হতে হয়। এই জন্য ঋষি ও দেবতা পরস্পরের উপর একান্তভাবেই নির্ভরশীল। একজন অপরজনকে ছেড়ে দিলে উভয়েরই বিপদ।

সেই কারণে, ঋষিপ্রবাহ শ্রেষ্ঠ প্রবাহ হলেও, সে যেন এক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন খঞ্জ। সে পথ দেখাতে পারে, কিন্তু অন্য কেউ তাকে কাঁধে না নিলে সে চলতে পারে না। ঋষিপ্রবাহ বা পুরুষকারের দুর্বলতা এখানেই, এবং এ দুর্বলতা প্রকৃতিদত্ত; একে অস্বীকার করার কোনো শক্তি নেই মানুষের। মন আমাদের এত অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন যে, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চেয়েও বড়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সে তার বুদ্ধির গণ্ডীর মধ্যে ধরতে পারে, এবং তার পরেও সেখানে আরও অনেক কিছু ধরার জন্য ফাঁকা জায়গা থেকে যায়। কিন্তু এই মন নিজের থাকার জন্য দেহের মুখাপেক্ষী। দেহ না হলে সে থাকার জায়গা পায় না। এইখানে তার দুর্বলতা। এইখানে সে খঞ্জ। তাই তাকে দেহের রক্ষণাবেক্ষণ, বাড়বৃদ্ধি ইত্যাদির ভাবনায় মনোনিবেশ করতে হয়। দেহের উপর নির্ভর না করে তার উপায় নেই। দেবপ্রবাহের ভালমন্দ না ভাবলে তাই ঋষিপ্রবাহের চলে না। কিন্তু কোনো কারণে মানুষের শরীরটাই যদি প্রধান এবং একমাত্র হয়ে ওঠে? যদি মনের খোরাকের কথা, মনের শ্রেষ্ঠত্বের কথা দেহ ভুলে যায়? যদি পচা শরীরটার সেবাই মনের একমাত্র কাজ হয়ে ওঠে? যদি মানুষের অস্তিত্বের একটাই মানে দাঁড়ায় তার শরীরকে বাঁচানো? যদি দৈব এমন প্রবল হয় যে পুরুষকারের অস্তিত্বই অস্বীকৃত হয়ে যায়? তা হলে?

কাঁধ থেকে ল্যাংড়াকে নামিয়ে রেখে যে অন্ধ-বীর দৌড়য়, তার কী হবে!

দেবতা শব্দের মানে এতকাল বুঝতাম god। সে যে কত বড় ভুল ধারণা, এখন তা বোঝা যায়। এই শব্দের মূলে রয়েছে 'দেব নাকি দেব নাকি বলে যে' সেই সত্তা। এই সত্যটিকে আমরা বুঝতে পারি যখন আমরা 'দ্যূতক্রীড়া' কথাটি মনে রাখি। দিব্ ধাতুর দুটি মানে; একটি

বিকিরণ করা, আর একটি ক্রীড়া করা। দিব্ ধাতু থেকেই দ্যূত শব্দটি নিষ্পন্ন। আমরা জানি সনাতন হিন্দুর কোজাগরী লক্ষ্মীপূজায় দ্যূতক্রীড়া একটি আচরণীয় প্রক্রিয়া। তা ছাড়া 'দেবন' শব্দের অর্থ যে 'পাশকক্রীড়া' ও 'ক্রয়বিক্রয়াদি' সে কথা বঙ্গীয় শব্দকোষেই রয়েছে। তা সে যাই হোক, যতদূর বোঝা যায়, আদিতে সমাজের শক্ত-সমর্থ জোয়ান সদস্যরা যা কিছু আহরণ করে আনতেন, সবার আগে তা শিশু, বৃদ্ধ ও গর্ভবতীদের দিতেন, তারপর যা বাঁচত নিজেরা ভাগ করে নিতেন। তাঁদের বলা হত দেবতা। তাঁরা মানুষের প্রাণের বা অস্তিত্বের (অস্) বিকাশসাধন (উ) করে রক্ষা (র) করতেন, তাই তাঁদের 'অসুর'ও বলা হত। (মৃতব্যক্তিকে বলি 'গতাসু', কেননা 'অসু' কথাটির অর্থ প্রাণ।) এই ভাল অসুরদের কথা আমাদের মহাভারতে যেমন বিস্তারিতভাবে বলা আছে,[১২] তেমনই জরথুস্টপন্থীদের ধর্মগ্রন্থে তাঁকে 'আহুর মাজদা' রূপে বসানো হয়েছে ঈশ্বরের আসনে। যতদূর বোঝা যায়, আদিম যৌথসমাজের সেই 'অসুরীয়' দেশকেই পরবর্তীকালে 'অ্যাসিরিয়া' বলা হত। ... পরবর্তীকালে প্রথম মহাপ্রলয়ের (দক্ষযজ্ঞ কাণ্ডের) পর এক সময় সমাজে যখন বিনিময় শুরু হল, যারা বিক্রিবাটা করতে শুরু করলেন, তাঁরাও বললেন, 'দেব নাকি দেব নাকি, একদম টাটকা, আমার নিজের হাতে বানানো', তাঁদেরও দেবতা বলা হল; পার্থক্য এই যে, আগে যে দেবতারা দিতেন, 'দিব' 'দিব' করতেন, দান করতেন, এবং প্রতিদানে কিছুই চাইতেন না; এই দেবতারাও সেইরকম দান করেন বটে, কিন্তু প্রতিদান চেয়ে নেন, দানের বিনিময়ে মূল্য চান। স্বাভাবিকভাবেই তখন 'দেবন' কথাটির মানেই হয়ে যায় 'ক্রয়বিক্রয়াদি'। এই দেবতাদের প্রতিভূ হলেন নগদ নারায়ণ, সম্পদ হয়ে গেলেন লক্ষ্মী; আর গদ-নারায়ণ পাশ্চাত্য দেশে পৌঁছে হয়ে গেলেন God। বাহ্যসম্পদের সমগ্র লোকটিই হয়ে গেল দেবলোক। সত্যব্রত ব্রহ্মর্ষিদের অনেকেই দেবব্রত গ্রহণ করে দেবর্ষি হয়ে গেলেন। এতদিন যা ছিল শুভ 'দেবদৃষ্টি' (দ্র. বঙ্গীয় শব্দকোষ, হ. চ. বন্দ্যো.), এবার তা হয়ে গেল অশুভ অপদেবতার দৃষ্টি। দেবনদী হয়ে গেল commodity flow বা পণ্যধারা গঙ্গা।[১৩] দৈবসর্গে দেবপ্রবাহের ধারাবাহকেরা এবার বিভাজিত হল বিদ্যাধর (বিদ্যাবিক্রয়জীবী), অপ্সরা (হকার), যক্ষ (সুদখোর), রক্ষ (মজুতদার), গন্ধর্ব্ব (দোকানী), কিন্নর (ঘোড়ামুখে সরকারি তোলা আদায়কারী হিসাবরক্ষক), পিশাচ (ভিনদেশি পাইকার), গুহ্যক (মাল সরিয়ে ফেলে যে), সিদ্ধ (?), ও ভূত (হাটুরে) ইত্যাদি নানা সত্তায়।[১৪] দৈব বলতে হয়ে গেল সম্পূর্ণত বাহ্যসম্পদের এলাকা। আর সে-বাহ্যসম্পদ বা দৈব তো কোনো হিসাবে চলে না। কোথায় কোন পণ্য কতটা উৎপাদিত হবে, কতখানি বাজারে আসবে এবং তার মধ্যে আপনি কখন কতটা কিনতে পারবেন, সবই তো অনিশ্চিত। এই অনিশ্চয়তাকে যিনি বুঝবার ক্ষমতা রাখেন, তিনি হয়ে গেলেন 'দৈবজ্ঞ' (একালে যাঁদের আমরা 'অর্থনীতিবিদ' বলে থাকি, যেমন অমর্ত্য সেন বা মহম্মদ ইউনূস একালের সেরা দৈবজ্ঞ)। তাও 'দৈবাৎ' আপনি যদি কিছু পেয়েই যান, ধরে নিতে হবে প্রাচীনকালে আপনি 'ভাগে যা পেতেন' এও সেইরকম ভাগে পাওয়া বা 'ভাগ্য' মাত্র। আর, কপালে কয়টি তিলক রেখা রয়েছে, সেই অনুযায়ী সেকালের মানুষ ভাগে যা পেতেন, এও

যেন তাই; 'কপালে' ছিল তাই পেয়েছেন। এই দৈব যদি প্রবল হয়ে ওঠে, কখন যে কী ঘটবে সবই অনিশ্চিত হয়ে যায়। তা ছাড়া এ-প্রবাহ দেখতে পায় না, সে কোন দিকে চলেছে। কারণ সে জন্মান্ধ। এখানেই তার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। দৈবের অসীম শক্তি সন্দেহ নেই, কিন্তু সে দেখতে পায় না, নিজেই জানে না সে এগোচ্ছে কোন দিকে? সবচেয়ে বড় কথা, তাকে যে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে, সেই ঋষিপ্রবাহকে, তার হোতা পুরুষকারকে এতকাল দৈবই ঘাড়ে তুলে নিয়ে চলত। কিন্তু দৈব অত্যন্ত প্রবল হয়ে গেলে সে ল্যাংড়াটাকে বাধ্য করে অবসরে তার পদসেবা করতে। নইলে সে ভয় দেখায়, আর সে তাকে কাঁধে করে বইবে না। একালের প্রবল দৈব আমাদের জ্ঞানীগুণী নির্লোভ মানুষদের কী হেনস্থাই না করে চলেছে!

বৌদ্ধযুগের শেষ লগ্নে দৈবই প্রবল হয়ে উঠেছিল। তখন ঋষিপ্রবাহের আধারশক্তি জ্ঞানজীবীরা বাহ্যসম্পদের জন্য দৈবের দাসত্ব স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। বাংলাভাষার আদি কবি কৃত্তিবাস তখনকার জ্ঞানজীবীদের দুরবস্থার কথা জানাচ্ছেন এইভাবে — 'জগতের কর্তা আমি ব্রহ্মা মহামুনি। / পড়াই বালকগণে লঙ্কাতে আপুনি।' এর ফল একেবারেই ভাল হয়নি। ভারতসমাজ তিতিবিরক্ত হয়ে একদিন সিদ্ধান্ত নেয়, দৈব নয়, পুরুষকারই একমাত্র আরাধ্য। ফলস্বরূপ ভারতসমাজে পণ্যজীবিতা ঘৃণ্য হয়ে যায়, সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হয়ে যায়; ব্যবসায়ীর সম্মান থাকে না সমাজে। কয়েকশো বছরের মধ্যে ভারতসমাজ এমন এক দুর্বল সমাজে পরিণত হয় যে, মাত্র কয়েকজন ডাকাতসঙ্গীকে নিয়েও দেশী-বিদেশী ডাকাতেরা ভারতে ঢুকে লুঠতরাজ চালানোর সাহস পেয়ে যায়।

তারপর প্রায় চোদ্দোশো বছর কেটে গেছে। শক হুন দল পাঠান মোগল পেরিয়ে ব্রিটিশের মাধ্যমে ভারতে পুনরায় দৈবের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে দৈব ক্রমশ প্রবল হতে থাকে। আজ, আবার এই দৈব সারা পৃথিবীতেই অত্যন্ত প্রবল। পুরুষকার একান্তভাবেই পদদলিত। প্রায় সমস্ত ঋষিই এখন দেবপ্রবাহের সেবাদাস। ফল হয়েছে এই যে, 'সিলিকন-ভ্যালি' নামক অন্ধ-দেবর্ষির নেতৃত্বে আজকের বিশ্বায়নী সভ্যতা তীব্র বেগে ছুটে চলেছে। এ তো নিজে মরবেই, বিশ্বের যে-সকল মানুষ এই সভ্যতার উপর নির্ভর করে দিনগুজরান করছেন, তাঁরাও বেঘোরে প্রাণ দেবেন।

বৌদ্ধযুগে বিশ্বের আদি শিল্পবিপ্লব সম্পন্ন করে বাহ্যসম্পদের বিপুল উৎপাদন করে ভারতের মাটি কিন্তু একদিন বুঝেছিল, দৈব প্রবল হওয়া অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাই সে দৈবের প্রাবল্য স্তিমিত করে সনাতন হিন্দুধর্মের সূত্রপাত ঘটিয়ে পুরুষকারের বিজয় ঘোষণা করেছিল। কিন্তু শুধুমাত্র পুরুষকারও যে ভাল নয়, সে কথা ভারত মর্মে মর্মে বুঝেছে হিন্দুধর্মের সূত্রপাতের পরের চোদ্দোশো বছর ধরে ক্রমশ বাহ্যসম্পদ হারিয়ে সহায় সম্বলহীন ভিখারী হয়ে, যার-তার হাতে লাঞ্ছিত হয়ে হয়ে। ভারতের মাটি তাই দু দিক থেকেই দৈব ও পুরুষকারকে প্রত্যক্ষ করেছে। সে জানে দৈব প্রবল হওয়া ভাল নয়। সে আরও জানে কেবলমাত্র পুরুষকারও ভাল নয়। একজন অন্ধ অন্যজন খঞ্জ। একমাত্র উপায় অন্ধ যদি খঞ্জকে কাঁধে নিয়ে হাঁটা দেয়; কানা খোঁড়ার কাঁধে থাকলেই তাদের জীবনযাত্রা সুনিশ্চিত হয়। পুরুষ প্রকৃতির এই পরস্পর

নির্ভরতা নেচারের নিজস্ব নিদান। এর অন্যথা করলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। আর সেই বিপদে পড়ে গেছে আজকের বিশ্বায়ন, আজকের বিশ্বসভ্যতা, বিশ্বমানব।

হয়তো সে কারণেই সাম্প্রতিক ভারতে শিল্পায়নের বিরুদ্ধে অনেকেই সোচ্চার। দৈবের প্রাবল্যকে এই সমাজ কিছুতেই মানতে রাজি হচ্ছে না। এতদিন এই ভারত সেই দেশনেতাদেরই দেশ পরিচালনার দায়িত্বে বসাত, যাঁরা নিজেরা বাহ্যসম্পদের পিছনে ছুটতেন না। স্বাধীনতার আগে পরে আমাদের দেশে তাঁরাই সর্বজনমান্য নেতা হতে পারতেন, যাঁরা ব্যক্তিজীবনে বাহ্যসম্পদ সংগ্রহ করাকে সম্মানজনক কাজ বলে মনে করতেন না। পশ্চিমবাংলার কমিউনিস্ট নেতারাও ছিলেন বাহ্যসম্পদ বিরোধী। এখনও ভারতের তথা পশ্চিমবাংলার বহু নেতাকে দেখা যায়, তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিজীবনে বাহ্যসম্পদের প্রাধান্যকে এখনও স্বীকার করেন না। এমনকী বহু মানুষের চোখে যে দুজন 'যত নষ্টের গোড়া' সেই বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কিংবা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিজীবন তার স্পষ্ট উদাহরণ। কিন্তু বিশ্বে উঠেছে দেবপ্রবাহের ঝড়। তাই দেখে রতন টাটাকে দেশের শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে মনে করার মতো বোকামি করে ফেললে আমাদের সমূহ বিপদ। সে তো অন্ধ। মানুষের বা তার সমাজের লক্ষ্য কী হওয়া উচিত, সে জানে না। চক্ষুষ্মান কাউকে ঘাড়ে নিয়ে না ছুটলে সে নিজেই খাদে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। মানুষকে বা সমাজকে সুস্থ-সবল ও রসে-বশে রেখে তাকে সামনে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলার যোগ্যতা তার নেই, নেই তার চেয়ে বহুগুণে বড় সিলিকন-ভ্যালির বাসিন্দাদেরও। অথচ দৈবের প্রাবল্যের কারণে তারাই এখন সমাজ-ট্রেনের সামনের কামরার বাসিন্দা ও চালক। আমরা কিন্তু জানি, নারীলোলুপকে যেমন মেয়েদের হস্টেলের দায়িত্ব দেওয়া যায় না, তেমনই বাহ্যসম্পদপিয়াসীকে সমাজের দায়িত্ব দেওয়া যায় না। কেননা সে নিজেই তো অন্য সমাজসদস্যের বাহ্যসম্পদ সুযোগ পেলেই নিয়ে নেবে। সেকারণেই সমাজ চালানোর যোগ্যতার বিচারে পণ্যজীবী মাত্রেই প্রথম পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হতে পারে না। অর্থাৎ, সমাজের নেতৃত্বে আনতে হবে নির্লোভ ভূয়োদর্শী ও হৃদয়বান মানুষকে, যাকে অতীত ভারতবর্ষ নাম দিয়েছিল 'মহর্ষি', এবং অন্যান্য ঐতিহ্যে যাকে 'আউলিয়া বা অম্বিয়া', 'ফিলজফার-কিং' ইত্যাদি নামে বুঝবার চেষ্টা করা হয়েছে।

অপর দিকে যেখানে দেবতার গৌরব, সেখানে তাকেও মর্যাদা দিতে হবে। সে দেবপ্রবাহের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ এবার ঋষিপ্রবাহ ও দেবপ্রবাহের মধ্যেকার সম্বন্ধটিকে সমমর্যাদার সম্বন্ধে উত্তীর্ণ করতে হবে, 'পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহার'-এর নীতিতে উত্তীর্ণ করার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।[১৫]

এও পুরুষ-প্রকৃতি সম্বন্ধের সাধারণ নিয়মে চলবে। পুরুষ খঞ্জ, প্রকৃতি অন্ধ। দোঁহার ভালবাসার বন্ধন দুজনকে বাঁচায়। মাথায় থাকবে পুরুষ, তার সব ভাবনার কেন্দ্র 'প্রকৃতির নিয়ম', তার লক্ষ্য প্রকৃতির ভালমন্দ, তার সুরক্ষা, তার টিকে থাকা, বিকাশ। এতেই পুরুষ প্রকৃতি উভয়ের চরম সুখ, আনন্দ, মোক্ষলাভ।

কিন্তু সেই 'পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহার'-এর নীতিতে উত্তীর্ণ হওয়া যাবে কীভাবে? পাঠকপাঠিকা, মাফ করবেন। সে কথা বারান্তরে।[১৬]

টীকা ও টুকিটাকি

১. 'আঙুল ফুলে কলাগাছ' কথাটির ভিতরে কী রয়েছে, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন কলিম খান তাঁর 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' নিবন্ধে, যা আসামের 'সাহিত্য' পত্রিকার ৯৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

২. শাস্ত্রাদিতে 'হিন্দুধর্ম' কথাটি নেই, রয়েছে 'সনাতন ধর্ম'; অথচ লোকাচারে দুটি কথাই কমবেশি রয়েছে। তাই আমরা 'সনাতন হিন্দুধর্ম' শব্দটি দিয়ে আপাতত কাজ চালিয়ে নিচ্ছি।

৩. পণ্ডিত রামদেব স্মৃতিতীর্থ সঙ্কলিত 'বিশুদ্ধ নিত্য কর্মপদ্ধতি' গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

৪. বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে আমাদের যৌথগ্রন্থ 'বাংলাভাষা : প্রাচ্যের সম্পদ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের 'বাংলাভাষা ও ভাষার উৎপত্তি রহস্য' নিবন্ধে।

৫. এই বিষয়টি সবচেয়ে ভাল বোঝা যায় নিমি রাজার যজ্ঞের কাহিনীতে। কাহিনীটির বয়ানের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ থেকেই বর্তমান লেখকদ্বয়ের এ-বিষয়ে বোধোদয় ঘটেছিল।

৬. দ্রষ্টব্য: মহাভারত/কাশীরাম দাস। কৃত্তিবাসী রামায়ণেও এই রকম ধারণার কথা আছে।

৭. পুরাণাদিতে এই 'পিতৃগণ' শব্দটি বহুবার পাবেন, কিন্তু কিছুতেই তার মানে খুঁজে পাবেন না। প্রতিটি মানুষের মধ্যে যে তার পূর্বসূরিগণ বাস করেন, তাঁরাই তার পিতৃগণ।

৮. শিবনারায়ণ রায় মহাশয়ের একটি নিবন্ধ 'নাস্তিকের মৃত্যুচিন্তা'। তিনি নাস্তিক; অমরত্ব মানেন না। কিন্তু তর্পণের রহস্য ভেদ করে আজ আমরা নিশ্চিত মানুষ সত্যিই অমর হয়।

৯. পরলোকে বিশ্বাসী খ্রিস্টীয় বা ইসলামী মতে এবং জন্মান্তরে বিশ্বাসী সনাতন-হিন্দু বা বৌদ্ধ মতে মানুষের আত্মার অন্যরকম অমরত্ব আছে। সে আলোচনার যে পরিসর লাগবে তা এখানে নেই। তা ছাড়া বিষয়টি আমাদের যৌথগ্রন্থ 'বাংলাভাষা : প্রাচ্যের সম্পদ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের 'বাংলাভাষার সমস্যা : প্রাচ্যের সম্পদ ও রবীন্দ্রনাথ' নিবন্ধে 'আত্মা' বিষয়ক আলোচনায় খানিকটা করা হয়েছে। তবে বিজ্ঞানগ্রাহ্য তথ্যের অভাব এ বিষয়টিকে এখনও সম্পূর্ণ বোধগম্য রূপে উপস্থাপিত করার যোগ্যতা আমাদের দেয়নি; হয়তো অদূর ভবিষ্যতে পারা যাবে। তাই এ আলোচনা থেকে আপাতত বিরত থাকছি।

১০. মার্কস সাহেবের The Capital গ্রন্থের Fetishism and the secret thereof চ্যাপ্টারটি দ্রষ্টব্য।

১১. 'ততঃ কিম' / রবীন্দ্র রচনাবলী, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫০৯

১২. দ্রষ্টব্য — হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ কৃত মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২২৬ অধ্যায়। এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ ও ব্যাখ্যা রয়েছে কলিম খান রচিত 'দিশা থেকে বিদিশায়' গ্রন্থের 'লক্ষ্মীর পাঁচালি: ওয়েলফেয়ার ইকনমির ভূত-ভবিষ্যৎ' নিবন্ধে।

১৩. বিস্তারিত জানার জন্য রবি চক্রবর্তী লিখিত 'পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা' নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য। নিবন্ধটি সঙ্কলিত হয়েছে আমাদের 'বাংলাভাষা: প্রাচ্যের সম্পদ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে।

১৪. কোন কোন যুক্তির জেরে এই সত্তাগুলিকে শনাক্ত করা গেছে তা বলতে গেলে আর একটি বড়ো নিবন্ধ লিখতে হয়। এখানে তার অবতারণা অসম্ভব।

১৫. মানুষের অস্তিত্বের মূলে সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধ মূলত চার প্রকার— নিপীড়ক-নিপীড়িতের বন্ধন, শাসক-শাসিতের বন্ধন, সম-মর্যাদার বন্ধন, পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহারের বন্ধন। এ বিষয়ে কলিম খান-এর 'আত্মহত্যা থেকে গণহত্যা: আসমানদারী করতে দেব কাকে?' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১৬. এ বিষয়ে আমাদের কিছু নিবন্ধ ইতিমধ্যেই কলকাতায় প্রকাশিত হয়েছে 'অপর', 'এবং', ও 'রবীন্দ্রনাথ' পত্রিকায়। আরও কিছু নিবন্ধ অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হতে চলেছে।

আসামের হাইলাকান্দির 'সাহিত্য' পত্রিকার ৯৫ সংখ্যায় প্রকাশিত।

বিশ্বায়নে ঋষিপ্রবাহ : এবার তবে জোড়ার পালা

কলিম খান

সংস্কৃতিপ্রসঙ্গ: ঋষিপ্রবাহের কথা

বঙ্গীয় শব্দকোষ গ্রন্থে 'ঋণ' শব্দের অর্থ দিতে গিয়ে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'মনুষ্য জন্মমাত্র তিন ঋণে বদ্ধ হয়' — পিতৃঋণ, দেবঋণ, ও ঋষিঋণ; আর সেই ঋণ শোধ করার উপায় হল পিতৃতর্পণ, দেবতর্পণ, ও ঋষিতর্পণ করা।

এগুলি বাংলা কথা হলেও, এ সব কথার অর্থ আমরা ইংরেজি-জানা বাংলাভাষীরা এখন বুঝতে পারি না, যে কারণে এই কথাগুলিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করা যায় না; খুব চেষ্টা করলে বড়জোর খানিকটা ভুল অনুবাদ করা যায়। আর যে-বাংলাভাষীরা ইংরেজি জানেন না, ইতিহাসের মারে তাঁরাও এর অর্থ গেছেন ভুলে। তবে, সদ্য হাতে-আসা বাংলা ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি[১] অনুসরণ করে এগোলে আমরা এর সরল অর্থটি সহজেই বুঝে নিতে পারি, তখন চাইলে এর ইংরেজি অনুবাদও করে ফেলা যায়। কেবল তাই নয়, আজ আমরা 'সংস্কৃতি', 'কৃষ্টি', 'ঐতিহ্য', 'কালচার', 'জ্ঞান', 'নো-হাউ' ও 'ইনফরমেশন' প্রভৃতি নানা শব্দে মানুষের মানসসম্পদের প্রবাহকে যে খণ্ড খণ্ড করে বিচ্ছিন্ন ঘনবস্তুরূপে বুঝে থাকি, আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা সেগুলির সমগ্র চেহারাটিকে কেন অখণ্ড প্রবাহরূপে বুঝতেন এবং সে বিষয়ে তাঁদের অভিপ্রায় কীরূপ ছিল, তাও জানতে পারি।

তবে, সে কথায় যাওয়ার আগে মনে রাখা চাই, বিশ্বের সমস্ত প্রাচীন সাহিত্যে — বেদ-পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারত-বাইবেল-কোরান-ত্রিপিটক-ইলিয়ড-অডিসি ও পশ্চিমের পুরাণাদি গ্রন্থে — মানবজাতির যে-অর্জন লিপিবদ্ধ রয়েছে, তাতে বিশ্বের সকল মানুষের সমান অধিকার। তা কোনো দেশের বা জাতির, কোনো বিশেষ ধর্মাবলম্বীদের বা ধর্মহীনদের নয়; বিশ্বের সমস্ত মানুষের। কেন, সে অনেক কথা, এবং প্রয়োজনে সে সব কথা বারান্তরে বলা যাবে। আপাতত বিষয়ীর কথা মুলতুবি রেখে মুক্ত মন নিয়ে বিষয়ে প্রবেশ করা যাক।

তথ্য এই যে, 'পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন' বা 'পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন'কে 'তর্পণ' বলে।[২] সেকালে 'পিতৃলোক' ও 'পিতৃগণ' কথাটির অর্থ ছিল এইরকম — 'পুত্ররূপে জন্মে লোক ভার্য্যার উদরে'।[৩] এ-বিশ্বাস পৃথিবীর সকল দেশের সমাজেই কমবেশি ছিল, আছে। তা ছাড়া, ছেলে তো প্রায়শ 'বাপের মতো'ই দেখতে হয়! আমার অস্তিত্বেই আমার পিতার অস্তিত্ব। এই 'পিতৃ' আমার মাধ্যমে, আমার পুত্রের মাধ্যমে, তার পুত্রের মাধ্যমে চিরপ্রবহমান এক 'পিতৃলোক' গড়ে তোলেন; আর এই পিতৃলোকে থেকে যান পিতৃপরম্পরায় সমস্ত পিতৃগণ। ভবিষ্যতের দিকে দাঁড়িয়ে দেখলে একে 'পিতৃপ্রবাহ' এবং অতীতের দিকে দাঁড়িয়ে দেখলে একে 'পুত্রপ্রবাহ' বা 'সন্তানপ্রবাহ'রূপে চিহ্নিত করতে আমাদের একটুও অসুবিধা হয়

না। এই প্রবাহ রক্ষা করা ও তাতে বেগ সঞ্চার করার জন্য আমার শরীরটিকে বাঁচিয়ে রেখে, সেই শরীরের উত্তরাধিকারীর সৃষ্টি করে যেতে পারলে প্রবাহটি অব্যাহত থাকে। এই কাজটিই 'পিতৃতর্পণ'-এর ফলিত প্রয়োগ, আর পিতৃতর্পণ মন্ত্রটি হল ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায় প্রকল্পিত তার কোড মাত্র। অর্থাৎ কিনা, সন্তানপ্রবাহ অব্যাহত রাখাকেই পিতৃতর্পণ বলে এবং জীবমাত্রেই এ কাজ করে থাকে, কিংবা নেচার তাকে ঘাড়ে ধরে করিয়ে নেয়।

স্বভাবতই সন্তানপ্রবাহ অব্যাহত রাখার কথা মানুষও ভাবে। কিন্তু ভাবলেই হয় না। তার জন্য অনেক কিছুই লাগে। সবার আগে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় বাহ্যসম্পদ লাগে, সঙ্গিনী ও সন্তানের জন্যও সে সম্পদের প্রয়োজন হয়; সে সব সম্পদ সৃষ্টি করা, সংগ্রহ করা, রক্ষা করা ও তার বিকাশ সাধন করার জন্য এবং সর্বোপরি সবগুলি ব্যাপারের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করার জন্য অবশ্যই প্রয়োজন হয় যথেষ্ট পরিমাণ জ্ঞানবুদ্ধির। অর্থাৎ সন্তান উৎপাদন, বাহ্যসম্পদ-সৃজন, এবং মানসসম্পদের প্রয়োগ করে তবেই পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করা যায়; সন্তানপ্রবাহে যথার্থে বেগ সঞ্চার করা যায়। সেকালে বাহ্যসম্পদের প্রবাহে বেগ সঞ্চারকে 'দেবতর্পণ করা' এবং মানসসম্পদের প্রবাহে বেগ সঞ্চারকে 'ঋষিতর্পণ করা' বলা হত।

আসলে আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা মনে করতেন, মানুষ জন্মায় তিনরকম উত্তরাধিকার বা ঋণ নিয়ে — ক) পিতার শরীরের উত্তরাধিকার বা পিতৃঋণ; খ) পূর্বতন প্রজন্ম পর্যন্ত সমাজের উৎপন্নের উত্তরাধিকার (ঘটিবাটি থেকে ইন্টারনেট, পূর্বতন সমাজ যা বানিয়ে রেখেছে, যার মাঝখানে মানুষ জন্মায়) বা দেবঋণ; এবং গ) পূর্বতন প্রজন্ম পর্যন্ত মানুষের অর্জিত জ্ঞানের উত্তরাধিকার (সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার) বা ঋষিঋণ। বিশ্বের প্রায় সকল দেশের মানুষ, ধর্মশিক্ষা নিয়ে বা না-নিয়ে, তাঁদের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক সংস্কারবশেই এই তিন প্রকার ঋণ শোধ করে থাকেন। প্রথম ঋণ শোধ করেন উত্তরাধিকারীর জন্ম দিয়ে ও তার রক্ষণাবেক্ষণ করে; দ্বিতীয় ঋণ শোধ করেন কোনো না কোনো প্রকারের সামাজিক উৎপাদন কর্মে যোগ দিয়ে; এবং তৃতীয় ঋণ শোধ করেন কোনো না কোনো প্রকারের সাংস্কৃতিক কর্মে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লিপ্ত হয়ে। এর ফলে সন্তানপ্রবাহ, বাহ্যসম্পদ-প্রবাহ ও মানসসম্পদের প্রবাহ অব্যাহত থাকে। একালের ভাষায় এগুলিকে যথাক্রমে human resource development বা মানবসম্পদের বিকাশ, consumer production development বা ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের বিকাশ (commodity flow), এবং cultural tradition (= flow) বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য— এই তিন জাতীয় শব্দবন্ধের দ্বারা কমবেশি প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

জ্ঞানের এই প্রবাহকে বা cultural tradition-কে এখন থেকে আমরা 'ঋষিপ্রবাহ' বলতে চাই। কারণ, মানুষের সর্বপ্রকারের জ্ঞান, সংস্কৃতি ইত্যাদি সর্বপ্রকার মানসফসলের প্রবাহকে সমগ্রভাবে বোঝাতে হলে 'ঋষিপ্রবাহ' না বলে উপায় নেই। এরই খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন রূপকে একালে আমরা অঙ্ক বিজ্ঞান ইতিহাস নাচ গান সাহিত্য সংস্কৃতি ইত্যাদি নানা নামে চিহ্নিত করে থাকি। খেয়াল করতে পারি না যে, মানসসম্পদের এই প্রবাহের ভিতরে এক ধরনের

ধারা ও 'পূর্ণতা' এবং 'ধারা-বাহিকতা' রয়েছে। কার্যত, এ হল মনচাষিদের (ঋষিদের) মানসফসলের প্রবাহ, যা-কিনা ঋষিপরম্পরায় বা চিন্তক-পরম্পরায় প্রবাহিত থাকে এবং তাঁদের মাধ্যমে দেশের জনসাধারণের মনে আলোহাওয়া ও জলসেচ দেওয়ার কাজ করে। তাই এর স্বভাব অনেকটা বায়ুপ্রবাহের মতো, যা কিনা সমাজের ও মানুষের মনোলোকের আকাশে প্রবাহিত থাকে। একে সমাজের ও মানুষের মনোলোকের ভূমিতে নদীপ্রবাহের মতো প্রবাহিত ধারাও বলা যায়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় — 'ভারতবর্ষের গঙ্গা, মিশরের নীল ও চীনের ইয়াংসিকিয়াং ... এই সমস্ত নদী মাতার মতো একটি বৃহৎ দেশের এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্তকে পালন করিয়া চলিয়াছে। ইহারা এক-একটি প্রাচীন সভ্যতার স্তন্যদায়িনী ধাত্রীর মতো। তেমনি মহাকাব্যও ... ইলিয়ড, অডেসি, রামায়ণ ও মহাভারত।'[৪] কেবল তাই নয়, 'বিদ্যাসমবায়' নিবন্ধে তিনি লিখছেন, 'বিদ্যার নদী আমাদের দেশে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, প্রধানত এই চারি শাখায় প্রবাহিত।' এমনকী 'বিদ্যার স্রোতে'র মিলনের কথাও তিনি বলেছেন। জ্ঞান ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর এইরূপ 'ধারা-বাহিকতা'র ধারণা ছিল বলেই, তিনি 'শিক্ষার বাহন' কথাটি ব্যবহার করতেন। অর্থাৎ মানুষের সমাজে মানসফসলের চলাচল বায়ুপ্রবাহ বা নদীপ্রবাহের মতো। সেই কারণে একে 'ঋষিপ্রবাহ' বললেই সঠিক বলা হয়।

হ্যাঁ, মানসসম্পদ সৃষ্টির অর্থাৎ 'ঋষিপ্রবাহে বেগ সঞ্চার'-এর কাজই মানুষের সবচেয়ে মহৎ কাজ; বাহ্যসম্পদ সৃষ্টি কিংবা সন্তান উৎপাদনের চেয়ে তা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। কারণ সেই মানসসম্পদ নিজের প্রবাহকে এবং বাহ্যসম্পদ ও মানবসম্পদের প্রবাহকে রক্ষা করার ও তাতে বেগ সঞ্চার করার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। ঋষিপ্রবাহের এই ধারায় একটি সামান্য গানের কিংবা একটি পত্রিকার প্রকাশও অনেক সময় যথেষ্ট বেগ সঞ্চার করতে পারে, যদি সেই গানে বা পত্রিকায় প্রকাশিত বাকফসল মানুষের ব্যবহারে লেগে যায়।

মানসসম্পদের প্রবাহে বা ঋষিপ্রবাহে হাত লাগানোর মানেই হল, পরোক্ষভাবে মানুষের সমস্ত প্রবাহগুলিতেই বেগ সঞ্চারের চেষ্টা, মানবসম্পদ বিকাশের চেষ্টা। এর মূল উপায় হল নিজ নিজ মানবজমিনে সোনা ফলানো বা মনচাষ করা। তার জন্য নিজ নিজ মানবজমিনে 'কৌতূহল' ও 'অজানাকে-জানার-আগ্রহ'র বীজ পুঁততে হয়, এবং বহু প্রাচীন কাল থেকে চলে আসা এবং এখনও বয়ে চলা ঋষিপ্রবাহ থেকে তত্ত্ব-তথ্যের জল নিয়ে তাতে সেচের ব্যবস্থা করতে হয়। এই মনচাষের মত ফসল ফলে তার প্রধান ফসলটির নাম 'সম্পর্ক জ্ঞান', আর সে জ্ঞান সুরে-ভাবে, সুরে-শব্দে, বিষয়ে-বয়ানে, মানুষে-মানুষে, মানুষে-জীবে, মানুষে-জড়ে, জীবে-জীবে, জড়ে-জড়ে — জগতের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। এই মনচাষের সেরা ফসলকে বলা হয় 'প্রকৃতির সম্পর্কের নিয়মকে জেনে ফেলা' বা 'ব্রহ্মলাভ' করা।[৫] ভূতল ও আপেলের মধ্যেকার সম্পর্কের নিয়মকে জেনে ফেলেছিলেন নিউটন; অসীমে-সীমায়, ভাবে-সুরে বিধৃত থাকা সম্পর্কের নিয়মকে জেনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই তাঁদের ব্রহ্মলাভ ঘটেছিল। ব্রহ্মলাভই ব্যক্তিমানবের জীবনের সবচেয়ে বড় সার্থকতা। এই ব্রহ্মলাভই অপর দিকে বিশ্বমানবকে এগিয়ে যাওয়ার উপায় সরবরাহ করে, মানুষকে সুখ-শান্তি দেয়, আনন্দ দেয়।

মনচাষের এই ফসলগুলির সবচেয়ে বড় অবদান এই যে, সেগুলি মানুষের মনোলোকের উপরের আচ্ছাদনস্বরূপ বিশ্বাসের আকাশটি গড়ে তোলে। এই আকাশের তলাতেই কাটে মানুষের মানসজীবন। আগেই বলেছি, ঋষিপ্রবাহে বেগ সঞ্চারের কাজই মানবজীবনের মহত্তম কাজ। দু-দশ শতাংশ মানুষের সন্তান না জন্মালে কিংবা দু-দশ শতাংশ মানুষ সামাজিক উৎপন্নে হাত না লাগালেও বিশ্বমানবের খুব একটা ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না; কিন্তু মানসসম্পদের প্রবাহে সামান্যতম বিঘ্ন ঘটলে বিশ্বমানবের অগ্রগতি দারুণভাবে ব্যাহত হয়। মানুষের মাথা খারাপ হয়ে গেলে, সেই উন্মাদ-অবস্থাকে যেমন মানুষটির জীবনের সর্বোচ্চ ক্ষতি বলে মনে করা হয়, তেমনই সমাজের মানসসম্পদের প্রবাহে বিঘ্ন ঘটলে তার ফল সমাজের পক্ষে সবচেয়ে ক্ষতিকারক হয়; সমাজের মাথা খারাপ হয়ে যায়; মানুষের মাথায় তার মনোলোকের 'আকাশ ভেঙে পড়ে'। সুনামির মতো ভয়ংকর প্রাকৃতিক দুর্যোগ যখন কোনো জাতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, কিংবা একেবারে বিজাতীয় সংস্কৃতির ধারক সাম্রাজ্যবাদ যখন কোনো জাতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে তখন এরকমই হয়। তখন সে-সমাজের অগ্রগতির সমস্ত চেষ্টাই নষ্ট হয়ে যায়।

সেই কারণে জ্ঞানপ্রবাহে বেগ সঞ্চার করার কাজটিই মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ জানতেন। তাই তিনি বলেছেন, '... আমার যতটুকু সাধ্য, এই প্রবাহের পথকে আগে ঠেলিয়া দিতে হইবে। ইহার জ্ঞানের ভাণ্ডারে আমার সাধ্যমত জ্ঞান, ইহার কর্মের চক্রে আমার সাধ্যমত বেগ সঞ্চার করিয়া দিতে হইবে।'[৬]

মানবপ্রজাতির জন্মলগ্ন থেকে এই প্রবাহ ঋষিপরম্পরায় বা চিন্তক-পরম্পরায় আজ পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে এসেছে। এই প্রবাহই মানুষকে নেচারের সকল সৃষ্টির উপরে স্থান করে দিয়েছে; সমস্ত জীব থেকে তাকে শ্রেষ্ঠ করেছে। অন্য দিকে যে-মানুষ এই ক্ষেত্রে কিছু সৃষ্টি করেন, শিল্পে সাহিত্যে বিজ্ঞানে যাকে আবিষ্কার, উদ্ভাবন বা সৃষ্টি বলা হয়, সে-মানুষ ব্যক্তিজীবনেও চরম সার্থকতা লাভ করেন, চরম তৃপ্তি ও শান্তি পান। তাই বহু প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ এই মানসসম্পদের প্রবাহকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে আসছে।

সংস্কৃতিপ্রসঙ্গ : ঋষিপ্রবাহের বর্তমান স্বরূপ

একজন ইংরেজিভাষীকে যদি বলেন, 'The sky has broken down on my head!', সে কথাটির মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারবে না; আপনার মাথার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে। কিন্তু একজন বাংলাভাষীকে বলুন, 'আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে!' দেখবেন সে হন্তদন্ত হয়ে জানতে চাইবে — 'কেন? কী হয়েছে?' অর্থাৎ কথাটির মানে সে শোনার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পেরেছে।

আপনি ভাবতে পারেন — সত্যিই তো! 'মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া'র কথাটা আমরা এত সহজে বুঝতে পারি, অথচ ইংরেজ কেন যে বুঝতে পারে না!

'বুদ্ধিমান' কেউ হয়তো আপনাকে বলে বসতে পারে — আরে বাপু, এ হল কালচারাল

গ্যাপ। ওদের কালচার আলাদা, আমাদের কালচার আলাদা। আমাদের সব কথা ওদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়।

কিন্তু সেই বুদ্ধিমানকে যদি জানতে চান, ইংরেজের কোন কথাটি আমরা বুঝতে পারিনি, অন্তত আমাদের লেখাপড়া জানা কোনো বাংলাভাষীই বুঝতে পারেননি? দেখা যাবে, তিনি একটিও নমুনা দিতে পারছেন না। তাঁকে আপনি এ কথাও স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন যে, পরীক্ষা করে দেখার জন্য আমাদের দেশী-শিক্ষায় শিক্ষিত ইংরেজি-না-জানা কয়েকজন পণ্ডিতকে একবার ইয়োরোপীয় (গ্রীক) দর্শনের সবচেয়ে কঠিন বিষয়গুলি বলে দেওয়া হয়েছিল; তার একটু পরেই দেখা গেছে, তাঁদের পক্ষে সেই ইয়োরোপীয় দর্শন নিয়ে নিজেদের ভাষায় আলোচনা করতে বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে না।[৭] অথচ আমাদের অধ্যাত্মবিদ্যা তো বহু দূরের ব্যাপার, সাধারণ বাংলাভাষীর মুখে প্রচলিত শতসহস্র কথা ইয়োরোপের মহা মহা পণ্ডিতেরাও যে বুঝতে পারেননি, তা আমরা গুনে গুনে দেখিয়ে দিতে পারি।

অর্থাৎ কিনা, আমরা চাইলে ইয়োরোপীয়দের মানসসম্পদকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করতে পারি, কিন্তু তাঁরা চাইলেও আমাদের মানসসম্পদকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করতে পারেন না। কালচারাল গ্যাপই যদি হবে, এ কেমন গ্যাপ?

আসলে তাদের sky-এর 'কনসেপ্ট' আর আমাদের 'আকাশ'-এর 'কনসেপ্ট', দুটিই আলাদা চরিত্রের। তাঁরা sky বলতে বোঝেন উপরের নীল আকাশটাকে; সেই আকাশের চিত্রপটটি ছাড়া তাঁদের sky শব্দটি আর কোনো ধারণাকে আশ্রয় দেয় না। আর আমরা এককালে 'আকাশ' বলতে উপরের sky-টি সহ আরও অনেক কিছুই বুঝতাম; 'কাশের আশ্রয় যাতে' থাকত, সেই চিদাকাশ, জলাকাশ, ঘটাকাশ, মেঘাকাশ, মহাকাশ — সব কিছুই আমাদের 'আকাশ' ধারণার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের কারণে আমরা সেই অনেক কিছুর কিছু কিছু হারিয়েছি বটে, কিন্তু সামান্য কিছু আমাদের কথা বলার অভ্যাসে থেকে গেছে। এ দেশে ইংরেজ-আগমনের পর, সেই 'কিছু'কে একটুখানি সরিয়ে রেখে আমরা ইংরেজের সঙ্গে মানসিক লেনদেন শুরু করি এবং আমাদের 'আকাশ'কে ওদের sky শব্দের সমান করে নিই, অন্যথায় লেনদেনের অসুবিধা। কিন্তু তাই বলে 'আকাশ' শব্দের বাকি যে 'কিছু' অনুষঙ্গ আমাদের কথা বলার অভ্যাসের ভিতর থেকে গিয়েছিল, সেগুলি তো আর উবে যেতে পারে না; সেগুলি থেকেই গেছে। তারই কারণে আমরা 'মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া', 'আকাশ হাতে পাওয়া', 'আকাশ থেকে পড়া', 'আকাশ পাতাল ভাবনা', 'ঘটে (ঘটাকাশে) বুদ্ধি থাকা', 'চিদাকাশে ধ্বনি ওঠা'— এরকম কিছু কথা এখনও বলে ফেলি। আর, 'আকাশ'-এর এই 'কনসেপ্ট'গুলি ইংরেজের ভাষায় না-থাকায়, তারা আমাদের এই কথাগুলির কোনো মানেই বুঝতে পারে না।

ইংরেজিভাষী ও বাংলাভাষী, দুই জাতির মধ্যে কেন এরকম ভাষাবিভ্রাট হল, ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি হাতে আসার পর আজ তার কারণ আমরা জানতে পারছি। এর মূল কারণটি হল, অনিবার্য সাংস্কৃতিক বিপর্যয়, যা জাতিগুলিকে নিজেদের অতীত থেকে 'আত্মবিচ্ছিন্ন' করে

দিয়েছে, বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে অন্য জাতিগুলি থেকেও। আদিতে পৃথিবীর সব জাতির আদি মানুষেরা যে একই আদিম যৌথসমাজের বাসিন্দা ছিল, একই সংস্কৃতিতে লালিত-পালিত হত এবং একই ভাষায় কথা বলত, সে-বিষয়ে আজ আর সন্দেহমাত্র নেই। (অন্যান্য সাক্ষ্যের পাশাপাশি সম্প্রতি এ কথার পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছিল 'জিন আর্কিয়োলজি', আজ ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধিও সুস্পষ্টভাবে তার সাক্ষ্য দিতে শুরু করেছে।) সে ছিল এক আদি ক্রিয়াভিত্তিক ভাষা ও আদি সংস্কৃতি। আজকের পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যেমন সেই একই আদিম মানবজাতির উত্তরসূরি, তেমনই আজকের পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতি সেই আদি ভাষা ও সংস্কৃতিটিরই উত্তরসূরি, যদিও তাঁদের আত্মবিচ্ছেদের বিষয়ে তাঁরা নিজেরাই সচেতন নন। এই আত্মবিচ্ছেদ ঘটেছে মূলত তিন প্রকারে — অগণিত বিন্দুরূপে, কিছু কিছু প্রক্ষিপ্ত ঢেউয়ের আকারে, এবং মাঝে-মধ্যে সামাজিক প্রলয়রূপে। এই তিন রূপে সাংস্কৃতিক বিপর্যয় নেমে এসেছে মানুষের উপর, আর সেই সমস্ত বিপর্যয়ের ফলস্বরূপ মানুষ, তার সংস্কৃতি ও ভাষা, তার আদি রূপ থেকে বিপর্যস্ত হতে হতে তার বর্তমান স্বরূপে এসে পৌঁছেছে।

বিন্দু-বিন্দু রূপে আত্মবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই, একটি দেশ থেকে, তার সংস্কৃতি থেকে একটি একটি করে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য দেশে, অন্য সংস্কৃতির এলাকায় চলে যেতে বাধ্য হন, এবং তখন তাঁর ওই বিচ্ছিন্ন জীবন কাটতে থাকে (রবীন্দ্রনাথের ভাষায়) 'টিকটিকির কাটা লেজের মতো'। ফলত প্রাণ বাঁচাতে এই আত্মবিচ্ছিন্ন মানুষ তাঁর নিজের সংস্কৃতি ও ভাষা থেকে সরে যেতে থাকেন, তাঁর পরবর্তী প্রজন্ম আরও সরে যায়। প্রক্ষিপ্ত ঢেউরূপে বা গোষ্ঠীরূপে আত্মবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই, মানুষ দলে দলে দেশত্যাগ করছেন; যেমন ঘটে দেশভাগে, নানারকমের দলবদ্ধ দেশান্তরের ঘটনায়। এর চেহারা অনেকটাই সদ্য-বলিপ্রদত্ত পাঁঠার ধড়ের মতো, যার মাথাটাই নাই। এই অবস্থায় গোষ্ঠীটি তিন-চার প্রজন্ম পর্যন্ত নিজস্ব সংস্কৃতি ও ভাষাকে ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবটা ধরে রাখতে পারে না। জিপসিদের ইতিহাসে এই ঘটনার বিস্তারিত প্রমাণ মেলে। সর্বোপরি, সামগ্রিকভাবে বা জাতিরূপে আত্মবিচ্ছেদের ঘটনা ঘটে 'প্রলয়' আকারে। প্রথম 'প্রলয়'কে পশ্চিম দেশ চিহ্নিত করে রেখেছে তাদের 'গ্রেট এক্সোডাস' ধারণায়, আমাদের ইতিহাসে তা চিহ্নিত হয়েছে 'দক্ষযজ্ঞ-পণ্ডে' ও মৎস্যাবতারের কাহিনীতে। বিশ্বের ইতিহাসে এরকম প্রলয় ঘটেছে অন্তত পক্ষে আরও সাত-আট বার। বৌদ্ধ-খ্রিস্ট-ইসলাম-হিন্দু প্রভৃতি ধর্মের উত্থান ও বিপর্যয় কালে, সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বদখলে, পৃথিবীর কয়েকটি দেশে সমাজতন্ত্রের উত্থানে, এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। উত্থান ও পতনকালে এই প্রলয়গুলির চেহারা হয় খানিকটা জোয়ার ও ভাটার মতো। এই প্রলয়ে বিপর্যস্ত জাতির চেহারা হয়ে যায় অনেকটাই সুনামি-জাতীয় বড় ঘটনায় পরিবার-পরিজন-ধনসম্পত্তি সর্বস্ব হারিয়ে 'হাবা' হয়ে যাওয়া মানুষের মতো। তার পরে একদিন সে আবার কথা বলা শুরু করে বটে, কিন্তু আগের মানুষটির সঙ্গে এই 'হাবা থেকে ক্রমান্বয়ে স্বাভাবিক হয়ে ওঠা' মানুষটির বিস্তর ফারাক ঘটে যায়। সেই মানুষ কদাচিৎ যদি তার হারানো পরিজনের একজনকেও

জীবিত অবস্থায় ফিরে পেয়ে যায়, সে-মানুষ তৎক্ষণাৎ প্রাণ পেয়ে সরব হয়ে ওঠে। অর্থাৎ এই যে 'টিকটিকির কাটা লেজের মতো' মানুষ, 'কাটা ছাগলের মতো' মানুষ, সর্বহারা 'হাবা' মানুষ, এঁরা প্রাণ পান কেবল তখনই যখন কখনো তাঁদের হারানো অংশটির সঙ্গে তাঁদের সংযোগ ঘটে যায়। আর, সে সংযোগ কদাচিৎ ঘটে কোনো কোনো পরবর্তী প্রলয়ের জোয়ারের সময়, ভাটার সময় নয়। (এ বিষয়ে আমরা পরে আসছি।) তখন এই বিপর্যস্ত মানুষগুলির, জাতিগুলির আত্মবিচ্ছেদের ছিন্নসূত্রসমূহের কয়েকটিও যদি কোনোভাবে জুড়ে দেওয়া সম্ভব হয়, তারা মুহূর্তে প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারেন।

আত্মবিচ্ছেদের এই তিনরকম প্রক্রিয়া বিশ্বের মানুষের সংস্কৃতি ও ভাষার প্রবাহকে দারুণভাবে বিঘ্নিত করেছে। স্বভাবতই বিঘ্নিত হয়েছে মানুষের বাহ্যসম্পদ ও মানবসম্পদের প্রবাহ। ভারতীয় উপমহাদেশের সমস্ত জাতির ক্ষেত্রে এই ঘটনার কথা বুঝতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও কার্ল মার্কস। রবীন্দ্রনাথ একে বলেছেন 'নির্মম আত্মবিচ্ছেদ', আর মার্কস বলেছেন, ভারতবাসীর সমস্ত দুর্দশার কারণ এই 'আত্মবিচ্ছেদ'। কিন্তু, ইয়োরোপের ও অন্যান্য দেশের জাতিগুলির ক্ষেত্রে এই আত্মবিচ্ছেদের কত ঘটনা ঘটেছে? কেউ কি কখনো সেই আত্মবিচ্ছেদকে শনাক্ত করেছেন? না, আমার স্বল্পজ্ঞানে সে খবর সবিশেষ জানা নেই। আমার বিশ্বাস, নিশ্চয় কেউ না কেউ, কখনো না কখনো তা করে থাকবেন। সামান্য লেখাপড়ায় যতটুকু যা বুঝেছি, তা হল— আদিম মানবজাতির প্রথম স্রষ্টাসংক্রান্ত ধারণার ঈশ্বরের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' অভেদ রূপটিকে আজ আমরা শনাক্ত করতে পারছি, তার উত্তরাধিকারটি তাঁরা সরাসরি পাননি (যদিও বহু পরে যিশু ও মহম্মদ তাকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করে গেছেন), কিন্তু তার দ্বৈতাদ্বৈত 'অর্ধনারীশ্বর' বা পুরুষ-প্রকৃতি রূপটিকে তাঁরা পেয়েছিলেন তাঁদের 'স্রষ্টা ও স্রষ্টার পুত্র' এবং 'স্রষ্টা ও তাঁর প্রেরিত দূত' রূপে। আরও পরের তৃতীয় রূপটির উত্তরাধিকার তাঁরা সরাসরি পেয়েছিলেন, যাকে খ্রিস্টান ইয়োরোপ তাত্ত্বিক রূপ দেয় তাদের 'ট্রিনিটি গড'-এ — 'গড দ্য ফাদার', 'গড দ্য সন', ও 'গড দ্য হোলি ঘোস্ট'-এ; আমরা ভারতীয় উপমহাদেশের বাসিন্দারা যার উত্তরাধিকার পেয়েছিলাম ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর রূপে। কিন্তু তাতেই তো ঈশ্বরের বিবর্তন থেমে ছিল না, অজস্র মাতৃপূজায় তা বিবর্তিত ও খণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল। প্রাচীন ইয়োরোপের সেই উত্তরাধিকার যিশুর জন্মের আগে-পরে রীতিমত প্রচলিত ছিল। খ্রিস্টান ইয়োরোপ তাদের সেকালের সমাজের সেই প্রচলিত মাতৃপূজাকে আত্মসাৎ করবার উপায় বের করে সেই মাতাদের আসনে 'ভার্জিন মেরি'কে বসিয়ে দিয়ে। ফলস্বরূপ পাশ্চাত্যের মাতৃপূজা বিলুপ্ত হয়ে যায়। কেবল তাই নয়, অন্যান্য মূর্তিপূজার স্থানে তাঁরা বসিয়ে দেন 'গড দ্য সন' যিশুকে। 'গড দ্য ফাদার' ও 'গড দ্য হোলি ঘোস্ট'কে তাঁরা রেখে দেন বৌদ্ধ ও মুসলমানদের মতো নিরাকার করে। এইভাবে পূর্ব এশিয়ার বৈদিক-তান্ত্রিক-বৌদ্ধ সভ্যতা ও পশ্চিম এশিয়ার ইহুদি ও ইসলামী সভ্যতার মাঝামাঝি (একই সঙ্গে সাকার-নিরাকার) অবস্থানে নিজের জায়গা নির্দিষ্ট করে নেন তাঁরা এবং এইভাবেই তাঁরা তাদের অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকেন। এমনকী শেক্সপীয়রের হাতে অতীতের যে-বিশাল

আকাশটি ধরা দিয়েছিল, রেনেসাঁস-উত্তর ইয়োরোপ সে আকাশটিকে ছেঁটে ছোট করে নেয়। এবং এই বিচ্ছিন্নতা সেখানেই থেমে থাকে না, আরও পরবর্তীকালের প্রোটেস্টান্ট-ইয়োরোপ, প্রাচীন ইয়োরোপ ও ক্যাথলিক ইয়োরোপের অধিকাংশ বেশভূষা তাদের জাতীয় চেতনা থেকে খুলে নিয়ে নামিয়ে রাখে। এভাবে তাঁরাও ক্রমান্বয়ে অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন।

বিশ্বের প্রতিটি জাতির অগ্রগতির ইতিহাসেই এরকম বিপর্যয় ঘটেছে। আর, প্রতিটি বিপর্যয় জাতিটিকে তার অতীতের সংস্কৃতি ও ভাষা থেকে আরও বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। বিচ্ছিন্ন করেছে দু ভাবে — অন্তরের দিক থেকে এবং বহিরঙ্গের দিক থেকেও। অবশ্য, এই আত্মবিচ্ছেদের ছিন্ন সূত্রগুলি কখনোই জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করা হয়নি, অতীতকে ফিরে পাওয়ার বা পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা কোনো জাতিই আর কখনো করেনি, এমন নয়। বরং বলা ভাল, মানুষের স্বভাবের ভিতরে অন্তর্নিহিত চেষ্টা থেকেছে তার আদি অর্জনগুলিকে ফিরে পাওয়ার। আর সেজন্যেই পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা গেছে এক-একটা উল্টোরথের পালা, যাকে কখনো নাম দেওয়া হয়েছে রেনেসাঁস, কখনো নাম দেওয়া হয়েছে রিভাইভ্যাল। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ যেমন কর্মচক্রে এগিয়ে চলতে বাধ্য হয়, চলে তার আয়-আহরণ ও সব কিছুকে নিজের দিকে আকর্ষণের পালা; আবার কোনো একটা ছুটির দিনে চলে তার ত্যাগের পালা, ব্যয়-বিকর্ষণের উল্টোযাত্রা; রবীন্দ্রনাথের মতে 'উল্টা করিয়া নিজেকে সারিয়া লওয়া'। জাতিগুলির আত্মবিচ্ছেদের ছিন্নসূত্র জোড়া দেওয়ার এ সব চেষ্টা চলেছে অনেকটা সেরকমভাবেই, বলতে গেলে প্রকৃতির অমোঘ নিয়মেই।

হ্যাঁ, সেই প্রাকৃতিক নিয়মে প্রতিটি জাতিই তার আত্মবিচ্ছেদের ছিন্নসূত্র জোড়া লাগানোর চেষ্টা কমবেশি চালিয়ে গেছে, কেউ কেউ কখনো কখনো কমবেশি সফল হয়েছে, কেউ-বা কখনোই তেমনভাবে সফল হতে পারেনি। ভারতীয় উপমহাদেশের বিশেষত্ব হল, তারা সেই চেষ্টায় অত্যন্ত সফল হয়েছিল তার প্রথম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর, আনুমানিক ১৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, যখন সে আদিম মানুষের ভাষার মূল নিয়মে প্রচলিত ভাষাকে সংস্কার করে সংস্কৃত ভাষার জন্ম দিয়ে ফেলেছিল, ঋষিপ্রবাহকে লিপিবদ্ধ করতে শুরু করে দিয়েছিল। তারপর আবার চলে তার বিচ্ছিন্নতার পালা। সংস্কৃতভাষার বলতে গেলে মৃত্যু হয়ে যায়। পুনরায় সে নবজন্ম লাভ করে বঙ্গবাসীদের হাতে ১৩০০-১৪০০ খ্রিস্টাব্দে; বাংলাভাষায় রামায়ণ-মহাভারত লেখা হয়, মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণবসাহিত্যের জন্ম হয়। সেই কারণে অতীতের ভাষাব্যবহারের অভ্যাসের বেশ খানিকটা থেকে গেছে বাংলাভাষীর কথা বলার অভ্যাসের ভিতর। আর, ইয়োরোপ সেই চেষ্টায় কখনো কখনো বেশ খানিকটা সফল হলেও, বিশেষত শেক্সপীয়রের কালে কিংবা রেনেসাঁসের প্রথম দিনগুলিতে, বিচ্ছিন্নতার দিকে তার দৌড়ের গতি অত্যন্ত বেশি থাকার ফলে তার সাফল্যের চেয়ে বিচ্ছিন্নতাটিই আজ বেশি করে চোখে পড়ে। বলতে কি, অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হতে তার ভাষা আজ প্রায় একার্থ-সম্বল হয়ে গেছে। সেই কারণে, আমরা চাইলে তাকে বুঝতে পারি বটে, কিন্তু সে চাইলেও আমাদের পুরোপুরি বুঝতে পারে না। আমরা তাদের sky-কে পুরোটাই চিনতে-বুঝতে পারি, সে আমাদের 'আকাশ'কে

আংশিক বোঝে; সম্পূর্ণ বুঝতেই পারে না। এভাবে আমরা, প্রত্যেক জাতির মানুষেরা, কেবল অতীত থেকেই ক্রমান্বয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়িনি, পরস্পর থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি এবং সেটি সবচেয়ে বেশি ঘটেছে ঋষিপ্রবাহের বা মানসসম্পদের প্রবাহের ক্ষেত্রে।

অথচ মানুষের এই মানসসম্পদ তার অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় সহায়ক। বলতে গেলে এই সম্পদই তার প্রাণসম্পদের কারণ, জগতে তার টিকে থাকার চাবিকাঠি। কেননা, জগতের নিয়মগুলিকে আত্মসাৎ করে তাকে ব্যক্তরূপে প্রকাশ করা হয় এই ঋষিপ্রবাহে। জীবিত মানুষের মনের আধার যেমন তার নাচ-গান-কথা-জ্ঞান-বুদ্ধি-চিন্তা প্রভৃতি সমস্ত প্রকার প্রকাশ, তেমনি সমাজমনের আধার এই ঋষিপ্রবাহ। এযাবৎ অর্জিত বিশ্বমানবের সমস্ত মানসিক সম্পদ প্রবাহিত থাকে এই ধারায়। বিশ্বমানব এই অমৃতধারায় সিক্ত থাকে বলেই সে প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিরূপে সক্রিয় থাকে। এই প্রবাহকে বাদ দিয়ে মানুষের অস্তিত্ব ভাবাই যায় না। এই প্রবাহই মানুষকে রসেবশে রাখে।

সংস্কৃতিপ্রসঙ্গ : ঋষিপ্রবাহে বিঘ্নের ফল

নেচারের নিয়মের মতোই মানুষের সামাজিক সম্পর্কগুলিতে কিছু অনিবার্য নিয়ম সক্রিয় থাকে এবং প্রায়শই তা আমাদের চোখে পড়ে না। সেলাম ঠুকি সম্মুখস্থ প্রত্যক্ষ যমদূত দারোগাকে, তার লক্ষগুণ বড় দেশের রাজার কথাটাই ভুলে যাই। মুজতবা আলী বলতেন — চোখের সামনে নিজের বুড়ো আঙুল তুলে ধরলেই হিমালয় আড়াল হয়ে যায়। চোখের সামনের সাময়িক সমস্যাগুলি সরিয়ে দিয়ে একটু দূরদৃষ্টি ফেলে সমাজের ইতিহাসের দিকে তাকালেই, আমরা নিয়ামক রূপে আমাদের প্রকৃতি-রাজাকে অত্যন্ত সক্রিয় দেখতে পাই।

তথাকথিত সভ্যযুগের সূত্রপাতে, বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও নিত্যনতুন আবিষ্কারমূলক নীতি সাময়িকভাবে পরিত্যাগ করাই উচিত বলে মনে হয়েছিল মানুষের। তার অনিবার্য ফল ফলে যৌথসমাজের বিভাজনে, ঘটে যায় প্রথম প্রলয়। তার পর, পাহাড় থেকে পতনের পর প্রস্তরের চাঁই যেমন গড়াতে থাকে, গড়িয়ে গড়িয়ে ক্রমশ বিচূর্ণীভূত হতে থাকে, মানবসমাজের বিবর্তন চলতে থাকে সেভাবেই। পরবর্তীকালের সামাজিক সত্তা ও শক্তিগুলি সেই গতিকে বড়জোর ত্বরান্বিত বা শ্লথ করেছে মাত্র; তাদের আর কোনো ভূমিকা এখন আর মালুম করা যায় না। সেভাবেই আদি যৌথমানুষ ক্রমশ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে তার আজকের স্বরূপে এসে পৌঁছেছে। কেন তার এই অধঃপতন, তা কতখানি অনিবার্য ছিল, সে সব কথায় এখন আর আমরা যাব না। আমরা দেখব, এর ফলে সে বর্তমানে কীরূপ লাভ করেছে এবং সেখান থেকে সে কোথায় পৌঁছতে পারে।

আমাদের সমাজ যত খণ্ডিত হয়েছে তত বেড়েছে আমাদের আত্মবিচ্ছেদ। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের আত্মবিচ্ছেদ ঘটেছে দু ভাবে — বহিরঙ্গে এবং অন্তরঙ্গে। বাইরের শরীরের যে খণ্ডতা, তার স্বরূপ একরকম, অন্তরের যে বিচ্ছিন্নতা তার স্বরূপ অন্যরকম। প্রথমে বাইরের বিচ্ছিন্নতার কথাতেই আসা যাক।

আজ আমরা দেখছি, মানুষের দেশগত ও জাতিগত বা ধর্মগত বিভাজনের মতো মানুষের জ্ঞানও অজস্র খণ্ডে বিভাজিত — অংক বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস সাহিত্য রাজনীতি অর্থনীতি নাচ গান বাজনা চিত্র স্থাপত্য ভাস্কর্য ... ইত্যাদি ইত্যাদি এবং সর্বোপরি ভাষা; সে আবার প্রতিটি দেশের একেবারেই আলাদা আলাদা। এর মধ্যে যেগুলি ব্যক্ত (explicit) জ্ঞানের ধারা, যেমন অঙ্ক ও বিজ্ঞান, সেগুলি অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রায় অব্যাহতভাবেই এগিয়ে চলেছে। কিন্তু যেগুলি অব্যক্ত (tacit) জ্ঞানের ধারা, যেমন দর্শন সাহিত্য ইতিহাস সংগীত ইত্যাদি, সেগুলির প্রত্যেকটিই নিজ নিজ অতীত থেকে ক্রমান্বয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ঘটেছে সেগুলির আন্তরিক বিচ্ছিন্নতা। কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে এখন সেই আন্তরিক বিচ্ছিন্নতার বিষয়টিকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করা যাক। (বহিরঙ্গের বিচ্ছিন্নতার কথায় যাব না, দুটি কারণে — অনেকেই তা কমবেশি জানেন, এবং ইতোপূর্বে আমার অন্য রচনায় তা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।)

সবার আগে মূলনীতিটির কথা হোক। যতদূর বোঝা গেছে, আদিম মানুষের সমস্ত রকম 'প্রকাশ'-এর মূলনীতি ছিল — যাকে দেখা যাচ্ছে না, যার বাহ্য চেহারা নেই, অথচ সমাজে ও প্রকৃতিতে সক্রিয়ভাবে বিরাজ করছে এবং মানুষের চলার পথে নানারকম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটাচ্ছে, তাকে দেখানো এবং তার বিষয়ে সবাইকে অবহিত করা। অর্থাৎ বিমূর্ত সত্তাকে মূর্ত করাই ছিল প্রকাশের মূলনীতি। যাকে খালি চোখে দেখা যায়, আঙুল দিয়ে দেখানো যায়, তার বিষয়ে মানুষের আদিপুরুষদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। দৃশ্য বস্তুকে বোঝানোর জন্য ভাষা-গান-ছবি কোনো কিছুরই প্রয়োজন হয়নি তাঁদের। একমাত্র 'অদৃশ্য-কিন্তু-বর্তমান-ও-সক্রিয়' সত্তাগুলিকে নিয়েই ছিল তাঁদের মাথাব্যথা। ... ভাষা, সঙ্গীত, চিত্র, ভাস্কর্য প্রভৃতি সমস্ত মানবিক প্রকাশের মূলে ছিল এই নীতি।

প্রথমে ভাষার কথাতেই আসি। পৃথিবীর সব ভাষাই আদিতে এক ছিল, বাইবেলের Babel-কাণ্ডে এই আদি সত্যের আভাষ রয়েছে। সেই আদি ভাষা ছিল ক্রিয়াভিত্তিকরূপে এবং তার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ক্রিয়া দিয়ে ক্রিয়াকারীকে বোঝানো; যে-ক্রিয়াকারী অদৃশ্য হতে পারে, দৃশ্যও হতে পারে। প্রথম প্রলয়ে সেই ভাষা কমবেশি ষোলোটি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে গেলেও, প্রত্যেকের মধ্যেই কিছুটা পরিমাণে আদি ক্রিয়াভিত্তিক গুণ থেকে গিয়েছিল। আদিতে মানুষ বলত 'জ্ঞ আত্মন্' বা 'gno aut(m)on' (= নিজেকে জানো)। প্রথম বিভাজনের পর ইয়োরোপ বলল, 'gnothi seauton'; আর আমরা বললাম, 'আত্মানং (auton-se) বিদ্ধি (= জ্ঞ = জ + ঞ = g-no thi)'। পরবর্তী অধ্যায়ে ইয়োরোপ সেটিও হারিয়ে ফেলল, পৌঁছল 'know (g-no) thyself'-এ, আমরা পৌঁছলাম 'নিজেকে জানো'-তে। ইয়োরোপের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য অনেকখানি বেড়ে গেল। এরপর ইয়োরোপের প্রতিনিধি ইংরেজ যখন বাংলায় পা রাখল, আমরা বাধ্য হলাম আমাদের 'আত্মা'র সমস্ত অর্থ ফেলে দিয়ে তাকে ইংরেজের soul-এর সমান করে নিতে। দুই ভাষার মধ্যেকার পার্থক্য এবার দুস্তর পারাবার হয়েই থেকে গেল। অথচ, উভয়েই যে একই উৎস থেকে যাত্রা করে বর্তমান

অবস্থানে এসে পৌঁছেছি, সে নিয়ে আজ আর সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু নিজ নিজ অতীত থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি, পরস্পর থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি।

একই অবস্থা চিত্রে-ভাস্কর্যেও। মানুষের ছবি আঁকার মূল নীতি ছিল, যা বাস্তবে আছে কিন্তু বাহ্যিক চেহারা নেই, তাকে বোঝানোর জন্যই ছবি আঁকা; বিমূর্ত-বাস্তবকে মূর্ত করা। সে ছবিতে সমাজের শিব ছিলেন এক নম্বর আসনে; ছিল তাঁর বৃষ, ধর্মের ষাঁড়, শিবতেজের বাহন— মানবসমাজের ঋষিপ্রবাহের বেগ সঞ্চারকারী ঋষি-মানুষের প্রতীক। গোয়ালের বন্ধন যার নেই, কারও ঘাসজল খায় না, সবাই যাকে খাতির করে ভক্তি করে খেতে দেয়; আর সে প্রকৃতির রোদে-জলে স্বাধীন থেকে সম্পূর্ণ নেচারাল থাকে ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রজননের কাজ চালায়। ফলে গো-প্রজাতির উত্তর প্রজন্ম নেচারাল থাকে, স্বাভাবিক থাকে। মানুষেরও সেই অবস্থা ছিল, মহর্ষিরা সংসারবন্ধন থেকে দূরে থাকতেন, বাহ্যসম্পদের পিছনে কখনো যেতেন না, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজ নিজ মানবজমিনে চাষ চালাতেন (সেকালের ভাষায় যাকে বলা হত সাধনা করা), লোকে তাঁদের ভক্তিশ্রদ্ধা করে খেতে দিত, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শিক্ষা দিয়ে 'দ্বিতীয় জন্ম' দিয়ে 'দ্বিজ' বানাতেন তাঁরা, সমাজকে পথ দেখাতেন। সেই শিব ও বৃষ প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয় দেশের চিত্রে-ভাস্কর্যে প্রচলিত ছিল। প্রথম প্রলয়ের পর ইয়োরোপ শিবকে হারিয়ে ফেললেও বৃষকে হারায়নি দীর্ঘকাল, যদিও ক্রমে তার অর্থ হারিয়ে ফেলেছিল। অজস্র বৃষের চিত্র ও ভাস্কর্য ছিল তাদের। এশিয়ায় সংস্কৃতভাষার জন্মের ফলে তার সহায়তায় শিব ও বৃষ দুটিই থেকে গেল দীর্ঘকাল, যদিও ক্রমান্বয়ে সেও অর্থ হারাচ্ছিল। Classical Antiquities-এর যুগ শেষ হওয়ার পর ইয়োরোপ তার বৃষকেও অর্থহীন বলে ফেলে দিল এবং ইয়োরোপের প্রতিনিধি ইংরেজ ভারতে পা দেওয়ার পর, আমরাও আমাদের চিত্রশিল্পে ও ভাস্কর্যে শিব ও বৃষ দুটোকেই অর্থহীন বলে ফেলে দিলাম। নিজেদের অর্থ হারিয়ে আমাদের শিব আর বৃষ থেকে গেল কেবল ধর্মেই। সুখের কথা এই — ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি আজ তার অর্থ উদ্ধার করে ফেলেছে। চিত্র-ভাস্কর্যের ইতিহাসে এখন তাকে জুড়ে নেওয়া আর অসম্ভব নয়।

প্রায় একই ঘটনা ঘটল বহুমাথাওয়ালা মূর্তিগুলির বেলায়। আমরা জানি দশ কথাটির মানে শুধুমাত্র ten নয়, দশ মানে 'অনেক'ও হয় (দশে মিলি করি কাজ)। রাষ্ট্রের বহু বিভাগ, বহু মাথা। মানবসমাজের সেই বিমূর্ত বহু-ডিপার্টমেন্টওয়ালা প্রথম রাষ্ট্রশরীরকে আঁকা হত দশ-মুণ্ড দশাননরূপে। ধারণাটির উত্তরাধিকার ইয়োরোপ পেয়েছিল শতমাথা সহস্রমাথা মূর্তিতে। কিছুদিন পরে এত মাথাওয়ালা মূর্তির মানেটাই তারা হারিয়ে ফেলল। আর আমরাও, ব্রিটিশ যুগের পরে রাষ্ট্রের মূর্তি আঁকতে ভুলে গেলাম; মানেটা ভুলে গিয়েছিলাম ১৭০০ সালের আগেই। সে জন্যই একালের কোনো শিল্পীই 'রাষ্ট্রের' মূর্তি আঁকতে পারেন না।

কেবল তাই নয়, বৌদ্ধযুগের আগেই আমরা 'জনসাধারণ'-এর মূর্তি বানাতাম মহামায়ারূপে, 'শিক্ষিত জনগণ'-এর ছবি আঁকতাম সরস্বতীরূপে, 'ধনবান জনগণ'-এর ছবি আঁকতাম লক্ষ্মীরূপে, 'মধ্যবিত্ত জনগণ'কে আঁকতাম দুর্গারূপে, 'শ্রমিক জনতা' ও 'কৃষক জনগণ'-এর

ছবি আঁকতাম যথাক্রমে কালী ও শ্যামারূপে। ব্রিটিশের আগমনের পর সেই প্রতিমাগুলিকে আমরা 'অসভ্যের মাতৃপূজা' নাম দিয়ে ঠেলে দিলাম কেবলমাত্র হিন্দুধর্মের এলাকায়, যে-ধর্মের জন্মই হয়েছিল সেই প্রতিমাগুলির আবির্ভাবের বহু পরে, ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে। আমাদের আত্মবিচ্ছেদ এত হল যে, আমাদের আধুনিক কবি-সাহিত্যিকদের কেউ-বা সেই 'শিক্ষাজীবী জনসাধারণ'-এর মাতৃমূর্তিকে 'ল্যাংটা সাঁওতাল মাগি' বলতেও কুণ্ঠিত হলেন না। মাঝ থেকে পাশ্চাত্য সভ্যতার দাপটে আমরা 'জনসাধারণ'-এর মূর্তি আঁকতেই ভুলে গেলাম। অবন ঠাকুর ও নন্দলাল প্রথম দিকে তাও খানিকটা চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ছবিগুলির অর্থ হারিয়ে ফেলায় তাঁরাও একদিন সে-পথ ত্যাগ করেন। আজও ভারতীয়রা তাঁদের সংস্কৃতিতে অর্থহীন বোঝার মতো করে হলেও ওই মূর্তিগুলি বহন করে নিয়ে চলেছেন, তবে সে হিন্দু ধর্মের নামে। ভক্তির জোরটুকু না থাকলে এই বোঝা বহন নিতান্তই দুঃসাধ্য ছিল। কিন্তু সেই প্রতিমাগুলি যে আদৌ অর্থহীন ছিল না, মহত্তম অর্থবান ছিল, বাংলাভাষায় আবিষ্কৃত ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি বিশ্বমানবের চিত্র-ভাস্কর্যের সেই বিশাল দিগন্তও উন্মুক্ত করে দিয়েছে। আজ চাইলে চিত্র-ভাস্কর্যের ইতিহাসের আদি থেকে বর্তমান পর্যন্ত সবটাই জুড়ে নেওয়া যায়।

আজকের পৃথিবীতে পুনরায় বিমূর্ত ছবি ও ভাস্কর্যের কাজ হচ্ছে। কিন্তু ছবি-ভাস্কর্যের নিজের আদিম ইতিহাসের সঙ্গে তার যোগ নেই বলে, সে জানেই না যে, চিত্র-ভাস্কর্যের সূত্রপাতই হয়েছিল বিমূর্তকে মূর্ত করার জন্য। আজকের চিত্রশিল্পী ও ভাস্করগণ মূর্তকে বিমূর্ত করে দিয়ে, তার মাধ্যমে বর্ণের (রঙের ও অক্ষরের) গোড়ায় যে-অখণ্ডবোধ ছিল, যুক্তি-শৃঙ্খলাহীন অব্যক্ত জ্ঞানের ইশারার সাহায্যে তার গন্ধ অনুভব করানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। চাইলে তাঁরা বিশ্বমানবের আদি অর্জনকে এবার তাঁদের ব্যক্ত জ্ঞানের সাহায্যেই আপডেট করে নিতে পারবেন।

এ কথা কবিতা ও গানের কথার ক্ষেত্রেও বলা যায়। আদি ভাষায় শব্দের ভিতরে (= ক্রিয়াভিত্তিক + বর্ণভিত্তিক) অর্থ ছিল। কয়েকটি প্রলয়ের পর পৃথিবীর সব দেশই তাদের ভাষার শব্দের ভিতরের সেই অর্থ হারিয়ে ফেলল। তাই আধুনিক ভাষা অনুসারে শব্দের ভিতরে কোনো অর্থ নেই, সে প্রতীক মাত্র; কোনো বস্তু বা বিষয়কে উল্লেখ করার মূর্ত 'আওয়াজ মাত্র'। তা দিয়ে বিমূর্ত কিছু বোঝানো বেশ অসুবিধাজনক। এ দিকে আধুনিক কবিও মানুষ, স্রষ্টা। তাঁর চোখে বিমূর্ত অনেক কিছুই ধরা দেয়। কিন্তু এই 'স্থির' স্বভাবের শব্দগুলির সাহায্যে সেই বিমূর্ত সচলকে তিনি বোঝাবেন কেমন করে? স্বভাবতই তিনি তাঁর মূর্ত শব্দগুলিকে বিমূর্ত ও অস্থির করে নেওয়ার জন্য নানারকমের তাৎক্ষণিক কৌশল ও উপায়ের উদ্ভাবন করেন, যে-কৌশলের সঙ্গে পাঠক সাধারণের যোগ নেই। আধুনিক কবির কবিতা সেকারণেই পাঠক আর বুঝতে পারেন না। এই কবিরা যদি জানতেন, বিমূর্ত ও অস্থিরকে বোঝানোর জন্যই মানুষের আদিভাষার জন্ম হয়েছিল, তা হলে হয়তো এত দিনে অন্য পথ বেরিয়ে আসত।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। আদিম মানুষ গান গাইত ভাব প্রকাশ করার জন্য। সুরের

অকারণ কালোয়াতি করার বোকামি ছিল না তাঁদের 'সঙ্গীতে' (= নৃত্য + গীত + বাদ্য)। প্রথম প্রথম, যখন সে 'তা-ই-উ' ছাড়া আর কোনো স্বর-ব্যঞ্জনেরও সৃষ্টি করতে পারেনি, তখন, তাকে তো কাজ চালাতে হত শুধু মাত্র সুর দিয়ে। ভাবের রকমফেরে তার সুরও বদলে যেত। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতে হাত লাগাতে গিয়ে দেখলেন — ভাবের কথাটাই একালের সঙ্গীতকাররা ভুলে মেরে দিয়েছেন। তবু ভাল, বাঙালি হিন্দু-মুসলিম পদকাররা, কীর্তনীয়ারা, লালন-হাসনরাজারা যতটুকু পেরেছেন ভাবপ্রকাশকে তাঁদের সঙ্গীতে যতটা সম্ভব গুরুত্ব দিয়ে গেছেন। কিন্তু ভাব ও সুরের যে অভেদ, সুরের সঙ্গে ভাবের যে 'লীলা' (এ শব্দটির ইংরেজি অনুবাদ করা যায় না), তার কারণ তিনি জানতে পারলেন না। কোনো উত্তরাধিকার নেই, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সবাই ভুলে গেছে, তিনি দেখলেন। অথচ এককালে ভারতের হাতে তা ছিল, তিনি তাও দেখতে পেলেন; কিন্তু হাতে পেলেন কেবল সেই আদি অভেদাত্মক সংগীতের শুষ্ক সরোবরটি, খাঁচাটি, প্রাণপাখিটা নাই। তিনি দেখলেন, ইয়োরোপের হাতে এমনকী আদি অভেদাত্মক সঙ্গীতের প্রথম পর্যায়ের খাঁচাটিও নেই, রয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়ের রূপটি — হারমনি, যেখানে বাদী-বিসম্বাদী সুরের সমমর্যাদা মৌলবাদী কট্টরতায় প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু ভাবের খবর নেই। কী করবেন তিনি! আবেদন জানালেন —

> "সংগীতবেত্তাদিগের প্রতি আমার নিবেদন যে, কী কী সুর কিরূপে বিন্যাস করিলে কী কী ভাব প্রকাশ করে, আর কেনই বা তাহা প্রকাশ করে, তাহার বিজ্ঞান অনুসন্ধান করুন। ... দুঃখ সুখ, রোষ ও বিস্ময়ের রাগিণীতে কী কী সুর বাদী ও কী কী সুর বিসম্বাদী, তাহাই আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হউন। ... আমাদের সুখদুঃখের রাগরাগিণী কৃত্রিম নহে। আমাদের স্বাভাবিক কথাবার্তার মধ্যে সেই-সকল রাগরাগিণী প্রচ্ছন্ন থাকে। কতকগুলা অর্থশূন্য নাম (মুলতান, ইমন-কল্যাণ, কেদারা ইত্যাদি) পরিত্যাগ করিয়া, বিভিন্ন ভাবের নাম অনুসারে আমাদের রাগরাগিণীর বিভিন্ন নামকরণ করা হউক। ... এখন যেমন সংগীত শুনিলেই সকলে বলেন, 'বাঃ ইহার সুর কী মধুর', এমন দিন কি আসিবে না যেদিন সকলে বলিবেন, 'বাঃ কী সুন্দর ভাব।'
>
> আমাদের সংগীত যখন জীবন্ত ছিল, তখন ভাবের প্রতি যেরূপ মনোযোগ দেওয়া হইত, সেরূপ মনোযোগ আর কোনো দেশের সংগীতে দেওয়া হয় কি না সন্দেহ। ... সেদিন গিয়াছে। কিন্তু আবার কি আসিবে না?"
>
> (সংগীতচিন্তা / রবীন্দ্রনাথ)

অগত্যা ক্রিয়াভিত্তিক শব্দবিধি ছাড়াই, ভাবভিত্তিক সুরবিধি ছাড়াই রবীন্দ্রনাথকে এগোতে হল। তিনি তাঁর প্রবল প্রতিভার অসামান্য শক্তিতে যতদূর অনুভব করতে পেরেছিলেন, তাকেই আপডেট করে তাঁর কবিতা ও সঙ্গীত সৃষ্টি করে যেতে লাগলেন। আদি অখণ্ডের গন্ধ নিয়ে তাঁর কাব্য-সঙ্গীতের ধারা প্রবাহিত হতে লাগল। কিন্তু উৎসের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার ছিন্নসূত্রগুলি তিনি নিজস্ব প্রতিভার শক্তিতে তাঁর অব্যক্ত (tacit) জ্ঞানে অনুভব করে নিতে পারলেও, সেগুলিকে ব্যক্তভাবে (explicitly) বুঝে নিয়ে কিছুতেই জোড়া দিতে পারলেন

না, সারাজীবন ধরে বারংবার হা-হুতাশ করে গেলেন। মাঝ থেকে সঙ্গীতের অতীতের সঙ্গে বর্তমানের বিচ্ছিন্নতা কার্যত বিচ্ছিন্নতাই থেকে গেল।

ইয়োরোপ বেচারা কী আর করবে! সঙ্গীত বিষয়ে তার হাতে এমনিতেই অতীতের উত্তরাধিকার এশিয়ার তুলনায় অনেক কম ছিল। তার ওপর যেখানে সে ছিল, সেখান থেকে সে ছিটকে গেল বহু দূরে। কারণ, যন্ত্রসভ্যতার দাপট তার ওপরই পড়ল সবচেয়ে বেশি করে। আর, যন্ত্রসভ্যতার স্বভাবই এই যে, একই কর্মের দারুণ পুনরাবৃত্তির কারণে প্রকৃতি থেকে মানুষকে সে অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন করে দেয়। আদি মানুষের সভ্যতা জন্মেছিল প্রকৃতি থেকে, তার অখণ্ডবোধ ছিল স্বাভাবিক। দক্ষের আবির্ভাব এক ধরনের আদি-যান্ত্রিকতা বলেই তার সামাজিক স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ ক্রমশ তার প্রকৃতিগত স্বভাব ও সংস্কৃতি থেকে সরে সরে যাচ্ছিল; শিল্পবিপ্লবোত্তর যন্ত্রসভ্যতা ইয়োরোপকে প্রকৃতি থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন করে দিল। কৃষক ও জেলে-মাঝির ভিতর দিয়ে প্রকৃতি গান হয়ে তা-ও দেখা দিতে পারে, কিন্তু মেসিনম্যানের কিংবা কমপিউটার অপারেটারের ভিতর দিয়ে প্রকৃতি গান হয়ে বেরোনোর পথ পায় না। যন্ত্রসভ্যতা মানুষের গান কেড়ে নিল। অফিসে কারাখানায় কাজ করা মানুষ মাঝি-চাষির মতো গান গেয়ে উঠতে পারল না। কোনো মানুষকে তার প্রকৃতি থেকে, স্বভাব থেকে দীর্ঘকাল এভাবে পেটের দায়ে বিচ্ছিন্ন করে রাখলে, সে যেমন ছাড়া পেলে অনেকক্ষণ ধরে একনাগাড়ে হাত-পা ছুঁড়ে প্রবল চীৎকার ক'রে মনের ক্ষোভ মেটায়, বিংশ শতাব্দীর গোটা পাশ্চাত্য দেশ তার সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে সেভাবেই তার মনুষ্যত্বের চরম অবমাননার প্রকাশ খুঁজতে থাকে। তারই ঢেউ এসে লাগছে আজ ভারতীয় উপমহাদেশেও; কারণ, আসছে সেই দমবন্ধ করা উপকরণবহুল যন্ত্রসভ্যতাও। এখানকার সঙ্গীতও আজ মাতালের চীৎকারের দিকে পা ফেলতে শুরু করেছে। আদি সুর ও স্বরের সঙ্গে এর যোগ ক্ষীণ, অন্য দিকে আজকের মানুষ সঙ্গীতে খুঁজছে তার মনুষ্যত্বের অবমাননার ক্ষোভের প্রকাশ! যন্ত্রসভ্যতার প্রচণ্ড চাপে হাঁফিয়ে ওঠা প্রকৃতিবিচ্ছিন্ন মানুষ খানিকক্ষণ ধরে একনাগাড়ে চেঁচিয়ে নিজেকে হালকা করতে চায়। তার দাবি, তার সেই চেঁচানিকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করুক বাদ্য ও নৃত্য। নরম সুরের মলম তার চাই না, রাগ করে সে তা ছুঁড়ে ফেলে দেয়! এক ভয়ানক পরিস্থিতি!

একই ব্যাপার জ্ঞানের সব শাখাতেই — সাহিত্য, ইতিহাস, নৃত্য, বাদ্য, চিকিৎসাবিদ্যা, বাস্তুবিদ্যা — সর্বত্র। সব ক্ষেত্রেই অতীত থেকে বর্তমান ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এখানে তা নিয়ে আর বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে, আমরা বরং এই পরিস্থিতির পিছনে প্রকৃতির নিয়মের ইশারা কী, এবং পরিস্থিতিটি কোন দিকে যেতে চাইছে সে দিকে নজর দিই।

গোলোকায়নী (Glocalizing) সভ্যতার সংস্কৃতিপ্রসঙ্গ : এবার তবে জোড়ার পালা

উল্টো পথে নিজেকে সেরে নেওয়ার অঙ্ক সংসারকর্মে লিপ্ত কর্মীর বেলায় যদি সপ্তাহে একদিন হয়, তবে সমাজের বেলায় সে হয় এক এক যুগ পরে পরে। প্রকৃতির নিয়মেই হয়।

সেই নিয়মেই আসে প্রলয়। নানা যুগে সেই প্রলয়ের নানা নাম। আজ যে-প্রলয় এসেছে, তার নাম দেওয়া হয়েছে বিশ্বায়ন।

পুরাকালে প্রাচ্যদেশে জনসাধারণকে বলা হত 'জল' এবং এই বিশ্বায়নের মতো ব্যাপারকে বলা হত 'প্রলয়' বা 'একার্ণব'। এর অর্থ, দুনিয়ার সমস্ত মানুষের 'এক জনসমুদ্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া'; কিংবা বলা যায়, একই জীবনাচারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া। এর কারণ হল — জলকে যেমন কেটে কেটে খণ্ড খণ্ড করা যায় না, মানুষ-নামক 'ঝাঁকজীব'টিকেও তেমনি টুকরো টুকরো করে আলাদা করা যায় না; করলে সে-চেষ্টা তার বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় বারংবার বিপর্যস্ত হবেই; একেই একটু আগে বলেছি 'উল্টোভাবে সেরে নেওয়া'। সতীনাথ ভাদুড়ী নামে এক বাঙালি সাহিত্যিক তাঁর 'ডায়রি'তে এ কথাটিই লিখে গেছেন একটু অন্যভাবে, 'মানুষ অতৃপ্ত — কী যেন খুঁজছে সারা জীবন — কী সে জিনিস? সেই পূর্ণ জিনিসটা নয়তো — যার থেকে সে খণ্ডিত হয়ে এসে বর্তমানের জীবন নিয়েছে?' তার মানে, মানুষের মনের গভীরে বিশ্বপ্রকৃতির এক অমোঘ ইচ্ছা নিয়ত কাজ করে চলেছে। সেই ইচ্ছা থেকেই সে কোনোদিন ফাঁক পেলে, যান্ত্রিকতার চাপে তার আত্মস্বরূপের যে-জায়গাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেছে, সেগুলি সেলাই করে নিতে দৌড়োয়। ব্যক্তিমানুষের মতো সমাজও তার প্রলয়কালে সেইরকম আচরণই করে থাকে। তাই এই প্রলয়ের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব দেখা যায়, এর আয়োজকদের চরিত্রে। দেখা যায়, এতকাল যে-শক্তি লোকালাইজেশনের বা খণ্ডতার জয়গান গাইছিল, প্রলয়কালে সেই শক্তিই গ্লোবালাইজেশনের বা অখণ্ডতার ডাক ডাকছে, এবং এতকাল যে-শক্তি আদি গ্লোবালাইজেশনের উত্তরাধিকার থেকে কিছুতেই লোকালাইজড হতে রাজি হচ্ছিল না, সেই শক্তিই এই প্রলয়কালে লোকালাইজেশনের পক্ষে সওয়াল করছে। অর্থাৎ যে-শক্তি বহুকালক্রমাগত ধারাকে ছিঁড়ছিল, সেই বলছে সেলাইয়ের কথা; এবং যে-শক্তি যথাস্থিতি বজায় রাখছিল, কিছুতেই ছিঁড়তে দিচ্ছিল না, সেই-শক্তি এই সেলাই-চেষ্টায় আপত্তি তুলছে। বোঝা যায়, আপত্তিটা তার সেলাইয়ে নয়, পাছে সেলাইয়ের নাম করে বর্তমান সেলাই-চেষ্টার দাবিদাররা আরও ছিঁড়ে না দেয়। এই সব কারণে আমরা একে 'বিশ্বায়ন' না বলে 'গোলোকায়ন' বা 'গ্লোকালাইজেশন' বলে শনাক্ত করছি।

কিন্তু 'একই জীবনাচারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া'র জন্য বর্তমান গোলোকায়নী সভ্যতার এই যে ডাক, এর আর একটি অর্থ হল, কেবল রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক একাকার নয়, এ-প্রলয় সব ক্ষেত্রেই। একাকার চলবে কেবল পণ্যের দুনিয়ায় বা দেবপ্রবাহে, তা হবে কেমন করে! দেবপ্রবাহ তো ঋষিপ্রবাহের উপর নির্ভরশীল। সেখানেও অতএব একাকারের ডাক এসেছে। সেই ডাকে সাড়া দিতে গেলে বিশ্বের সমস্ত জাতির ঋষিপ্রবাহকে একত্রে জুড়ে নেওয়া প্রয়োজন। যে যে ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা ঘটেছে, সেই সেই ক্ষেত্রে এখন জুড়ে নেবার পালা। আর সে-কাজই শুরু হয়েছে আজ বিশ্বজুড়ে।

পূর্ববর্তী প্রলয়গুলিতে এই কাজ তেমন করে কেউই করতে পারেননি। বৌদ্ধ-প্রলয়ে বিশ্বের অন্য জাতিগুলির সঙ্গে যে একাকার ঘটেছিল, তাতে মানুষ যে এক হতে পারেনি, সে

কথা আমরা জানি। ক্রুসেড বা জেহাদের সময়ও তা হতে পারেনি। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের সময় কিছুটা হয়েছিল বলেই আমরা বিভিন্ন দেশের ইতিহাস-সংস্কৃতি-ভাষা ইত্যাদির একটা সামগ্রিক সংবাদ আজও পাই। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা চেষ্টা করেছিলেন বাকি বিশ্বকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে নিতে, যদিও বহু ক্ষেত্রেই প্রভুগিরির কারণে সেই একাকারেও আমরা এক হতে পারিনি। সবচেয়ে বড় কথা, এই একাকার ঋষিপ্রবাহের ক্ষেত্রে যেটুকু এক করার চেষ্টা করেছিল তা সবই বহিরঙ্গের একাকার। অন্তরের নয়। ফলে একাকার হয়েছিল, এক হয়নি। কেন হয়নি তার ব্যাখ্যা দিয়ে গিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ — 'একাকার হওয়া এক হওয়া নয়। যারা স্বতন্ত্র তারাই এক হতে পারে। পৃথিবীতে যারা পরজাতির স্বাতন্ত্র্য লোপ করে, তারাই সর্বজাতির ঐক্য লোপ করে।'[৮] আজকের বিশ্বায়ন-নামিত প্রলয়েও এইরকম শক্তি এখনও সক্রিয়। সে অন্যের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করতে চায় না, অথচ একাকার চায়। তা ছাড়া, একালের দেবপ্রবাহের অধিকারীরা এখনও যুগের প্রয়োজনের সম্পূর্ণ যোগ্য হয়ে উঠতে পারেননি। তাঁরাও অপরের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করতে এখনও ইতস্তত করছেন।

তবুও, প্রকৃতির নিয়মেই আজ বিশ্বজুড়ে একটা চেষ্টা শুরু হয়েছে মানুষের সমগ্র ঐতিহ্যকে, তার পিতৃপ্রবাহ, দেবপ্রবাহ ও ঋষিপ্রবাহকে একত্রে বুঝে নেওয়ার, একাকার করে নেওয়ার। সেই আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের সমাজ যে পথ বেয়ে এসেছে, সেই পথের সংবাদ যার কাছে যেটুকু আছে, তা নিয়ে এবার বিশ্বসভায় হাজির হওয়ার ডাক শোনা যাচ্ছে। আর সন্দেহ নেই, এই সংবাদ আজ সবচেয়ে বেশি রয়েছে বাংলাভাষীদের হাতে।

সেকালের ভাষায় সন্তানপ্রবাহকে (পিতৃগণকে) ব্রহ্মা, দেবপ্রবাহকে বিষ্ণু এবং ঋষিপ্রবাহকে মহেশ্বরও বলা হত। আদিতে এঁদের সমমর্যাদা ছিল, ছিল পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহার। আদি প্রলয়ের প্রাক্কালে শিবের অসম্মান ঘটিয়ে দেয় দক্ষ বা একই কর্মের পুনরাবৃত্তি, যা কিনা একপ্রকারের যান্ত্রিকতা বই অন্য কিছু নয়। তাই, সমাজে যান্ত্রিকতার (দক্ষতার) সামাজিক স্বীকৃতির পর থেকেই ঋষিপ্রবাহে বিঘ্নের সূত্রপাত হয়। এই একই কর্মের পুনরাবৃত্তি প্রচলিত ঋষিপ্রবাহকে, রবীন্দ্রনাথের মতে, 'একটেরে' করে দেয়। সমস্ত জোর পড়ে যায় বাহ্যসম্পদের প্রবাহে বা দেবপ্রবাহে বেগ সঞ্চারের দিকে। দৈবই প্রবল হয়ে ওঠে এবং পুরুষকার গুরুত্ব হারায়। হিন্দু যুগের সূত্রপাতের ঠিক আগে, এইরকম দৈবই প্রবল হয়ে উঠেছিল। তখন ভারতসমাজ পুরুষকারের গৌরব ঘোষণা করে এবং দৈবকে পর্যুদস্ত করে দেয়, ভারতসমাজে বহির্বাণিজ্য নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এরপর ভারতসমাজে মানুষের বাহ্যিক সমৃদ্ধি হত কদাচিৎ, সে-দৈবাৎ তখন 'হঠাৎ' অর্থে গৃহীত হতে থাকে। বলতে কি, হিন্দুসভ্যতায় পুরুষকারের এই প্রাবল্য দৈবকে প্রায় নিঃশেষ করে ফেলে, ভারতসমাজ ভিখারি ও দুর্বলদের সমাজে পরিণত হয়ে যায়। তারপর পাঠান-মোগল-ব্রিটিশ ও স্বাধীনতার যুগ পেরিয়ে আজ আবার আমাদের দেশে দৈব (পণ্যজনিত সমৃদ্ধি) প্রবল হয়ে উঠেছে; সারা বিশ্বজুড়েই আজ দৈব অত্যন্ত প্রবল। পুরুষকার আবার পদদলিত। অথচ কমপক্ষে উভয়ের সমমর্যাদা এবং অধিকপক্ষে উভয়ের 'পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহার'ই দেবপ্রবাহ ও ঋষিপ্রবাহের মধ্যেকার সম্বন্ধ (সম-বন্ধন) হওয়া উচিত এবং আদিতে সেরকমই ছিল।

হ্যাঁ, আজ দৈবই প্রবল, পুরুষকার তার সেবায় নিয়োজিত অর্থাৎ ঋষিপ্রবাহ দেবপ্রবাহের সেবাদাস। তার স্বাতন্ত্র্যকে, তার 'পথপ্রদর্শক'-এর ভূমিকাকে এখনও যথোচিত মর্যাদা দিতে বাকি। আজও মানুষের সমস্ত জ্ঞানবুদ্ধি পণ্য উৎপাদনের সেবাদাসে পরিণত হয়। অঙ্ক বিজ্ঞান দর্শন সাহিত্য সবই পণ্য-উৎপাদকের কাছে চাকরি নিতে বাধ্য হয়। ফলস্বরূপ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, এই দেবপ্রবাহ 'যে বিজ্ঞান (= ঋষিপ্রবাহের একটি অংশ) যথার্থ আত্মসাধনার সহায় তাকে বিশুদ্ধ জ্ঞানের পথ থেকে ভ্রষ্ট করে জগতে মহামারী বিস্তার করেছে।'[৯] তবে এর সবচেয়ে খারাপ ফল ফলছে অন্য দিকে। সবচেয়ে মহান যে মানুষটি তাকে যদি সেবাদাসের কাজে নিয়োগ করা হয়, সবাইকে পথ দেখানোর মহান দায়িত্বের দিকটি ফাঁকা পড়ে যায়। সে দিকটি পূর্ণ করার লোক পাওয়াও যায় না। অথচ এত দিন সেটাই ছিল ঋষিপ্রবাহের সর্বোত্তম কাজ — সমাজকে পথ দেখানো, সেই কাজটি আজ দারুণভাবে ব্যাহত। আজকের গোলোকায়নী বিশ্ব অন্ধ, জানে না সে কোথায় যাবে। তার পথপ্রদর্শকের আসন শূন্য। লোকে অনুসরণ করছে দৈবকে (পণ্যজনিত সমৃদ্ধিকে), পুরুষকার পদদলিত, গোলোকায়নী সভ্যতা এগিয়ে চলেছে, সবার সামনে সিলিকন ভ্যালির ধনীরা এগিয়ে চলেছেন এবং তাদের সামনে অন্ধকার ভবিষ্যৎ। পথ দেখানোর কেউ নেই। অথচ এই সিলিকন ভ্যালির নেতৃত্বেই আজকের অন্ধ গোলোকায়নী সভ্যতা তীব্র বেগে ছুটে চলেছে! অন্ধের এই দুর্বার গতি নিঃসন্দেহে মহা বিপজ্জনক! কেননা, এই দুর্বার গতির উপরে আমরা, বিশ্বের সাধারণ মানুষেরা, সওয়ার আছি! এ-পাগল খাদে পড়ে মরতে চায় মরুক, কিন্তু এ যে আমাদের সকলকে নিয়ে খাদে পড়বে! নিজেও মরবে, আমাদেরও মারবে! তাই, অবিলম্বে এর দিশা ঠিক করে দেওয়ার উপায় বের করতে হবে। নইলে নিস্তার নাই! আর সে-দিশা ঠিক করে দেওয়ার যোগ্যতা ধরে কেবল মানুষের ঋষিপ্রবাহ। অবশ্য তার আগে তাকে তার আত্মবিচ্ছেদের ছিন্নসূত্রগুলি জুড়ে নিতে হবেই।

একালের ঋষিরা (মনচাষিরা) তাঁদের মানসফসল দিয়ে আজকের এই সমস্যা সমাধানের উপায় বের করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে দুটো মুখ্য কর্তব্য — ১) ঋষিপ্রবাহকে সমাজের পথপ্রদর্শকের দায়িত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা এবং ২) দেবপ্রবাহের ক্রীতদাসত্ব থেকে ঋষিপ্রবাহকে মুক্ত করা ও দেবপ্রবাহের পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। তবে সে কাজ করতে গেলে সবার আগে ঋষিপ্রবাহকে তার আত্মবিচ্ছেদ থেকে বাঁচানো দরকার। আর সেটাই বর্তমান সময়ের ঋষিদের (সংস্কৃতিচিন্তকদের) প্রধান কাজ।

আজকের একাকারে ঋষিপ্রবাহের বহিরঙ্গের আত্মবিচ্ছেদের ছিন্নসূত্রগুলি জোড়া দেওয়ার কাজটি একালের ইনফর্মেশনের দুনিয়া বিশ্বজুড়ে শুরু করে দিয়েছে। ঋষিপ্রবাহের আন্তরিক জোড়ের দিকের কাজটায় এখনও তেমন করে হাতই পড়েনি। কেননা তার জন্য যে-অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন, আজকের একাকারের ডাক যাঁরা দিচ্ছেন তাঁদের হাতে সেই বস্তু নেই। আদি থেকে বর্তমান পর্যন্ত ঋষিপ্রবাহের যে-ধারা, তার উৎসের দিকটা তাঁরা একেবারেই জানেন না। এইখানে ডাক পড়েছে বাংলাভাষীদের। কেননা তাঁদের হাতে রয়েছে ঋষিপ্রবাহের আদি থেকে

বর্তমান পর্যন্ত একটি সার্বিক অন্তর্দৃষ্টি। অন্য জাতিগুলিকে তাঁদের অতীত থেকে বর্তমানে আসার পুরো পথটি আবিষ্কারের ব্যাপারে গাইডের মতো সহায়তা করতে পারেন বাংলাভাষীরা। কিন্তু সে কাজ তাঁরা করবেন কেমন করে!

না, অর্জনগত যোগ্যতা থাকলেও বাংলাদেশ বা পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী-বাংলাভাষীরা এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবেন বলে মনে হয় না। কারণ তার জন্য প্রয়োজনীয় সংযোগ তাঁদের নেই। সেই সংযোগটি হল অন্য জাতির বর্তমান ঋষিপ্রবাহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাহচর্য। এই জায়গায় রয়েছেন বাংলার বাইরে থাকা বাংলাভাষীরা, বাংলাভাষী অগ্রবীজেরা। এই কাজ তাঁরা হাতে নিতে পারেন। তাতে এক দিকে যেমন বর্তমান একাকারের অনুকূলে তাঁরা মাথা উঁচু করে হাঁটতে পারবেন, তেমনই অন্য দিকে তাঁদের অস্তিত্বের নিজ নিজ হারানো অংশটির সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ঘটে যাবে, ফেলে আসা অতীতের সংস্পর্শ ঘটে যাবে। এই সম্পর্ক তাঁদের অস্তিত্বে প্রাণ সঞ্চার করবে এবং স্বস্তি দেবে বলেই মনে হয়।

গোলোকায়নী সভ্যতা মানুষের অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত সমস্ত যাত্রাপথটিকে জুড়ে নিতে চাইছে, বিভাজিত মানবসমাজকে এক করতে চাইছে, মহামানবের পুনর্গঠন করে নিতে চাইছে। সেই কাজে ঋষিপ্রবাহের হরাইজন্টাল ও ভার্টিকাল বিচ্ছিন্নতাগুলিকেও জুড়ে না নিলে সে এগোতে পারছে না। আর সেই কাজে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তার প্রয়োজন বাংলাভাষী অগ্রবীজদের। যুগের এই ডাকে তাঁরা কি নীরব থাকতে পারেন?

টীকা ও টুকিটাকি

১. মানুষের আদি ভাষায় শব্দের গঠনপদ্ধতি ছিল ক্রিয়াভিত্তিক। আজকের পৃথিবীর সব ভাষাই সেখান থেকেই জন্মেছে এবং ক্রমাধয়ে প্রতীকী স্বভাবের হয়ে গেছে। এমনকী নিজেদের এই অতীতের কথাও প্রায় সব ভাষা এবং তাদের ভাষাতাত্ত্বিকেরা ভুলে গেছেন। এর উত্তরাধিকার এখনও যতটুকু জীবন্ত অবস্থায় রয়েছে, তা রয়েছে একমাত্র বাংলাভাষায়। সংস্কৃতের এ-উত্তরাধিকার ছিল, তবে 'মৃতভাষা' বলে তার সে-উত্তরাধিকার রয়েছে 'শব' রূপে। সেই ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি উদ্ধার করে বর্তমান লেখক আমাদের প্রাচীন গ্রন্থগুলিকে যথাসাধ্য একালের মতো করে ব্যাখ্যা করে চলেছেন। এ বিষয়ে লেখকের বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী পাঠক তা থেকে বিস্তারিত তথ্য পেয়ে যাবেন।

২. দ্রষ্টব্য: *বঙ্গীয় শব্দকোষ*/হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩. দ্রষ্টব্য: *মহাভারত* / কাশীরাম দাস। কৃত্তিবাসী রামায়ণেও এই রকম ধারণার কথা আছে।

৪. 'সাহিত্যসৃষ্টি' / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৫. জিনিসটি কী, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে রবি চক্রবর্তী ও কলিম খান লিখিত গ্রন্থ 'বাংলাভাষা: প্রাচ্যের সম্পদ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে। এখানে তা অতি সংক্ষেপে সারতে হল।

৬. 'ততঃ কিম' / রবীন্দ্র রচনাবলী, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫০৯

৭. সাধক প্রফেসর অরিন্দম চক্রবর্তীর লেখা নিবন্ধ থেকে। প্রকাশক *দেশ*।

৮. কালান্তর, পৃষ্ঠা ১৮৩

৯. 'আরোগ্য' / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিউইয়র্কের 'অগ্রবীজ' পত্রিকার ২০০৭ এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত।

উত্তরপ্রজন্মের লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষা

কলিম খান রবি চক্রবর্তী

এক. ছেলেমেয়েদের লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষা বলতে এখন আমরা কী বুঝি।

'ছেলেমেয়েদের লালন করা' বলতে ঠিক কী বোঝায়, আমরা অ্যাকাডেমি-শিক্ষিত বাংলাভাষীরা আজ তা জানি না। যেহেতু 'লালন' কথাটিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করা যায় না, অ্যাকাডেমির বিচারে ওটি বাজে কথা। অভিধানে তার কোনো অর্থ নেই। সুতরাং তা কার্যকর করার প্রশ্নও নেই; রইল বাকি 'পালন' করার কথা। হ্যাঁ, আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের 'পালন' করি, তবে সে-পালন ইংরেজির 'bringing-up' বই অন্য কিছু নয়, যার সঙ্গে 'গোপালন'-এর বিশেষ ভেদ নেই — 'দামড়াটা যেন হালটানায় দক্ষ বলদ হয়ে ওঠে। সংসারের জোয়াল কাঁধে নিতে হবে তো!' বলতে গেলে, এই দাঁড়িয়েছে আমাদের মনোবাসনা।

মোট কথা, ছেলেমেয়েদের 'লালন-পালন' করা বলতে আমাদের পূর্বপুরুষেরা যা বুঝতেন, আমরা তা বুঝি না। আমরা তাঁদের 'লালন' কথাটিকে ফেলে দিয়েছি, 'পালন' কথাটিকে ফেলে দিইনি; তবে তার অর্থ বুঝি 'ছোটো-ইংরেজ'-এর মতো করে, যে কিনা 'মানুষ' হওয়ার চেয়ে 'টাকার কুমীর' হওয়াকে চিরকাল আদর্শ মনে করেছে।[১] তার আদর্শ অনুসরণ করে আমরাও ঠিক করেছি, ছেলেটা মানুষ হোক-না-হোক, বড় হয়ে যেন 'টাকা' কামাতে পারে। আমাদের রাষ্ট্র-সরকার-অ্যাকাডেমিও এখন সেটাই চায়।

ছেলেমেয়েদের 'শিক্ষা-দীক্ষা'র ক্ষেত্রেও আমাদের অবস্থা তথৈবচ। ইতিহাসের মারে আমরা 'দীক্ষা' কথাটির মানে ভুলে গেছি, ভুলে গেছেন বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিতেরাও; ধর্মের নামে শব্দটির ব্যবহার প্রায় অর্থহীনভাবে ধরে রেখেছেন কেবল ধর্মভীরু বাংলাভাষীরা। ওদিকে, ইংরেজের পূর্বপুরুষরা 'দীক্ষা'কে না চিনলেও ইয়োরোপের গুরুস্থানীয় গ্রীক পণ্ডিতেরা 'দীক্ষা'র কানীনপুত্রকে পালন করতেন 'দক্ষ' বা doxa (*dox*ology, ortho*dox*) শব্দে; যদিও তাঁদের সেই doxa আগেই অতীত ভুলে বংশপরিচয় হারিয়ে অনাথ হয়ে গিয়েছিল। তারই মধ্যে প্রোটেস্টান্ট-উত্থান ইয়োরোপের জীবন্ত অতীতের যেটুকু যা অবশিষ্ট ছিল তাকে 'আবর্জনা' বলে ফেলতে শুরু করে দেয়; আর 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন' এসে সেই আবর্জনাকে ঝেঁটিয়ে সাফ করে দেয়। মোট কথা, এরপর ইয়োরোপীয় ভাষার শব্দেরা তাদের বংশকথা-সহ সমস্ত অতীত একেবারেই ভুলে গেল। অতঃপর সেই ইয়োরোপ গায়ে-গতরে হল, হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের ওপর। আমরা যথার্থে পরাধীন হয়ে হতভম্ব হয়ে গেলাম। সেই হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠতেই আমাদের একশো বছর কেটে গেল। তারপর ধীরে ধীরে আমরা দু-চার কথা বলতে শুরু করলাম বটে, কিন্তু ঘাড়ের উপর বসে ইংরেজ বলল, 'আমাদের যা নেই তোমাদের তা থাকে কী করে?'. তাদের সেকথায় অত্যন্ত প্রভাবিত

হল আমাদের ক্রমান্বয়ে গড়ে-ওঠা অ্যাকাডেমিগুলি। সত্যিই তো, রাজা যদি তার বাপের নাম ভুলে গিয়ে থাকে, প্রজারও নিজ নিজ পিতৃনাম ভুলে যাওয়া উচিত! শব্দের অতীত রাজা-ইংরেজির থাকবে না, প্রজা-বাংলার থাকবে, এটা ভালো কথা নয়! রাজগৌরবের অংশীদার হতে গেলে রাজার মতো হওয়ার চেষ্টাই করতে হবে আমাদের! ...

সেই অ্যাকাডেমি থেকে শিক্ষালাভ করে একদিন একথা জেনে আমরা গর্ববোধ করতে শুরু করলাম যে, 'দীক্ষা' কথাটির কোনো মানে নেই, কারণ কথাটির ইংরেজি অনুবাদ করা যায় না; এ-হল ব্রাহ্মণ-গুরু-পুরোহিতদের পয়সা কামানোর বদমাইশি মাত্র। তা সত্ত্বেও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে 'দীক্ষান্ত ভাষণ' নামে এখনও যে-ব্যাপারটি চালু আছে, সেটি কী? একালের অ্যাকাডেমিক শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিকতাবাদী বুদ্ধিমানরা আমাদের শেখালেন— ওসব আসলে সেই ব্রাহ্মণ-গুরুদেরই নস্টালজিয়া। কারণ, যাঁরা এখনও সেই 'দীক্ষান্ত ভাষণ' নামক আচারটির অনুষ্ঠান করে থাকেন, তাঁরা নিজেরা জানেন না 'দীক্ষা' কথাটির মানে কী, এবং তাঁরা কী দীক্ষা কীভাবে দিয়ে থাকেন! আর কেনই-বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এখনও 'দীক্ষান্ত ভাষণ' দেওয়ার ব্যবস্থা করে থাকেন? ফলে, আমাদের যে-ছেলেমেয়েরা 'দীক্ষান্ত ভাষণ' নামক বকবকানি শোনে, তারা জানতেই পারে না, তারা কী দীক্ষা পেল, কীভাবেই বা পেল এবং তা নিয়ে তারা করবেই বা কী! এসব কারণে ছেলেমেয়েদের 'দীক্ষা'র কথা ভাববার কোনো অবকাশ আমাদের নেই। রইল বাকি 'শিক্ষা'র কথা।

হ্যাঁ, আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা নিয়ে অবশ্যই ভাবি, ভাবি ইয়োরোপের মতো করে। বুঝি, ছেলেমেয়েদের educationটা জরুরি — সে যেন 'করে খেতে পারে'। কারণ, একালের ইয়োরোপ education বলতে তাই বোঝে। ছেলেমেয়ে যেন 'মানুষ' হতে পারে — এরকম ভাবনা আমাদের পূর্বপুরুষেরা ভাবতেন, আমরাও তাঁদের সন্তান হওয়ার সুবাদে এতকাল সেরকম হয়তো-বা ভাবতাম,[২] কিন্তু আজকাল আর ওসব ভাবি না আমরা। অর্থাৎ, ছেলেমেয়েদের 'লালন-পালন'-এর ক্ষেত্রে আমাদের যেরূপ আচরণ, তাদের 'শিক্ষা-দীক্ষা'র ক্ষেত্রেও আমাদের সেরূপ আচরণ। 'লালন'-এর মতো 'দীক্ষা'কেও আমরা ফেলে দিয়েছি, আর 'পালন'-এর মতো 'শিক্ষা'কে রেখেছি, তার মানেটাকে তলানিতে ঠেকিয়ে দিয়ে। অর্থাৎ, 'লালন-পালন'-এর ক্ষেত্রে আমরা সাইকেলের সামনের চাকাটা খুলে ফেলে দিয়েছি; আর 'শিক্ষা-দীক্ষা'র ক্ষেত্রে আমরা খুলে ফেলে দিয়েছি তার পেছনের চাকাটি, এবং উভয় ক্ষেত্রেই যে-চাকাটি এখনও হাতে রয়েছে, তার হাওয়া বেরিয়ে গেছে! অতএব, গাড়িটির চলার প্রশ্নই নেই, তাতে সওয়ার হওয়ার তো কথাই নেই! আমাদের 'লালন-পালন' ও 'শিক্ষা-দীক্ষা' এখন দুটি হাওয়াহীন-চাকা নিয়ে কিশোরদের গাড়ি-গাড়ি খেলামাত্র!

তার মানে, যে দু-ধরনের পরিপূরক ক্রিয়াগুলির যুগপৎ প্রয়োগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা উত্তরপ্রজন্মের 'লালন-পালন' ও 'শিক্ষা-দীক্ষা'র ব্যবস্থা করতেন, তার এক ধরনের ক্রিয়াগুলিকে আমরা পরিত্যাগ করেছি এবং অপর ধরনের ক্রিয়াদের কাটছাঁট করে সীমিত করে পাশ্চাত্যের মতো করে নিয়েছি। আর সেকথাটা আমাদের অ্যাকাডেমি-শিক্ষিত

বাংলাভাষীদের ভাষায় শব্দের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তার ছায়া ফেলেছে। সেজন্যেই আমরা 'লালন' কী তা বুঝি না, 'পালন' আংশিক বুঝি; আংশিক বুঝি 'শিক্ষা'কেও এবং 'দীক্ষা'কে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না।

দুই. লালন ও দীক্ষার অর্থ ভুলে গেলাম কেন? অভ্যাসবশে কথাদুটি তো এখনও বলি!

আসলে 'লালন-পালন', 'শিক্ষা-দীক্ষা' এই দু'জোড়া 'ক্রিয়াকলাপ' ও তৎপ্রকাশক শব্দমাত্রই নয়, এরকম অজস্র শব্দ (ও তন্নিহিত পরস্পরের পরিপূরক ক্রিয়াকলাপ) রয়েছে আমাদের ভাষায় (সমাজে)। যেমন আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ, আবেদন-নিবেদন, অর্জন-উপার্জন, উৎপীড়ন-নিপীড়ন, উৎকট-বিকট, আদেশ-নির্দেশ, আয়-উপায়, শাপ-অভিশাপ, তাপ-উত্তাপ, উন্নতি-উন্নয়ন, আপদ-বিপদ, মুগ্ধ-বিমুগ্ধ ... যাদের এখন মাত্র একটা করে মানে — আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ = invitation; আবেদন-নিবেদন = submission; অর্জন-উপার্জন = income; ... মুগ্ধ-বিমুগ্ধ = charmed। সেই নিয়মেই লালন-পালনেরও এখন একটাই মানে — bringing up, এবং শিক্ষা-দীক্ষার education। অথচ একশো বছর আগেও, এই সব শব্দজোড়ের প্রত্যেকের দুটো করে সুনির্দিষ্ট ও ব্যাপক অর্থ ছিল।[৩] আসলে এরা তো দুটো সম্পূর্ণ পৃথক শব্দ, দুটো সম্পূর্ণ পৃথক কিন্তু পরিপূরক ধারণা; সাইকেলের চাকা দুটোর মতো, একটিকে বাদ দিলে অন্যটি নিরর্থক হয়ে যায়। তাসত্ত্বেও একালে তাদের একটি করে মানে ফেলে দেওয়া হয়েছে এবং অপর শব্দের মানেটিকে সঙ্কুচিত করে দেওয়া হয়েছে। তার ফলে আমাদের পর্বতোপম 'ধারণার জগৎ' (conceptual world) যেমন উইঢিপিতে পরিণত হয়েছে, তেমনি তার ধারক ভাষার-শব্দসংখ্যাও গেছে কমে; যেটুকু আছে, তার অর্থধারণক্ষমতাকে তলানিতে ঠেকিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তা প্রায় নিরর্থক হয়ে গিয়ে আমাদের মনোভাব বহন করবার অযোগ্য হয়ে মনের ঘাড়ে বোঝার মতো চেপে রয়েছে।[৪]

এর ফল হয়েছে সাঙ্ঘাতিক। ভাষার শব্দেরা তো ভাষা-ব্যবহারকারীর মনের হাত-হাতিয়ার বা মেন্টাল ইন্সট্রুমেন্ট, মনোভাবের বাহন। সেই হাত-হাতিয়ার দিয়ে সে তার জগৎ-সম্পর্কিত ধারণাকে ধরে রাখে, বহন করে ও প্রয়োজনে নাড়াচাড়া করে। সেই শব্দসংখ্যা কমে যাওয়ায় ও তার ধারণক্ষমতা কমিয়ে দেওয়ায়, আমাদের মানসিক হাতিয়ারের সংখ্যা গেছে কমে; মনের হাতটাই 'নুলো-হাত' হয়ে গেছে এবং তার ফলে আমাদের মনটা কার্যত ঠুঁটো-জগন্নাথ হয়ে গেছে। সেকারণে আমাদের মনের সার্বিক ধারণক্ষমতা অত্যন্ত কমে গেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করার মতো বিপুল শক্তিসম্পন্ন যে মনটি প্রকৃতি আমাদের দিয়েছিল, সেই মনোলোকটিই ছোট হয়ে গিয়ে লিলিপুট-মনোলোকে পরিণত হয়েছে। ফলত আমাদের চৈতন্যের জগৎটাই (conceptual world) ছোট হয়ে গেছে; আর এর অনিবার্য ফল ফলেছে আমাদের সমগ্র জাতির উপর। আমাদের মনের চেহারা গৌরীশঙ্কর পাহাড় থেকে উইয়ের ঢিপি হয়ে গেছে। আমরা বাংলাভাষীরা ছোট-চৈতন্যজগতের অধিকারী মানুষ (owner of a small conceptual world) হয়ে প্রকৃতপক্ষে ছোট মাপের মানুষ হয়ে গেছি! লম্বায় দশ

হাত চওড়ায় পাঁচ হাত মানুষকে বড়মানুষ বলে না, বড়মানুষ মানে বড়-চৈতন্যজগতের অধিকারী মানুষ! তেমন মানুষ আমরা এখন আর নই। আমাদের ভাষাকে নিতান্ত খর্ব করে দিয়ে আমাদের অ্যাকাডেমিগুলি নিজেদের ছোট করেছে, আমাদেরকেও ছোটমানুষে পরিণত করেছে। তাদের শিক্ষার প্রভাবে আমরা আমাদের মনোলোকের ধারণক্ষমতা ছোট করে দিয়ে ছোট হয়ে গেছি। গেছিই যে, তার অজস্র প্রমাণ চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। বহু বাঙালি বুদ্ধিজীবী সেকারণেই আজকাল নিজেদের 'মধ্যমেধা'র ধারক বলে গাল পাড়তে শুরু করেছেন।[৫] সাধারণ বাংলাভাষীর কথা আর নাই বা তুললাম।

ভাবছেন বুঝি, এভাবে ছোট হবো কেন! তার চেয়ে বরং অভিধানগুলি ঘেঁটে তার থেকে 'লালন-পালন', 'শিক্ষা-দীক্ষা' প্রভৃতি কথার মানে জেনে নেব! এসব কথার ভিতরে আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে সকল ধারণা ধরে রেখেছিলেন, তাদের জেনে নেব! তা হলে তো আমাদের চৈতন্যের জগৎ ছোট থাকবে না। কিন্তু হা-হতোস্মি! হাতের কাছে যে সংসদ বাংলা অভিধান রয়েছে সেটি খুলে ফেলুন। দেখবেন, লালন-পালন, শিক্ষা-দীক্ষা বিষয়ে তাঁরা কার্যত একটি করেই মানে দিয়ে গেছেন, যা আপনিও জানেন। অর্থাৎ, এ-ব্যাপারে ওই সব গ্রন্থের রচয়িতাদের জ্ঞানবুদ্ধি আপনার চেয়ে একটুও বেশি নয়; তাঁদের শরণাপন্ন হওয়া অতএব নিরর্থক। উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত 'পরমপিতা' সেজে বসে থাকা ওই পদাধিকারীরা আপনাকে আপনার এই দুরবস্থা থেকে উদ্ধার করতে অক্ষম।

আসলে, ইতিহাসের মার পড়েছে বিশ্বের সকল জাতির উপর; সকলেই অতীত ভুলেছে, কেউ কম কেউ বেশি। আমাদের বাংলাভাষীদের সৌভাগ্য এই যে, আমাদের ভাষা অতীত ভুলেছে সবচেয়ে কম; আপন শক্তিতেই ইতিহাসের মারকে সে প্রায় অতিক্রম করেই ফেলেছিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, তাসত্ত্বেও সে বিজয়ী হতে পারেনি; বরং কালক্রমে তাকে পুনরায় পরাভূতদের দলেই নাম লেখাতে হয়েছে। ইয়োরোপীয় ভাষাগুলি নিজ-শক্তিতে ইতিহাসকে অতিক্রম করতে পারেনি, তাদের অ্যাকাডেমিগুলির তাই কিছু করার ছিল না। আমাদের অ্যাকাডেমিগুলির ছিল। এমনকী রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পর আমাদের ভাষার বিজয় ঘোষণার সম্ভাবনা আরও বেড়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এতদিন তা করা যায়নি। বঙ্গসমাজে ও বঙ্গভাষায় রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম-মীরমোশর্‌রফদের গৌরবজনক ভূমিকা[৬] এবং পাশাপাশি আমাদের অ্যাকাডেমিগুলির অধঃপতন সেই বিজয়ঘোষণার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তথাপি সে বাধাকেও সরিয়ে ফেলা যেত, যদি মানুষের ভাষার প্রাণবিন্দুটি কী, ভাষার কোন গভীরে তা আজও 'বর্ত্ত-মান', এবং তার সজীব উত্তরাধিকারটি কীভাবে বাংলাভাষা আজও ধারণ-বহন করে নিয়ে চলেছে, তা ইতোমধ্যেই আবিষ্কৃত হয়ে যেত। বলতে গেলে, রবীন্দ্রনাথ ও হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তা আবিষ্কৃত হতে হতে হয়নি। রত্নভাণ্ডারের দরজায় পৌঁছে গিয়েছিলেন তাঁরা, দরজার তালাটুকু খুলতেই যা বাকি ছিল; চাবিটা হাতের কাছে পাওয়া যাচ্ছিল না। সুখের কথা হল, 'ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি'[৭] নামে আজ তা আমাদের হস্তগত; এবং রত্নভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত। সুতরাং বাংলাভাষার বিজয়

ঘোষণা করতে আজ আর কোনো অসুবিধা নেই। ... এই বিজয়ঘোষণা এতদিন করা যায়নি বলে ইতোমধ্যে আমাদের বহু ক্ষতি হয়ে গেছে। সেই অজস্র ক্ষতির একটি হল, মানবপ্রজাতির প্রবাহ রক্ষার মূল যে-কাজ — উত্তরপ্রজন্মের লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষা — সে-বিষয়ে প্রকৃতি আমাদের কীরূপ বিদ্যাবুদ্ধি দিয়েছিল, তা আমরা ভুলে গেছি। মানবসভ্যতার মহাভাণ্ডারের অধিকারী হয়েও সে-ভাণ্ডারকে পোড়োবাড়ি হিসেবে ফেলে রেখেছি এবং হাত পেতেছি এমন অভাবীর কাছে, যে নিজের অভাব পূর্ণ করতে আগ্রাসী-সাম্রাজ্যবাদী হয়ে সারা দুনিয়া হাতড়ে বেড়ায়। ... কিন্তু আমরা তো সত্যিই অসহায় নই। আজ আমরা জানতে পারছি কোথায় আছে ভাষার প্রাণ। উত্তরপ্রজন্মের লালন-পালন বিষয়ে প্রকৃতি-প্রদত্ত বিদ্যাবুদ্ধির খবর আমরা এখন আমাদের ভাষার ভিতরেই পেয়ে যেতে পারি। ... এখন তা হলে আমাদের ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির সাহায্যে 'লালন-পালন' ও 'শিক্ষা-দীক্ষা' শব্দজোড় দুটির ভেতরে প্রবেশ করা যাক, দেখা হোক কী ছিল 'লালন' ও 'দীক্ষা'র মানে।

তিন. বাংলাভাষীর সনাতন সংস্কৃতি লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষা বলতে কী বুঝত।

লালায়িত এবং পালায়িত বা পলায়িত শব্দ দুটিকে এখনও আমরা খানিকটা চিনতে পারি। লালায়িত ব্যক্তি কাঙ্ক্ষিতের দিকে যায়, তাই সে বহির্মুখী। বিপরীতে পলায়িত নিজের ঘরে ফিরে যায়, সে অন্তর্মুখী। ললায়ন ও পলায়ন তাই পরস্পরবিরোধী শব্দ। লল্ ও পল্ এই দুটি ক্রিয়ামূল থেকে শব্দদুটির সৃষ্টি। এই লল্ থেকে লালন, ও পল্ থেকে পালন কথা দুটি সৃজিত হয়েছে।[৪] লল্ থেকে লাল্, এবং পল্ থেকে পাল্ শব্দ জন্মেছে। যাকে লালন করা হয় তাকে লাল, এবং যাকে পালন করা হয় তাকে পাল বলে। ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধিতে 'যার দ্বারা লাল্-কে (লালিতের কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে লয়েচ্ছাকে বা আত্মপ্রসারণ ইচ্ছাকে) অন্ (অনট্ = সচল /on) করে রাখা হয়', তাকে 'লালন' বলে; যেমন 'চাল্-কে অন্' করে রাখলে 'চালন' ('পরিচালন') হয়, তেমনি। তার মানে, কাউকে লালন করার অর্থ হল তাকে তার কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের দিকে যাওয়ার ব্যাপারে লাই দিতে থাকা। সেভাবে লালন করা বা 'আশকারা'[৮] দেওয়া হয় যাকে, তাকে লাল বলে। বাংলাভাষায় এই (লাল্ + অ =) লাল কথাটির প্রচলন রয়েছে প্রিয়লাল, নন্দলাল প্রভৃতি নামশব্দে। 'প্রিয় সন্তান' বোঝাতে গ্রামবাংলার কোথাও কোথাও এখনও 'লাল' ও 'দুলাল' শব্দ দুটির প্রচলন আছে। 'রাজার প্রিয় পুত্র' বোঝাতে রবীন্দ্রনাথও 'রাজার দুলাল' শব্দটি তাঁর কবিতায় প্রয়োগ করেছেন। প্রথম বাংলা উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর কথা অ্যাকাডেমি-শিক্ষিত বাঙালিরা জানেন। মধ্যযুগে, যে জমিকে লালন করতে হয়, চাষির সন্তানতুল্য প্রিয় সেই চাষের জমিকে বলা হত 'লাল ভূমি' এবং পতিত জমিকে বলা হত 'খিল ভূমি' ('খিল ভূমি লিখে লাল')। হিন্দিতে শব্দটি প্রচলিত রয়েছে 'মেরে লাল', 'ধরতিকে লাল' প্রভৃতি শব্দবন্ধে।

অপরদিকে 'পালন' শব্দের অর্থ হল, 'যার দ্বারা পাল্‌কে (পালিতের কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে লয়েচ্ছাকে বা আত্মরক্ষার ইচ্ছাকে) অন্ করে রাখা হয়'। কার্যত 'পল' বলতে সেই সমস্ত

বস্তুকেই বোঝানো হত, যাদের দ্বারা মানবশরীরের রক্ষণ বা পালন সাধিত হয়; যথা পোলাও, মাংস, টাকাপয়সা, সোনাদানা প্রভৃতি। যার দ্বারা উচ্চমার্গের পালন হয়, তাকে তাই পুল বলে। সেই উচ্চতায় কেউ পালিত হলে তার পুলক জাগে, সে 'পেলব' হয়। এইরকম পুলকিত পেলব সন্তানকে বা পুলের আধারকে গ্রামবাংলা আজও তাই 'পোলা' বলে থাকে। মনে রাখা দরকার, ইংরেজি ভাষায় এক দিকে যেমন এই পুল শব্দের পদচিহ্ন রয়ে গেছে তাদের pull শব্দে এবং পল, পাল শব্দের উত্তরাধিকারের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে তাদের pal যুক্ত প্রায় সমস্ত ইংরেজি শব্দে (যথা pal. palace ... ইত্যাদি); তেমনি 'লালন' শব্দের ধ্বংসাবশেষের চিহ্নও রয়ে গেছে তাদের loll, lull ও lullaby শব্দে।

এই যে লালন ও পালন, এর মূল ক্রিয়ার ব্যাপারটি প্রাচীন ভাষায় বিশদে বলে গেছেন বেদরচয়িতাগণ, এবং আধুনিক ভাষায় বলে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। বেদের মতে একজোড়া পরস্পরের পরিপূরক দেবতা রয়েছেন প্রতিটি জীবের ভেতরে, তাঁদের নাম মিত্র ও বরুণ বা মিত্রাবরুণ। এঁরা হলেন, 'প্রসারিত হবো, নাকি যেমন আছি তেমন থাকব' — এই দ্বি-মত। অর্থাৎ এই মিত্রদেবতা জীবকে আত্মপ্রসারণে প্ররোচিত করে, আর বরুণদেবতা জীবকে আত্মসংবরণের পরামর্শ দেয়। বিষয়টি নিজের মতো করে বুঝে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — *একটি কুকুরছানা একটি পোকার পেছন পেছন যায়, শোঁকে, হঠাৎ দু-পা পিছোয়, আবার এগোয়। প্রতিটি জীবের ভিতরে এই দুই সত্তা; একজন বলছে 'রোসো রোসো', অপরজন বলছে 'দেখাই যাক না'।* এই 'রোসো-রোসো'র দেবতা বরুণ, আর 'দেখাই যাক না'-র দেবতা মিত্র। মানবশিশুর ভেতরেও এই দুই দেবতা বিদ্যমান। মানুষের সন্তানকে 'লালন' করার অর্থ তার মিত্রদেবতাকে সক্রিয় থাকতে দেওয়া; সন্তানের আত্মপ্রসারণের ইচ্ছাকে 'প্রশ্রয়' (= প্রকৃষ্ট আশ্রয়) দেওয়া, 'আহ্লাদ' বা 'আশকারা' দেওয়া এবং বাধা না দেওয়া; এককথায় 'লাই দেওয়া'। এবং 'পালন' করার অর্থ তার বরুণদেবতাকে সক্রিয় হতে দেওয়া, প্রয়োজনে কীভাবে আত্মসংবরণ করতে হয় সন্তানকে তার কৌশল শেখানো। তার মানে সন্তানকে 'লালন' করতে হলে তার আত্মপরিধির বাইরে বেরোনোর বা আত্মবিকাশের ইচ্ছাকে বাড়তে দেওয়া দরকার, বাড়তে সহায়তা করা দরকার; তাকে 'বাঁড়াবাড়ি' বলে আটকে দেওয়া ঠিক নয়। আটকে দিলে, তার আবিষ্কারক মন আহত হয়, তার সৃজনশীলতা-গুণে বা শিবগুণে (পুরুষগুণে বা গতিগুণে) আঘাত পড়ে। আর, 'পালন' করতে হলে তাকে স্থিতাবস্থা রক্ষা করার ও আত্মসংযমের (আত্মপ্রসারণে ব্রেক কষবার) কৌশল শেখানো জরুরি; তবে সে কৌশল কোথায় কখন কতখানি সে প্রয়োগ করবে, তার সিদ্ধান্ত তাকেই নিতে দেওয়া দরকার, সেখানে মাতব্বরি করতে নেই; অন্যথায় তার স্থিতাবস্থারক্ষক মন আহত হয় অর্থাৎ তার ধারকবাহক-গুণে বা দক্ষগুণে (প্রকৃতিগুণে বা স্থিতিগুণে) আঘাত পড়ে। একবাক্যে বললে, লালন করার অর্থ ছেলেমেয়েদের সৃজনশীল-শিবগুণকে বাড়তে সহায়তা করা এবং পালন করার অর্থ তাদের ধারকবাহক-প্রকৃতিগুণকে পরিশীলিত হতে সহায়তা করা। সংক্ষেপে এই হল 'লালন-পালন'-এর ভেতরের কথা।

এবার '**শিক্ষা-দীক্ষা**'য় কী ছিল, তা দেখা যাক। সেকালে মানুষের সমাজে যাঁরা নতুন কিছু আবিষ্কার বা সৃষ্টি করতেন, আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা তাঁদের জ্ঞানের 'অগ্নিশিখা' (= শি) 'বহনকারী' (= ব) 'শিব' বলে চিহ্নিত করেছিলেন। সেই শিব বা আবিষ্কারক-স্রষ্টারা নিজ নিজ নিষ্ঠায় এই মহাবিশ্বে বিরাজিত অব্যক্ত মহাজ্ঞানের কণা কণা আবিষ্কার করে তাকে ব্যক্তজ্ঞানে বদলে ফেলতেন (আজও আবিষ্কারকেরা সেটাই করেন) এবং তা দিয়ে মানুষের সমাজের বেঁচে থাকা ও এগিয়ে চলা নিশ্চিত করতেন। তাঁর সেই শিখা থেকে অগ্নি নিয়ে স্ব স্ব কর্মযজ্ঞে আগুন জ্বালানোর কৌশল শিখে নিতেন বাকি মানুষেরা। এ হল আবিষ্কৃত জ্ঞানকে পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে নিয়মিত কাজে পরিণত করা ও সেই কাজটিতে দক্ষ হয়ে ওঠা। এই 'শি'-কে 'ক্ষ্'-এ বা কর্মে পুনরাবৃত্ত (য) করার বিদ্যাকেই বলা হত 'শিক্ষা'।[৯] এ হল ইতিপূর্বে আবিষ্কৃত জ্ঞান শিখে নেওয়া বা জ্বলা আগুন থেকে আগুন নিয়ে এসে নিজের উনুনে আগুন জ্বালানো; ইতোমধ্যে আবিষ্কৃত ও প্রচলিত জ্ঞানের প্রয়োগকৌশল শিখে নিয়ে তার পুনরাবৃত্তি করে চলা। তাই, সেকালের ভারতে 'শিক্ষা'র এলাকা ছিল মূলত সমাজের অর্জিত জ্ঞান রপ্ত করার (বেদপাঠের) কৌশল শেখা ও কর্মযজ্ঞে যুক্ত হওয়ার আগের যোগ্য বিদ্যাবুদ্ধি অর্জন। একালের ভাষায় যাকে আমরা মনুষ্যত্ব অর্জনের পাঠকৌশল শেখা ও কর্মযজ্ঞ-চালনার বিদ্যা শেখা বা টেকনিক্যাল ট্রেনিং বলতে পারি। মোট কথা, শিক্ষা দিয়ে উত্তরসূরির সামনে মানুষ হওয়ার ও বিশেষ কাজে দক্ষ হওয়ার রাস্তা খুলে দেওয়া হত।

কিন্তু নিজে দক্ষ হয়ে উঠলেই তো হল না, লব্ধ শিক্ষাকে কাজে রূপায়িত করতে হবে, পরবর্তী প্রজন্মকে দক্ষরূপে গড়ে তুলতে হবে। সেসব করবে কে? উত্তর হল, যে যথার্থে দক্ষ হয়ে উঠেছে, সে-ই করবে। তার জন্য তাকে কাজে নামার ও অন্যদের দক্ষ বানানোর অনুমতি ও অধিকার দিতে হবে; আর সেটা দেওয়াই ছিল 'দীক্ষা' দেওয়া। অর্থাৎ সমাজের অর্জিত জ্ঞান হস্তান্তর করে নেওয়ার কৌশল শেখা ও তার মাধ্যমে সে জ্ঞান হস্তান্তরকে বলা হত 'শিক্ষা' এবং তা কাজে পরিণত করার অধিকার-দানকে বলা হত 'দীক্ষা'। সেকালে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিয়ে অবশেষে দীক্ষা ('কার্য্যাধিকার', একালের ভাষায় 'নিয়োগপত্র') দেওয়া হত এবং 'দীক্ষান্ত ভাষণ' দিয়ে বলে দেওয়া হত — এবার তাদের কী করতে হবে, সমাজ তাদের কাছে কী কী প্রত্যাশা করে। একালে এখনও উত্তরাধিকারের ধ্বংসাবশেষরূপে দীক্ষান্ত ভাষণ আছে, কিন্তু কোনো 'কার্য্যাধিকার' নেই। সেকারণে ব্যাপারটি অর্থহীন আচারমাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মোট কথা, লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষা বলতে চার রকমের ক্রিয়া-সমাবেশকে বোঝায়। ১) লালন = সন্তানসন্ততিরা যতদূর আশা করতে (মন দিয়ে স্পর্শ করতে) সাহস পায়, ততদূর 'আশ্'-করার জন্য 'আশকারা' দেওয়া বা লাই দেওয়া এবং তার জন্য যা যা করা দরকার, সেগুলি করা; ২) পালন = তাদের শরীর রক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণ যোগান দেওয়া, কোনোভাবে তাদের শরীরে বা মনে যাতে কোনো আঘাত না লাগে, তারা যেন সবসময় সুরক্ষিত থাকে তার দিকে সদাসতর্ক নজর রাখা, এবং আত্মরক্ষার এই কৌশলগুলি শেখানোর জন্য করণীয় কাজগুলি করা; ৩) শিক্ষা = প্রচলিত জ্ঞানভাণ্ডারে ঢোকার সমস্ত রাস্তা

তাদের সামনে খুলে রাখার জন্য যা যা করণীয়, তা সব করা; ৪) দীক্ষা = শিক্ষালাভের পর যে-সন্তানসন্ততি সামাজিক কর্মযজ্ঞ চালানোর যোগ্য হয়ে উঠেছে, তাদের কার্যাধিকার দেওয়ার জন্য যা যা করণীয়, সে সব করা।

ছেলেমেয়েদের বড় করার ব্যাপারে এই ছিল আমাদের ঐতিহ্য।

চার. একালের আধুনিকতাবাদী বাবা-মায়ের সন্তানপালন ও শিক্ষাদান প্রক্রিয়া

সন্তানসন্ততির লালন-পালন ও তাদের শিক্ষা-দীক্ষার এসব কথা এখন আমরা, অ্যাকাডেমি-শিক্ষিত মানুষেরা, ভুলে গেছি। আমরা এখন সন্তানসন্ততিদের কেবলমাত্র পালন করি এবং তাও করি অত্যন্ত কট্টরভাবে তাদের সংযত করে। অজস্র বিধি ও নিষেধের (এটা করোনি কেন? ওটা করেছ কেন?) প্রাকারে তাদের আটকে রাখি। অপরাধীদের সঙ্গে দারোগা যে-ভাষায় কথা বলে ('... করেছ কেন?'), ঠিক সেই ভাষায় তাদের সঙ্গে সারাক্ষণ কথা বলি আমরা, কথা বলে আমাদের অ্যাকাডেমি, সরকার, রাষ্ট্র। আমাদের এই ধরনের অপরাধমূলক অসভ্যতার কারণে, বলতে গেলে শৈশব থেকেই আমাদের সন্তানসন্ততিরা নিজেদের 'অসভ্য' 'অপরাধী' ভাবতে বাধ্য হয়, এবং সেভাবেই বড় হতে থাকে। ছেলেমেয়েদের যাঁরা আশকারা দেন, লাই দেন, প্রশ্রয় দেন, আমরা তাঁদের মুণ্ডপাত করি। আত্মপ্রসারণ নয়, আমাদের সবটাই আত্মরক্ষা! ছেলেমেয়েদের আমরা আত্মসংবরণের কৌশল শেখাই না। 'এটা করেছ কেন?' 'ওটা করেছ কেন?' ইত্যাদি ভর্ৎসনা দিয়ে তাদের আত্মসঙ্কোচন করতে বাধ্য করি আমরা। আমরাই আগ বাড়িয়ে তাদের ইচ্ছার গাড়িটায় ব্রেক কষে দিয়ে তাদের বিশেষ দিকে ঠেলে দিই। তারা একঘাতী বাণের[১০] মতো বড় হতে থাকে। জীবনের একটা উদ্দেশ্যই তাদের উপর চাপানো হয়ে যায়, তা হল — টাকা রোজগার!

কার্যত, ছেলেমেয়েদের আমরা 'টাকা রোজগারের যন্ত্র' বানানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছি। সেই উদ্দেশ্যে তাদেরকে আমরা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় নামক 'যন্ত্র বানানোর কারখানা'তে দিয়ে আসি, চাষিরা যেভাবে বাবলা কাঠ দিয়ে আসে কামারশালায় লাঙল বানিয়ে দেবার জন্য। রবীন্দ্রনাথ তা বুঝেছিলেন বলেই একালের শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে 'বিদ্যা-কারখানা' নামে চিহ্নিত করেছিলেন। এই কারখানাগুলি আমাদের সন্তানসন্ততিদের মস্তিষ্ককে কমপিউটারের মস্তিষ্কের মতো খাপে খাপে বিন্যস্ত (programmed) করে দেয়, তাদের চিন্তাভাবনার পদ্ধতি ও আচরণকে সুনির্দিষ্ট (predictable) করে দেয় এবং, সবাই জানেন, এরকম predictable বা সুনির্দিষ্ট আচরণকারী-সত্তা মাত্রকেই যন্ত্র বলে। ছেলেমেয়েদের এভাবে যন্ত্রে পরিণত করে ফেলতে পারলে, তাদেরকে অনুগত রাখতে ছোট মনের অভিভাবক ও শাসক-কোম্পানি-প্রতিষ্ঠান-রাষ্ট্রের পক্ষে আর কোনো অসুবিধা থাকে না। — এভাবে, যে-মানবশিশুকে অপরিমেয়-অসীম-অনন্তের অনির্দিষ্ট (unpredictable) এলাকায় বিচরণ করবার শক্তি দিয়ে পরমাপ্রকৃতি জন্ম দিয়েছিলেন, আমরা একালের ছোট-মানুষেরা তাকে পরিমিত-সীমান্তের সুনির্দিষ্ট ঘেরাটোপে ঢুকিয়ে দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করি।

যাঁরা অ্যাকাডেমি-শিক্ষিত নন, স্বভাব-শিক্ষিত বা স্বশিক্ষিত, তাঁরা এখনও আমাদের বহুকাল-ক্রমাগত সনাতন সংস্কৃতি অনুসরণ করে থাকেন। এই সংস্কৃতি এখনও 'লালন-পালন' ও 'শিক্ষা-দীক্ষা'কে যথাসম্ভব মনে রেখেছে। তারই কারণে সকল বাংলাভাষী আজও তাঁদের কথাবার্তায় শব্দ দুটিকে যথারীতি ব্যবহার করে থাকেন। এমনকি অ্যাকাডেমি-শিক্ষিত আমরাও, আমাদের নিজ নিজ বাবা-মাকে আমাদের ছেলেমেয়েদের অধিক লালন করার জন্য অভিযুক্ত করি, 'মা, তোমরা কিন্তু ছেলেটাকে / মেয়েটাকে বড্ড লাই (= লালন) দিচ্ছ। তোমাদের আশকারা পেয়ে পেয়ে ও মাথায় উঠেছে!' ... ইত্যাদি। আর, সেই সনাতন সংস্কৃতি বাংলার আকাশে-বাতাসে আজও বহমান বলেই, গণ্ডমূর্খ বাংলাভাষীও তাঁর অব্যক্ত (tacit) জ্ঞানে টের পেয়ে যান যে, স্কুল-কলেজে পড়িয়ে মানুষের সন্তানকে 'যন্ত্র' বানানো হচ্ছে। গ্রামবাংলার মুখে তাই এখনও শোনা যায়, 'ঘোষেদের ওই ছেলেটা? ওটা তো একটা যন্ত্র!' যাঁরা এ ধরনের কথা বলেন, 'যন্ত্র' শব্দটি যে যম্ (সংযমন) থেকে জন্মেছে, এই 'যন্ত্র' অন্যকে সংযত করতে পারে, যন্ত্রণা পেতে পারে, দিতেও পারে — এতসব তাঁদের জানার কথা নয়। তথাপি বাংলার বাতাসের গুণে কথাটির যথাযথ ব্যবহার তাঁরা অনায়াসে করে থাকেন।

রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও লালন-পালন ব্যাপারটির প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতেন। বুঝতেন বলেই স্কুলবিমুখ ছেলেকে (রবীন্দ্রনাথকে) ইচ্ছে মতো বাড়তে দিয়েছেন, সেদিকেই এগিয়ে যাওয়ার জন্য লালন করেছেন, লাই দিয়েছেন, অ্যাকাডেমির জেলখানায় তাকে বন্দী করার চেষ্টা করেননি। মহর্ষি পিতার আশকারায় বাংলার সনাতন সংস্কৃতি তথা ভারতসমাজের মনের মাটি থেকে রস সংগ্রহ করে বড়ো হয়ে উঠেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পিতার ওইরূপ সন্তান লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষার নীতিকেই তিনি আরও ব্যাপক আকারে রূপ দিতে চেয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে। তার কী হল, সে-প্রসঙ্গে একটু পরেই আমরা আসছি।

আর আমরা? আপন শৈশব কৈশোর যৌবনে রবীন্দ্রনাথ যা করেছিলেন, একালে কোনো বাংলাভাষীর সন্তান যদি সেরকম আচরণ করে, আমরা অভিভাবকেরা তাকে আস্ত রাখি না। সমস্ত সুবুদ্ধি-কুবুদ্ধি প্রয়োগ করে তার ইচ্ছার গতিমুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করি, মারধর করি, আরও কত কী-যে করি ... সবই করি রবীন্দ্রকীর্তন করতে করতে। রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে গাইতেই আমরা তাঁর শিশুলালন নীতিকে ধ্বংস করে ধূলিসাৎ করি।

আজ আমরা জেনেছি, নিজেদের ভাষার শব্দের অর্থ ও তাতে ধরে রাখা ধারণাকে জলাঞ্জলি দিয়ে তাকে ইংরেজির পরিবর্ত শব্দ রূপে চালু করে এসব দুষ্কর্ম করা হয়েছে। 'লালন'-এর মতো যে-যে অধর্ষিত শব্দের গর্ভে ইংরেজি অর্থ নেই, অ্যাকাডেমিগুলি তাদের অপাঙ্‌ক্তেয় করে দূরে সরিয়ে রেখেছে। ... ইতিহাসের মার আমাদের ভাগ্যে ছিল। কিন্তু এর ফল যে কত মারাত্মক হয়েছে, আমাদের উত্তরসূরিদের জীবন কতখানি হীন ও গ্লানিকর হয়েছে, ভাবা যায় না! একবার সেদিকটা দেখে নিয়ে, কীভাবে আমাদের ছেলেমেয়েদের লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষার যথার্থ ব্যবস্থা আজকের দিনে আমরা করতে পারি, সেই আলোচনায় চলে যাব।

পাঁচ. লালনহীন পালনের ও দীক্ষাহীন শিক্ষার ফল

অমৃত বলে বিশ্বাস করে সন্তানকে যা পান করতে দিই, পরে যদি দেখি সেটি আসলে বিষ, তখন দুঃখের সীমা থাকে না। এ হল দুঃখের বাড়া; কী ভেবেছিলাম, আর কী পেলাম! নিজের মূর্খতার জন্য তখন নিজেকে খুন করলেও শান্তি মেলে না।

আমাদের বর্তমান অ্যাকাডেমিক শিক্ষাব্যবস্থা হল সেই রকম বিষ, যাকে আমরা অমৃত বলে গভীরভাবে বিশ্বাস করে নিজেরা খাই, ছেলেমেয়েদের খাওয়াই। ফল হয় এই যে, এই শিক্ষাব্যবস্থায় লেখাপড়া শিখে আমাদের ছেলেমেয়েরা আত্মনির্ভর 'মানুষ' হয় না। হয় না যে, সেকথা রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন তাঁর 'শিক্ষা' গ্রন্থে; আর আমরা চোখের ওপর তা দেখছি। দেখছি, লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরোয়, তারপর এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে গিয়ে কাতর নিবেদন করে; কিংবা খবরের কাগজ দেখে দাসমালিকদের (একালে যাদের সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মালিক বা পুঁজিপতি বলা হয়, তাদের) কাছে গিয়ে আত্মনিবেদন করে, 'প্লিজ, আমাদের তোমার সেবাদাস করে নাও! না না, আগের যুগের ক্রীতদাস কেনার মতো একসঙ্গে দাম দিতে হবে না; মাসে মাসে দিয়ো; ইনস্টলমেন্টে আমাদের কিনে নাও। দেখো, আগের যুগের ক্রীতদাসদের জীবনের দায়দায়িত্ব দাসক্রেতাদের নিতে হত, আমাদের ক্ষেত্রে তাও তোমাকে নিতে হবে না। আমাদের জীবনের দায় আমাদের নিজেদের, আমরা স্বাধীন তো! তুমি কেবল মাসে মাসে আমাদের দামটা খেপে খেপে দিয়ো। আমরা আসব যাব, তোমার নির্দেশ মতো কাজ করে দেব; আমাদের তোমার অধীন করো, সেবাদাস করো! আমাদের চাকর রূপে নিয়োগ করো!'

নিজেরা খাই না-খাই, স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে নিজেদের যথাসর্বস্ব দিয়ে আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাই। সেই লেখাপড়া শিখে তারা কিন্তু আদৌ স্বনির্ভর মানুষ হতে পারে না। পরনির্ভর, বলদানকারী 'বলদ' হতে গেলে, যে-যে বিদ্যাবুদ্ধি লাগে, এই স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তারা সেই বিদ্যা কমবেশি আয়ত্ত করে এক একটা সার্টিফিকেট নিয়ে বেরোয়। সন্দেহ নেই, এই বিদ্যাকেন্দ্রগুলিতে বহু মহৎ বাণী তারা শোনে, ক্রীতদাসপ্রথার বিলোপ বিষয়ে কত গৌরবজনক কাহিনী পড়ে, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পড়ে; পরাধীন হওয়াকে ঘৃণা করতে শেখে; এবং শেষ পর্যন্ত এমন এক অদ্ভুত স্বাধীনতার পাঠ পায় যে, সেখান থেকে বেরিয়েই পরাধীন ও ক্রীতদাস হওয়ার জন্য 'এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে' গিয়ে লাইন দেয়। কেননা, নিজেকে 'এক্সচেঞ্জ' বা বিনিময় করার সেটিই একালের সবচেয়ে বড় হাট, উলুবেড়িয়ার গরুহাটের মতো। প্রধানত এখান থেকেই একালের দেশী-বিদেশী, সরকারি-বেসরকারি দাসমালিকেরা ক্রীতদাস কিনে থাকে। ('আমরা এই এই ধরনের বলদ কিনিতে চাই' বলে সরাসরি বিজ্ঞাপন দিয়েও কেনাকাটা চলে। আজকাল বড় বড় বিদ্যাকারখানার গেটেও এক ধরনের হাট বসে, সেগুলোকে বলা হয় 'ক্যাম্পাস ইন্টারভ্যু'।) সেই কেনাকাটায় নিজেদের বেচে দিয়ে যখন লাখে লাখে ছেলেমেয়েরা (সাইবার কুলি হয়ে) বিশ্ববাজারের ক্রীতদাসমালিকদের সেবাদাস হয়ে যায়, অভিভাবক এবং

দেশনেতাদের বুক গর্বে ফুলে ওঠে দেখো, আমাদের ছেলেমেয়েরা আজ কীরকম কাজের লোক হয়ে উঠেছে! ক্রীতদাসদের বিশ্ববাজারে আমাদের ছেলেমেয়েরা আজ সবার সেরা!

প্রশ্ন উঠতে পারে, মানুষ কি তবে কাজ না করেই খাবে? কেউ কারও পরিচালনায় কোনো কাজই করবে না? এমন সমাজ কোনো কালে ছিল, নাকি এমন সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব? লেখকদ্বয় কি 'চাকরি-নিষিদ্ধ' সমাজ চান? — এমন ভাবলে আমাদের বক্তব্যকে ভুল বোঝা হবে। পারস্পরিক সম্বন্ধ বিনা সমাজ চলে না, কোনোদিনই চলবে না, এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অবহিত। কিন্তু সেই সম্বন্ধ কীভাবে মানুষকে পরাধীন-চাকরে বা ক্রীতদাসে পরিণত করে, আর কীভাবেই-বা সহযোগী স্বাধীন-মানুষে, সখায়, কর্মযোগী পুরুষে, বন্ধুতে পরিণত করে, সেকথাও আমরা জানি। সংক্ষেপে এই বলা যায় — ক্ষেত্রে শক্তি নিষেকের জন্য যাকে বরণ করে নিয়োগ করা হয়, তাকে 'বর' বলে, তা সে-ক্ষেত্র কন্যা হোক, কৃষিজমি বা কারখানা হোক, আর ছেলেমেয়েদের মস্তিষ্কই হোক। কিন্তু সেই বরণীয় বর-এর সঙ্গে 'হুকুম' যোগ হয়ে গেলে, সে 'হুকুমের চাকর' হয়ে যায়। অর্থাৎ 'চাকরি' থেকে 'হুকুম' বাদ দিতে পারলে চাকর-প্রভুর সম্বন্ধ 'নিত্যসম্বন্ধ' হওয়ার দিকে এগিয়ে যায় এবং তাতে নিয়োজক ও নিযুক্ত উভয়ের আত্মাই তৃপ্ত হয়; অন্যথায় উভয়ের আত্মাই কলুষিত হয়ে যায়।[১১]

নিজের ছেলেমেয়ে কারও হুকুমের চাকর হয়ে জীবন কাটাবে, একথা আজ থেকে এক-দুশো বছর আগে অনেক বাঙালি বাবামায়েরা ভাবতেই পারতেন না; উল্লসিত হওয়া দূরের কথা। এমনকি চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেও, কলিম খান তার ঠাকুর্দা-ঠাকুর্মাদের মুখে চাকরির প্রতি ঘৃণার কথা নিজ কানেই শুনেছেন। বিশেষত নাতনী-পৌত্রীদের বিয়ের সম্বন্ধ এলে যদি তাঁরা শুনতেন, হবুবর-ছেলেটি চাকরি করে, তা সে যত বড় চাকরিই হোক, তাঁরা বলতেন — হুকুমের চাকর তো! চাকরের সঙ্গে বিয়ে দেব না। কেন? উত্তরে তাঁরা বলতেন, তার মন তো চাকরের মতোই হবে। যে মানুষ অন্যের হুকুম তামিল করে সে মানুষ কিছুতেই বড় মনের মানুষ হতে পারবে না। ভালবাসলেও সে-ভালবাসা হবে ছোট-ভালবাসা, রাগ করলে সে ছোটলোকের মতো শাস্তি দেবে, বড়মানুষের মতো নয়। যাঁরা এসব কথা বলতেন, তাঁরা অ্যাকাডেমিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না, কিন্তু বুজুর্গ (মহৎ জ্ঞানী) ছিলেন। আজও এরকম বহু মানুষ আছেন আমাদের বাংলার গণ্ডগ্রামগুলিতে।

আর, আমরা, একালের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা? প্রচলিত ব্যবস্থায় আমরা এমনই বিমুগ্ধ হয়ে গেছি, ইংরেজিতে যাকে বলে captivated বা infatuated, যে, আমাদের চিন্তাভাবনাই 'কন্‌ডিশন্‌ড্' বা 'প্রোগ্রাম্‌ড্' ('programmed') হয়ে গেছে। ফলে আমাদের সন্তানদের সঙ্গে আমাদের সমাজ যখন এরকম নীচ ও নির্মম ব্যবহার করছে, তাদের জীবন হরণ করে ছিবড়ে করে দেওয়ার সমস্ত আয়োজন করে চলেছে, আমরা তা দেখতেই পাচ্ছি না। বিষকে অমৃত ভেবে পুলকিত হচ্ছি, আত্মহারা হচ্ছি। ফলে, প্রতিবাদ তো বহু দূরের কথা, উলটে সেই নির্মমতাকে আশীর্বাদ ভেবে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠছি!

কে প্রকৃত ক্রীতদাস? প্রাচীন গ্রীসের দাসসমাজের ক্রীতদাসেরা, প্রাগাধুনিক যুগের

আমেরিকার ক্রীতদাসেরা? নাকি আমরা? বিখ্যাত জার্মান মনীষী গ্যেটের মতে, 'সেই ক্রীতদাসই প্রকৃত ক্রীতদাস, যে জানে না সে ক্রীতদাস।' আমরা আধুনিক সভ্য মানুষেরা জানি না, আমরা ক্রীতদাস। এই ক্রীতদাসত্বই সবচেয়ে নির্মম ও ভয়ানক। আমরা বিষকে অমৃত জেনে যথাসর্বস্ব খরচ করে সেই বিষ কিনে পান করছি, নিজেদের উত্তরসূরিদের সেই বিষ পান করাচ্ছি। ফল হচ্ছে এই যে, ওই বিষ-শিক্ষার গুণে তারা দেশে বিদেশে আত্মবিক্রয় করছে, করতে বাধ্য হচ্ছে; এবং বিক্রি করতে পেরে, নিজেদের কৃতার্থ ও সফল ভাবছে। নিজের নিজের শরীরটুকু বাঁচানোর জন্য জীবন দিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে তারা। ...

অবশ্য, আগের যুগের ক্রীতদাসের সঙ্গে আমাদের সন্তানসন্ততিদের ফারাক আছে। আগের যুগের ক্রীতদাস নিজেকে নিজে চিরতরে বেচতে পারত না; অন্য লোকেরা তাদের ধরে-বেঁধে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দিত। ফলে তাদের দাস-জীবন তাদের কাছে ছিল বাধ্যতামূলক এবং তাদের অনিচ্ছাকৃত। মন্দ জীবনকে মন্দ জেনেই তারা গ্রহণ করতে বাধ্য হত। সেকারণে, মনুষ্যেতর জীবন যাপন করেও তাদের আত্মা কলুষিত হত না। আমাদের সন্তানকে কিন্তু দৃশ্যত কেউ ধরে-বেঁধে বেচে দেয় না; এমন শিক্ষা ও পরিবেশ দেওয়া হয় যে, তারা নিজেরাই নিজেদের বেচে দেওয়ার জন্য আকুল আবেদন করতে থাকে। বাজারে গিয়ে সার্টিফিকেট হাতে নিয়ে দাঁড়ায় (দেহবিক্রয়জীবী যৌনকর্মীদের মতো, আত্ম-অবমাননা না-করে বেঁচে থাকার উপায় যাদের রাখা হয়নি)। খদ্দের না এলে সে হকারের মতো দাসক্রেতা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দুয়ারে দুয়ারে ঘোরে নিজেকে বেচবার জন্য। আত্মবিক্রয়ের এই চেষ্টায় সফল হতে পারলে আমাদের সন্তানের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও পুলকিত হই! অন্যথায় তারা দেখতে পায়, তাদের কৃতী (?) পূর্বপুরুষেরা তাদের জন্য এমন 'মহৎ গণতান্ত্রিক' সমাজ বানিয়ে রেখেছেন যে, নিজেদের এভাবে বেচতে না পারলে না-খেয়ে মরা ছাড়া তাদের সামনে আর কোনো পথই নেই। নিজের নিজের শরীরটুকু বাঁচানোর জন্য জীবন দিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে তারা। আমাদের শিক্ষা ও পরিবেশের কল্যাণে এভাবেই আমাদের সন্তানেরা ক্রীতদাস হয়ে গিয়ে জীবনের বাকি দিনগুলি কাটায়।

এ তো গেল অ্যাকাডেমির দাগিয়ে দেওয়া 'সেরা-ছেলেমেয়ে'দের কথা। যাদেরকে 'মন্দ নয়' কিংবা 'বাতিল' বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়, সেইরকম ছেলেমেয়েদের সংখ্যাই বেশি। তাদের অবস্থা হয় আরও খারাপ। তারা ক্রীতদাস হওয়ার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে 'স্বাধীন' পেশায় বা পৈতৃক পেশায় আত্মনিয়োগ করতে বাধ্য হয়; আর সারাটা জীবন ধরেই তিন ধরনের মানসিক যন্ত্রণায় ভুগতে থাকে। এক) অ্যাকাডেমি তাদের 'সেরা ছেলে' বা 'সেরা মেয়ে' বলে সার্টিফিকেট না দেওয়ায়, অভিভাবকদের চোখে, দাসক্রেতাদের চোখে, অতএব সমাজের চোখে তারা হীন, এই বিশ্বাস তাদের অধিকাংশের মনে গেড়ে বসে এবং তারা নিজেদের হীন ভাবতে থাকে (একটি সমাজের অধিকাংশ ছেলেমেয়েকে এভাবে হীন করে দেওয়া কত বড় পাপকাজ, ভাবা যায় না!); দুই) কর্মজগতে নেমে দেখে, স্কুল-কলেজে শেখা তাদের কোনো বিদ্যাই বিশেষ কাজে লাগছে না, অধিকাংশ বিষয়ই তাদের নতুন করে শিখতে হয়,

অ্যাকাডেমি-শিক্ষায় তাদের সুনির্দিষ্ট (predictable) হয়ে-যাওয়া মন যা মেনে নিতে কষ্ট পায় এবং হীনম্মন্যতায় ভুগতে থাকে; তিন) সম্মুখস্থ পরিস্থিতি তাদের — নতুন কিছু করা, প্রচলিতকে ভেঙে ফেলা ও সনাতন চিরাচরিতে ফিরে যাওয়া — এই তিন দিক থেকে ডাকতে থাকে, সেসব দিকে যাওয়ার জন্য তাদের মন আঁকুপাকু করতে থাকে কিন্তু কিছুতেই যেতে পারে না। সব মিলে চিন্তাটা তাদের তালগোল পাকিয়ে যায়। শেষমেষ সব ভাবনা ফেলে, কী করে দু পয়সা কামানো যায় সেদিকেই মনোযোগ দিতে বাধ্য হয় তারা এবং প্রায়শই এমন কাজ করতে বাধ্য হয় যাতে তাদের মন সায় দেয় না; তাদের আত্মা কলুষিত হয়ে যায়।

আমাদের প্রায় সমগ্র উত্তরপ্রজন্ম এখন এভাবেই জীবন অতিবাহিত করে থাকে। শরীর বাঁচাতে আত্মা কলুষিত হয়ে যায় তাদের। পরমাপ্রকৃতি যে ঘোড়া (শরীর) দিয়েছিলেন, তার জন্য ঘাস কাটতে কাটতেই ঘোড়সওয়ারের দিন কাবার হয়ে যায়, সেই ঘোড়ায় চেপে রাজকুমারীর (বা আত্মার তৃপ্তির) কাছে যাওয়া আর হয়ে ওঠে না; তার আগেই জীবনের সন্ধ্যা নেমে আসে। সংক্ষেপে এই হল আমাদের সন্তানসন্ততিদের 'মনুষ্যজীবন'!

মানুষের আত্মার এই অবমাননা পরমাপ্রকৃতি সইতে পারে না। এই মহাবিশ্ব জুড়ে যে অতিচেতন বিরাজ করে, তাঁর কণা[১২] দেওয়া হয়েছিল মানুষকে; সেই কণার পূজা করা হয়নি। সারা জীবন ধরে ঘোড়ার ঘাস কাটতে গিয়ে আমাদের আত্মবিক্রীত সেই সন্তান-সন্ততির আত্মা (পরমাত্মার অংশ বা কণা) অভুক্ত অতৃপ্ত থেকে থেকে গ্লানিগ্রস্ত হয়ে গেছে; সেই কণার আধার মানুষটিও অতৃপ্ত থেকে গেছে। তাই, পরমাপ্রকৃতির অমোঘ নির্দেশে আমাদের ওই নাজেহাল সন্তানসন্ততিরা অতঃপর তাঁদের নিজ নিজ আত্মার গ্লানি থেকে মুক্তির উপায় খোঁজে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেদের অজান্তেই। খোঁজে দুভাবে — এক) যারা অত্যন্ত গ্লানিগ্রস্ত, ঘোড়ার ঘাসকাটা থেকে যখনই অবকাশ পায় তখনই, যতপ্রকারের উগ্র, সন্ত্রাসমূলক, চরম, তীব্র জীবনবিরোধী-জীবনীশক্তি-রস[১৩] রয়েছে, যত প্রকারের শারীরিক-মানসিক মাদকতার নেশা রয়েছে, তাতে ডুবে গিয়ে, সেগুলিকে আরও বাড়িয়ে দিয়ে তারা সমগ্র সমাজের ওপর এবং নিজেদের ওপর শোধ তোলে; দুই) যারা তুলনায় কম গ্লানিগ্রস্ত তারা, অবকাশ পেলেই মনুষ্যজীবন কাকে বলে তা জানার জন্য এদিক-ওদিক ভ্রমপূর্ণ 'ভ্রমণ' করে বেড়ায়, মন্দিরে-মসজিদে ঘুরে ঘুরে আত্মার মলম খোঁজে, পুরোহিত-মোল্লার হাত ধরে মৌলবাদের সেবা করে আত্মার মুক্তি খোঁজে। বিশ্বজুড়ে ট্যুরিজমের ব্যবসা বাড়ে এই 'বিভ্রান্ত'দের জন্যই। মনুষ্যজীবন কাকে বলে, কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না তারা, খুঁজে বেড়ায় পৃথিবীময়। মাঝে মাঝেই কলকাতায় এসে কী খোঁজেন আমাদের মণি ভৌমিক? তাঁর আত্মার অবমাননার প্রতিকার? তাঁর অতৃপ্ত আত্মার শান্তি? কী খোঁজেন তিনি?

ছয়. একালের দাসপ্রথার স্বরূপ এবং বলির পাঁঠা

কীভাবে একালে সন্তানসন্ততিদের যথার্থ লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করব — এই আলোচনায় একটি কাঁটা রয়েছে। সবার আগে সেটিকে সাফ করে যেতে হবে। কাঁটাটি হল,

আমাদের যে-কোনো অহিতের জন্য কাউকে না কাউকে দায়ী করা। তবে সে আলোচনায় আমরা পুনরায় আমাদের উত্তরপ্রজন্মের অ্যাকাডেমি-চিহ্নিত 'ভালছেলে'দের প্রসঙ্গে আসব, কেননা, তারাই তো আমাদের 'হীরের টুকরো ছেলে', 'সোনার ছেলে'! তারাই তো আগামী সমাজের অগ্রণী অংশ।

হ্যাঁ, গণতন্ত্র স্বাধীনতা মুক্তি দাসপ্রথা-বিলোপ — এসব কার্যত এখন বাজে কথা। দাসপ্রথা বিলোপ করার নাম করে 'ভুয়া-মুক্তি' ও 'ভুয়া-স্বাধীনতা'র নামে মিথ্যা ও খণ্ডিত গণতন্ত্রের সূত্রপাত হয়েছে। এখনও আগের দাসপ্রথাই রয়েছে, এবং রয়েছে আরও নির্মমভাবে। আগের কালে দাস ছিল পণ্যবস্তু, ক্রেতা-বিক্রেতা তাকে নিয়ে দরাদরি লেনদেন করত। কিন্তু ক্রীতদাসকে খেতে পরতে দিতে, স্বাস্থ্য-সুরক্ষা দিতে বাধ্য ছিল তার মালিক; নইলে রাজার আদালতে তার বিচার হত। একটা প্রথা বা সামাজিক ব্যবস্থা যখন প্রথম প্রচলিত হয়, তখন তা অত্যন্ত বৈপ্লবিক ও কল্যাণকারী থাকে, থাকে বলেই তা প্রচলিত হতে পারে। কালে কালে প্রথাটি মৌলবাদী হয়ে ওঠে এবং নানাভাবে গ্লানিগ্রস্ত হয়। দাসপ্রথাও সেরকম ছিল। একালের গণতন্ত্রের 'বিচ্ছিন্ন ব্যাপার'-এর মতো তখনও দাসতন্ত্রের 'বিচ্ছিন্ন-ব্যাপার'গুলি ঘটত, তার কথাই লেখে 'আংকল টম্‌স কেবিন', এবং তার কথাই একালে দাসপ্রথাবিরোধীরা ফলাও করে বলে থাকে। বিপরীত কথাটা তারা একেবারেই বলে না, যে, বহু ক্রীতদাসই পুত্রস্নেহে বড় হত (সন্দেহ হলে শেক্‌সপীয়রের 'দি কমেডি অফ এররস' পড়ে দেখুন) এবং নানা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হত, এমনকী দেশের রাজা পর্যন্ত হয়ে যেত। নইলে ইতিহাসে সেরকম বেশ কিছু দাস-রাজার দেখা পেতাম না আমরা।

কিন্তু এখন? এখন দাস-বিক্রেতা নামক চরিত্রটি নেই। তার বদলে আছে অনন্যোপায় পরিবেশ ও অনন্যোপায় শিক্ষা। তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাব কীভাবে, খুঁজে পাই না। এই পরিবেশ ছেড়ে যাব কোথায়, জানি না। এই শিক্ষাব্যবস্থায় ছেলেমেয়েদের না-পড়িয়ে কোথায় পড়াব? জানি, এই পরিবেশে একজন মানুষ নিজেকে না বেচলে অনাহারে মরে; এই শিক্ষায় একজন মানুষ ক্রীতদাসে পরিণত হওয়াকে গৌরবজনক বলে মনে করে। জানি, একালের ছেলেমেয়েরা 'স্ব-ইচ্ছা'য় আত্মবিক্রয় করে, করতে বাধ্য হয় এবং ভাবে সে স্বাধীন; নিজেকে বিক্রি করা-না-করা তার নিজের ব্যাপার! সে আত্মশ্লাঘা বোধ করে। তার স্ব-এর যে-খোপে তার ইচ্ছা থাকে, সেই খোপের বস্তুটাই বদলে দিয়েছে তার শিক্ষা, কিন্তু সেকথা সে জানতেই পারে না। আত্মবিক্রয় করে প্রথম জীবনে নিজেকে সফল বলে বিবেচনা করতে শুরু করে সে।

কিন্তু একথাও তো খুব ভালভাবেই জানি (এবং রবীন্দ্রনাথও কথাটি খুব স্পষ্ট করে বলে গেছেন) যে, 'এ-সবই তার বাইরের প্রকৃতি।' মনের গভীরে সে অপমানিত, লাঞ্ছিত, তার আত্মা অতৃপ্ত ব্যথিত; **এই হুকুমের চাকরের দাসজীবন যে তার কাঙ্ক্ষিত নয়, সেকথা প্রায় প্রত্যেক চাকুরিজীবীর মুখে তার শেষজীবনে শুনতে পাওয়া যায়।** বিশেষত হুকুমদারির অধীনে কর্মরত কারও কাছেই আমরা তাঁদের চাকরিজীবনের সুখ্যাতি শুনিনি। মনে রাখা দরকার যে, যেসকল নির্দেশ, হুকুম, গাইডেন্স, ইন্‌স্ট্রাকশন মানতে মন অস্বস্তিবোধ

করে, বিবেক সায় দেয় না; তা মেনে নিলেই মানবমনের অবমাননা হয়, তার আত্মা কলুষিত ও ব্যথিত হয়; এবং এরকম প্রতিটি অবমাননার ঘটনায় মানুষ একটু একটু করে ছোট-মানুষে পরিণত হতে থাকে।

সেকালের দাসপ্রথায় কার্যত দুটি পক্ষ ছিল। প্রথম পক্ষ দাস-ক্রেতা এবং দ্বিতীয় পক্ষ দাস-বিক্রেতা; মাঝে বিনিময়যোগ্য পণ্য ছিল দাস। প্রথাটি তুলতে গেলে পক্ষ দুটিকে নির্মূল করার ব্যবস্থা করতে হত। তা করা হয়নি। ক্রেতাপক্ষ আগের মতোই আছে, পণ্যরূপী দাসও আছে, কেবল বিক্রেতাপক্ষকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। গরু আছে, গোমাংসভক্ষক ক্রেতাও আছে, কিন্তু গরু পাইকারের নামে হুলিয়া জারি করে দেওয়ায় সে গোহাটায় আর ঢুকতে পারছে না। এমন অবস্থায় গোমাংসভক্ষক কীভাবে গরু কিনবে এবং মালিকহীন গরুগুলিই বা যাবে কোথায়? তাই দেখে ক্রেতাপক্ষ ঘোষণা করল, গরুদের স্বাধীন করে দেওয়া হোক। এখন থেকে তারা নিজেরা নিজেদের মালিক হয়ে যাক; নিজেদের বেচবে কি না তারা নিজেরাই ঠিক করুক, নিজেদের দাম নিজেরা বলুক, নিজেদের নিজেরা বেচুক। এই বলে ক্রেতাপক্ষ ঘাস-কুঁড়ার সরবরাহ আগের চেয়েও বেশি করে কুক্ষিগত করে নিল। গরুরা স্বাধীন হওয়ার পর দেখল তাদের জন্য না আছে ঘাস, না আছে কুঁড়া। তারা খাবে কী? অগত্যা তারা গোক্রেতাকে বলল, আমাদের কিনে নাও, বদলে ঘাসপাতা দাও। দাসতন্ত্র পেরিয়ে প্রতিষ্ঠিত হল গণতন্ত্র! প্রাচীন দাসযুগ থেকে যাত্রা শুরু করে সামন্ততন্ত্র, রাজতন্ত্রের ভিতর দিয়ে নাকানিচোবানি খেতে খেতে একালের গোপন-ভোটনির্ভর গণতন্ত্রে পৌঁছে দাসপ্রথার মুক্তি ঘটে গেল; প্রতিষ্ঠিত হল সত্যিকারের দাসতন্ত্র!

অতএব ক্রীতদাসপ্রথা আদৌ বিলুপ্ত হয়নি, শুধু ভোল বদলেছে তার এবং তা আগের চেয়ে নির্মম, দায়দায়িত্বহীন এবং আগের চেয়েও ধূর্ত। আজকের দাসক্রেতা দাস কেনে, কিন্তু কেনার সমস্ত দায় সে চাপিয়ে রাখে বিক্রেতার উপর। 'আমি কি তোমাকে কিনতে গিয়েছি, তুমি নিজেই নিজেকে বেচেছ'— এই হল তার যুক্তি। স্বাধীনতার নামে মানুষকে এমন পরিবেশ ও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যে, মানুষ নিজেই নিজেকে বেচবার জন্য হা-পিত্যেশ করে বেড়াচ্ছে। বিক্রির মাধ্যমে নিজেকে কারও পরাধীন করতে না পারলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, এটা আজকের বিশ্বের সকল 'গণতান্ত্রিক' দেশের প্রত্যেক 'স্বাধীন' মানুষই স্পষ্ট দেখতে পান।

অর্থাৎ এক সাঙ্ঘাতিক অবস্থার ভিতর দিয়ে আমরা এগোচ্ছি। আমাদের সমাজ দাসপ্রথা বিলোপের নামে হাজারগুণ ভয়ানক ও ব্যাপক এমন এক অভিনব সুবিন্যস্ত দাসতন্ত্রের প্রচলন ঘটিয়েছে, যাকে কোনো দাসই আর চিনতে পারে না। ভাবে, এই তো স্বাধীনতা! সে যে নিজেই নিজেকে বেচে দিয়ে ক্রীতদাসের জীবন কাটাতে বাধ্য হয়েছে, সেকথা যখন টের পায় তখন জীবনের বেলা গড়িয়ে গেছে; আর কিছু করার থাকে না। কোন অমোঘ নিয়মে অন্যের হুকুম খেটে তার সারাটা জীবন খরচ হয়ে গেল, সেকথা ভাববার অবকাশ মেলে না আর।

দেশে এখন 'ফলিত মার্কসবাদ'-এর রমরমা। এই মতবাদ 'দোষারোপ'-এর সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করে; যে কোনো অহিতের জন্য কাউকে দোষী সাব্যস্ত করে তাকে নিকেশ করাকে

যুক্তিসঙ্গত মনে করে। এই সংস্কৃতিতে আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসীরা আজ নিতান্তই কলুষিত। সেই কলুষিত স্বভাবের অভ্যাসদোষে ছেলেমেয়েদের এই দুর্গতির জন্য দায়ী বলির পাঁঠা খুঁজি আমরা; তাকে বলি দিয়ে আমাদের সন্তানপালনের ত্রুটির পাপ থেকে মুক্তি পেতে চাই। কিন্তু সে-পাঁঠা পাই কোথায়? ভাবি, সন্তানসন্ততিদের বর্তমান দুর্দশার জন্য বুঝিবা আমাদের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-অধ্যাপক শ্রেণীই দায়ী, অথবা অ্যাকাডেমি, সরকারি শিক্ষাবিভাগ, শিক্ষাব্যবস্থা, এবং যে-দেশনেতারা দেশ চালাচ্ছেন তাঁরাই দায়ী। কিন্তু, একটু আঁচালেই টের পাওয়া যায়, সেটি ঠিক নয়।

সর্বাগ্রে অধ্যাপক বা শিক্ষকশ্রেণীর কথাই হোক। এঁরা নিজেরাই 'আবেদনপত্র' দিয়ে ক্রীতদাস হয়েছেন। স্বভাবতই প্রচলিত এই দাসপ্রথার বিরুদ্ধে বলবার জোর নেই তাঁদের। তাঁদের দায়ী করা আর হত্যাকারীর ছুরিকে দায়ী করা সমান ব্যাপার। অবশ্য চিরকাল আমাদের শিক্ষকশ্রেণীর এই দুরবস্থা ছিল না। এমনকি ইংরেজ আমলেও আইন ছিল, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটি ছেলেমেয়েদের মানুষ করার জন্য, জ্ঞান দিয়ে, দ্বিতীয় জন্ম দিয়ে 'দ্বিজ' বানানোর জন্য দেশবিদেশ খুঁজে জ্ঞানী মানুষদের 'বরণ' করে নিয়ে আসতেন। তেমন জ্ঞানী মানুষের খোঁজ পেলেই তাঁদের কাছে গিয়ে হাজির হতেন তাঁরা; তাঁদের অনুরোধ করতেন প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়ে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করতে, অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে। তখনকার স্কুল কলেজে গিয়ে কোনো জ্ঞানী মানুষ কখনো 'আমাকে জ্ঞান দেওয়ার কাজে নিয়োগ করুন' বলে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার নীচতা স্বীকার করতেন না, তাতে না-খেয়ে মরতে হলেও করতেন না। যাঁরা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বরণমূলক' নিযুক্তি পেতেন, তাঁরাই যেতেন। ফলে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু 'মর্যাদাবান' 'বরণীয়' শিক্ষকেরা কর্মরত থাকতেন এবং তাঁরা স্বভাবতই মাথা উঁচু করে চলতেন। রাজা-উজিরের কাছে শির নত করার চেয়ে শির কেটে দিয়ে দেওয়াকেই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করতেন তাঁরা। ব্যক্তিজীবনে বাহ্যসম্পদের পিছনে কখনও ছুটতেন না, টিউশন করে টাকা-কামানোর কথা তাঁরা কল্পনা করতে পারতেন না; সরল জীবন ও উচ্চ চিন্তা ছিল তাঁদের জীবনের মূল মন্ত্র। উত্তরপ্রজন্মের লালন ও শিক্ষাই তাঁদের জীবনের ব্রত ছিল। গোটা সমাজ তাঁদের সম্মান করত। মনে রাখা দরকার, সেই শিক্ষকশ্রেণীর ব্রহ্মগুণসম্পন্ন-আদিপুরুষদের 'ভরণ'-পোষণ করার সমস্ত দায় যে-দেশের জনসাধারণ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিল, সেই দেশের নাম হয়েছিল 'ভারত'।

ব্রিটিশ আমলেও এরকম হতে পারত এই জন্য যে, তখনও আমাদের ভারতসমাজ গণতন্ত্রের ভেকধারী কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পণ্যশাসিত ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিষগ্রস্ত হয়নি। তখনও আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষেরা ইয়োরোপীয় শিক্ষার বিষে জারিত হয়ে যন্ত্রে বা কলে পরিণত হননি। ফলে তাঁরা নিজেরা যেমন 'মানুষের-জীবন' যাপন করতেন, সন্তানসন্ততিদেরও 'মানুষের-জীবন' যাপনের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার চেষ্টা করতেন; সন্তানসন্ততিকে 'মানুষ-করা'র চেষ্টা করতেন। মানুষকে 'যন্ত্র' বা 'কল' বানানোর চেষ্টা করতেন না তাঁরা। তা ছাড়া, তখনও আমাদের দেশে 'মানুষকে যন্ত্র বানানোর

কারখানা' বা আধুনিক অ্যাকাডেমি তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি। ফলে, মানুষের সন্তানকে 'মানুষ-করা'র উত্তরাধিকার তখনও আমাদের সমাজে কমবেশি সক্রিয় ছিল।

আর এখন? এখন পৃথিবীর প্রায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই মানুষের সন্তানকে যন্ত্রে রূপান্তরিত করার কারখানায় পরিণত হয়েছে। (কেবলমাত্র দু-চারটি অতি উচ্চমার্গের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অতি বিখ্যাত বিশ-পঞ্চাশজন জ্ঞানীর ক্ষেত্রে এখনও 'বরণমূলক' নিয়োগ কার্যকর হয়ে থাকে। এখানে তাঁদের কথা হচ্ছে না।) একালের প্রায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সব শিক্ষকেরাই চাকর হওয়ার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের কাছে 'আবেদন' করেন। ইন্টারভিউ দিয়ে নিজের জ্ঞান আছে বলে প্রমাণ দিতে লজ্জা বোধ করেন না তাঁরা। ক্রমে আরও নানা হেনস্থার পথ বেয়ে নিজের আত্মাকে বিক্রি করে নিজেরাই 'চাকরি' নামক ক্রীতদাসত্ব মেনে নেন; নিজেদের কাছে নিজেরাই ছোট হয়ে যান। ফলত তাঁদের মুখে ঈশ্বরের কথা, স্বাধীনতা-সাম্য-লিবার্টি-মুক্তির কথা আর সত্য হয়ে বাজে না। সেই ছোট মানুষদের হাতে গড়া মানুষ যে আরও ছোট হতে দ্বিধা করবে না, আরও হীন ক্রীতদাসত্ব গ্রহণ করতে পিছপা হবে না, সেটাই স্বাভাবিক। ফলে আমাদের সমগ্র উত্তরপ্রজন্ম আজ সার্বিক দাসত্বকেই তাদের মনুষ্যত্ব বলে মনে করছে, বিশ্বাস করছে। তাকেই সাগ্রহে গ্রহণ করছে; আত্মবিক্রয় করছে — ভাল কাজ করছে এই বিশ্বাসে করছে। গণতান্ত্রিক দেশের গণতান্ত্রিক স্বাধীন মানুষেরা এখন আত্মবিক্রয়ের এই স্বাধীনতাই ভোগ করছেন! এ হল নিজেকে দাস রূপে বেচে দেওয়ার বাধ্যতামূলক স্বাধীনতা। দাসপ্রথার এ হল আরও জটিল, নির্মম ও ভয়ানক রূপ।

কিন্তু আর একটু গভীরে ঢুকলে দেখতে পাওয়া যায়, আমাদের সন্তানসন্ততির এই দুর্গতির জন্য যাকে আমরা এতক্ষণ দায়ী করে আসছি, সেই 'আধুনিক শিক্ষা ও পরিবেশ'-এর পেছনে রয়েছে প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম। অর্থাৎ এই 'শিক্ষা ও পরিবেশ'-এর জন্য তথাকথিত অ্যাকাডেমি, শিক্ষকশ্রেণী, সরকার, দাসক্রেতা পুঁজিপতি বা প্রতিষ্ঠান কেউই যথার্থে দায়ী নয়। এদের অধিকাংশই নিমিত্তমাত্র অথবা ইতিহাসের ক্রীড়নক। হ্যাঁ, তাঁদের অনেকেই এই শিক্ষা ও পরিবেশের ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থার রক্ষক এবং তার প্রসারে সহায়ক হয়ে থাকেন। তাঁদের সে-কাজকে বড়জোর বিষবৃক্ষে জলসেচ ও সার দেওয়ার দায়ে অভিযুক্ত করা যায়, কিন্তু বিষবৃক্ষটির উদ্ভব ও বেড়ে ওঠার পেছনে প্রধান ও মূল কারণ তারা নয়। গাছটি না জন্মালে তাদের কোনো ভূমিকাই থাকত না। আর, গাছটি জন্মেছে তার বীজ থেকে, সমাজমনের মাটির গুণে; এবং সেসবই ঘটেছে প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে। স্বভাবতই তাকে নির্মূল করতে হলে প্রকৃতির নিয়মেই তার বিনাশ সাধন করতে হবে। অন্য কোনো পথ নেই। বিষবৃক্ষের[১৪] একটি পাতা পোড়ালে যেমন তার কিছুই যায় আসে না, স্কুল-কলেজ পুড়িয়েও তার কিছুই করা যায় না।

তা হলে এখন কী করব আমরা? ছেলেমেয়েদের লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষার কী ব্যবস্থা করলে পর আমাদের ছেলেমেয়েরা ক্রীতদাস না হয়ে স্বাধীন মুক্ত মানুষের জীবন কাটাতে পারবে, তৃপ্তি পাবে, শান্তি পাবে, তাঁদের আত্মা তৃপ্ত হবে, তাদের জীবন সফল হবে? সেরকম

ব্যবস্থা কি আমরা কোনোদিন করতে পারব না? আমরা কি পশুপাখি কীটপতঙ্গ গাছগাছালির চেয়েও অধম হয়ে গেছি? তারা তাদের উত্তরপ্রজন্মের জীবন সফল করার ব্যবস্থা করে দিয়ে যেতে পারে, আর মানুষ হয়ে আমরা তা পারি না?

পারি। অবশ্যই পারি। এবং তার নিশ্চিত উপায় হল এ-ব্যাপারে নেচারের নিয়মের অনুসারী হয়ে যাওয়া, কেননা তার নিয়ম অমান্যের ফলই রয়েছে 'শিক্ষা ও পরিবেশ'-এর পিছনে। অর্থাৎ, নেচার তার অন্যান্য জীবকে উত্তরসূরি লালন-পালনের যে যোগ্যতা দিয়েছিল, মানুষকেও সেরকম যোগ্যতা দিয়েছিল। সেগুলি কী তা খুঁজে শনাক্ত করা এবং সেগুলিকে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে একালিক বা আপডেট করে নেওয়া; তারপর সেগুলি অনুসরণ করে যদি আমরা আমাদের সন্তানসন্ততির লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করি, তাহলে আমরাও আমাদের উত্তরপ্রজন্মের জীবন সফল করার ব্যবস্থা করে দিয়ে যেতে পারি। — এই কাজ করতে গেলে আমাদের জানা দরকার, মানুষের সন্তান লালন-পালনের ও শিক্ষা-দীক্ষার ইতিহাস কীরূপ, কীভাবে সেই কাজ করতে গিয়ে মানুষ উত্তরপ্রজন্মকে গড়ে দিয়ে যাওয়ার নেচার-প্রদত্ত যোগ্যতা থেকে সরে এসেছে? তা জানতে পারলে, আমরা তার বিপরীত ব্যবস্থা নিয়ে পুনরায় নেচার-অনুসারী হয়ে যেতে পারি।

সাত. লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

উত্তরপ্রজন্মের হাতে বর্তমান প্রজন্মের অভিজ্ঞতার হস্তান্তর সকল জীবের ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতিতে হয়, কিন্তু মানুষকে দেওয়া হয়েছে একটি বাড়তি পদ্ধতি। প্রথম পদ্ধতিটি হল জিনের নথিতে নতুন অভিজ্ঞতা মুদ্রিত করা; আর দ্বিতীয় পদ্ধতি হল জীবদেহের চেতনকোষের অব্যক্ত জ্ঞানপ্রবাহে অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করা।[১৫] মানুষ-সহ সকল জীবের রক্তে ও মস্তিষ্কে এই দুটি কাজ নেচার নিজেই করে দেয়। কিন্তু তৃতীয় পদ্ধতিটি মানুষ নিজে গ্রহণ করতে পারে এবং করেও। এই স্বাধীনতা নেচার তার শ্রেষ্ঠ সন্তান মানুষকে দিয়েছে — মানুষ তার অভিজ্ঞতার কথা তার সন্তানসন্ততিকে বলে যেতে পারে, অন্য কোনো জীব সেভাবে যা পারে না। একেই একালে 'শিক্ষাব্যবস্থা' বলা হয়ে থাকে, এবং এর ইতিহাস কমবেশি পাওয়া যায়। লালন-পালনের তেমন কোনো ইতিহাস পাওয়া যায় না। তাহলে, হাতের কাছে যা পাওয়া যাচ্ছে, প্রথমে তার কথাই হোক।

শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাসকে মূলত দু ভাগে ভাগ করা যায় — অভিজ্ঞতা হস্তান্তরের সাংগঠনিক ব্যবস্থার ইতিহাস ও হস্তান্তরের বিষয় পরিবর্তনের ইতিহাস। আলোচনার সুবিধার জন্য প্রথমটিকে আমরা জ্ঞানবৃক্ষের ইতিহাস এবং দ্বিতীয়টিকে জ্ঞানবৃক্ষের ফলের ইতিহাস বলব। এর সঙ্গে এই জ্ঞানবৃক্ষ ও তার ফলকে রবীন্দ্রনাথ কীরূপ বুঝেছিলেন, সে-প্রসঙ্গ একই সঙ্গে সেরে নেব। আমরা দেখতে চাইব, কীভাবে আমরা নেচার থেকে সরে এসেছি, কতটা সরে এসেছি এবং কীভাবেই বা নেচারের কাছে ফিরে গিয়ে তার লীলাসঙ্গী হওয়া যায়।

সাত. ক) জ্ঞানবৃক্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

যতদূর বোঝা যায়, আদিম যৌথসমাজ আপন আত্মরক্ষা ও আত্মবিকাশের জন্য যে ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল, সেকালের (আনুমানিক ১৫০০-১৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) চিন্তাবিদেরা তার নাম দিয়েছিলেন 'পঞ্চ অশ্বত্থ — বোধিদ্রুম, পিপ্পল, চলদল, কুঞ্জরাশন, ও অশ্বত্থ'। এর মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থার নাম ছিল সর্বাগ্রে — বোধিদ্রুম। তার বহু বৎসর পরে ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, গৌতম বুদ্ধের পটভূমিতে আমরা সেই বোধিদ্রুমকে পাই বোধিবৃক্ষ রূপে। মধ্যপ্রাচ্যের ইহুদিরা সেই বোধিদ্রুম বা বোধিবৃক্ষের ধারণাটি ইয়োরোপকে হস্তান্তর করেছিল 'জ্ঞানবৃক্ষ' নামে। সেই 'জ্ঞানবৃক্ষ'কে অতঃপর আমরা পাই ইয়োরোপের বা ইংরেজের হাত-ফেরতা হয়ে বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে।

বাইবেল জানায়, জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়েই নাকি মানুষের অধঃপতন শুরু হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের সেই উত্তরাধিকার আরও স্পষ্টভাবে রয়েছে, রয়েছে আমাদের সংস্কৃতিতে, পুরাণাদি গ্রন্থে, তবে অন্য ভাষায় — 'বিদ্যাদির আগম বিধায়' নাকি মানুষের অধঃপতন আরম্ভ হয়েছিল; সত্যযুগ থেকে 'মিথ্যাযুগ'-এর সূচনা হয়েছিল। এর অর্থ হল, মানুষের সমাজে প্রথম যে বোধিদ্রুম বা জ্ঞানবৃক্ষের (academic institution-এর) জন্ম হয়েছিল, তাতে শিক্ষালাভ করেই মানুষ অধঃপতিত হতে শুরু করেছিল। তার আগে পর্যন্ত মানুষের (মনুষ্যত্ব থেকে) পতন ঘটেনি। অর্থাৎ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজের অর্জিত জ্ঞান উত্তরপ্রজন্মকে হস্তান্তর করার চেষ্টা তার সূচনাতেই কুফল দিতে শুরু করেছিল। যেকারণে প্রাচীন ভারতে যেমন বেদবিক্রয় বা বিদ্যাবিক্রয় নিন্দনীয় হয়ে যায়, প্রতীচীতেও জ্ঞানবৃক্ষের ফলভক্ষণ নিন্দনীয় হয়ে যায় (যদিও প্রতীচী তার জ্ঞানবৃক্ষের মানেই ভুলে গেছে)। অর্থাৎ, সেকালের জ্ঞানবৃক্ষ অমৃতফল দানকারী বনস্পতি[১৬] না হয়ে বিষফল দানকারী বিষবৃক্ষে পরিণত হয়ে যাচ্ছিল। প্রশ্ন হল, সেরকম হচ্ছিল কেন?

সমস্যাটির সূত্রপাত সেই আগুন আবিষ্কারের কালে। আগুন তো ছিলই জগতের দাবানলে, বিদ্যুতে, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে জগতের সর্বত্র; পরমাপ্রকৃতির অব্যক্ত মহাজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে। কিন্তু কালের প্রয়োজনে[১৭] মানুষ তাকে আবিষ্কার করে ফেলল চকমকিতে। অব্যক্ত মহাজ্ঞানের এক টুকরো ব্যক্তজ্ঞানে বদলে গেল। মহাজ্ঞানের কণাপরিমাণ অর্থের চেক মানবমস্তিষ্করূপী ব্যাঙ্কে ক্যাশ টাকায় রূপান্তরিত হয়ে গেল; আগুন হয়ে গেল মানুষের কুক্ষিগত। অতঃপর এই আগুনকে মানুষ নিজের খুশিমত ব্যবহার করতে পারল, অখাদ্যকে খাদ্যে পরিণত করতে পারল, শত্রুকে ভয় দেখাতে পারল; আরও কত কী করতে পারল।

কিন্তু আগুন জ্বালানোর এই ব্যক্তজ্ঞান বহন করবে কে? আবিষ্কৃত জ্ঞানকে বহন করার জন্য যে যান্ত্রিক-নীতি অবশ্যই মানতে হয়, তা হল 'একই কর্মের পুনরাবৃত্তির নীতি'; আবিষ্কারকের পক্ষে যে-নীতি মানা খুবই কঠিন। কেননা তাতে তার উদ্ভাবক-আবিষ্কারক সত্তাটিই লোপ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। একাজে সে স্বভাবতই অবহেলা করে ফেলে। অগত্যা এক নতুন শক্তির জন্ম হয় সমাজে — স্পেশালিস্ট বা বিশেষজ্ঞ। সেকালে আবিষ্কারককে

শিব বা পুরুষ এবং স্পেশালিস্টকে দক্ষ বা প্রকৃতিও বলা হত। আবিষ্কারক 'পুরুষগুণসম্পন্ন' স্রষ্টা-মানুষেরা আবিষ্কার করে আনবেন, স্পেশালিস্ট 'প্রকৃতিগুণসম্পন্ন' সৃষ্টিধর-মানুষেরা তা সুবিন্যস্ত করে বহন করে নিয়ে চলবেন, এটিই সমাজের স্বাভাবিক রীতি হয়ে গেল।

এই পর্যন্ত সব ঠিকঠাক চলছিল। পরমাপ্রকৃতি আমাদের যা দিয়েছিলেন, আবিষ্কারের মাধ্যমে আমরা সে এলাকার বাইরে যেতে শিখলাম, সাবালক হতে লাগলাম। সব মায়েরাই চান, তার সন্তান সাবালক হোক। কিন্তু সাবালকত্বের কিছু হ্যাপা আছে এবং সে হ্যাপা সাবালককেই সামাল দিতে হয়। এক্ষেত্রেও সেই হ্যাপার সূত্রপাত হয়ে গেল। বাঁচতে গেলে ক্যাশ টাকার মতো ব্যক্তজ্ঞান দরকার, সেজন্য পরমাপ্রকৃতির দেওয়া অব্যক্তজ্ঞানের চেক ক্যাশ করার বিদ্যা (ব্রহ্মজ্ঞান) অর্জন করা দরকার; অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ দরকার, আবিষ্কারকও দরকার; সৃষ্টিধরকে দরকার, স্রষ্টাকেও দরকার। সমাজ সত্তা দুটির জন্মও দিয়ে ফেলেছিল।

সমস্যা দেখা দিল, উত্তরপ্রজন্মের হাতে সমাজের অর্জিত-প্রচলিত জ্ঞান হস্তান্তরের বেলায়। জ্ঞান হস্তান্তরের জন্য যে বোধিদ্রুমের জন্ম দেওয়া হয়েছে, তার কাণ্ডধারী বা কাণ্ডারী করা হবে কাকে? স্রষ্টা-উদ্ভাবককে, না জ্ঞানবাহক বিশেষজ্ঞ-সৃষ্টিধরকে? যদিও জ্ঞানপ্রবাহের আধার স্বরূপ জ্ঞানবৃক্ষের অধিকাংশ ব্যাপারই সৃষ্টিধরের; কিন্তু মূল দায়িত্বে বসানো হবে কাকে? উদ্ভাবককে না বিশেষজ্ঞকে? স্রষ্টাকে না সৃষ্টিধরকে? শিবকে না দক্ষকে? পুরুষকে না প্রকৃতিকে? স্রষ্টাকে না তার পুত্রকে? স্রষ্টাকে না তার প্রেরিত দূতকে? এর সঙ্গে আর একটি গুরুতর প্রশ্ন জড়িয়ে গেল — মন না দেহ, মানবিক অস্তিত্বমাত্রকে কে চালায়? তার কাণ্ডারী কে? কারণ, দেখা গেল, স্রষ্টাকে সর্বোচ্চ আসন দিলে সব কিছুর সামনে চলে আসে মন, আর সৃষ্টিধরকে সর্বোচ্চ আসন দিলে সব কিছুর সামনে চলে আসে দেহ। জ্ঞানবৃক্ষের ক্ষেত্রে কাকে কাণ্ডারী করা হবে, দেহকে না মনকে?[১৮]

একধরনের যুক্তিবাদী আছেন, যাঁদের চিন্তাপদ্ধতি যন্ত্রের মতো। সেই চাষার কথা ভাবুন, গরম কাস্তে জলে ডোবালে ঠাণ্ডা হয় দেখে যে তার বুড়ি-মায়ের জ্বর-তপ্ত গরম-গা ঠাণ্ডা করার জন্য তাকেও পুকুরে চোবানো উচিত বিবেচনা করেছিল। এঁরাও সেইরকম। এঁরা বায়োডাটা দিয়ে মানুষ চেনেন। ঈশ্বরের বাড়ি, ফোন নম্বর, বউয়ের নাম, এসব না পেলে ঈশ্বরের পুত্র বা প্রেরিত দূতকে এঁরা চিনতে পারেন না। বায়োডাটা কই? সমাজমনের গভীরতম লোকে সর্বজনীন (মহামায়ার) অব্যক্ত জ্ঞানপ্রবাহের যে সূর্যকিরণ সতত বিচ্ছুরিত হয়ে চলেছে, তা এঁরা দেখতে পান না। তাই মানুষের ঈশ্বরবিষয়ক, ঈশ্বরপুত্র বা ঈশ্বর-প্রেরিত দূত বিষয়ক ধারণাগুলিকে শোনামাত্রই তাঁরা নস্যাৎ করে দেন। অথচ এসব ধারণা যে আদৌ শূন্য থেকে জন্মায়নি, আজ তা স্পষ্ট বোঝা যায়। মানুষের সমাজে 'আমার' ('mine' বা 'মীন' অবতারের) অর্থাৎ ব্যক্তিমালিকানার ধারণার জন্ম যেমন তার সমান্তরালে জগৎস্রষ্টার বা ঈশ্বর-ধারণার জন্ম দিয়েছিল,[১৯] সেভাবেই মানুষের সমাজে আবিষ্কারক ও বিশেষজ্ঞ (পুরুষ ও প্রকৃতি) সক্রিয় হতেই 'ঈশ্বর ও ঈশ্বরপুত্র' বা 'ঈশ্বর ও তাঁর প্রেরিত দূত' ধারণার জন্ম হয়েছিল। সঙ্গত কারণেই তাঁদের আবির্ভাব ঘটেছিল, আজও যার যাথার্থ্য 'বর্ত্তমান।

যাঁরা সেই ঈশ্বর বা ঈশ্বরের পুত্র বা প্রেরিত দূতকে নিয়ে ব্যবসা করেন, তাঁদের অজস্র দোষ আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু কিছু ধর্মবাণিজ্যিকের দোষে মানবজাতির প্রকৃত অর্জনকে ফেলে দেওয়া যায় না। তা করলে, আমাদের পূর্বপুরুষদের অর্জিত সত্যকেই আমরা নিজেদের অতি-চালাকির কারণে হারাব। পূর্বপুরুষদের সেই সমস্ত সত্যকে ফেলে দিলে মানবজাতি নিঃস্ব হয়ে যাবে। তাঁদের সেকেলে কথাবার্তার অর্থ যতটুকু বুঝতে পারা যায়, ততটুকু বুঝতে হয়। যা বোঝা যাচ্ছে না, তা যেমন আছে, তেমন থাকতে দিতে হয়, অপেক্ষা করতে হয়। সেই উত্তরসূরি একদিন জন্মাবেই, যে এই সব রহস্যই পরিষ্কার করে দেবে। না বুঝে এখনই ফেলে দিলে পরে একদিন পস্তানোরও জায়গা থাকবে না। আজ যে-পস্তানিতে খানিকটা ভুগছে ইয়োরোপ-আমেরিকা এবং 'এশিয়ান মিস্টিসিজম'-এর ভিতরে তাঁদের 'হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ'-এর দেখা মিলবে এই আশায় এশিয়ার দুয়ারে এসে ধরনা দিচ্ছে।

আদি জ্ঞানবৃক্ষ নিয়ে সমস্যায় পড়া সেকালের মানুষ অবাক হয়ে দেখলেন — জ্ঞানবৃক্ষকে বিষবৃক্ষে পরিণত হতে না-দেওয়ার কোনো উপায় দেখা যাচ্ছে না। কারণ, স্রষ্টা ও সৃষ্টিধরের (বা পুরুষ ও প্রকৃতির) সম্বন্ধ যে সামাজিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়েছিল, সেই ভিত্তিটাই বদলে গেছে, সমাজমনের মাটিটাই বদলে গেছে; এবং তা সামাল দিতে সৃষ্টিধরকেই বসিয়ে দিতে হচ্ছে সর্বোচ্চ আসনে। তাঁরা দেখলেন, স্রষ্টাকে যতদিন সর্বোচ্চ আসনে রাখা হয়েছিল, জ্ঞানবৃক্ষ ততদিন অমৃতফল প্রসব করছিল। কিন্তু সে আসনে সৃষ্টিধরকে বসানোর পর দেখা গেল জ্ঞানবৃক্ষ থেকে বিষফল ফলছে; যদিও উভয় ক্ষেত্রেই জ্ঞানবৃক্ষের বাকি সমস্ত আসনে তার উদ্ভবকাল থেকে বসে আছেন সৃষ্টিধরেরাই। অনন্যোপায় প্রাচীন মানবসমাজ দেখতে পায়, তাদের সাধের জ্ঞানবৃক্ষ বিষবৃক্ষে পরিণত হয়ে যাচ্ছে অথচ তাদের কিছু করার নেই। অতঃপর সেই বিষবৃক্ষে বিষফল ফলতেই থাকে, সমাজ সেই ফল ভক্ষণকে নিন্দাও করতে থাকে এবং সেভাবেই সেই প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের সমাজ যুগপৎ বিষবৃক্ষের চাষ (ভজনা) ও নিন্দা করতে থাকে! বিষবৃক্ষরূপী জ্ঞানবৃক্ষের চাষ কিন্তু আর বন্ধ হয় না। মানবজাতির সমগ্র সংসার-অরণ্য আজ সেই বিষবৃক্ষে ছেয়ে ফেলেছে। এই বিষবৃক্ষগুলিকেই একালে আমরা 'অ্যাকাডেমিক ইনস্টিটিউশন' বলে থাকি।

যেখানে 'একই কর্মের পুনরাবৃত্তি'মূলক যান্ত্রিক নীতিতে কাজ-কারবার চলে, সেই স্থানগুলিকে বাংলাভাষায় 'শল্' ক্রিয়াজাত শব্দ 'শালা' বা 'শাল' শব্দে শনাক্ত করা হয়ে থাকে; যেমন ঢেঁকিঘর = ঢেঁকিশাল, রান্নাঘর = রান্নাশাল, কর্মের ঘর = কর্মশালা, কামারঘর = কামারশালা, ... এবং পাঠগৃহ = পাঠশালা। 'পাঠশালা' শব্দটি স্বভাবতই আমাদের বলে দেয়, এখানে যান্ত্রিক নীতিতে লেখাপড়ার কাজ চলে। ইংরেজ আসার আগে বঙ্গসমাজে উত্তরপ্রজন্মের শিক্ষা-দীক্ষার কাজটি চালাত এই পাঠশালাগুলি। যতদূর জানা যায়, এই পাঠশালাগুলির অধিকাংশই চালাতেন অব্রাহ্মণেরা।

আর এক ধরনের পাঠগৃহ আমাদের ছিল, যেগুলিকে বলা হত চতুষ্পাঠী বা টোল। এগুলি চালাতেন ব্রাহ্মণেরা। টোলগুলিতে বেদাদি পাঠের ব্যবস্থা ছিল, যেকারণে কেবলমাত্র

ব্রাহ্মণসন্তানেরাই সেখানে লেখাপড়া করতে পারত। আর ছিল মক্তব-মাদ্রাসা। সেগুলি ছিল তক্ষশীলা-নালন্দার বাগদাদী বংশধরদের সুদূর উত্তরসূরির বঙ্গীয় রূপায়ণ, যা প্রধানত মুসলমান ছেলেমেয়েদের জন্য। প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে এই ছিল আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার 'সুরত-এ-হাল', 'আবর্ত্তমান' অবস্থা।

প্রাচীন ইয়োরোপেরও এই দুই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল। অভিজাতদের ছেলেমেয়েদের কর্মজ্ঞান দেওয়ার কাজে তাঁরা ক্রীতদাসদের নিযুক্ত করতেন। সেখানে যা পড়ানো হত, সেগুলিকে আমাদের পাঠশালাগুলিরই ইয়োরোপীয় পরিবর্ত বলা যেতে পারে। আর ছিল schole (scheme আর 'স্কেম' যেমন একই পিতার উত্তরসূরি, গ্রীক skhole ও তার ল্যাটিনায়িত রূপ schola আর আমাদের 'স্কল'ও তেমনি একই আদি শব্দের উত্তরসূরি। এই schole থেকে পরে ইংরেজিতে school শব্দটি তৈরি হয়েছে।) সেখানে যা পড়ানো হত এবং যেভাবে পড়ানো হত, তা অনেকটা আমাদের টোলের মতোই। টোলে যেমন ব্রাহ্মণদের সর্বাধিকার ছিল, এগুলিতেও অভিজাতদের (ইয়োরোপের ব্রাহ্মণদের) সর্বাধিকার ছিল। দীর্ঘ পথ বেয়ে শিল্পবিপ্লবের পর ইয়োরোপের এই শিক্ষাব্যবস্থা উত্তীর্ণ হয় school, college, university-তে। তারই মডেল ভারতে পৌঁছায় ব্রিটিশ শাসকের হাত ধরে। ভারতের মাটিতেই যে পৃথিবীর আদি বিশ্ববিদ্যালয় (তক্ষশীলা, পরে নালন্দা) গড়ে উঠেছিল, তারই গৌরব বাহিত হয়ে একদিন গড়ে উঠেছিল কনস্টানটিনোপল, বাগদাদ, অজহর, এবং আরও পরে কর্ডোভা; আর সেই কর্ডোভা থেকেই ক্রমে একদিন গড়ে উঠেছিল ইয়োরোপের university, সেসব কথা ততদিনে আমরা একেবারে ভুলেই গিয়েছি। ফলে বহু দিন পরে বহু পথ ঘুরে তক্ষশীলার উত্তরসূরি যখন ফিরে এল, তাকে আমরা চিনতেই পারলাম না। চিনতে না পারার আরও একটা বড় কারণ ছিল এই যে, তার বহু আগেই আমরা তক্ষশীলা ও নালন্দাকে খুন করে কবরস্থ করে দিয়েছিলাম এবং চলে গিয়েছিলাম টোল ও পাঠশালায়। মাঝ থেকে মক্তব-মাদ্রাসা ঢুকে পড়েছিল, এই যা। এদের বাদ দিলে অশোকের আগে ভারতের যে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল, ব্রিটিশ যুগের প্রারম্ভেও ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা প্রায় তাইই ছিল। সময়ের ছাপ ছাড়া তাতে আর কোনো বদল ঘটেনি।

'ক্ষত' করে বা 'খাত' কেটে আনা কিংবা বানানো যায় যাকে, তাকে 'খান' বলা হত। বাংলায় এর উত্তরাধিকার 'খান', (এক-*খান*) 'খানা' (*খানা*-খন্দ) বা নালা, ফারসিতে তার উত্তরাধিকার ঘরবাড়ি, খাবারদাবার অর্থে। বঙ্গদেশে পাঠান-মোগলের শাসনকালে ফারসি 'খান্হ' বা 'খানা' শব্দটি বাংলার 'ঘর', 'গৃহ' বা 'শালা'র প্রতিশব্দ হিসেবে প্রচলিত হয়ে যায়; যথা বৈঠকখানা, মুদিখানা, মালখানা ইত্যাদি। আদি 'কর্' শব্দের উত্তরাধিকার ফারসির ছিলই, সেই সুবাদে 'কার্য্যগৃহ' বা 'কর্মশালা'র পরিবর্তে তাদের 'কারখানা' শব্দটিও বাংলায় প্রচলিত হয়ে যায়। ব্রিটিশ ভারতে আসার পর, তাদের factory, workhouse, workshop, mill, manufactory প্রভৃতি শব্দের পরিবর্ত শব্দরূপে বাংলাভাষায় সাধারণভাবে 'কারখানা' শব্দটি ব্যবহৃত হতে থাকে। লোকে বুঝে যায়, ওই স্থানগুলিতে 'একই কর্মের পুনরাবৃত্তির' যান্ত্রিক

নীতিতে কাজ কারবার চলে। রবীন্দ্রনাথ যখন সক্রিয়, তখন ব্রিটিশ সরকার আমাদের দেশে যে liberal education-এর মডেলটি আমদানি করেছিল এবং তার ভিত্তিতে স্কুল-কলেজ চালাতে শুরু করেছিল, তাতে যে একইরকম যান্ত্রিক নীতিতে লেখাপড়া চলছে, রবীন্দ্রনাথের তা চোখে পড়ে যায়। তাই তিনি সেগুলিকে নাম দেন 'বিদ্যা-কারখানা'। মানুষের সন্তানকে এখানে ভরে দেওয়া হয়, তারা এক একটি যন্ত্রে পরিণত হয়ে বেরিয়ে আসে। অব্যক্ত জ্ঞানপ্রবাহে সিক্ত সাধারণ বাংলাভাষী তা অনুভব করে বলেই, কখনও-সখনও তাদের সম্পর্কে 'ছেলে তো নয়, এক-একটি যন্ত্র' বলে মন্তব্য করে বসে। এই বিদ্যাকারখানাগুলি যে আমাদের পাঠশালারই বিলেতফেরত আধুনিক রূপ, তাতে সন্দেহ নেই। স্বজাতীয় বলে তাদের চিনতে পেরেছিল বলেই আমাদের সে সময়ের অধিকাংশ পাঠশালাই ক্রমে 'প্রাইমারি স্কুল'-এ রূপান্তরিত হয়ে যায়।

আগেই বলেছি, ইয়োরোপের স্মৃতিতে খণ্ডভাবে ছিল শুধুমাত্র school। শব্দটি গৃহীত হয়েছিল গ্রীক skhole (= স্কোলে) শব্দ থেকে, যার অর্থ ছিল 'অবসর'। যে আদি শব্দ থেকে গ্রীকজাতি উত্তরাধিকার সূত্রে skhole পেয়েছিল, তার থেকে আমরাও পেয়েছিলাম 'ক্ষল'। প্রাচীন গ্রীসের গুরুরা সকলেই বাগানের অবসরকে বা 'স্কোলে'কে ব্যবহার করতেন তাঁদের শিষ্য বা ছাত্রদের মনে জ্ঞানের পরম্পরা দিয়ে যেতে। সেটিই ইয়োরোপের school-এর আদি রূপ। আমাদের কিন্তু পুরোটাই ছিল। কর্মক্ষেত্র থেকে সরে (অব-সরে) গাছের তলায় বসে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কর্মলব্ধ অভিজ্ঞতাকে গুছিয়ে নেওয়া, কর্মজগৎ ও বিশ্বজগতের সঙ্গে আমাদের যে সম্বন্ধ তা নিয়ে মানসলোক বিহার, উপলব্ধ অভিজ্ঞতার বিন্যাস করে রাখা, উত্তরপ্রজন্মকে বলা — এসব কিছুকে বলা হত 'ক্ষল্' (সঞ্চয়, চয়ন, শোধন, ক্ষালন)। যেখানে বসে এভাবে মানসলোক বিহার করা হত বা *উদ্‌লোকে যাওয়া* হত সেই গাছের তলাকে বলা হত 'উদ্-যান' বা উদ্যান। শুরুতে, অভিজ্ঞতা হস্তান্তরের এই প্রক্রিয়াকে সমাজ মহৎ কাজ রূপে চিহ্নিত করেছিল এবং যাঁরা তা করতেন তাদের চিনেছিল 'মহর্ষি'রূপে।

পরে পরে, অভিজ্ঞ ব্যক্তি যখন আর কখনওই কর্মে লিপ্ত না হয়ে বংশপরম্পরায় গাছতলায় বসে জ্ঞানদান করতে ও তার বদলে উৎপন্নের ভাগ পেতে ও নিজেদের 'ব্রাহ্মণ', 'অভিজাত' ইত্যাদি বলে দাবি করতে লাগলেন, কাজটি নিন্দিত হয়ে যায়। তখন শব্দটি 'ক্ষল' থেকে 'স্খল'-এ পরিণত হয়। কর্মক্ষেত্র থেকে স্খলিত বা পলাতক এই 'ক্ষল' ও 'স্খল' মানুষেরা সকলেই 'খল' হয়ে যায়। সেরকম খল জ্ঞানজীবী বা বেদজীবীর কাছে যে ছেলে শিক্ষা নিত, কর্মক্ষেত্রে লিপ্ত মানুষের চোখে সেও নিন্দনীয় হয়ে যায়; গ্রামবাংলায় আজও যার উত্তরাধিকার রয়েছে 'বেদাবাচ্চা'[২৩] শব্দে, যা এখনও গালাগালি রূপে প্রচলিত।

রবীন্দ্রনাথ সেই বিষবৃক্ষ দেখে এবং উত্তরপ্রজন্মকে তার ফল খেয়ে বিষগ্রস্ত হতে দেখে মর্মাহত হলেন এবং অমৃতফলদায়ী জ্ঞানবৃক্ষের স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন। তাঁর সেই স্বপ্নই বাস্তবায়িত হয় 'শান্তিনিকেতন'-এ। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি প্রচলিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে 'বিদ্যা-কারখানা' বলছিলেন, ততক্ষণ আমরা অবাক হইনি, কিন্তু যে-মুহূর্তে তিনি তাঁর

পরিকল্পিত শান্তিনিকেতনকে 'বনস্পতি' বললেন, আমরা তার মধ্যে অব্যক্ত জ্ঞানপ্রবাহের স্পষ্ট সঙ্কেত দেখতে পেলাম। মহান প্রজ্ঞা এভাবেই আত্মপ্রকাশ করে![১৬]

সাত. খ) জ্ঞানবৃক্ষের ফলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

আমাদের ছিল বেদ। 'বেদদোহন' করা হয়েছিল আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে 'মানবসমাজের আদি রাষ্ট্র' (পৃথু) প্রতিষ্ঠার পর। সম্ভবত তার ১০০ বছরের মধ্যেই বোধিদ্রুমের উদ্ভব ঘটে এবং তাতে চার রকমের ফল ফলতে শুরু করে, সেটিই চারি বেদ। পরমাপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ও সম্মুখস্থ বস্তুজগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, সবই সেই 'অধ্যাত্মবিদ্যা'র অন্তর্ভুক্ত ছিল। একে মনুষ্যত্বের শিক্ষা ও কর্মশিক্ষা রূপেও দেখা যেতে পারে। যুগ যত এগোয় বিভাজন তত বাড়তে থাকে। অশোক-পূর্ববর্তী কালে (চাণক্যের কালে) পৌঁছে আমরা দেখি, জ্ঞানবৃক্ষের ফল আর চার-বেদে সীমাবদ্ধ নাই; অজস্র টুকরো হয়ে গেছে তার। তিন বেদ, আন্বীক্ষিকী (আত্মবিদ্যা), দণ্ডনীতি (অর্থশাস্ত্র), বার্ত্তা (কৃষি, বাণিজ্য, আয়ুর্ব্বেদ ইত্যাদি) তখন পঠনপাঠনের বিষয়। কোথাও কোথাও তা চার বেদ, ছয় বেদাঙ্গ, মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ, ও ধর্মশাস্ত্র — এই চোদ্দো ভাগে পড়ানো চলছে। আরও পরে তা বত্রিশ ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। সবই এক টোল বা চতুষ্পাঠীতে পড়ানো হত তা নয়, এক কেন্দ্র থেকে নিয়ন্ত্রণ করে বিভিন্ন টোলে বিভিন্ন বিষয় পড়ানো হত, তাও নয়; বলতে গেলে যে-যার খুশিমত পড়াত। আমরা দেখছি, অশোকের কিছু আগেই তক্ষশীলা একটা রূপ পেয়ে গেছে। অনুমান করা যেতে পারে, অশোকের সময় তার একটা নিয়মতান্ত্রিক কেন্দ্রীভূত চেহারা গড়ে ওঠে তক্ষশীলায় এবং পরে হর্ষবর্ধনের সময়ে নালন্দায়। পরে তাও ভেঙে পড়ে। কিন্তু সমাজ তো দাঁড়িয়ে থাকে না। তার মানবিক জ্ঞানসমূহ চাই, কর্মজ্ঞানও চাই। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দের পর ব্রহ্মচর্যাশ্রম-স্বরূপ পাঠকেন্দ্রগুলি কার্যত দু-ভাগে ভাগ হয়ে গেল — টোল (চতুষ্পাঠী) ও পাঠশালা। টোলের হাতে মানবিক জ্ঞানসমূহ হস্তান্তরের কাজ এবং পাঠশালার হাতে কর্মজ্ঞান হস্তান্তরের কাজ চলতে লাগল। মোগল যুগে, এর ভিতর ঢুকে পড়ে মক্তব-মাদ্রাসা। তারও মনুষ্যত্বের জ্ঞান ও কর্মজ্ঞান দুটি ভাগ ছিল। ইংরেজ আসার আগে এই ছিল আমাদের জ্ঞানফলের হালহকিকৎ।

ইংরেজ উচ্চশিক্ষার যে বিগ্রহটা আমাদের দেশে ওপর থেকে বসিয়ে দিল, সে শিক্ষাটাকে বলা হত liberal education, অর্থাৎ যে শিক্ষা liber বা স্বাধীন মানুষের উপযুক্ত শিক্ষা। কী ছিল তাতে? আদিতে এই শিক্ষায় চর্চার জিনিস ছিল সাত রকমের liberal arts; এর নীচের পর্যায়ে ছিল Grammar, Rhetoric এবং Logic, যাদের একত্রে বলা হত Trivium; (আমাদের যা ছিল ষড়ঙ্গ বেদের অন্তর্ভুক্ত) এবং এর উপরের পর্যায়ে ছিল চারটি গণিতভিত্তিক বিষয় — Arithmetic, Astronomy, Geometry আর Music, যাদের একত্রে বলা হত Quadrivium (আমাদের যা ছিল জ্যোতিষ ইত্যাদিতে)। এই রকমের বিভাজন প্রাচীন রোমেই নির্দেশ করা হয়ে গিয়েছিল। মধ্যযুগের পরিণতির কালে যাজকশ্রেণী ও রাজশক্তির

সহযোগিতায় ইয়োরোপে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি গড়ে ওঠে, সেখানে খ্রিস্টীয় ঈশতত্ত্ব বা Divinity-র বিকল্পস্থানীয় Humanities হিসেবে (আমাদের যা আন্বিক্ষিকীর অন্তর্ভুক্ত ছিল), প্রাক্‌খ্রিস্টীয় যুগের ল্যাটিন ও প্রাচীন গ্রীক ভাষায় বিধৃত সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদির চর্চা শুরু হয়ে যায় (আমাদের যা সাধারণপাঠ্য রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও মঙ্গলকাব্যাদিতে চলছিল।)। আর Liberal Arts-এর Quadrivium-এর এলাকায় বিকাশ হতে লাগল নানারকমের জড়বিজ্ঞান ও জীববিদ্যা (ভারতে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দের পর যা আর তেমন বিকশিত হয়নি)। এই শিক্ষাব্যবস্থায় Liberal Arts-এর পাশাপাশি বা তাদের সমাপ্তিতে আইন, ঈশতত্ত্ব (Theology / Divinity — আমাদের যার পাঠ চলত মনুসংহিতাদির মাধ্যমে), ও চিকিৎসাশাস্ত্র (আমাদের ছিল আয়ুর্বেদ) অধ্যয়নের ব্যবস্থা অবশ্য ছিল। কিন্তু কোনো রকমের বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায় ঠাঁই দেওয়া হত না (ঠাঁই দেওয়া হত না আমাদের টোলেও)। Accountancy / Book Keeping, Business Administration, এবং নানারকমের যন্ত্র চালানোর বিদ্যা বা Engineering-এর কোনো অধিষ্ঠান ছিল না বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। তাদের অনুশীলন হত সীমিত চৌহদ্দির Institute প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে (ভারতেও তাই হত)। অর্থাৎ, উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাটাই ছিল সমাজের মাথায় যারা থাকবে ঠিক তাদের তৈরি করার জন্য। ঈশ্বরের ব্যবস্থা, মানবসমাজ এবং মানবদেহ — এই তিন এলাকার নিয়মের তারা খোঁজখবর রাখবে, কিন্তু সেটাও জীবিকার জন্য নয়, সেটা মনুষ্যত্ব অর্জনের স্বার্থে, সমাজ পরিচালনার যোগ্যতা অর্জনের স্বার্থে। নিছক বৃত্তিমূলক শিক্ষা অধীনস্থ ব্যক্তিদের জন্য, এবং সেজন্য সেগুলি সবই Liberal Education-এর বাইরে। অর্থাৎ এ ছিল আমাদের টোলেরই ইয়োরোপীয় মডেল।

এই শিক্ষাব্যবস্থায় যেমন উচ্চ-নীচ অথবা পাঙ্‌ক্তেয়-অপাঙ্‌ক্তেয় ভেদ মানা হয়েছিল, তেমনি এর সমর্থন ছিল সমাজের কৌলীন্য, অভিজাততন্ত্র বা Aristocracy-র দিকে। ফলে উঠতি গণতন্ত্র এবং ঐহিকতাবাদের প্রশ্রয়ে পার্থিব সম্পদ বাড়িয়ে যাওয়ার ক্রমবর্ধমান তাগিদে এই শিক্ষাব্যবস্থাকে পশ্চাদ্‌মুখী এবং কৌলীন্যপোষক বলে ভাবা হতে লাগল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে শিল্পবাণিজ্যের উপযোগী কর্মী এবং পরিচালক তৈরির চেষ্টায় Accountancy, Engineering প্রভৃতি বিদ্যার অনুপ্রবেশ ঘটতে লাগল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে। একই সঙ্গে ক্লাসিক্‌স্ চর্চার অবমূল্যায়ন হতে লাগল, আর গুরুত্ব দেওয়া হতে লাগল আধুনিক বিদ্যায় (যথা বিগত কয়েক শতাব্দীতে আবিষ্কৃত জড় ও জীববিজ্ঞানের নানাবিধ তত্ত্ব ও তথ্য), আধুনিক ভাষা ও সাহিত্যকে গুরুত্ব দেওয়া হতে লাগল। কিন্তু তত্ত্বের জগতে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটল না। ফলে, বলা ভুল হবে না, আগে যেখানে ছিল স্রোত-রোধী পশ্চাদ্‌মুখিতা, এখন সেখানে এল দিশাহীন পরিবর্তনশীলতা। Liberal Education যেন liberal হতে গিয়ে বিদিশাগ্রস্ত হয়ে গেল।

এই প্রবণতা চূড়ান্ত রূপ পেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তাদের একজন পুরোধা পুরুষ হেনরি ফোর্ড তো বলেই বসলেন, 'All history is bunk।' বাজারি অর্থনীতির নিয়ম আস্তে আস্তে

গ্রাস করতে লাগল বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্র চর্চার বিভাগ পর্যন্ত তুলে দেওয়া হল। কার্যত বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিকে দাঁড় করানো হল খামার ও কলকারখানার প্রয়োজন মতো দক্ষ কর্মী তৈরির কারখানায় অর্থাৎ মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করার কারখানায়। বাজারি অর্থনীতির বাধাবন্ধহীন প্রচলন কি সমাজে, কি বিদ্যার জগতে, প্রতিষ্ঠা করল এক দেহবাদী বিকাশের ধারা। সমাজের যেনবা গরিমাদীপ্ত মানুষ আর চাই না, কেবল যন্ত্রের মতো কারও নির্দেশানুসারে কাজ করবে এইরকম মানুষ চাই। যান্ত্রিকতায় মনুষ্যত্বের অধঃপতন ঘটানোই শিক্ষার উদ্দেশ্য হয়ে গেল। ইয়োরোপের Liberal Education সম্পূর্ণ রূপে অধঃপতিত হয়ে গেল।

ওই liberal শিক্ষাদর্শই ইংরেজ ভারতে এনেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। সবাই জানেন, ইংরেজ তা করেছিল দুটি স্বার্থে : এক, ইংরেজ শাসকের জন্য আমলা-কেরানি তৈরি করা, আর সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য ছিল এমন একটি শ্রেণী সৃষ্টি করা যারা রুচি বা মনের দিক থেকে যুক্ত হয়ে যাবে ইংরেজের সঙ্গে। তেমনি আমাদের দেশের মানুষের একটি অগ্রণী অংশ সে শিক্ষা চেয়েছিল দুটি কারণে : এক, ইংরেজের জমানায় চাকরি, ব্যবসায় প্রভৃতি ক্ষেত্রে বেশি প্রতিষ্ঠা পাওয়া, আর দুই, আধুনিক দুনিয়া এবং তার জ্ঞানের জগতের সুলুকসন্ধান। কিন্তু এর ফলটি হল ব্যাপক এবং মিশ্রতায় জটিল। দেশের উচ্চশিক্ষিত মানুষ দেশের ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। দ্বিতীয়ত যে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা এল, দেশের মানসজীবন থেকে বিচ্ছিন্নতার দরুন তাতে যান্ত্রিকতার প্রকোপ আরও তীব্রতর হল। সেই যান্ত্রিকতা চোখে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথের।

সাত. গ) জ্ঞানবৃক্ষ ও তার ফল বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা

এল স্বদেশী আন্দোলন। ইংরেজের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে শাসকের কুক্ষি থেকে বার করে এনে শিক্ষাকে স্বদেশমুখী করার উদ্যোগ হল। দেশের ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতিকে চর্চার বিষয় করা হতে লাগল। সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও গড়া হতে লাগল। এই প্রেরণায় স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বহু বিদ্যালয় গড়ে উঠল। সেগুলির প্রধান বিশেষত্ব হল এই যে, তারা দেশীয় সেকেলে বিদ্যাকারখানা বা টোল-পাঠশালা হতে চাইল না, দেহ ও মন সব দিক থেকেই সেগুলি ইংরেজের আধুনিক বিদ্যাকারখানাই হয়ে উঠল, বদল ঘটল শুধুমাত্র মালিকানার। অন্যান্য পণ্য উৎপাদনের কারখানাগুলিতে যেমন ব্রিটিশ মালিকের স্থানে ভারতীয় মালিক বসল, তেমনি এই বিদ্যাকারখানাগুলিতেও দেশী মালিক বসানো হল। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ সেই পুরুষ, দেহ-মন-মালিকানা সব দিক থেকেই যিনি আমাদের টোল-পাঠশালা ও ইংরেজদের বিদ্যাকারখানা উভয় দিক থেকে পৃথক হতে চাইলেন।

কেন পৃথক হতে চাইলেন, তার বিবরণ পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিষয়ক রচনাগুলিতে, (যা সংকলিত হয়েছে তাঁর 'শিক্ষা' গ্রন্থে), এবং বক্তৃতাগুলিতে। আমরা এখানে

তাঁর 'শিক্ষা' গ্রন্থ থেকে মূল কয়েকটি কথা পাঠকের ভাবনার জন্য তুলে দিচ্ছি।

১. **প্রচলিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মত —**

এখানে চলে 'শিক্ষা-দোকানদারির নীচতা'। এগুলো হল 'এগজামিন পাশের কুস্তির আখড়া'। ... 'ইংলন্ডে একদিন ছিল যখন সামান্য কলাটা মূলাটা চুরি করিলেও মানুষের ফাঁসি হইতে পারিত, কিন্তু এ যে তার চেয়েও কড়া আইন। এ যে চুরি করিতে পারে না বলিয়াই ফাঁসি। কেননা মুখস্থ করিয়া পাস করাই তো চৌর্যবৃত্তি। যে ছেলে পরীক্ষাশালায় গোপনে বই লইয়া যায় তাকে খেদাইয়া দেওয়া হয়; আর যে ছেলে তার চেয়েও লুকাইয়া লয়, অর্থাৎ চাদরের মধ্যে না লইয়া মগজের মধ্যে লইয়া যায়, সেই বা কম কী করিল? সভ্যতার নিয়ম অনুসারে মানুষের স্মরণশক্তির মহলটা ছাপাখানায় অধিকার করিয়াছে। অতএব, যারা বই মুখস্থ করিয়া পাস করে তারা অসভ্যরকমে চুরি করে, অথচ সভ্যতার যুগে পুরস্কার পাইবে তারাই?'

২. **প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর অভিমত —**

"এ সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য কথা এই যে, লেখাপড়া শেখানো বলিয়া আমরা আজকাল যাহা বুঝি তাহার জন্য বাড়ির গলির কাছে যে-কোনো একটা সুবিধামত ইস্কুল এবং তাহার সঙ্গে বড়ো জোর একটা প্রাইভেট টিউটার রাখিলেই যথেষ্ট। কিন্তু এইরূপ **'লেখাপড়া-করে-যেই-গাড়িঘোড়া-চড়ে-সেই'**-শিক্ষার দীনতা ও কার্পণ্য মানবসন্তানের পক্ষে যে অযোগ্য, তাহা আমি একপ্রকার ব্যক্ত করিয়াছি।" (*মোটা হরফ, হাইফেন আমাদের*)

৩. **শিক্ষার লক্ষ্য ও শিক্ষার স্থান বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত —**

'দ্বিতীয় কথা এই ... যদি কেবল পরীক্ষাফললোলুপ পুঁথির শিক্ষার দিকেই না তাকাইয়া থাকি, যদি **সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের ভিত্তিস্থাপনা**কেই শিক্ষার লক্ষ্য বলিয়া স্থির করি তবে তাহার ব্যবস্থা **ঘরে এবং ইস্কুলে** করা সম্ভবই হয় না। ...' (*মোটা হরফ আমাদের*)

৪. **স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক জ্ঞানের সূর্যালোক ও ব্যক্তজ্ঞানের বিজলির আলো সম্পর্কে তাঁর ধারণা—**

'বই পড়াটাই যে শেখা, ছেলেদের মনে এই অন্ধসংস্কার যেন জন্মিতে দেওয়া না হয়। প্রকৃতির অক্ষয় ভাণ্ডার হইতেই যে বইয়ের সঞ্চয় আহরিত হইয়াছে, অন্তত হওয়া উচিত, এবং সেখানে যে আমাদেরও অধিকার আছে, এ কথা পদে পদে জানানো চাই।'

৫. **প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা পরিত্যাজ্য বলে কেন তিনি মনে করতেন, তার কারণ —**

'যে শিক্ষাশালা সকলের চেয়ে স্বাভাবিক ও প্রশস্ত সেটা যে আমাদের পক্ষে নাই তাহা নহে — তাহা তদপেক্ষা ভয়ংকর, তাহা আছে অথচ নাই, তাহা সত্যকে পথ ছাড়িয়া দেয় না এবং মিথ্যাকে জমাইয়া রাখে। এ সমাজ গতিকে একেবারেই স্বীকার করিতে চায় না বলিয়া স্থিতিকে কলুষিত করিয়া তোলে।' ... 'স্বজাতীয়ের শাসনেই হউক আর বিজাতীয়ের শাসনে হউক, যখন কোনো-**একটা বিশেষ শিক্ষাবিধি** সমস্ত দেশকে একটা কোনো **ধ্রুব আদর্শে** বাঁধিয়া ফেলিতে চায় তখন তাহাকে 'জাতীয়' বলিতে পারিব না; তাহা সাম্প্রদায়িক, অতএব **জাতির পক্ষে তাহা সাংঘাতিক**।' ... (*মোটা হরফ আমাদের*)

৬. এই শিক্ষাব্যবস্থার বদল ঘটানোর কী উপায় তিনি ভেবেছিলেন —

'এতদিন ধরিয়া ইংরেজি বিদ্যার যে কলটা চলিতেছে সেটাকে মিস্ত্রিখানার যোগে বদল করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। তার দুটো কারণ আছে। এক, কলটা একটা বিশেষ ছাঁচে গড়া, একেবারে **গোড়া হইতে সে ছাঁচ বদল করা সোজা কথা নয়**। দ্বিতীয়ত, এই ছাঁচের প্রতি ছাঁচ-উপাসকদের ভক্তি এত সুদৃঢ় যে, আমরা ন্যাশনাল কলেজই করি আর হিন্দু য়ুনিভার্সিটিই করি আমাদের মন কিছুতেই এই ছাঁচের মুঠা হইতে মুক্তি পায় না। ইহার সংস্কারের একটিমাত্র উপায় আছে, এই ছাঁচের পাশে একটা **সজীব** জিনিসকে অল্প একটু স্থান দেওয়া। তাহা হইলে সে তর্ক না করিয়া, বিরোধ না করিয়া **কলকে আচ্ছন্ন করিয়া** একদিন মাথা তুলিয়া উঠিবে এবং কল যখন আকাশে ধোঁওয়া উড়াইয়া ঘর্ঘর শব্দে হাটের জন্য মালের বস্তা উদ্‌গার করিতে থাকিবে তখন এই বনস্পতি নিঃশব্দে দেশকে ফল দিবে, ছায়া দিবে এবং দেশের সমস্ত কলভাষী বিহঙ্গদলকে নিজের শাখায় শাখায় আশ্রয় দান করিবে।' (*মোটা হরফ আমাদের*)

কে কাকে আচ্ছন্ন করেছে, সে তো এখন আমরা দেখতেই পাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যদ্বাণী এ ক্ষেত্রে একেবারেই উলটো হয়েছে। তাঁর শান্তিনিকেতনকেই বিদ্যাকারখানাগুলি গ্রাস করে নিয়েছে। অথচ, সেই কারখানাগুলির হাত থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাঁচানোর জন্যই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন নামক 'সজীব' 'বনস্পতি' রোপণ করেছিলেন, যা 'ঘর এবং ইস্কুল' নয়, যেখানে আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের মনে 'সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের ভিত্তিস্থাপন' করা হত, যেখানে 'মনুষ্যত্বের শিক্ষা ও কর্মশিক্ষা', 'প্রাকৃতিক শিক্ষা ও বইয়ের শিক্ষা', 'স্বশিক্ষা ও সুশিক্ষা', 'প্রাচ্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা'কে মেলানোর চেষ্টা করা হত। সম্ভবত তিনি জানতেন না, জ্ঞানবৃক্ষের কাণ্ডধারীর পদ থেকে শিব চলে গেলে সেরকম সৃষ্টিশীল কাজ আর হয় না; জ্ঞানবৃক্ষ বিষবৃক্ষে পরিণত হয়ে বিষফল প্রসব করে। প্রকৃতির এই বিধান থেকে তাঁর এই বনস্পতিও নিষ্কৃতি পায়নি। তাঁর মৃত্যুর পর অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মতো তাঁর সাধের বিশ্বভারতী-শান্তিনিকেতনও বিদ্যাকারখানারূপী বিষবৃক্ষে পরিণত হয়ে গেছে।

তাঁর সময় তাঁকে একথায় বিশ্বাস করতে প্ররোচিত করেছিল যে, শিক্ষাক্ষেত্রে 'গোড়া হইতে' 'ছাঁচ বদল করা সোজা কথা নয়'। বিষবৃক্ষের একটি মাত্র ডাল ভেঙে দিলে বিষবৃক্ষ নির্মূল হয় না, সেকথা তিনি ভালই জানতেন; এমনকী সেই অপরাধে গান্ধীকে তিনি অভিযুক্ত করেছিলেন।[১৪] অথচ নিজের বেলায় ভাবলেন, অজস্র কারখানার মাঝখানে একটি মাত্র বনস্পতি রোপণ করলে সেটি শুধু টিকে যাবে নয়, কারখানাগুলিকে **আচ্ছন্ন** করে ফেলবে। তা যে হয়নি, সে তো দেখাই যাচ্ছে। তা হলে করণীয় কী? সে কথাতেই আসছি।

সাত. ঘ) ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে গিয়ে নেচার থেকে কতখানি সরে গেছি

জ্ঞানবৃক্ষের ইতিহাস থেকে আমরা দেখছি, আকাশ ও পৃথিবীর যে-সম্বন্ধ নেচার নির্দেশ করে রেখেছিল, সেখান থেকে আমরা সরে গেছি। পিতা বড়, না মাতা বড় — এরকম তুলনা হয়

না। যাঁর যেখানে স্থান তাঁকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত রাখতে হয়। যে-সংসারে বাবাই সব, মায়ের কোনো প্রতিষ্ঠা নেই কোথাও, তা যেমন দূষিত ও নষ্ট হয়ে যায়; তেমনি যে-সংসারে মাতাই সব, পিতার যথাস্থানে প্রতিষ্ঠা নেই, সে-সংসারকেও দুর্দৈব থেকে বাঁচানো কঠিন। শিকার করতে পটু যে, তাকে ঘরসংসার-রান্নাবান্নার দায়িত্ব দিলে, সে যেমন সব কিছু ঘেঁটে রাখে; তেমনই ঘরসংসার সামাল দিতে পটু যে, তাকে শিকারে পাঠালে সে নিজেই কারও শিকার হয়ে যেতে পারে অথবা কাদাজল মেখে হাত-পা ভেঙে হাজির হয়ে যেতে পারে। এসব সত্ত্বেও শিক্ষাসংগঠনের ক্ষেত্রে আমরা আবিষ্কারক-স্রষ্টাকে তাঁর আসন থেকে সরিয়ে দিয়েছি। ফলে শিক্ষারথের চালকের আসনে কোনো সমগ্রদ্রষ্টা বসে নেই, যে কিনা অব্যক্ত জ্ঞানের অজানা ধারণাদের (wild concept-দের) একটু-আধটু চেনে। গোটা শিক্ষাসংসারে এখন বিশেষজ্ঞের রাজত্ব, যাঁরা জ্ঞাত ধারণাদের (pet concept-দের) খুব ভাল করে চেনে এবং বিন্যাস করে রাখতে পারে ও কাজে লাগাতে পারে অর্থাৎ সার্থকভাবে ঘরসংসার সামাল দিতে পারে।[২১] এ দিকে সময় এগিয়ে চলেছে, সমাজ এগিয়ে চলেছে, নিত্যনতুন পরিস্থিতি আমাদের দিকে ছুটে ছুটে আসছে এবং তাদের আমরা চিনতে পারছি না। চিনতে পারার ও বিহিত করার যোগ্যতা যার ছিল, তাকে আমরা অপসারিত করেছি। তাই শিক্ষাসংসারের বহির্দৃষ্টি আজ অন্ধ। সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে দূষিত করে তোলার সেটাই মূল কারণ।

অপর দিকে জ্ঞানবৃক্ষের ফলের ইতিহাস থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, মানুষ হওয়ার শিক্ষাকে ক্রমশ পিছন দিকে ঠেলতে ঠেলতে ফেলে দেওয়া হয়েছে এবং যান্ত্রিক কর্মশিক্ষা শিক্ষাজগতের সবকিছুকে সম্পূর্ণ 'আচ্ছন্ন' করে ফেলেছে। এ শিক্ষাব্যবস্থায় মনুষ্যত্বের নিঃশ্বাস নেওয়ার জায়গাটুকু পর্যন্ত নেই। অর্থাৎ কিনা, আজকের শিক্ষাব্যবস্থা মানুষের দেহরূপ নৌকা সারাই, সাজানো, তাকে সোনার নৌকাতে পরিণত করা এবং তার গতিবৃদ্ধি করার গল্পে মুখর; কেবল নৌকাবিহারের কোনো কথা নেই, কোন দিকে নৌকা চালানো হবে সেই দিগ্‌দর্শনের কথা নেই। অথচ, নৌকাবিহারের আনন্দ লাভের জন্যই মানুষকে নেচার দেহরূপী নৌকাটি দিয়েছিল। তার যথার্থ ব্যবহার না করে, মানুষ আজ তার নিজের দেহদাস হয়ে গেছে। উপায় উদ্দেশ্যকে এমন ছাড়িয়ে গেছে যে, উদ্দেশ্যকে আজ আর দেখাই যায় না।

অতএব দেখা যাচ্ছে, সন্তানসন্ততির লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে আমরা মূল জায়গাটিতেই নেচার থেকে সরে এসেছি। মনকে তার আসন থেকে সরিয়ে দেহকে সেখানে বসিয়ে দিয়েছি। আর সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভাবক-স্রষ্টা-পুরুষ তাঁদের স্বস্থান থেকে চ্যুত হয়ে গেছেন এবং সেই স্থান পূরণ করেছেন যথাক্রমে বিশেষজ্ঞ, সৃষ্টিধর, ও প্রকৃতিশক্তি; নিজেদের স্ব-স্ব স্থান তো তাঁদের দখলে আছেই। তাই আজকের মানবসমাজ মানুষের দেহের গৌরবেই গমগম করছে, মানুষের মন গুরুত্বহীন হয়ে গেছে; সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভাবক ও স্রষ্টারা নিতান্তই ফেলনা হয়ে গেছেন। একালের মানবসভ্যতার সমস্ত দুর্গতির মূলে মনের এই স্থানচ্যুতি। মানুষ তো পশু নয়, নেচার তাকে মনপ্রধান-প্রাণীরূপে জন্ম দিয়েছিল, সে নিজে তার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পশুর পথে হাঁটতে লেগেছে, যা কিনা নেচারাল নয়, স্বাভাবিক নয়। ভারতীয় সংস্কৃতি সাক্ষ্য

দেয়, 'ত্রিপাদস্য দিবি' — মানবজীবনে মানুষের মনের অধিকার ৭৫ শতাংশ, দেহের অধিকার ২৫ শতাংশ। রবীন্দ্রনাথও সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। অথচ তা সত্ত্বেও ... ...

আট. লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষার স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক নীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাব্য উপায়

গত তিন-চারশো বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিশ্বে আবিষ্কারক জন্ম দেওয়ার তালিকায় জার্মান জাতির নাম সবার আগে, অথচ সূক্ষ্ম জিনিসপত্র তৈরিতে তাদের তেমন নাম নেই। বিপরীতে চীন ও জাপান খুঁটিনাটি ও সূক্ষ্ম জিনিসপত্র তৈরিতে বিশ্বে এক নম্বর স্থানে, কিন্তু এ পর্যন্ত আবিষ্কারক জন্ম দেওয়ার তালিকায় তাদের নাম তুলনায় অনেক কম। ... প্রতিটি জাতির এরকম নিজ নিজ বিশেষত্ব রয়েছে। কেউ কেউ একে stereotype বলে থাকেন। গভীরভাবে অনুধাবন করলে দেখা যায়, এই বিশেষত্বের পিছনে আছে জাতিটির সন্তান লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষার বহুকালক্রমাগত অভ্যাসের ফল, একালে যে অভ্যাসকে আমরা সংস্কৃতি বা কালচার বলে থাকি। দেখা যায়, যে জাতির সংস্কৃতিতে লালনের স্থান পালনের আগে, সে জাতির আবিষ্কারক-স্রষ্টা জন্ম দেওয়ার (বা শিব গড়ে তোলার) ক্ষমতা বেশি। আর যে জাতির সংস্কৃতিতে পালনের স্থান লালনের আগে, সে জাতির দক্ষ মানুষ তৈরির ক্ষমতা বেশি হয়ে থাকে। ফ্যাসিবাদে পীড়িত হওয়ার আগের জার্মান অভিভাবকদের দিকে তাকিয়ে দেখুন, ছেলেমেয়েরা তাদের কী-নাই করছে অথচ তাঁদের ভ্রূক্ষেপ নেই; তাঁরা যে-যার কাজ করে চলেছেন। 'ওটা করছ না কেন,' 'এটা কোরো না,' এরকম কোনো বিধিনিষেধের কথা যেন তাঁরা বলতেই জানেন না। যে-সাংস্কৃতিক ভিত্তির উপর তাঁদের এই মানসিকতা গড়ে উঠেছিল, তাঁদের ইতিহাসে তো বটেই, এমনকী তাঁদের সামান্য একটি চলচ্চিত্র 'The Sound of Music'-এও তার খবর পাওয়া যায়, যার অনুসরণে বাংলায় 'জয়জয়ন্তী' নামে চলচ্চিত্রটি নির্মিত হয়েছিল। আর চীন ও জাপানের ছেলেমেয়েদের দেখুন। বাচ্চা মেয়েদের পায়ে কাঠের জুতো বাঁধা, পা যেন কিছুতেই বড় না হয়; ছেলেদের বিশাল টিকি, নির্ধারিত চালচলন। কীভাবে খাবে, কীভাবে বসবে, কীভাবে জামাকাপড় পরবে, সব নিয়মানুগ, যেন কলের পুতুল। অর্থাৎ জার্মান জাতির কালচারে ছেলেমেয়েদের লালন করা, আশকারা দেওয়া, লাই দেওয়ার রেওয়াজ এমন প্রথাগত যে, যেন-বা অভ্যাসটি তাঁদের রক্তে মিশে রয়েছে। বিপরীতে চীনা ও জাপানিদের কালচারে লালন নেই বললেই চলে; অথচ পালন রয়েছে পুরোদমে। শৈশবের এই ব্যবহার কেবল তাদের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ ঠিক করে দেয় না, জাতির ভবিষ্যৎও ঠিক করে দেয়। এই সেই মূল কারণ, যার জন্য মৌলবাদী, ফ্যাসিবাদী, কমিউনিস্ট প্রভৃতি কট্টরপন্থীদের দ্বারা শাসিত দেশে আর যাই হোক, স্রষ্টা-উদ্ভাবক-আবিষ্কারক বড়মানুষ বা শিবগুণসম্পন্ন মানুষদের জন্ম হয় খুবই কম; পূর্বতন কালচারের গুণে কিছু হয়ে থাকলেও তাদের দেশ ছেড়ে না পালিয়ে বেঁচে থাকা কঠিন হয়। আইনস্টাইনদের ইতিহাস তার সবচেয়ে বড় সাক্ষী। The Sound of Music-ও সেকথাই আমাদের জানায়।

বস্তুত জীবের শৈশব যেভাবে গঠিত হয়ে যায়, সেই গঠনই তার পরবর্তী জীবনের গতিমুখ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। লালন মানবশিশুকে সমাজের প্রচলিত জ্ঞানের পরিধির বাইরে হাত বাড়াতে প্ররোচিত করে। বিপরীতে পালন মানবশিশুকে আত্মরক্ষা করতে, নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রেখে নিজের মনুষ্যত্বকে খুঁটিনাটিতে প্রকাশ করতে প্ররোচিত করে।

আমাদের ভাষায় 'পশুলালন' বলে কোনো কথা নেই, কিন্তু 'পশুপালন', 'গোপালন' ইত্যাদি আছে। অর্থাৎ পশুপাখিদের লালন করার দায়িত্ব আমরা নিইনি, কিন্তু ছেলেমেয়েদের লালন ও পালন দুটো দায়িত্বই আমরা নিয়েছি। তার মধ্যে আবার লালন সর্বাগ্রে। আমাদের সংস্কৃতিতে লালনের অভ্যাস যে বেশি, তাতে সন্দেহ নেই। 'লালয়েত পঞ্চবর্ষাণি' কথাটি অধিকাংশ ভারতীয়ই জানেন ও মানেন, তা তিনি লেখাপড়া জানুন আর নাই জানুন। সেই সুবাদে আমাদের দেশ আবিষ্কারকের জন্ম দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণীও বটে। বিশেষত জার্মান জাতি যদি এ-ব্যাপারে এক নম্বরে থাকে, আমাদের নাম তার আগেই থাকার কথা। নেই যেকারণে, তা হল, একালে দেহভিত্তিক আবিষ্কারগুলিকেই আবিষ্কার ও সৃষ্টি বলে মনে করার একটা দক্ষসুলভ একপেশে রেওয়াজ চালু হয়েছে, মনভিত্তিক আবিষ্কারগুলিকে দক্ষ-পরিচালিত ব্যবস্থাগুলি সহজে বুঝে উঠতে পারে না; যদিও সেগুলিই মানবসভ্যতার মুখ্য অর্জন, আবিষ্কার ও সৃষ্টির প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই মানসিক আবিষ্কারগুলির অধিকাংশই সম্বন্ধের নিয়মের খবর; স্বভাবতই সেগুলি দর্শনভিত্তিক, অঙ্কভিত্তিক (ম্যাথমেটিক্যল), বিজ্ঞানভিত্তিক — ফিলজফি, পিওর ম্যাথমেটিকস, পিওর সায়েন্স। এগুলি প্রধানত জীবের, জগতের, মানুষের, সমাজের, বস্তুর ধর্মের সঙ্গে জড়িত। এই সব ক্ষেত্রে বহু আবিষ্কার আগুন আবিষ্কারের কাল থেকেই হয়ে আসছে। সে আবিষ্কারগুলি স্বাভাবিক নিয়মেই পরে পরে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের (রিলিজিয়নের) সঙ্গে জড়িয়ে যায়। যে অব্যক্ত জ্ঞানপ্রবাহকে সম্প্রতি 'অতিচেতন' নামে কোয়ান্টাম বিজ্ঞানীরা শনাক্ত করার চেষ্টা করেছেন, তার সঙ্গে জগৎ-জীবন ও মানুষের সম্বন্ধ বিষয়ে ভারতের অজস্র আবিষ্কার রয়েছে। সেই সমস্ত আবিষ্কারকে 'ধর্মীয় ব্যাপার' বলে দাগিয়ে দিয়ে ঠেলে রাখা হয়েছে রিলিজিয়নের এলাকায়। কেবল শূন্যের ও সংখ্যার আবিষ্কার, সুর-সঙ্গীত-ভাষা-সাহিত্য-কাব্যের জগতের কয়েকটি সৃষ্টি ও আবিষ্কার (সম্প্রতিকালে Vedic Mathmatics) একালের অ্যাকাডেমিক মহলে একটু আধটু স্বীকৃতি পেয়েছে। অথচ এই ধারাতে কত আবিষ্কারক-স্রষ্টা যে ভারতের মাটিতে জন্মেছেন, তার হিসেব নেই। সবাইকে ধর্মগুরু, সাধক, যোগী, সিদ্ধপুরুষ ইত্যাদি নাম দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের 'ধর্মস্রষ্টা'র তালিকায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে; বস্তুধর্মের আবিষ্কারকের তালিকায় তাদের নাম লেখাই হয়নি। আলেকজান্ডারের গুরুকে যদি আবিষ্কারক-স্রষ্টার আসনে বসানো হয়, তাহলে চন্দ্রগুপ্তের গুরু চাণক্য কী দোষ করল, বোঝা কঠিন। আমাদের বিচারে সক্রেটিস প্লেটো অ্যারিস্টটলেরাও স্রষ্টা, চাণক্য-আর্যভট্টেরাও স্রষ্টা। যিশু, বুদ্ধ, মহম্মদ, মনসুর, কৃত্তিবাস, কাশিরাম, শ্রীচৈতন্য, নানক, কবির, রামকৃষ্ণ, লালনফকির ... এমনকী ভবা পাগলাও স্রষ্টা। এঁদের গুরুত্ব ও মর্যাদার তারতম্য আছে কি নেই, থাকলে কতখানি, সেসব প্রসঙ্গ

এখানে অবান্তর। ভারতের এই স্রষ্টা-সৃজনের ধারার শেষ জাতকের নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

লালন-এর শত্রু আর্থিক অভাব বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ততখানি নয়, যতখানি সামাজিক সন্ত্রাস। এই সন্ত্রাস আসে নানাভাবে — পরাধীনতা, যুদ্ধবিগ্রহ, হিংস্র রাজনীতি, মৌলবাদ, উগ্রপন্থা ইত্যাদির নামে। সন্ত্রাস মানুষের মুখের হাসি কেড়ে নেয়। সন্ত্রস্ত অভিভাবক তাঁর সন্তানসন্ততিকে নানা বিধিনিষেধের ঘেরাটোপে রাখতে বাধ্য হন, পাছে তার সন্তানসন্ততি বহমান সন্ত্রাসঝঞ্ঝার মধ্যে পড়ে গিয়ে প্রাণ হারায়। ওই ঘেরাটোপ সেই সন্তানসন্ততিকে বাড়তে দেয় না। ফ্যাসিবাদগ্রস্ত জার্মান, মৌলবাদগ্রস্ত মধ্যপ্রাচ্য, তথাকথিত সমাজতন্ত্রবাদী দেশগুলি মানুষকে সন্ত্রস্ত করে রাখত বা রাখে বলেই তাদের আমলে 'লালন' অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলস্বরূপ সেই সেই সমাজে বড়মানুষের জন্ম স্তব্ধ হয়ে যায়, ছোটমানুষে সমাজ ভরে যায়; যারা ছোট হতে রাজি হয় না, তারা পালায়। হিটলারের আমলে বড়-জার্মান পালিয়ে যায় এবং জার্মান জাতির অধঃপতন ঘটে। মৌলবাদী মধ্যপ্রাচ্য ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ক'জন স্রষ্টার জন্ম দিতে পেরেছে? সাম্প্রতিক ভারতের যে যে অঞ্চলকে নানারঙের মৌলবাদী উগ্রপন্থী সন্ত্রাসবাদী সাম্প্রদায়িক হিংস্র রাজনীতি গ্রাস করেছে, সেই সেই অঞ্চলে মানবসন্তানের লালন অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, হচ্ছে। মানুষকে যারা ধমকায়, তারা লালনের শত্রু।

সংস্কৃতি সাক্ষ্য দেয়, আমাদের দেশ হল 'শিবঠাকুরের দেশ' বা আবিষ্কারকদের দেশ। লালন আমাদের অভ্যাসের সঙ্গে মিশে ছিল, অনেকটা আছেও। ভারতবর্ষের ইতিহাসের নানান উথালপাথাল, সামাজিক ধমকানির বাড়বাড়ন্ত সেই লালনকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করলেও, এখনও ভারতীয়রা সাধারণভাবে সন্তানসন্ততির লালন-পালনের ক্ষেত্রে লালনকেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন।

যে-শিশুর বয়স পাঁচ বছর পেরোয়নি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখন তাকে স্কুলে ভর্তি করা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। অনেক আগেই তা হওয়া উচিত ছিল এবং বিশ্বের সব দেশেই হওয়া উচিত। লালয়েত পঞ্চবর্ষাণি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন আরও বেশি — ছ-সাত বছর। 'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে' কথাটি আমরা অ্যাকাডেমি-শিক্ষিত বাংলাভাষীরা সবাই জানি; 'বালগোপাল'-এর উত্তরাধিকারও আমাদের আছে। তা সত্ত্বেও আমাদের দেশে এখন দু-তিন বছরের শিশুকে যন্ত্র বানানোর কারখানায় নিয়ে যাওয়ার রেওয়াজ শুরু হয়েছে। এ হল ঈশ্বর-অবমাননার মতো পাপ কাজ। এ সব পাপ কাজ অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত। কমপক্ষে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত মানুষের সন্তানসন্ততিকে লালন করা, লাই দেওয়া, আশকারা দেওয়ার চিরায়ত নেচারাল নীতিই আমাদের মান্য করা উচিত।

শিক্ষাক্ষেত্রে পুনরায় নেচার-নির্দিষ্ট পথে ফিরে যেতে হলে মনকে বসাতে হবে স্বস্থানে, উদ্ভাবক-স্রষ্টা-শিবগুণসম্পন্ন মানুষকে বসাতে হবে আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির কাণ্ডারীর আসনে। তেমন করতে পারলে, ক্রমান্বয়ে বাকি সমস্ত অহিতের বিনাশ হয়ে যাবে। এই কাজটিই তাঁর যুগে বসে 'বিশ্বভারতী-শান্তিনিকেতন' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে করার চেষ্টা করেছিলেন

রবীন্দ্রনাথ। সে কাজ করতে গিয়ে তিনি যে-যে প্রক্রিয়াগুলি গ্রহণ করেছিলেন, সেগুলির অধিকাংশই সঠিক প্রক্রিয়া; তাঁর যুগের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ উত্তরপ্রজন্মের শিক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আমাদের কাজ সেগুলিকে আপডেট করে নেওয়া।

কিন্তু সেকালীন সমাজকাঠামো রবীন্দ্রনাথের বনস্পতির অনুকূলে ছিল না। তাই তাঁর গড়ে তোলা শান্তিনিকেতনের শেষরক্ষা হয়নি। তবুও, বিশ্বের সমস্ত বিদ্যাকারখানার মাঝে তাঁর শান্তিনিকেতন মস্ত বড় একটি নিরীক্ষা (experiment)। এই নিরীক্ষা আমাদের জানিয়ে দেয়, কী করলে সারা দেশে অজস্র শান্তিনিকেতন গড়ে তুলে আমাদের সন্তানসন্ততির যথাযথ শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। তার জন্য সমাজকাঠামোর দিকে আজ আমাদের নজর দিতে হবে। সমাজকাঠামোর যে আদলটি এখন রয়েছে, তা পঞ্চ-অশ্বত্থের শাখায় তো বটেই, এমনকী কাণ্ডারীর আসনেও অশ্ব বা স্পেশালিস্ট-বিশেষজ্ঞদের বসিয়ে রাখাকে যুক্তিসঙ্গত মনে করে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, আরেক ধরনের সমাজকাঠামো সম্ভব (যার একটি রূপ প্রাচীন অতীতে কার্যকর ছিল) যে-কাঠামো সমস্ত অশ্বত্থের কাণ্ডারীর আসনে উদ্ভাবক-স্রষ্টাকে এবং শাখা-প্রশাখায় সৃষ্টিধরদের বসানোই যুক্তিসংগত মনে করে। সেরূপ সমাজকাঠামো থাকলে, জ্ঞানবৃক্ষ অমৃতফলদায়ী বনস্পতিরূপে অনায়াসে টিকে থাকতে পারে। ...

সন্দেহ নেই, তেমন সমাজকাঠামো গড়ে তোলা বেশ বড় ব্যাপার। তার আলোচনা সেকারণেই 'বাংলাই বিশ্বকে পথ দেখাতে পারে' শীর্ষক পৃথক প্রবন্ধে করা হচ্ছে।[২২] এখানে তার প্রাসঙ্গিক কথা খুব সংক্ষেপে বলে নেওয়া যেতে পারে।

ওই প্রবন্ধটিতে 'পূর্ণ-গণতন্ত্র' নামক এক প্রকার 'দ্বৈরাজ্যিক সমাজকাঠামো'র প্রস্তাব রাখা হয়েছে। তাতে রয়েছে স্রষ্টা ও সৃষ্টিধরের (অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতির /স্রষ্টা ও তাঁর পুত্রের /স্রষ্টা ও তাঁর প্রেরিত দূতের /শিব ও দক্ষের /সৃজনশীল-উদ্ভাবক ও বিশেষজ্ঞ-স্পেশালিস্টের) দ্বৈরাজ্য — সর্বক্ষেত্রেই; শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, উৎপাদনে, রাষ্ট্রব্যবস্থায়, প্রশাসনে ... সর্বত্র। প্রবন্ধটির প্রস্তাব মতে, সারা দেশ জুড়ে গড়ে তুলতে হবে অজস্র অণুবর্ষ (যথা, পাঁশকুড়া অণুবর্ষ, জয়নগর অণুবর্ষ, চণ্ডীপুর অণুবর্ষ... ইত্যাদি); প্রতিটি অণুবর্ষে ৪০/৫০টি গ্রাম, যার লোকসংখ্যা ১ লক্ষের কম। ৫/৭ শো বা ততোধিক অণুবর্ষ নিয়ে এক একটি উপবর্ষ (যথা পশ্চিমবঙ্গ-উপবর্ষ, বিহার-উপবর্ষ ...) এবং উপবর্ষগুলির যোগে সমগ্র বর্ষ বা দেশ, ভারতবর্ষ।[২৩] প্রতিটি অণুবর্ষ তার এলাকার জনসাধারণের পার্টিহীন প্রকাশ্য-সাক্ষ্যসম্পন্ন-সমর্থনে (ওপেন ডকুমেন্টেড ভোটে)[২২] পূর্ণ গণতন্ত্রসম্মত প্রথায় নির্বাচিত অণু-লোকসভার দ্বারা স্বশাসিত হবে ও স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে পরিচালিত হবে। অণুবর্ষের সভাপতিদ্বয়ের প্রকাশ্য ভোটে নির্বাচিত উপবর্ষের উপ-লোকসভা এবং ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় লোকসভাই দেশের কেন্দ্রীয় বিষয় ও বড় নগরগুলির শাসন-পরিচালনের দায়িত্ব পালন করবেন। ...

এইরকম রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় প্রত্যেকটি অণুবর্ষে থাকবে একটি করে নিজস্ব শান্তিনিকেতন, সম্পূর্ণ আবাসিক। তার শিশুবিভাগটি থাকবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সমগ্র অণুবর্ষে ১৫/২০টি ভাগ হয়ে। অণুবর্ষের সমগ্র উত্তরপ্রজন্ম এই শান্তিনিকেতনে লালিত-পালিত হবে, শিক্ষা-দীক্ষা

পাবে। এগুলির প্রত্যেকটিই হবে স্বশাসিত। এর কাণ্ডারী রূপে থাকবেন একজন শিবসত্তার ধারক উদ্ভাবক-স্রষ্টা।[২৪] তাঁকে খুঁজে এনে কাণ্ডারীর পদে বরণ করে বসাবেন অণুবর্ষের অণু-লোকসভার সভাপতিদ্বয়।[২২] শান্তিনিকেতনের সমস্ত দায়িত্ব ও ক্ষমতায় থাকবেন সেই কাণ্ডারী — বরেণ্য 'রবিঠাকুর'। শাখা-প্রশাখায় প্রয়োজন মতো ক্ষিতিমোহন, হরিচরণ, রামকিংকর, বিধুশেখর, নন্দলালদের তিনিই বরণ করে আনবেন। সবাইকে নিয়ে তিনি হাত লাগাবেন জ্ঞানচর্চার প্রধান ক্ষেত্রে — 'মানবজমিন' চাষের কাজে। এভাবে আমাদের পশ্চিমবাংলাতেই গড়ে উঠবে সহস্র শান্তিনিকেতন। ...

প্রতিটি শান্তিনিকেতনের দুটি পৃথক বিভাগ থাকবে — শ্রীনিকেতন ও শুশ্রূষানিকেতন। শ্রীনিকেতনে উচ্চতর কর্মজ্ঞান (ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি) ও শুশ্রূষানিকেতনে উচ্চতর স্বাস্থ্যরক্ষা-জ্ঞান (চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি) শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। অণুবর্ষের কর্মজগতের সঙ্গে যুক্ত থেকে তাদের কর্মজ্ঞানের অভাব সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের উপায় বের করার কাজে যুক্ত থাকবে এই শ্রীনিকেতন; এবং অণুবর্ষের চিকিৎসাব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থেকে তাদের জ্ঞানের অভাব সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের কাজে যুক্ত থাকবে এই শুশ্রূষানিকেতন। অণুবর্ষের প্রয়োজনীয় উচ্চতর কর্মজ্ঞান ও রোগনিরাময়বিদ্যা এখান থেকেই শিখে নেবেন অণুবর্ষের সন্তানসন্ততিরা। অণুবর্ষের প্রয়োজনীয় অধিক কর্মজ্ঞান আনয়নের জন্য 'রবিঠাকুর' অণুবর্ষের ছাত্রছাত্রীদের ভেতর থেকে যোগ্য ছাত্রছাত্রী নির্বাচন করে অণুবর্ষের সন্তানসন্ততিরূপে তাদের বাইরে পাঠাবেন, অবশ্যই অণুবর্ষের খরচে। যেসব সন্তানসন্ততির মেধা বিশেষ ধরনের তাদের সেই মেধা লালন করার ব্যবস্থা করবেন স্বয়ং 'রবিঠাকুর'। বাইরে থেকে কোনো বিশেষ জ্ঞানের জ্ঞানীকে সাময়িক কালের জন্য আনয়ন করার ব্যাপারেও তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন। কার্যত অণুবর্ষের তরফে বাইরের সঙ্গে জ্ঞান লেনদেনের একটি প্রক্রিয়া সবসময় প্রচলিত থাকবে, তা সে ছাত্র বা শিক্ষক পাঠিয়ে বা আনিয়ে, যেভাবেই হোক। এভাবে দেশ-বিদেশের জ্ঞানসম্পদ আহরণ ও একালিকরণ সবসময় চলতে থাকবে। ...

একালের বিদ্যাকারখানার স্থান হবে নগরে, অণুবর্ষের বাইরে। সেগুলির শাসন-পরিচালন নিয়ন্ত্রিত হবে উপবর্ষগুলির দ্বারা ও বর্ষের দ্বারা এবং সেগুলি কেমনভাবে তাঁরা চালাবেন, তাঁরাই ঠিক করবেন। যে সব বিষয় সামগ্রিক — মহাকাশবিদ্যা, সমুদ্রবিদ্যা, ব্যয়বহুল গবেষণা ... তেমন সমস্ত জ্ঞানের চর্চা থাকবে অবশ্যই উপবর্ষ (রাজ্য-লোকসভা) ও বর্ষের (কেন্দ্রীয় লোকসভার) এখতিয়ারে। ... উপবর্ষকে ও বর্ষকে মেধা ও মানবসম্পদ দেওয়ার বাৎসরিক কোটা থাকবে প্রতিটি অণুবর্ষের (বছরে ১০ জন সেনা, ৫ জন ডাক্তার, ১ জন বিজ্ঞানী ... এইরকম)। কিন্তু অণুবর্ষের শান্তিনিকেতনের সঙ্গে রাষ্ট্রের আর কোনোরকম নিয়মতান্ত্রিকতার যোগ থাকবে না। অণুবর্ষের শান্তিনিকেতনের শিক্ষকেরা, গবেষকেরা হবেন আদি ব্রাহ্মণের মতো, সুফি-সাধকদের মতো, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মতো ...; তাঁরা কখনও বাহ্যসম্পদের পিছনে ছুটবেন না, বিভিন্ন অণুবর্ষে যাবেন জ্ঞান আদানপ্রদানের জন্য। তাঁদের জীবন-জীবিকার সমস্ত দায়িত্ব থাকবে অণুবর্ষের। বিপরীতে অণুবর্ষের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে লালন-পালন ও শিক্ষা-

দীক্ষার সমস্ত দায়িত্ব থাকবে তাঁদের ওপর। সারাদেশের সমগ্র উত্তরপ্রজন্মকে একই ছাঁচে লেখাপড়া শেখাতে হবে, রবীন্দ্রনাথ যে শিক্ষাকে বলেছেন 'সাম্প্রদায়িক' ও 'জাতির পক্ষে সাংঘাতিক', একালের শিক্ষানিয়ন্ত্রক সংস্থার তেমন শিক্ষা-ছাঁচ থেকে মুক্ত থাকবে এই শান্তিনিকেতন। প্রতিটি শান্তিনিকেতনের 'রবিঠাকুর' তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে বসে তাঁদের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাৎসরিক পাঠ্যক্রম (সিলেবাস) নিজেরাই ঠিক করে নেবেন। ...

প্রশ্ন উঠতে পারে, শান্তিনিকেতনের শিক্ষক রূপে এরকম ঋষিপ্রতিম মানুষদের পাওয়া যাবে কোথায়? এর উত্তর রবীন্দ্রনাথই দিয়ে গিয়েছেন তাঁর 'শিক্ষা' গ্রন্থের 'শিক্ষাসমস্যা' নিবন্ধে। তাঁর কথাকে আপডেট করে নিলেই আমরা প্রকৃত উত্তর পেয়ে যেতে পারি। একালের বিদ্যা-কারখানাগুলিতে যাঁরা ক্রীতদাস-শিক্ষক রূপে নিতান্ত অবহেলা সয়ে সয়ে কাজ করে যাচ্ছেন, তাঁদের থেকেই আমরা ওই নতুন শিক্ষকদের পেয়ে যেতে পারি। আমরা জানি, এই শিক্ষক-অধ্যাপকদের মধ্যে (অন্তত পশ্চিমবঙ্গে) এখনও প্রায় ষাট শতাংশ মানুষ রয়েছেন, যাঁরা টাকা কামানোর জন্য শিক্ষা জগতে আসেননি, এসেছিলেন জ্ঞানচর্চা নিয়ে থাকার জন্য। পরিস্থিতির শিকার হয়ে রয়েছেন তাঁরা। তাঁদের বেছে নিয়ে 'গুরু'র মর্যাদার উচ্চ আসনে বসান, অণুবর্ষের বাসিন্দা তেমন 'গুরু'কে গোটা অনুবর্ষ বরণ করে নিক; দেখবেন এঁরাই মনপ্রাণ দিয়ে আমাদের উত্তরপ্রজন্মকে গড়ে তোলার কাজে নিজেদের চব্বিশ ঘণ্টা ব্যয় করে দিচ্ছেন। যতটা জানেন ততটাই হাত ভরে দেওয়ার জন্য জীবনপণ করবেন তাঁরাই। বাকিটা তাঁরাই শিখতে পড়তে লেগে যাবেন। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, কারখানার নিয়মে গুরুকে তাঁর উচ্চাসন থেকে বিদ্যা-ব্যবসায়ীর আসনে নামিয়ে দিলে তাঁর 'পণ্যতালিকায় স্নেহ শ্রদ্ধা নিষ্ঠা' থাকতে পারে না, থাকেও না। কিন্তু ক্রীতদাস-শিক্ষককে যদি গুরুর আসনে তুলে বরণ করে বসিয়ে দেন, দেখা যাবে গুরু-শিষ্যের মাঝে ওগুলি অনায়াসে লেনদেন হচ্ছে। ... তার ওপর স্রষ্টা-আবিষ্কারক তো থাকছেনই।

অণুবর্ষের শিক্ষানীতিতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের অধিকারই প্রধান হবে। আর্টস পড়লে সায়েন্স পড়তে পারবে না, ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পারবে না, এখনকার শিক্ষানীতির এই সব নানারকম অসভ্যতা যেন একেবারেই না থাকে। এই ক্ষেত্র হবে সম্পূর্ণ অবাধ ও মুক্ত। যে যখন যা শিখতে চাইবে, তাই শেখার-পড়ার অধিকার থাকবে তাদের। আমরা জানি, জ্ঞানের মূল যে দুটি ভাগ — তত্ত্ব (ক্রিয়া-বিষয়ক-জ্ঞান) ও তথ্য (ক্রিয়াকারী-বিষয়ক-জ্ঞান),[২৫] দুটোই এতদিন মানবমস্তিষ্কে রাখতে হত। এখন সুবিধে হয়ে গেছে, মানুষের মস্তিষ্ককে অযথা তথ্যভারে ভারাক্রান্ত হতে হবে না। এখন মানুষ তার তত্ত্বজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে আরও সক্ষম ও সফল হতে পারে। কারণ, তথ্য রাখার জন্য কমপিউটার এসে গেছে মানুষের হাতে। তাই, এখন মূলত তত্ত্বজ্ঞান ধারণ করবেন শান্তিনিকেতনের শিক্ষক-শিক্ষিকারা, আর সারা বিশ্বের সমস্ত তথ্যজ্ঞান থাকবে শান্তিনিকেতনের নিজস্ব কমপিউটার লাইব্রেরিতে। এই শান্তিনিকেতনে শিক্ষকদের কাছে মনুষ্যত্বের জ্ঞান অর্জনের পর কর্মজ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থাও থাকবে। সাধারণ কর্মজ্ঞান শেখানোর কোনো ব্যবস্থা থাকবে না; অণুবর্ষের কর্মক্ষেত্রে

যুক্ত হয়ে 'উপযুক্ত' বা apprentice-রূপে যে-কেউ তা শিখে নিতে পারবে। কিন্তু উচ্চতর কর্মজ্ঞান, উচ্চতর চিকিৎসাবিদ্যা... এসবের ব্যবস্থা অণুবর্ষের শান্তিনিকেতন তার শ্রীনিকেতন ও শুশ্রূষানিকেতন গড়ে নিয়ে করে নিতে পারে এবং পারলেই ভাল হয়। না-পারলে অণুবর্ষের 'রবিঠাকুর' সেই ছাত্রদের নির্বাচন করে নেবেন, শান্তিনিকেতনের তরফে তিনি কাদের কী কী শিক্ষার জন্য কোথায় কোথায় পাঠাবেন; প্রতিবেশী কোনো অণুবর্ষের শান্তিনিকেতনে, নাকি বাইরে, বিদেশে। নিঃসন্দেহে সেখান থেকে ফিরে এসে তারা অণুবর্ষের সেবায় নিযুক্ত হবেন। ব্যক্তিগতভাবে কেউ তাঁর সন্তানসন্ততিকে বাইরে পাঠাতে পারেন। শিক্ষিত হয়ে এসে সে কোথায় কীভাবে কর্মরত হবে, সে বিষয়ে অণুবর্ষের কোনো দায় কিংবা বাধ্যবাধকতা থাকবে না। ... মোট কথা, প্রতিটি শান্তিনিকেতন বিশ্বমানবের সমস্ত জ্ঞানের 'বিন্দুতে সিন্ধু'রূপী আধার হওয়ার লক্ষ্যে পরিচালিত হবে।

সংগীতচর্চা (নৃত্যগীতবাদ্য), শিল্প, ভাস্কর্য... ইত্যাদি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের প্রদর্শিত পথকেই আপডেট করে নিতে হবে। লাইব্রেরি... ইত্যাদি থাকবে ছেলেমেয়েদের জন্য সম্পূর্ণ অবাধ। ধমকানি, মারধর প্রভৃতি হবে অন্য গ্রহের বস্তু। ... প্রতি বছর মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার নামে, এবং তার ফলপ্রকাশের পর কলেজে কলেজে ভর্তির নামে আমাদের ছেলেমেয়েদের এখন যে নিদারুণ হেনস্থা, অপমান, নির্লজ্জ অসভ্যতা সইতে হয়, সেগুলি বর্ণনার অযোগ্য পাপ। একমাত্র অজস্র অণুবর্ষ গড়ে সেখানে শান্তিনিকেতন গড়ে তুলতে পারলে তবেই ওই অত্যাচার বন্ধ হবে। ... উত্তরপ্রজন্মকে অবমাননা করে করে ছোটো করে ক্রমান্বয়ে যন্ত্রে পরিণত করা, তাদের শিক্ষা-দীক্ষায় অত্যন্ত অবহেলা করা, ইউনিয়নবাজি করা — আজকের এই পাপ স্খালনের জন্য ভবিষ্যতের সমস্ত শান্তিনিকেতন বছরে একদিন শোকপালন করে প্রায়শ্চিত্ত করবে; যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করার পাপ স্খালনের জন্য যেমন করা হয়ে থাকে। ভবিষ্যতের কোনো শান্তিনিকেতনে কোনো অশিক্ষক কর্মী থাকবে না, থাকবেন কেবল গুরু ও শিষ্য; নিজেদের কাজ তাঁরা নিজেরাই করে নেবেন। ... এভাবে অণুবর্ষের সকল সন্তানসন্ততি অণুবর্ষের শান্তিনিকেতনেই লালিত-পালিত ও শিক্ষিত-দীক্ষিত হবেন।

এই শান্তিনিকেতনগুলি প্রতিষ্ঠিত হলে, আজকের বিদ্যাকারখানাগুলির ছাত্রসংখ্যা রাতারাতি ৮০/৯০ শতাংশ কমে যাবে। শহরের জনসংখ্যাও কমে যাবে। কোনো চাপই থাকবে না আজকের বিদ্যাকারখানাগুলিতে। তাদের স্বভাবও অনেকটাই বদলে যেতে বাধ্য হবে। তারাও আজকের তুলনায় সুফল দিতে শুরু করবে। রবীন্দ্রনাথ যেমন চেয়েছিলেন, তাঁর বনস্পতি বিদ্যাকারখানাগুলিকে 'আচ্ছন্ন' করে দেবে, সেটাই বাস্তবায়িত হয়ে যাবে। শহরের ছেলেমেয়েদের নিয়ে এই সব ভাবনার কথা বারান্তরে আরও বিস্তারিতভাবে বলা যাবে। ...

অণুবর্ষের ছেলেমেয়ের খাওয়াদাওয়া, লেখাপড়ার সমস্ত দায়িত্ব যেহেতু অণুবর্ষের শান্তিনিকেতনের, সেই কারণে শান্তিনিকেতনের ভরণপোষণের সমস্ত দায়িত্ব অণুবর্ষের পরিবারগুলির। উপবর্ষ ও (ভারত) বর্ষের সঙ্গে অণুবর্ষের দায় ও কর্তব্যের যে দ্বৈরাজ্যিক সম্বন্ধ থাকবে, তার থেকে অণুবর্ষের প্রাপ্য তাঁরা অবশ্যই পাবেন। বর্তমান প্রজন্মের জীবন

তো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যই। তাদের খাইয়ে-পরিয়ে এবং প্রচলিত জ্ঞানের ধারক ও উদ্ভাবক রূপে বড় করাই অণুবর্ষের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। প্রয়োজনে অণুবর্ষের বাবা-মায়েরা না-খেয়েই তাঁদের শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েদের খাওয়াবেন। যাঁরা ছেলেমেয়েদের এই শান্তিনিকেতনে রাখবেন না, তাঁরা শহরের বিদ্যাকারখানায় সন্তানদের পাঠাবেন। আমরা জানি, ক'দিন পরেই তাঁদের চোখ খুলে যাবে।

সংক্ষেপে, সমাজের অর্জিত ও প্রচলিত জ্ঞান উত্তরপ্রজন্মের হাতে তুলে দেওয়ার এই প্রক্রিয়াই হবে ভবিষ্যতের যথার্থ প্রক্রিয়া।

নয়. উপসংহার

রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন, 'সম্বন্ধে বন্ধন, সম্বন্ধেই মুক্তি।' ভারতীয় ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার থেকে আমরা জেনেছি, 'পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহার'-এর যে বন্ধন, সেই 'বন্ধু'ত্বের বন্ধনে অধীনতা নেই, রয়েছে মানুষের মুক্তি। যে সম্বন্ধের বন্ধনে হুকুম থাকে, সে বন্ধন শুধুই বন্ধন, তাতে মুক্তি নেই; তাতেই থাকে পরাধীনতা। একজন মানুষ হুকুম করবেন আর তা শুনে অন্যজন তদনুসারে কাজ করবেন — এই নীতি মানবসভ্যতার সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে। যে-মতবাদ এই নীতির নিন্দা করে না, সে মতবাদ মানববিরোধী। পৃথিবী থেকে এরকম সমস্ত মতবাদকে এবার বিদায় জানানো হোক।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষা বিষয়ে এই আলোচনাটি আমাদের একটি প্রস্তাবমাত্র। এই ভাবনায় অজস্র ত্রুটি থাকতে পারে। তবুও আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি, বলার অবকাশ অনুসারে এই প্রস্তাব আমরা রাখলাম। যাঁরা এসব বিষয়ে আরও অনুভবক্ষম, তাঁরা নিশ্চয় আরও ভাল উপায়ের কথা বলতে পারবেন। উত্তরপ্রজন্মকে যথাযথভাবে লালন-পালন করা সকলের দায়। সবাই তাঁদের বিচারবুদ্ধি কাজে লাগান, এই আমাদের নিবেদন।

টীকা ও টুকিটাকি

১. রবীন্দ্রনাথ 'বড়ো ইংরেজ'-এর কথা বলে গেছেন, যে মনুষ্যত্বের সাধনা করত। সেই ইংরেজের প্রভাব এখন তেমন নেই। এখন বিশ্বায়নের কাল। একালের সারা পৃথিবীই 'ছোট ইংরেজ'-এর আদর্শকে নিজেদের আদর্শ বলে বিবেচনা করতে লেগেছে।

২. 'খাই না খাই, ছেলেটারে মানুষ করি', বাংলাভাষীরা এখনও বলেন। সেকালে সবাই জানত, 'মানুষ করা' আর 'শিব-গড়া' একই কথা। প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি ছিল, সে মানুষের সন্তানকে শিব রূপে গড়ে দেবে। পারেনি, 'শিব গড়তে বানর' গড়ে দেয়। সেই বানর প্রতিষ্ঠানের (বৃক্ষের) ডালে ডালে বসে পেট চালায়। এই বানরদের নিয়ে এককালে গড়ে উঠেছিল বানরসেনা। তবে সে অন্য প্রসঙ্গ।

৩. এই গ্রন্থের প্রথম নিবন্ধ 'অপরের সন্ধানে' দ্রষ্টব্য।

৪. এরকম কত শব্দ যে আমাদের আছে, তা বলে শেষ করা যাবে না। শব্দের ভুল মানে করা, শব্দ ফেলে দেওয়া, রাখলে তাকে অর্থহীন করে রাখা, এবং সবশেষে তার অর্থ সঙ্কোচন করা — এসব দুষ্কর্ম কতদূর প্রসারিত হয়ে রয়েছে, তার কিছু সংবাদ দেওয়া হয়েছে আমাদের 'বাংলাভাষা : প্রাচ্যের সম্পদ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে। এখানে আরও একটুখানি সংবাদ দিয়ে রাখি। লল্ ক্রিয়াটির অর্থ আমরা ভুলেছি। ফল

হয়েছে এই যে, তা থেকে জনিত শব্দসমূহের অধিকাংশকেই আমরা ফেলে দিয়েছি। তবে কিনা, সাধারণ বাংলাভাষী পাবলিক বড় বেয়াদপ। তারা কিছুতেই তাদের পুরোনো অভ্যাস ছাড়ে না। অগত্যা তাদের অভ্যাস থেকে যে শব্দগুলিকে কিছুতেই তাড়ানো যায়নি, সেগুলিকে অ্যাকাডেমিতে স্থান দিলেও অর্থহীন বা হীনার্থ করে রেখে দিয়েছি; বাকিদের গর্ভে ইংরেজি অর্থ ভরে দিয়ে কেবলমাত্র সেগুলিকেই এখন বাঁচিয়ে রেখেছি। মোট কথা যে বাংলা শব্দের গর্ভে ইংরেজি মানে থাকবে না, সেই বাংলা শব্দকে মেরে ফেলা হবে — এই হল আমাদের বাংলা অ্যাকাডেমিগুলির একালের বাংলা-ভাষানীতি। এই নীতির সফল প্রয়োগের ফলে 'লল্' ক্রিয়ামূল থেকে জাত লল্-শব্দবংশের সকল সন্তানের কী অবস্থা হয়েছে, এখানে তার তালিকা করে দেখিয়ে দেওয়া হল।

বিসর্জিত শব্দ	হীনার্থকৃত শব্দ	ইংরেজি দ্বারা ধর্ষিত শব্দ
ললকা, ললন, ললনিকা, ললন্তিকা,	ললিত, লালন, লাই,	ললনা (girl), ললাট (forehead)
ললল, ললাটক, ললাটাক্ষ, ললাটিকা,	লালিত, লালিত্য, লীলা,	ললাটরেখা (line on the forehead)
ললাম, ললামক, ললামভূত, লালক,	লীলাখেলা, লীলায়িত,	ললিতকলা (fine-arts),
লালচ, লালাটিক, লালাটি, লালায়,	'লীলা' শব্দ যুক্ত সমস্ত	লালসা (greed), লালা (saliva),
লালিম, লাল্য, লুল, লুলা, লুলাপ,	শব্দ, ললিতা, লীলাবতী,	লালায়িত (hankering after),
লুলায়, লুলিত, লেলিহ্, লেলিহানা,	এবং লালমোহন, দুলাল,	আলুলায়িত (dishevelled),
লোল, লোলদৃষ্টি, লোলনী, লোলমান,	নন্দলাল প্রভৃতি লাল	লেলিহান (lolling), লোলুপ (greedy)
লোলাপাঙ্গ, লোলার্ক, লোলি, লোলিত,	শব্দ যুক্ত সমস্ত	লোলচর্ম (wrinkled skin)।
লোলুভ, লোলোলোলো, ললাটন্তপ,	নামবাচক শব্দ;	
ললিতাভিনয়, ললিতার্থবিন্ধ, আলাল।	লেলিয়ে দেওয়া।	

বাংলা 'লাল' নামে যে-লালকে আমরা পাচ্ছি, তা ফারসি 'লাল' বা red নয়, 'যাকে লালন করা হয়' এ হল সেই লাল। রাজার 'দুলাল'-এর মতো এ আমাদের প্রত্যেকের ঘরে ঘরে বালগোপাল হয়ে জন্মায়; এ আমাদের সন্তানসন্ততি। এই 'লাল' শব্দে প্রিয় লালিত জমি ('লালবন্দি লালভূমি')-ও বোঝায়।

৫. দ্রষ্টব্য : 'মধ্যমেধার মহাযজ্ঞ', প্রকাশক 'দেশ'। এ বিষয়ে আনন্দবাজার গোষ্ঠীর লেখকদের একটি অংশ ২০০৫ সাল থেকে বারংবার প্রশ্ন তুলে আসছেন তাঁদের নানা লেখায়। এমনকি ১৭ আগস্ট ২০০৭-এর 'দেশ' পত্রিকাতেও তার নিদর্শন রয়েছে।

৬. রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র-মীরমোশ্‌র্‌রফ বাংলাভাষার জয়লাভের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেন, একথা কল্পনা করতেও অবাক লাগে। কিন্তু বাস্তব অনেক সময় কল্পনাকে ছাড়িয়ে যায়। রামমোহন-বিদ্যাসাগরেরা বাংলা ভাষাকে ইংরেজির সঙ্গে পাশাপাশি আসনে বসবার যোগ্য করেছিলেন, কিন্তু সে কাজ করতে গিয়ে এতকালের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ রীতি ভেঙে দিয়েছিলেন। সেটি হল — তাঁদের আগে পর্যন্ত বাঙালি জ্ঞানীগুণীরা যাই সাহিত্য-কাব্য সৃষ্টি করুন না কেন, গোটা বঙ্গসমাজ তার উপভোক্তা ছিল। রামমোহনদের হাতে সেই নাড়ির সম্পর্কটাই ছিন্ন হয়ে গেল। বাংলা সাহিত্য ও বাংলাভাষী জনসাধারণ আলাদা হয়ে গেল। বাংলা সাহিত্য শুধুমাত্র অ্যাকাডেমি-শিক্ষিতদের ভোগ্য হয়ে গেল, এবং বিপুল সংখ্যক বাঙালি জনসাধারণ তা থেকে বঞ্চিত হয়ে মানসক্ষুধায় ক্ষুধার্ত অভুক্ত থেকে গেল। এর ফলে, মধ্যযুগের বাংলায় যে বৈপ্লবিক কাজ হয়েছিল, সেগুলি আর সামনের সারিতে উঠে আসতে পারেনি।

৭. যে-পাঠক আমাদের লেখা আগে কখনও পড়েননি, তাঁর জন্য নিবেদন এই যে, পৃথিবীর আদি ভাষা যে ক্রিয়াভিত্তিক ছিল, পরে সেই ভাষাই রূপান্তরিত হয়ে হয়ে আজকের পৃথিবীর সমস্ত ভাষাগুলিতে পরিণত হয়েছে, এ তথ্য একালের ভাষাতাত্ত্বিকরা জানেন না; যদিও তার বিশাল উত্তরাধিকার বাংলাভাষীদের রয়েছে, বঙ্গীয় শব্দকোষ গ্রন্থেও রয়েছে। আমাদের 'পরমাভাষার বোধন-উদ্বোধন' ও 'বাংলাভাষা : প্রাচোর সম্পদ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে এ বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

৮. ধিক্ করা যেমন ধিক্কার, তেমনি আশ্ করা হল আশ্কার। যে তা করে, সে আশ্কারী বা আশাকারী।

আশাকারী আশ্রয় পায় যাতে, তা হল অশ্‌কারা। আর 'আশা' হল, কোনো কিছুকে মন দিয়ে ছোঁয়া। বিষয়টি রবি চক্রবর্তী ও কলিম খান-এর যৌথ গ্রন্থ 'প্রাচ্যের সম্পদ ও রবীন্দ্রনাথ'-এ বিস্তারিত করা হয়েছে।

৯. 'শিক্ষা'র ভিতরের 'ক্ষ' বর্ণটির অর্থ কী, তার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে প্রকাশিতব্য 'অভিনব শব্দকোষ'-এ।

১০. মহাভারতীয় বীর কর্ণের একটি বাণের নাম ছিল 'একঘাতী বাণ'। এটি কেবল একবার যে কোনো একজন শত্রুর উদ্দেশ্যে ছোঁড়া যেতে পারত, এবং তা ছিল অনিবার্য। উধম সিং সেরকম নিজেই একঘাতী বাণ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর বড় হওয়ার, লেখাপড়া শেখার, রোজগার করার একটিই উদ্দেশ্য ছিল — লণ্ডন গিয়ে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পাণ্ডা মাইকেল ও'ডায়ার সাহেবকে খুন করা। উধম সিং তাই করেছিলেন।

১১. 'মানুষ মানুষের ঘাড়ে চাপল কেমন করে অথবা পাখীর কথা' নিবন্ধে বিষয়টির আরও ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে কলিম খান-এর 'আসমানদারী করতে সেব কাকে' নামক গ্রন্থে।

১২. মির্জা গালিবের একটি কবিতাংশ — 'কত্‌রা অপনী ভী হকিকত হ্যায় দরিয়া লেকিন ...' যদর্থ, মানুষ মাত্রেই পরমাত্মা-দরিয়ার এক জলকণা (কত্‌রা)।

১৩. জীবনবিরোধী-জীবনীশক্তির কথা উল্লেখ করেছেন হোমিয়োপ্যাথি দর্শনের প্রবাদপুরুষ কেন্টস। প্রকৃত জীবনীশক্তি কোনো কারণে দীর্ঘকাল রুদ্ধ হয়ে থাকলে, তা জীবনবিরোধী-জীবনীশক্তি রূপে সক্রিয় হয়ে ওঠে। কেন্টস-মতে সেই জীবনবিরোধী-জীবনীশক্তি মানুষের মূল জীবনীশক্তিকে পথচ্যুত ('derailed') করে দেওয়ায় মানুষ রোগগ্রস্ত হয়েছে। তার আগে পর্যন্ত মানব শরীরের কোনো রোগ ছিল না। সমাজশরীরে মৌলবাদ, উগ্রপন্থা, সন্ত্রাসবাদ প্রভৃতি সেই জীবনবিরোধী-জীবনীশক্তির বলে বলীয়ান। অবিলম্বে প্রকৃত জীবনীশক্তিকে রোধমুক্ত করতে না পারলে, তা একদিন সমাজদেহের মূল জীবনীশক্তিকে পথচ্যুত করে মানবসমাজকে রোগগ্রস্ত করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে।

১৪. বিষবৃক্ষের এই রোধ রবীন্দ্রনাথের কীরূপ ছিল, তার নিদর্শন পাওয়া যাবে তাঁর 'সমস্যা' প্রবন্ধে। সেখানে তিনি গান্ধীকে অভিযুক্ত করেছেন — গান্ধী অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের নামে বর্ণাশ্রম নামক বিষবৃক্ষের একটি মাত্র ডাল ভেঙে দুরাশা করছেন যে, তার ফলে বিষবৃক্ষটি নির্মূল হয়ে যাবে।

১৫. অব্যক্ত জ্ঞানপ্রবাহ কীরূপ ব্যাপার, সে-বিষয়ে 'বেণীসংহারবৃত্তান্ত' নামে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে কলিম খান লিখিত 'দিশা থেকে বিদিশায়' গ্রন্থে। তাতে দেখানো হয়েছে, মানুষের সম্পদের মালিকানার ইতিহাসের সঙ্গে তার কেশচর্চার ইতিহাস সমান্তরাল। একই নিয়মে বাঙালি মধ্যবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধির সমান্তরালে দুর্গাপূজার রমরমা বাড়ে। এই সমান্তরতা রক্ষা করে অব্যক্ত জ্ঞানপ্রবাহ। একই ভাবে, চীন-জাপানের সূক্ষ্মবস্তু উৎপাদনে দক্ষতা এবং জার্মানির বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে কৃতিত্বের পেছনে রয়েছে যথাক্রমে চীন-জাপানের শিশুদের শৈশবের নিয়মতান্ত্রিকতা এবং জার্মানির শিশুদের শৈশবের আশকারা। অব্যক্ত জ্ঞানপ্রবাহ এইভাবে মানবজাতির মনের গভীরে ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত হয়ে জ্ঞানের সামঞ্জস্য রক্ষা করে।

১৬. 'বনস্পতি' শব্দের একটি অর্থ হল, যে বৃক্ষে ফুল হয় কিন্তু ফল হয় না। এই অর্থ রয়েছে মনুসংহিতায়। এর সামাজিক অর্থ, যে-ব্যবস্থায় দরকারি জিনিস উৎপন্ন হয়, কিন্তু তা পণ্যে পরিণত হয় না; নিজেদের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করে নেওয়া হয়। সেই হিসাবে বনস্পতি আদিম সাম্যবাদী যৌথসমাজের উৎপাদনব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা প্রভৃতি পঞ্চ অশ্বত্থকে সঠিকভাবেই নির্দেশ করত। অমরকোষে অবশ্য এ ছাড়াও বলা আছে — বৃক্ষমাত্রেই বনস্পতি পদবাচ্য। আরও একটি সর্বজনবিদিত অর্থ রয়েছে — বনের পতি (শ্রেষ্ঠ), অর্থাৎ বনের সবচেয়ে উঁচু ও বড় গাছ। 'বনস্পতিসকল মধুমান হোক' (মধুমান নো বনস্পতি) কথাটি তো ব্রাহ্মণের মন্ত্রের অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ সব জেনে বনস্পতি শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন, নাকি মহান প্রজ্ঞা তাঁর ভেতর দিয়ে এই কাণ্ড ঘটিয়েছিল, আমরা জানি না। তবে পুরাণাদির সাক্ষ্য থেকে আমরা জানতে পারি, আদিতে প্রতিষ্ঠানকে নানারকমের সজীব বৃক্ষ বলা হত, পরবর্তী যুগের প্রতিষ্ঠানগুলিকে নির্জীব জড় 'পর্ব্বত' বলার রীতি গ্রহণ করা হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ 'সজীব বনস্পতি' কথাটিই বলেছেন।

১৭. এ-বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে কলিম খান রচিত 'জীবন দখলের গ্লোবাল প্রোগ্রাম : ম্যানেজিং ফিউচার্স' নিবন্ধে, যা প্রকাশিত হয়েছিল বাংলাদেশের 'নিসর্গ' পত্রিকার ১৮ বর্ষ, ১ম সংখ্যায়।

১৮. এই জটিল বিষয়টিকেও যথার্থ বুঝেছিলেন আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা এবং অবশ্যই একালের অনেকেই — রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ। তাঁদের সিদ্ধান্ত : মন শ্রেষ্ঠ কিন্তু দেহ প্রথম। নৌকার ফুটো দিয়ে ঢুকে পড়া জল দিন দুবেলা সেচে না ফেললে (খাদ্য গ্রহণ না করলে) নৌকাটি তার আরোহী মনকে নিয়েই ডুবে যাবে। কিন্তু নৌকাযাত্রার উদ্দেশ্য নৌকার সেবা নয়, তার আরোহীর নৌকাবিহার, জগদ্দর্শন, আরোহীর তৃপ্তিসাধন। রামকৃষ্ণ তাই বলতেন — খালি পেটে ধর্ম হয় না। কিন্তু ধর্মের জন্যই দেহ। রবীন্দ্রনাথ মন ত্যাগ করে শরীর বাঁচিয়ে মনমরা মানুষ রূপে বেঁচে থাকার গ্লানির বিষয়ে স্পষ্ট বলেছেন তাঁর 'চরকা' নিবন্ধে। মোট কথা, মনপাখিটার জন্যই দেহখাঁচা, কিন্তু খাঁচা না থাকলে পাখিটা থাকতেই পায় না। এদের তুলনা হয় না। যার যেখানে গুরুত্ব সেখানে তাকে থাকতে দিতে হয়। প্রাচীনেরা বলতেন পিতা আকাশের থেকেও উঁচু, মাতা পৃথিবীর থেকে বড়। ওত-র (ভার্টিক্যালের) সঙ্গে প্রোত-র (হরাইজন্টালের) তুলনা হয় না, তারা ওতপ্রোত।

১৯. 'জগন্নাথের জন্মমৃত্যু : শতাব্দীশেষের ঈশ্বরভাবনা' নামক নিবন্ধে কলিম খান বিষয়টি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। নিবন্ধটি সঙ্কলিত হয়েছে তাঁর 'দিশা থেকে বিদিশায়' গ্রন্থের প্রথমেই।

২০. স্বামী ভিন্ন কারও সঙ্গে গোপন সম্পর্কে যে সন্তান জন্মায়, বেদাবাচ্চা গালাগালিতে সেই সন্তানকে বোঝায়। এর প্রকৃত অর্থ, কর্মক্ষেত্রে ('উপযুক্ত' বা apprentice রূপে কাজের ভেতর দিয়ে/মশারির ভেতরে) যে সন্তান জন্মায়নি, জন্মেছে সেই কর্মক্ষেত্র থেকে স্খলিত পলাতকের (বেদজীবীর) কাছে গাছতলায় বসে বিদ্যা অর্জন করে। লক্ষণীয় যে, আমাদের যেখানে বিদ্যাবিক্রেতা ও বিদ্যাক্রেতা দুজনকেই নিন্দা করার উত্তরাধিকার রয়েছে, ইয়োরোপের সেখানে রয়েছে কেবল বিদ্যাক্রেতাকে নিন্দা করার উত্তরাধিকার।

২১. যদিও, বিশেষত পশ্চিমবাংলায়, সে-কাজটাও তাঁরা আজকাল ঠিকভাবে করতে পারছেন না বলে তাঁদের নামে অজস্র অভিযোগ শোনা যাচ্ছে।

২২. পরবর্তী নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

২৩. একালের অ্যাকাডেমির মতে — আমাদের দেশের নাম স্বাধীনতার পরে 'ভারত' বা 'India'; কাজেই 'ভারতবর্ষ' বলা অনুচিত। অ্যাকাডেমি মানুষের ও তার দেশের নামকরণের ইতিহাস জানে না; জানে না কেন প্রায় সব দেশের প্রাচীন ভাষায় প্রতিটি মানুষের ও তাদের দেশের নামের অর্থ ছিল এবং কেন ও কীভাবে সেই অর্থ ক্রমে বিস্মৃত হতে থাকে; তার ফলে কী কী ক্ষতি হয়। ইতিহাস-অজ্ঞ অ্যাকাডেমিশিয়ানরাই ভারতবর্ষের নামের শেষাংশ কেটে ফেলতে আগ্রহী। এঁরা শব্দটির মানে জানেন না; তা কেটে ফেললে অতীতের সঙ্গে যে ভারতের 'আত্মবিচ্ছেদ' ঘটে এবং সেই বিচ্ছিন্নতাই যে আমাদের সমস্ত দুর্দশার কারণ — এসব বিষয়ে কিছুই জানেন না। এঁদের বিদ্যাবুদ্ধি এতই কলুষিত যে, এঁরা এখন 'ভারতবর্ষ বলা অনুচিত' বলে বিবেচনা করেন এবং কেবলমাত্র 'ভারত' বলা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন। বোঝাচ্ছায়, 'বাপের নাম ভুলিয়ে দেওয়া'র যে প্রক্রিয়া ইয়োরোপীয় শিক্ষার প্রভাবে প্রচলিত হয়েছিল, এঁরা তাঁরই শিকার। এঁদের জেনে রাখা উচিত, ইয়োরোপ কিন্তু তাদের অতীত যতটুকু জানে, ততটুকুই অত্যন্ত যত্ন সহকারে সুবিন্যস্ত করে রাখে। তাদের বরং দুঃখ এই যে, তারা তাদের অতীত কেন আরও ভালভাবে জানে না। আর আমরা? আমাদের শিক্ষিতেরা? আমাদের যেটুকু অতীত মানুষের স্মৃতিতে এখনও আছে, কী করে তাকে মুছে ফেলা যায়, তার জন্য এঁরাই নানা কসরত করেন। ভারতবর্ষের 'বর্ষ' কেটে বাদ দিতে পারলে এঁদের মনে বড় শান্তি হয়! এঁরা ভাবতেই পারেন না যে, ভারতের সংবিধান যাঁরা রচনা করেছিলেন, তাঁরা ঈশ্বর ছিলেন না; মানুষ ছিলেন। ভুল হয়ে থাকতে পারে। সেই ভুলটিকেই চিরকাল চিরসত্য বলে মনে করতে হবে? তা কোনোদিনও সংশোধন করা যাবে না। আর তাছাড়া, সংবিধানে 'ভারত' লিখে ফেললেই তো ভারতবাসীর স্মৃতি থেকে 'ভারতবর্ষ' মুছে ফেলা যাবে না। তাঁদের অনেকেই এখনও 'আমাদের দেশ ভারতবর্ষ' বলেন। এরকম বলার জন্য আপনি কি তাদের জিভ কেটে নেবেন, না কি গলাটাই কেটে ফেলবেন?

তা সে যাই হোক, এখন আমরা 'বর্ষ' মানে year বুঝি। সেকালে দেশ বোঝাতে কেন যে 'বর্ষ' শব্দটি ব্যবহৃত হত, যেমন ইলাবৃতবর্ষ, কুরুবর্ষ ... তা আমরা ভুলেছি, যদিও আমাদের দেশমাতৃকার নাম যে

'ভারতবর্ষ' ছিল, সেকথাটি ভাগ্যক্রমে এখনও ভুলিনি। ... যাই হোক, 'ভারত' মানে কী, এই নিবন্ধের একস্থানে তা দেওয়া হয়েছে। তবে 'বর্ষ' শব্দের মানে এর আগে কোথাও আমরা জানাইনি। বিষয়টি বেশ বড়। অতি সংক্ষেপে তার অর্থ হল — যে দেশের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রতাপের কিরণে (সূর্যকিরণে) জনসাধারণের সম্পদজাত করসমূহ বাষ্প হয়ে 'গর্জনকারী মেঘে' পরিণত হয় ও পুনরায় (কেন্দ্রীয় শাসকের নির্দেশে) সারা দেশে সমভাবে 'বর্ষিত' হয়, সেই দেশকে সেই কেন্দ্রের বর্ষ বলে। পুরাণাদিতে রাজার কর্তব্য এভাবে কর আনয়ন ও বর্ষণ, এমন বর্ণনা বহু স্থানে আছে। ... আর ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির নিয়মে মূল ক্রিয়াটি এক হওয়ায় স্থান ও কাল উভয় ক্ষেত্রেই তার প্রয়োগ করা হয়। সে কারণেই বর্ষ এইরূপ 'বর্ষণ-এলাকা' (স্থান) বা country-কে যেমন বোঝায়, তেমনি 'বর্ষণ-সময়' (কাল) বা year-কেও বোঝায়। উভয়ক্ষেত্রে পরবর্তী অধ্যায়কে বরণ করে নেওয়ার পুনরাবৃত্তি থাকে বলেই তারা বর্ষ পদবাচ্য। ...

২৪. আমাদের পূর্বপুরুষেরা এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে সঠিক যে শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন তা হল 'শিব'। শিবসত্তার ধারক মাত্রেই 'উদ্ভাবক-স্রষ্টা'। এই শিবের বিষয়ে আমাদের নানা লেখায় কিছু কিছু ব্যাখ্যা রয়েছে। এখানে সংক্ষেপে কেবল এটুকু বলে রাখা যেতে পারে — পরমাপ্রকৃতির অমোঘ নিয়মে ব্রহ্মজ্ঞানী মাত্রেই একই ছাদে বিচরণ করবার অধিকারী, তা তিনি অতি বড় আবিষ্কারক-স্রষ্টা বা অতি ক্ষুদ্র আবিষ্কারক-স্রষ্টা, যাই হোন। তাই তাঁরা পরস্পরকে আধঘণ্টা কথা বললেই চিনতে পারেন। ... এবিষয়ে বারান্তরে লেখা যাবে।

২৫. কলকাতার যেকোনো একটি ঠিকানা উল্লেখ করে যদি জানতে চাওয়া হয়, সেখানে কে থাকে, তবে সেকথার উত্তর প্রশ্ন শোনামাত্র যে বলে দিতে পারে, একালের কুইজ কনটেস্টে সে ফার্স্ট প্রাইজ পায়। সন্দেহ নেই, তার যথেষ্ট তথ্যজ্ঞান আছে। যে কমপিউটারে কলকাতার ভোটার তালিকা রয়েছে, সেও তা অনায়াসে বলে দিতে পারে। কিন্তু যেকোনো ঠিকানা দিয়ে সেখানে যেতে বললে, কমপিউটার তা পারবে না। এমনকী যে প্রতিযোগী ফার্স্ট প্রাইজ পায়, সেও সেখানে যেতে ব্যর্থ হতে পারে। কারণ তার জন্য শহরের ম্যাপ দেখে বিশেষ ঠিকানায় কোন পথে কীভাবে পৌঁছোতে হয়, তার হিসেব নিকেশ জানা দরকার। যে ব্যক্তি এটা জানে, তার থাকে তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞানী দেরিতে হলেও সবটাই পারে, তথ্যজ্ঞানী সবটা পারে না। যাঁরা 'অবজেকটিভ প্রশ্ন'-এর ওকালতি করেন, তাঁরা তথ্যজ্ঞানকে গুরুত্ব দেন। মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করে ফোঁপরা করে দেওয়ার সেটি আর একটি কৌশল।

(নিবন্ধটি লেখকদ্বয়ের যৌথ মননের ফসল হলেও সামাজিক সৌকর্যের স্বার্থে কেবলমাত্র কলিম খান-এর নামে কলকাতার 'এবং' পত্রিকার ২০০৭ পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।)

বাংলাই বিশ্বকে পথ দেখাতে পারে

কলিম খান রবি চক্রবর্তী

> No man is an island, entire of itself; everyman is a piece of the Continent, a part of the main ... Anyman's death diminishes me, because I am involved in Mankind; and therefore never send to know for whom the bell tolls; it tolls for thee.[১]
>
> *John Donne*

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন / সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে —

পণ্ডিতেরা বলতেন, 'বেদে সব আছে'। 'বাঙালির গৌরব' বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা ঠাট্টা করে বলে গেলেন — 'হ্যাঁ, সব ব্যাদে আছে!' অর্থাৎ বেদে সব নেই। মাঝ থেকে সাধারণ বাঙালি পড়ে গেলেন মুশকিলে — তাই তো, বেদে তবে আছেটা কী? ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দেই যাস্কমুনি সাবধান করে দিয়েছিলেন, 'অর্থহীন বেদ পাঠ করা আর কাষ্ঠময় মৃগাকৃতিতে মৃগচর্ম লাগাইয়া মৃগ বলিয়া অনুভব-করা একই কথা।' তা শুনেও সেকালের বেদবাদীরা সাবধান হননি। তার প্রায় ১৫০০ বছর পরে বেদার্থ যখন বিস্মৃতির মুখে, বেদপাঠকদের উদ্দেশ্যে সায়ণাচার্য্য বললেন — 'উক্তরূপে যিনি বেদ পাঠ করেন, তাঁহার বেদসমূহ যাতযাম, জরাগ্রস্ত ও হীনবীর্য্য হইয়া যায়।' হলও তাই। লোকে বেদ পড়তে লাগল বটে, কিন্তু তার থেকে কিছুই জানতে-বুঝতে পারল না। সেই 'হীনবীর্য্য বেদসমূহ' নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ চলতে লাগল উত্তরকালে, বেদবাদী ও মেঘনাদ সাহাদের মধ্যে। সাধারণ বাংলাভাষী কী আর করেন, তাঁরা কেবল তাঁদের জ্ঞানী-বুদ্ধিজীবীদের দু-দলের বাগবিতণ্ডা শুনে যান!

বেদের এই দুরবস্থার কারণ খুঁজতে গেলে যা পাওয়া যায় তা এককথায় অভিনব। প্রথমে জানা যায়, বেদপাঠের প্রকৃত কৌশলটি বৌদ্ধ যুগে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলাভাষীদের হাতে তার কিঞ্চিৎ পুনরুদ্ধার ঘটলেও পুনরায় অষ্টাদশ শতাব্দীর আগেই আমাদের পণ্ডিতেরা সে কৌশল ভুলে যান। ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। তাঁদের বেদবাদী-উত্তরসূরিরা প্রকৃতপক্ষে বেদে কী আছে, জানেন না। আর, তাঁদের যে-উত্তরসূরিরা পাশ্চাত্য জ্ঞান অর্জন করেছেন তাঁরাও জানেন না বেদে কী আছে। মেঘনাদ সাহারা তাই মনে করেন বেদে কিছুই নেই, যা আছে সব বাজে কথা, অকাজের কথা।

তার পর ধীরে ধীরে জানা যায় — বিস্মৃত রূপে হলেও, বেদ বলে একটা জিনিস আমাদের ছিল, এখনও নানাভাবে তার উত্তরাধিকার আমাদের আছে; এবং সদ্য-আবিষ্কৃত ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির সাহায্যে তার অর্থ পুনরুদ্ধার করাও সম্ভব।[২] কিন্তু ইয়োরোপ সহ বাকি পৃথিবীর সেরকম কোনো আদি-উত্তরাধিকার নেই। নিজেদের অতীত জানতে হলে প্রাচ্যের, বিশেষ করে বাংলাভাষীর মুখাপেক্ষী না-হয়ে তাঁদের উপায় নেই।

আর, অতীত তো জানতেই হবে। নিজে এগিয়ে যেতে হলে, মানবসভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে অতীতকে জানতেই হবে — কোথা থেকে কেন কী উদ্দেশ্যে কীভাবে যাত্রা শুরু করেছিলাম, সেখান থেকে এখন পর্যন্ত কোথায় এসে পৌঁছেছি, এরপর তাহলে কীভাবে কোনদিকে চলা শুরু করব, একথা বুঝতে হলে অতীতকে জানতেই হবে।

সেজন্যেই মার্কস সাহেব ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পিছনে ধাওয়া করেছিলেন। কিন্তু পাননি সবটা। ঠিক কী কারণে, কখন, কীভাবে 'অসভ্য' যুগের পেট চিরে সভ্য যুগের উদ্ভব হতে পারল, পণ্যকেন্দ্রিক ব্যক্তিমালিকানা-ভিত্তিক সমাজের আবির্ভাব ঘটে যেতে পারল, সে তথ্য তিনি সংগ্রহ করতে পারেননি। তবে তাঁর গৌরব এই যে, সেসব কথা ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে রয়েছে, এই কথাটি তিনি বলে যেতে পেরেছিলেন।[৩] তাঁর আগে-পরে অনেকে ভারতের ইতিহাস থেকে সেসব বের করার চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু ভারতের সে ইতিহাস পড়তে গেলে যে-ভাষাতত্ত্ব জানার দরকার ছিল, তা ছিল না কারও হাতেই। ফলে, তাঁদের ইন্ডোলজি শেষ পর্যন্ত কোনো নতুন দিশা দেখাতে পারে না। পরিণামে ইতিহাস-জ্ঞানহীন পশ্চিমের নেতৃত্বে পরিচালিত হতে থাকে আধুনিক সভ্যতা, এগিয়ে চলার জন্য প্রয়োজনীয় দিক-দিশা যার নেই।

মোটকথা, আজকের দিশাজ্ঞানহীন বিশ্বসভ্যতা অন্ধের মতো ছুটে চলেছে; কোনদিকে যাবে না-যাবে, কী করবে, কিছুই ঠিক করে উঠতে পারছে না। একশো বছর আগেও এই সভ্যতার পরিচালকদের একদল বলতেন 'ধনতন্ত্রের দিকে', অন্যদল বলতেন 'সমাজতন্ত্রের দিকে'। তাঁদের কথিত সেই ধনতন্ত্রের একধরনের জীবনযাত্রা পদ্ধতির কথা ছিল, একধরনের মনুষ্যত্ব অর্জনের কথা ছিল, ধর্ম ছিল; সমাজতন্ত্রেরও ছিল। অন্যান্য সেকেলে ধর্মপ্রচারকদের মতো আধুনিকতার এই দু-দল পূজারীও প্রকৃতপক্ষে দুরকম ধর্ম গ্রহণের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলতেন। এখন সেসব কথা আর কেউ বলে না। সবাই বলেন 'বিশ্বায়ন'-এর কথা। কিন্তু তাতে কোনো নতুন ধর্মের কথা, নতুন জীবনযাত্রা পদ্ধতির কথা নেই, কোনো ধরনের মনুষ্যত্ব অর্জনের কথা নেই; রয়েছে কেবল পেটের কথা, টাকার কথা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল উৎপাদনের কথা। বোঝা যায়, কার্যত কেউই জানে না, আজকের 'বিশ্বায়ন-ঘোষী' অতিগর্জনশীল উত্তরাধুনিক মানবসভ্যতা কোন দিকে চলেছে? কোন দিক তার দিশা? একালের বুদ্ধিজীবী হা-হুতাশ করছেন — 'এই ইনফর্মেশন বিপ্লব আমাদেরকে যন্ত্রের যুগ থেকে টেনে বের করে কোথায় নিয়ে চলেছে কে জানে!'[৪]

কিন্তু দিশা তো একটা আছেই। চলা থাকবে অথচ তার কোনো দিশা থাকবে না, তা হয় না; হওয়ার উপায় নেই। এমন হতে পারে যে, সে-দিশা নেচার কর্তৃক নির্দিষ্ট। সেক্ষেত্রে সেই নেচার-নির্দিষ্ট দিশার খবর জেনে সেদিকে চলাই সুবিধাজনক; তাতে বিশ্বের সঙ্গে ছন্দ মেলে, সুখ আনন্দ তৃপ্তি সকলের ভাগেই জোটে। তা না-করে খোদার ওপর খোদকারী করে নিজে নিজের দিশা নির্ণয় করতে যাওয়া বিপজ্জনক, বিশেষত তা যদি নেচার-নির্দিষ্ট দিশার সঙ্গে না মেলে। তাই কবতে গিয়েই আধুনিক পাশ্চাত্যদেশ মানবসভ্যতার অনিকেত যাত্রার বিমানটিকে

'একঝোঁকা'[৫] করে ফেলেছে এবং মানুষের দুঃখদুর্দশার কারণ ঘটিয়েছে — তাঁদের বিরুদ্ধে এই গুরুতর অভিযোগ তুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। দেশবিদেশের জ্ঞানীগুণীরা তাঁর সে অভিযোগের বিচার করেননি, করেছেন বিধাতা স্বয়ং। সমগ্র একঝোঁকা সভ্যতাকে তিনি এনে হাজির করেছেন বিশ্বায়নের সম্মুখস্থ অতলান্তিক খাদের সামনে — এখনও যদি একঝোঁকা হয়েই এগোতে চাও, তো এগোও এবং সমগ্র মানবসভ্যতাকে নিয়ে রসাতলে যাও!

আমরা বাংলাভাষীরা আমাদের পূর্বপুরুষের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলাম বেদসহ বহু মূল্যবান জ্ঞানসম্পদ। অর্থনিষ্কাশন পদ্ধতি ভুলে যাওয়ার কারণে (কেন ভুলেছি সে অনেক কথা, অন্যত্র[৬] বলাও হয়েছে) সেগুলিকে আমাদের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত জ্ঞানজীবীরা ফেলে দিয়েছেন, যদিও আমাদের সেকেলে ধর্মপ্রাণ মানুষেরা ও গ্রামবাংলার বাংলাভাষীরা সেগুলি এখনও সম্পূর্ণ ফেলে দেননি; অর্থহীন বোঝা রূপে হলেও আজও বহন করে নিয়ে চলেছেন। সেগুলির কিছু কিছু অর্থ উদ্ধার করে আমরা দেখেছি, সেগুলির ভিতরে সবচেয়ে অর্থহীন বাজে ও ফালতু কথা বলে যেগুলিকে ভাবা হয়, সেইগুলিও কাজের কথা, আমাদের অমূল্য পৈতৃক সম্পদ। আজও, বাইরের দুনিয়া যে-বাংলাভাষীকে হীন চোখে দেখে, মানবসভ্যতার মহাসম্পদ রয়েছে তারই হাতে। সেসব কথার কিছু কিছু জানলেই বোঝা যায়, আজকের এই মহাসংকটের দিনে, সেই সম্পদই আমাদের বাঁচাবে; বিশ্বমানবকে আগামী দিনে চলার পথের দিশা দেখাতে পারবে। অনুমতি করুন, সেই বাজে কথার বোঝা থেকে একটি 'সম্পূর্ণ বাজে কথা' উদ্ধার করে আপনাদের সামনে রাখি। দেখুন তা 'বাজে' কি না।

মানবসভ্যতার প্রাণভোমরা : অরূপরতন পুনরুদ্ধার

উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা যেসকল জ্ঞানবাক্য পেয়েছি, তার মধ্যে অন্যতম হল 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'। সন্দেহ নেই, একালের প্রতীকীভাষায়-অভ্যস্ত বাংলাভাষীর বিচারে কথাটি সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, তাঁদের বিচারে 'ব্রহ্ম' একটি অলীক শব্দ, ধরা যাক 'X'; এর এমন কোনো মানে হয় না যাকে ইংরেজিতে অনুবাদ করা যায়। 'সত্য'কে বোঝা হয় truth হিসেবে, 'জগৎ'কে world, এবং 'মিথ্যা' বলতে false বোঝা হয়ে থাকে। তাই একালের অ্যাকাডেমি-শিক্ষিত বাংলাভাষীর মতে 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' কথাটির মানে দাঁড়ায় This world is false, only 'X' is truth। আর, যেহেতু 'X' অর্থহীন অলীক বস্তুমাত্র এবং world চোখের সামনে প্রত্যক্ষরূপে প্রতীয়মান; কাজেই সিদ্ধান্ত করা হয় 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' বাক্যটি অর্থহীন বাজে কথা মাত্র।

অথচ ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধিতে বাক্যটি কেবল যথার্থই নয়, জ্ঞানগর্ভও বটে। দেখা যায়, 'ব্রহ্ম' শব্দটির মূলে রয়েছে 'বৃংহ্' (বৃন্হ্) ও 'মন' এই দুটি কথা। 'বৃংহ্' শব্দের অর্থ হল 'বরণ করে আনা তেজের স্থির হওয়ন', আর 'মন' হল সেই যন্ত্র যা মানুষের ভিতরে থেকে তার ভিতরের বাইরের সবকিছুর প্রতিকল্প আপন অভ্যন্তরে আনয়ন করে সেগুলির পরিমাপ করে চলে।[৭] যে আদি শব্দ থেকে এই 'বৃংহ্' ও 'মন' কথা দুটি আমরা উত্তরাধিকার

[illegible] পেয়েছি, তার থেকেই পশ্চিমের মানুষেরা bring ও mind কথা দুটি পেয়েছিলেন। [illegible] চলন (চলা-কে on করে রাখা) যেমন একরকম ক্রিয়া, তেমনি ব্রহ্ম্-অন্ (বৃংহ্-[illegible]) [illegible]ও একরকম ক্রিয়া। এর অর্থ হল 'তেজকে (বহু সাধ্যসাধনা করে, সেধে) স্থির [illegible] মনে বরণ করে আনা'। তেজ বা অগ্নি হল অস্তিত্বের মূল, অংশরূপিণী, যার [illegible] ইংরেজিতে energy বলে। তাকে এভাবে আনয়ন করার ফলে একদিকে যেমন মনোলোকের এলাকার বৃদ্ধি ও জ্ঞানসম্পদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, তেমনি সেই আনীত সত্তার সহযোগে মানুষের বাহ্যসম্পদেরও বৃদ্ধি ঘটে যায়। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক।

তাপ ও আলোর জনক আগুন রয়েছে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, দাবানলে বিদ্যুতে সূর্যে, সর্বত্র। মানবজাতির জন্মের আগেও ছিল। কিন্তু কোনো জীবই সেই আগুনকে [illegible] করতে পারেনি। মানুষ একদিন সেই আগুনকে চকমকিতে সৃজন করার উপায় বের করে ফেলল। উপায়স্বরূপ এই ক্রিয়াটিই ব্রহ্ম এবং তৎসম্পর্কিত জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতিতে ছড়িয়ে থাকা আগুন মানুষের মনোলোকের 'ব্যক্তজ্ঞান'-এর ('explicit knowledge'-এর) অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল; তারপর সেই ব্যক্তজ্ঞান সমগ্র মানবসমাজের ব্যবহারে লেগে গিয়ে মানুষকে জীব থেকে অতিজীবে উন্নীত করে দিল। যেন-বা সারা পাহাড়ের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা বিপুল জলসম্ভারের একটু অংশ 'ব্রহ্ম'-নামক নির্ঝরের মাধ্যমে নদীতে পরিণত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল মানুষের কৃষিক্ষেত্রে। মানুষের উৎপাদন-কর্মযজ্ঞ ফুলে-ফসলে ভরে উঠল। মানুষের নতুন জগৎ সৃজিত হয়ে গেল। ফলত মানবপ্রজাতির মানসলোকে এই 'ব্রহ্ম' দেখা দিলেন 'স্রষ্টা' (পুরাণের ভাষায় 'সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা') রূপে। মানুষ তার জগদীশ্বরকে দেখতে পেয়ে গেল।

তার মানে, জ্ঞান এই বিশ্বপ্রকৃতিতেই আছে বা থাকে। মানুষ তাকে নিজের ক্ষমতায় ব্যবহারযোগ্য করে অনুবাদ করে নেয়। কোনো মানুষ যখন নিজেকে সেইরূপ উদ্ভাবক বা স্রষ্টা রূপে দেখে ফেলে, তখন তার ভেতরে সেই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' হয়ে যায়। ব্রহ্মস্বরূপ সেই [illegible]ধারাসমূহের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে মানুষের সমগ্র ব্যক্তজ্ঞান ও তার থেকে সৃষ্টি হয় সমাজের বিপুল সম্পদ। অন্য কোনো জীব এই উদ্ভাবন-সৃজন করতে পারেনি। মানুষ পেরেছে বলেই সে জীব থেকে অতিজীব-এ উন্নীত হয়ে পৃথক মানবসভ্যতা গড়ে তুলতে পেরেছে। অর্থাৎ, **মানবসভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশের মূলে রয়েছে এই ব্রহ্মজ্ঞান। এটিই মানবসভ্যতার প্রাণভোমরা, মানবসভ্যতার আত্মা।**

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, জ্ঞান বা চেতনা মূলত তিন প্রকার —

অব্যক্তজ্ঞান ——————> ব্রহ্মজ্ঞান ————————> ব্যক্তজ্ঞান
(tacit knowledge) (transcendental knowledge) (explicit knowledge)

অব্যক্তজ্ঞান (tacit knowledge) বা স্বাভাবিক জ্ঞান (instinctive knowledge) ছড়িয়ে রয়েছে সমগ্র বিশ্বব্যবস্থায়, যাকে আমরা স্বাভাবিক প্রাকৃতিক দিবালোক বা স্বাভাবিক জ্ঞানের আলো বলতে পারি। অপরদিকে ব্যক্তজ্ঞান (explicit knowledge) বা কৃত্রিম জ্ঞান (induced

knowledge) রয়েছে কেবল শিক্ষিত মানুষের দুনিয়ায়, অ্যাকাডেমিতে, যাকে বেদজ্ঞান বা ভেদজ্ঞান (academic knowledge) বলে, যাকে প্রদীপ-মোমবাতি-বিজলিবাতির ব্যবহারিক কৃত্রিম আলো বলা যেতে পারে। সর্বোপরি রয়েছে ব্রহ্মজ্ঞান (transcendental knowledge) বা সৃজনজ্ঞান (invention, creation, discovery), যাকে কৃত্রিম আলো জ্বালানোর মূল বিদ্যা বলা যেতে পারে। এই জ্ঞান অর্জন করে আনেন ব্রহ্মজ্ঞানী, ব্রহ্মর্ষি। (সেকালে মনচাষা মাত্রেই ছিলেন ঋষি পদবাচ্য, আর যিনি তাঁর মনোলোকে 'অগ্নিকে বরণ করে নিয়ে আসেন' তিনিই কথিত হতেন ব্রহ্মর্ষি নামে। এই অগ্নিধারক মনকে একালের ভাষায় 'Minds of Fire' বলা যেতে পারে।) তারপর তাঁর হাত থেকে সেই জ্ঞান সমাজ ও অ্যাকাডেমি হস্তান্তর করে নিয়ে তাদের ব্যক্তজ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত করে নেয়, বহন করতে থাকে এবং 'একই কর্মের পুনরাবৃত্তি'র নীতিতে প্রয়োগ করতে থাকে।

'শুধুমাত্র-অব্যক্তজ্ঞান' জ্ঞানের মহাসমুদ্র সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই মহাসমুদ্রের উপকূলে বসে তার দু-চারটে নুড়িকে ব্রহ্মজ্ঞানের মাধ্যমে অনুবাদ করে ব্যক্তজ্ঞানে পরিণত করে নিতে পেরেছে বলেই জীব-মানুষ অতিজীব-মানুষে উত্তীর্ণ হয়ে তার মানবসভ্যতা গড়ে তুলতে পেরেছে; অন্যথায় তাকে জীবজন্তুদের দুনিয়াতেই থেকে যেতে হত। আবার, 'শুধুমাত্র-ব্যক্তজ্ঞান' মানুষকে সুনির্দিষ্ট যন্ত্র বানিয়ে তোলে,[৮] তার মস্তিষ্ককে programmed ক'রে তার আচরণকে predictable করে দেয়। ফলস্বরূপ সে-মানুষ প্রকৃতি-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরকম মানুষ যন্ত্রে অধঃপতিত আত্মযন্ত্রণায় ক্লিষ্ট বেচারা মানুষ। মানবসভ্যতার বিকাশের 'একঝোঁকা' বিকৃতির থেকেই এরকম আস্বাভাবিক মানুষ জন্মায়। একালের 'শহুরে', 'শুধুমাত্র-অ্যাকাডেমি-শিক্ষিত', 'নেচার-বিচ্ছিন্ন' মানুষেরা এরকম বেচারা মানুষ। দৃশ্যত এঁদের সুখীমানুষ বলে মনে হলেও এঁদের অন্তরাত্মা একান্তে বুকচাপা কান্না কাঁদতে থাকে। ...

জ্ঞানের এই তিনটি রূপকে বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়। যে অংশ রয়েছে মাটির গভীরে অদৃশ্য শিকড় রূপে সেই অংশ হল অব্যক্তজ্ঞান, মাটির ঠিক উপরের কাণ্ড অংশটি ব্রহ্মজ্ঞান, এবং তার থেকে উপরে পাতা-ফুল-ফল পর্যন্ত সবটাই ব্যক্তজ্ঞান। কাণ্ড মাটির অভ্যন্তরে অব্যক্ত মহাজ্ঞানের বিশাল রসভাণ্ডার থেকে রস সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দেয় শাখাপ্রশাখার পাতা-ফুল-ফলের উদ্দেশে। তাই ব্রহ্মজ্ঞান যিনি অর্জন করেন, জ্ঞানের তিনটি দিকই কমবেশি দেখতে পেয়ে যান। সেই কারণে জ্ঞান সম্পর্কে তাঁর একটা সামগ্রিক ধারণাও তৈরি হয়ে যায়। ব্রহ্মজ্ঞানীর তাই কাণ্ডজ্ঞান থাকে। বলে রাখা ভালো, ঝরনা যখন পাহাড়ি জলাধারের দিকে মুখ করে থাকে, কাণ্ড যখন শিকড়ের দিকে মুখ করে থাকে, তখন তাকে বলা হয় নির্গুণ ব্রহ্ম[৯]; আর, ঝরনা যখন নদী ও তার শাখাপ্রশাখার দিকে নজর রাখে, কাণ্ড যখন তার ডালপালার দিকে তাকিয়ে থাকে, তখন তাকে বলে সগুণ ব্রহ্ম। এই সগুণ ব্রহ্ম থেকেই জন্মায় ব্যক্তজ্ঞান। মানুষের যে ব্যক্তজ্ঞান আজ স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়, তা-সবের মূলে রয়েছে এই সগুণ-ব্রহ্মজ্ঞান। এরই উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে মানুষের সভ্যতা।

অতএব ব্রহ্ম আদৌ অলীক নয়। সে হল মানবসভ্যতার প্রাণভোমরা। একালের ভাষায়

উদাহরণ দিতে গেলে বলতে হয় $E = mc^2$ হল ব্রহ্ম। যিনি সেই ব্রহ্মান্-কর্মটি করেছেন, ব্রহ্মজ্ঞানের 'অগ্নিশিখা (= শি) বহনকারী (= ব)' সেই শিবের নাম আইনস্টাইন। এই ব্রহ্মান্-কে যিনি যথার্থে জানেন তিনিই ব্রহ্মগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ।[১০] এই ব্রহ্মজ্ঞানকে যিনি ধারণ করেন, তিনি ব্রহ্মা; তাঁকে দক্ষ বা বিশেষজ্ঞও (specialist) বলা হয়ে থাকে। যে-দক্ষ মনে করেন, তেজের $E = mc^2$ স্বরূপটি আর কোনোদিনই বদলাবে না, এক্ষেত্রে আর কোনো উদ্ভাবন কোনোদিনই হবে না, অংরূপিণীর এই স্বরূপ অমোঘ ও চিরন্তন, তিনি 'একই কর্মের পুনরাবৃত্তি'র নীতিতে কট্টরভাবে বিশ্বাসী মৌলবাদী। বলে রাখা যাক, যিনি ব্রহ্মান্ করে ব্রহ্মলাভ করেন, তিনি এত আনন্দ[১১] পান যে, বাহ্যসম্পদের প্রতি তাঁর কোনো আগ্রহই থাকে না; বাহ্যসম্পদকে তুচ্ছ মনে হয় তাঁর। এই ব্রহ্মই মানুষের সমস্ত উৎপাদিত ও সৃষ্ট সম্পদের কারণ বলে তাঁকেই 'জগৎস্রষ্টা' রূপে মানুষ দেখতে পায়। সেকারণেই সাধারণ মানুষ ব্রহ্মলাভকারীর ব্রহ্মলাভকে ভাবেন 'ঈশ্বরপ্রাপ্তি'। সংক্ষেপে, ব্রহ্মের এই বৃত্তান্ত।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মানুষ তার নিজের যে বিশাল সভ্যজগৎ গড়ে তুলেছে, তা বাইরে দৃশ্যমান হলেও, তার মূলে প্রকৃত সত্য রূপে রয়েছে ব্রহ্ম। নানা দিক থেকে তাকে দেখে তার যে ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে, সেগুলিই হল আবিষ্কার, উদ্ভাবন, সৃষ্টি ... ইত্যাদি। এই ব্রহ্মই নিয়ন্ত্রণ করছে সভ্যজগতের রূপ কেমন হবে না-হবে। তার মানে যে-বাস্তবজগৎকে আমরা চোখের সামনে গড়ে উঠতে দেখছি, তার পেছনে ব্রহ্মরূপে রয়েছে এক নিয়ন্ত্রক সত্য; যাকে বাস্তবে দেখা যায় না। অর্থাৎ প্রকৃত সত্য বাস্তব নয়, অবাস্তব। কথাটি আর কেউ না বুঝুক, বাংলাভাষীদের চিরগৌরব ররীন্দ্রনাথ-রূপী শিব ঠিকই বুঝেছিলেন। তাঁর অজস্র রচনায় এই ব্রহ্ম ও সত্য বিষয়ে এরকম বহু কথা রয়েছে। যেমন —

> 'ধনবানের ধন ধনীর একমাত্র নিজের হতে পারে, কিন্তু সত্যবানের সত্য বিশ্বের। সত্যলাভের সঙ্গে সঙ্গেই তার নিমন্ত্রণ-প্রচার আছেই। ঋষি যখনই বুঝলেন 'বেদাহমেতম্' — আমি একে জেনেছি, তখনই তাঁকে বলতে হল, 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ' — তোমরা অমৃতের পুত্র, তোমরা সকলে শুনে যাও।'[১২]

তিনি জানতেন ব্রহ্ম = সত্য, সত্য = অবাস্তব। সেই সুবাদে জগৎ হল বাস্তব এবং মিথ্যা। পরিণত বয়সে, মৃত্যুর দু-মাস আগে তাঁর লেখা 'সত্য ও বাস্তব' নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে জানান —

> '... মানুষ আপনার দৈন্যকে, আপনার বিকৃতিকে বাস্তব জানলেও সত্য বলে বিশ্বাস করে না। তার সত্য তার নিজের সৃষ্টির মধ্যে সে স্থাপন করে। রাজ্যসাম্রাজ্যের চেয়েও তার মূল্য বেশি। ... মানুষ নিছক বাস্তব নয়। তার **অনেকখানি অবাস্তব, অর্থাৎ তা সত্য**। তা সত্যের সাধনার দিকে নানা পন্থায় উৎসুক হয়ে থাকে। তার সাহিত্য, তার শিল্প, (তার বিজ্ঞান), একটা বড়ো পন্থা। তা কখনো কখনো বাস্তবের রাস্তা দিয়ে চললেও পরিণামে সত্যের দিকে লক্ষ্য নির্দেশ করে।'[১৩]

বলে রাখা দরকার যে, রবীন্দ্রনাথকে কাজ চালাতে হয়েছিল ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি ছাড়াই। তাঁর সমস্ত অর্জন কার্যত তাঁর বিশাল প্রতিভার জোরেই সম্ভব হয়েছিল। ফলে, সত্য যে দুই প্রকার, তা তিনি সরাসরি বলে যেতে পারেননি। প্রথম সত্য হল অতিসত্য, যা কিনা বাস্তব সত্যের নিয়ন্ত্রক কিন্তু দৃশ্যত অবাস্তব, যা কিনা ব্রহ্মই বটে। আর দ্বিতীয় সত্য হল ব্রহ্ম থেকে জাত অনতিসত্য, যা দৃশ্যত বাস্তব, কিন্তু যার উদ্ভব (জ), বিকাশ (গ) ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন (ৎ) আছে; অতএব যা একদিন থাকবে না, তাই তাকে মিথ্যাও বলা যায়। ... রবীন্দ্রনাথ যেভাবে বিষয়টিকে রেখেছেন, তাকে একালের মতো করে আমরা বলতে পারি সত্য দুই প্রকার — অবাস্তব সত্য (অতিসত্য) ও বাস্তব সত্য (অনতিসত্য)। শঙ্করাচার্য এই অতিসত্যকে ব্রহ্ম এবং অনতিসত্যকে মিথ্যা বলে গেছেন। আমরা ইতিহাস ভুলে, শব্দার্থকৌশল ভুলে সেই 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'কে ফেলে রেখেছি বাজে কাগজের ঝুড়িতে।

এরকম হতে পারল কী করে? গাছের কাণ্ডটাকে রোগা করার বা কেটে দেওয়ার চেষ্টা করলে গাছটাই যে পড়ে যাবে, সে তো মূর্খেও বোঝে! মানবসভ্যতারূপী বৃক্ষটি যে-কাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেই ব্রহ্মকে বাদ দিয়ে দিলে, সমগ্র মানবসভ্যতাই মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে জন্তু-জানোয়ারদের সমতলে! তবুও সেই কাণ্ডটাকেই এরকম অবহেলা করা হল কেন? শিকড়বাকড়কে হিসেবে ধরাই হল না কেন?

মানবসভ্যতার সাবালক হয়ে ওঠার হ্যাপা : শিবহীন যজ্ঞ ও তার ফল

যতদূর বোঝা যায়, আদিম যৌথসমাজ আপন আত্মরক্ষা ও আত্মবিকাশের জন্য যে ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল, সেকালের (আনুমানিক ১৫০০-১৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) চিন্তাবিদেরা তার নাম দিয়েছিলেন 'পঞ্চ অশ্বত্থ'। তাদের নাম ছিল, 'বোধিদ্রুম, পিপ্পল, চলদল, কুঞ্জরাশন, ও অশ্বত্থ।' এর মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থার নাম ছিল সর্বাগ্রে — বোধিদ্রুম (বোধিবৃক্ষ) বা জ্ঞানবৃক্ষ।[১৪] খাদ্যাদির গণবণ্টনব্যবস্থার নাম ছিল তার পরেই — পিপ্পল, এখন যাকে আমরা পিপুল গাছ বলি। ইয়োরোপ এর উত্তরাধিকার পেয়েছে তাদের people (People's Democracy) শব্দে। ...

বাইবেল জানায়, জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়েই নাকি মানুষের অধঃপতন শুরু হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের সেই উত্তরাধিকার আরও স্পষ্টভাবে রয়েছে, রয়েছে আমাদের সংস্কৃতিতে, পুরাণাদি গ্রন্থে, তবে অন্য ভাষায় — 'বিদ্যাদির আগম বিধায়' (মনুসংহিতা) নাকি মানুষের অধঃপতন আরম্ভ হয়েছিল; সত্যযুগ থেকে 'মিথ্যাযুগ'-এর সূচনা হয়েছিল। এর অর্থ হল, মানুষের সমাজে প্রথম যে বোধিদ্রুম বা জ্ঞানবৃক্ষের (academic institution-এর) জন্ম হয়েছিল, তাতে শিক্ষালাভ করেই মানুষ অধঃপতিত হতে শুরু করেছিল। তার আগে মানুষের (মনুষ্যত্ব থেকে) পতন ঘটেনি। অর্থাৎ সমাজের অর্জিত-জ্ঞান শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উত্তরপ্রজন্মকে হস্তান্তর করার চেষ্টা তার সূচনাতেই কুফল দিতে শুরু করেছিল। যেকারণে প্রাচীন ভারতে যেমন বেদবিক্রয় বা বিদ্যাবিক্রয় নিন্দনীয় হয়ে যায়, প্রতীচীতেও জ্ঞানবৃক্ষের ফলভক্ষণ নিন্দনীয় হয়ে যায় (যদিও প্রতীচী তার জ্ঞানবৃক্ষের মানেই ভুলে গেছে)।

অপরদিকে, দক্ষোৎপত্তি, দক্ষযজ্ঞ, জ্বরোৎপত্তি, রোগোৎপত্তি নিয়ে আমাদের পুরাণাদি গ্রন্থে যে সকল বয়ান রয়েছে, তার থেকে জানা যায়, অধঃপতনের সূচনা হয়েছিল দক্ষযজ্ঞের কাল থেকে। মানবসভ্যতার সভ্যযুগের সূত্রপাত হয়েছিল তখন থেকেই। তার বহু পরে পৃথিবীর প্রথম রাষ্ট্ররূপে 'পৃথু'র উদ্ভব ঘটেছিল ভারতবর্ষেই। দক্ষযজ্ঞের কালের আগে পর্যন্ত যৌথমানবসমাজ উপরোক্ত যে-সমাজবৃক্ষগুলির জন্ম দিয়েছিল, তার প্রত্যেকটির কাণ্ডধারী বা কাণ্ডারী ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞানের অগ্নিশিখাবহনকারী শিব, এবং শাখাপ্রশাখার দায়িত্বে থাকতেন দক্ষেরা। দক্ষযজ্ঞের সময় সর্বপ্রথম কাণ্ডারীর দায়িত্বও চলে গেল দক্ষের হাতে। ব্রহ্মের অবহেলার ও অহিতের সূত্রপাত হয়ে গেল। প্রশ্ন হল, সেরকম হল কেন?

সমস্যাটির সূত্রপাত সেই আগুন আবিষ্কারের কালে। আগুন তো ছিলই; পরমাপ্রকৃতির অব্যক্তজ্ঞানের এলাকাভুক্ত হয়ে। ব্রহ্মজ্ঞান সেই অব্যক্তজ্ঞানকে ব্যক্তজ্ঞানে অনুবাদ করে নিল। অতঃপর এই আগুনকে মানুষ নিজের খুশিমতো ব্যবহার করতে পারল, অখাদ্যকে খাদ্যে পরিণত করতে পারল, শত্রুকে ভয় দেখাতে পারল, আরও কত কী পারল; মানবসভ্যতা গড়ে নিতে পারল। কিন্তু আগুন জ্বালানোর এই ব্যক্তজ্ঞান বহন করবে কে? আবিষ্কৃত জ্ঞানকে বহন করার জন্য যে যান্ত্রিক-নীতি অবশ্যই মানতে হয়, তা হল 'একই কর্মের পুনরাবৃত্তির নীতি'; আবিষ্কারকের পক্ষে যে-নীতি মানা খুবই কঠিন। কেননা তাতে তার ব্রহ্মসত্তা বা উদ্ভাবক সত্তাটি লোপ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। একাজে সে স্বভাবতই অবহেলা করে ফেলে। অগত্যা এক নতুন শক্তির জন্ম হয় সমাজে — স্পেশালিস্ট বা বিশেষজ্ঞ। সেকালে আবিষ্কারককে শিব বা পুরুষ এবং স্পেশালিস্টকে দক্ষ বা প্রকৃতিও বলা হত। আবিষ্কারক 'পুরুষগুণসম্পন্ন' স্রষ্টা-মানুষেরা আবিষ্কার করে আনবেন, স্পেশালিস্ট 'প্রকৃতিগুণসম্পন্ন' সৃষ্টিধর-মানুষেরা তা সুবিন্যস্ত করে বহন করে নিয়ে চলবেন, এটিই যৌথ সমাজের স্বাভাবিক রীতি হয়ে যায়।

এই পরিস্থিতি চলে আগুন আবিষ্কারের পর থেকে ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় ৮/১০ হাজার বছর কিংবা তারও বেশি। এই পর্যন্ত বলতে গেলে সব ঠিকঠাকই চলছিল। পরমাপ্রকৃতি আমাদের যা দিয়েছিলেন, আবিষ্কারের মাধ্যমে আমরা সে এলাকার বাইরে যেতে শিখলাম, সাবালক হতে লাগলাম। সব মায়েরাই চান, তার সন্তান সাবালক হোক। কিন্তু সাবালকত্বের কিছু হ্যাপা আছে এবং সে হ্যাপা সাবালককেই সামাল দিতে হয়। এক্ষেত্রেও সেই হ্যাপার সূত্রপাত হয়ে গেল। বাঁচতে গেলে ক্যাশ টাকার মতো ব্যক্তজ্ঞান দরকার, সেজন্য পরমাপ্রকৃতির দেওয়া অব্যক্তজ্ঞানের চেক ক্যাশ করার বিদ্যা (ব্রহ্মজ্ঞান) অর্জন করা দরকার; অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ দরকার, আবিষ্কারকও দরকার; সৃষ্টিধরকে দরকার, স্রষ্টাকেও দরকার। সমাজ সত্তা দুটির জন্মও দিয়ে ফেলেছিল।

সমস্যা দেখা দিল সেকালের বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় উদ্ভাবিত উৎপাদনের উপায়সমূহের, বিশেষত হাতিয়ারের পরিমাণ, যখন বেশি হয়ে গেল। দেখা গেল, একই কর্মের পুনরাবৃত্তির নীতি অনুসরণ করলেই মহেঞ্জদাড়োর মতো সমৃদ্ধ বিশাল বিশাল নগর গড়ে ফেলা যাচ্ছে। তাহলে নিত্যনতুন আবিষ্কারমূলক শিবনীতিতে পরিচালিত হওয়ার কী

প্রয়োজন! 'একই কর্মের পুনরাবৃত্তি'র দক্ষনীতিতে চললেই হয়, তাতে সমাজের পরিশ্রমও বাঁচে। সেরকম দক্ষ-পরিচালিত উৎপাদন কর্মযজ্ঞ শুরুও হয়ে গেল। ... দিনে দিনে প্রশ্ন দেখা দিল, সবই যখন দক্ষই করছে, সমাজবৃক্ষগুলির কাণ্ডারীর আসনে দক্ষকে বসানো হবে না কেন? স্রষ্টা-উদ্ভাবককে সরিয়ে সেখানে ব্যক্তজ্ঞানের বাহক বিশেষজ্ঞ-সৃষ্টিধরকে বসালে অসুবিধা কোথায়? যদিও ব্যক্তজ্ঞানপ্রবাহের আধার স্বরূপ সমাজবৃক্ষের অধিকাংশ শাখা-প্রশাখার দায়িত্বই সৃষ্টিধর দক্ষের; কিন্তু মূল দায়িত্বেই বা তাকে বসানো হবে না কেন? মোটকথা উদ্ভূত নতুন পরিস্থিতিতে সেখানে কাকে বসানো হবে তা নিয়ে গুরুতর মতভেদ দেখা দিল। কাকে কাণ্ডারী করা হবে? উদ্ভাবককে না বিশেষজ্ঞকে? স্রষ্টাকে না সৃষ্টিধরকে? শিবকে না দক্ষকে? পুরুষকে না প্রকৃতিকে? স্রষ্টাকে না তার পুত্রকে? স্রষ্টাকে না তার প্রেরিত দূতকে? এর সঙ্গে আর একটি গুরুতর প্রশ্ন জড়িয়ে গেল — মন না দেহ, মানবিক অস্তিত্বমাত্রকে কে চালায়? তার কাণ্ডারী কে? কারণ, দেখা গেল, স্রষ্টাকে সর্বোচ্চ আসন দিলে সবকিছুর সামনে চলে আসে মন, আর সৃষ্টিধরকে সর্বোচ্চ আসন দিলে সবকিছুর সামনে চলে আসে দেহ। সমাজবৃক্ষগুলির ক্ষেত্রে কাকে কাণ্ডারী করা হবে, দেহকে না মনকে?[১৫]

একধরনের যুক্তিবাদী আছেন, যাঁদের চিন্তাপদ্ধতি যন্ত্রের মতো। সেই চাষার কথা ভাবুন, গরম কাস্তে জলে ডোবালে ঠাণ্ডা হয় দেখে যে তার বুড়ি-মায়ের জ্বর-তপ্ত গরম-গা ঠাণ্ডা করার জন্য তাকেও পুকুরে চোবানো উচিত বিবেচনা করেছিল। এঁরাও সেইরকম। এঁরা বায়োডাটা দিয়ে মানুষ চেনেন। ঈশ্বরের বাড়ি, ফোন নম্বর, বউয়ের নাম, এসব না পেলে ঈশ্বরের পুত্র বা প্রেরিত দূতকে এঁরা চিনতে পারেন না। বায়োডাটা কই? সমাজমনের গভীরতম প্রদেশে (= লোকে) সর্বজনীন (মহামায়ার) অব্যক্ত জ্ঞানপ্রবাহের যে সূর্যকিরণ সতত বিচ্ছুরিত হয়ে চলেছে, তা এঁরা দেখতে পান না। তাই মানুষের ঈশ্বরবিষয়ক, ঈশ্বরপুত্র বা ঈশ্বর-প্রেরিত দূত বিষয়ক ধারণাগুলিকে শোনামাত্রই তাঁরা নস্যাৎ করে দেন। অথচ এসব ধারণা যে আদৌ শূন্য থেকে জন্মায়নি, আজ তা স্পষ্ট বোঝা যায়। মানুষের সমাজে 'আমার' ('minc' বা 'মীন' অবতারের) অর্থাৎ ব্যক্তিমালিকানার ধারণার জন্ম যেমন তার সমান্তরালে জগৎস্রষ্টার বা ঈশ্বর-ধারণার জন্ম দিয়েছিল,[১৬] সেভাবেই মানুষের সমাজে আবিষ্কারক ও বিশেষজ্ঞ (পুরুষ ও প্রকৃতি) সক্রিয় হতেই 'ঈশ্বর ও ঈশ্বরপুত্র' বা 'ঈশ্বর ও তাঁর প্রেরিত দূত' ধারণার জন্ম হয়েছিল। সংগত কারণেই তাঁদের আবির্ভাব ঘটেছিল, আজও যার যাথার্থ্য 'বর্ত্তমান।

যাঁরা সেই ঈশ্বর বা ঈশ্বরের পুত্র বা প্রেরিত দূতকে নিয়ে ব্যবসা করেন, তাঁদের অজস্র দোষ আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু কিছু ধর্মবাণিজ্যিকের দোষে মানবজাতির প্রকৃত অর্জনকে ফেলে দেওয়া যায় না। তা করলে, আমাদের পূর্বপুরুষদের অর্জিত সত্যকেই আমরা নিজেদের অতি-চালাকির কারণে হারাব। পূর্বপুরুষদের সেই সমস্ত সত্যকে ফেলে দিলে মানবজাতি নিঃস্ব হয়ে যাবে। **তাঁদের সেকেলে কথাবার্তার অর্থ যতটুকু বুঝতে পারা যায়, ততটুকু বুঝতে হয়। যা বোঝা যাচ্ছে না, তা যেমন আছে, তেমন থাকতে দিতে হয়, অপেক্ষা**

করতে হয়। সেই উত্তরসূরি একদিন জন্মাবেই, যে এই সব রহস্যই পরিষ্কার করে দেবে। না বুঝে এখনই ফেলে দিলে পরে একদিন পস্তানোরও জায়গা থাকবে না। আজ যে-পস্তানিতে খানিকটা ভুগছে ইয়োরোপ-আমেরিকা এবং 'এশিয়ান মিস্টিসিজম'-এর ভিতরে তাঁদের 'হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ'-এর দেখা মিলবে এই আশায় এশিয়ার দুয়ারে এসে ধর্না দিচ্ছে।

তা সে যাই হোক, আদি সমাজবৃক্ষ নিয়ে সমস্যায় পড়া সেকালের মানুষ অবাক হয়ে দেখলেন — স্রষ্টা ও সৃষ্টিধরের (বা পুরুষ ও প্রকৃতির) সম্বন্ধটি নেচার ও মানুষের যে-সম্বন্ধের উপর দাঁড়িয়েছিল, সেটিই বদলে গেছে; এবং তা সামাল দিতে সৃষ্টিধরকেই বসিয়ে দিতে হচ্ছে সর্বোচ্চ আসনে। যেন-বা ব্রহ্মজ্ঞানের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার প্রয়োজন আর নেই। জ্ঞানপ্রদীপের শিখা না-জ্বললেও এখন চলবে। শিখাহীন প্রদীপ ঘষে দিতেই জন্ম নিল আলাদীনের দৈত্য। 'একই কর্মের পুনরাবৃত্তি'র মাধ্যমে উৎপাদিত সম্পদ মানুষের প্রয়োজনকে অনায়াসে ছাড়িয়ে যেতে পারল। উদ্বৃত্ত উৎপন্নে সমাজ ভরে যেতে লাগল। সেকালের ব্রহ্মজ্ঞানীরা বুঝতে পারছিলেন, এর ফল অন্তিমে ভাল হবে না; তাই তাঁরা জনসাধারণকে (সতীকে) এই দক্ষপরিচালিত উৎপাদন কর্মযজ্ঞে যোগ দিতে মানা করলেন। জনসাধারণ তা শোনেননি, দক্ষযজ্ঞে যোগ দিয়ে উদ্ভাবকদের জন্য উৎপন্নের ভাগ (পতির জন্য 'যজ্ঞভাগ') দাবি করেছিলেন। কারণ, দক্ষ (স্পেশালিস্ট) যে-ব্যক্তজ্ঞানের পুনরাবৃত্তি করে কর্মযজ্ঞ চালাচ্ছে, তার উদ্ভাবক তো ব্রহ্মজ্ঞানের অগ্নিশিখাবহনকারী স্বয়ং শিব! ...

মোটকথা, সভ্যতার সূত্রপাতেই ব্রহ্মজ্ঞানকে অবহেলা করার সূত্রপাত হয়ে যায়। সেকালের উদ্ভাবকেরা (শিব) যতিধর্ম (কাজে হাত না লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার ধর্ম) গ্রহণ করলেন। মহর্ষিরা দক্ষ পরিচালিত যজ্ঞ মেনে নিলেও, নিজেদের 'ব্রহ্ম'গুণসম্পন্ন শিবসত্তাকে সম্মান দিতে ভুললেন না। তাছাড়া, ১০ হাজারের বছরের অভ্যাস ছাড়তে ২/৩ হাজার বছর তো লাগবেই। আমরাও উপরোক্ত ব্রহ্মবিষয়ক আলোচনা থেকে আগেই দেখেছি, ব্রহ্মকে বাদ দিয়ে মানবসভ্যতা একদিনও টিকে থাকতে পারে না। 'কৃত্রিম আগুন ব্যবহার করা চলবে না' — এই একটিমাত্র নিষেধেই আজকের মানবসভ্যতা মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে; সমস্ত ব্রহ্মজ্ঞান নিষিদ্ধ করলে তো কথাই নেই, কর্পূরের মতো উবে যাবে সমগ্র মানবসভ্যতা। এমনকি, নতুন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে সামান্য কিছু রদবদল করতে গেলেও ব্রহ্মকে চাই। কেননা, চোখের সামনে যে বস্তুজগৎকে দেখছি, তা প্রতীয়মান রয়েছে ঠিকই, কিন্তু যদি তাকে কোনোভাবে নাড়াচাড়া অদলবদল করতে চাই, তবে প্রতীয়মান জগৎকে সত্য বলে বিশ্বাস করলে ঠকতে হবে; বিশ্বাস করতে হবে অন্তর্নিহিত সত্যে, অতিসত্যে, ব্রহ্মে। উচ্চচিন্তার ক্ষেত্রে ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা। এই তত্ত্বে সেকালের মহর্ষিদের গভীর নিষ্ঠা ছিল। তাই, নিত্য ব্রহ্মন্ বা আবিষ্কারের ধারনাধারা যাতে সক্রিয় থাকে সেদিকে তাঁরা নজর রাখতেন। ব্রহ্মজ্ঞানের উৎসমুখ পাহারা দেওয়া ও নতুন নতুন ব্রহ্মজ্ঞানের আগমনকে বরণ করে নেওয়ার রীতি তাঁরা তার পরেও বহুদিন মান্য করে চলেছেন। ব্রহ্মের প্রতি এই নিষ্ঠা ছিল বলেই সমাজের কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায়নি। ফলত তাঁদের নেতৃত্বে পরিচালিত সভ্যতা তখনও 'একঝোঁকা' হয়ে যায়নি।

ব্রহ্মজ্ঞানের অগ্নিশিখাবহনকারী শিবের অমর্যাদা করে বা আবিষ্কারকের অমর্যাদা করে একই কর্মের পুনরাবৃত্তিকারী দক্ষের বা স্পেশালিস্ট-বিশেষজ্ঞের নেতৃত্বে সামাজিক উৎপাদন কর্মযজ্ঞ পরিচালনার ফল ফলতে শুরু করল অচিরেই। সর্বাগ্রে হাজির হল উদ্বৃত্ত উৎপন্ন, বাড়তি সম্পদ। সেই প্রাচীন যৌথসমাজের সামনে হাজির হয়ে সে জানতে চাইল — আমায় নিয়ে কী করবে করো! আমি মানুষের ঘাম থেকে, মেধা থেকে জন্মলাভ করেছি। আমি মানুষের সন্তান। আমায় আমার অবস্থান বলে দাও! সমাজ কিছুতেই খুঁজে পেল না, এই উদ্বৃত্ত সম্পদ নিয়ে সে কী করবে! (বলে রাখা যাক, এই প্রশ্নের উত্তর মানুষ আজও জানে না।)

সর্বাগ্রে এই উদ্বৃত্ত সম্পদকে ভুক্তাবশিষ্ট বলে, 'উচ্ছিষ্ট' বলে নিন্দা করা শুরু হল, তাকে বর্জনীয় ঘোষণা করে 'আবর্জনা নিক্ষেপস্থানে' ফেলে আসতে বলা হল; আর 'যে আবর্জনা নিক্ষেপ স্থানে যায়' এবং সেই উদ্বৃত্ত কুড়িয়ে নেয়, তাকে নিন্দা করা হল 'কিরাত' বলে। সমাজ দেখে ফেলল, এই 'অবশেষ' (abscess) সমাজশরীরে ফোঁড়া হয়ে, পুঁজ হয়ে দেখা দিচ্ছে। কিন্তু এত সব করেও 'পুঁজ' থেকে, 'পুঁজির উদ্ভব' থেকে সমাজশরীরকে কিছুতেই বাঁচানো গেল না; শেষরক্ষা করা গেল না। দক্ষের অনিবার্য অনুসারী রূপে যক্ষ (hoarder / usurer), রক্ষ, মদনের (সকাম কর্মের) ভস্মে পরিণত হওয়া, নিষ্কাম কর্মের ও রতিবিলাপের আবির্ভাব, পণ্যের উদ্ভব, পুঁজির বিকাশ, মৎস্যাবতার, কূর্ম্মাবতার, এককথায় নগদ নারায়ণের নানা রূপের আবির্ভাব কিছুতেই ঠেকানো গেল না। যৌথসমাজ খণ্ডিত বিখণ্ডিত হতে হতে ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক সমাজে পরিণত হতে লাগল; কিছুতেই তাকে আটকানো গেল না। ... পিছু পিছু একদিন রাষ্ট্রেরও (পৃথুর) আবির্ভাব ঘটে গেল। জন্ম হয়ে গেল সন্ত্রাসের। প্রতিটি রাষ্ট্রীয় এলাকার সীমান্তে ত্রাস (terror) সৃষ্টি করে রাষ্ট্রীয় এলাকা (territory)-গুলি গড়ে উঠল। মানবসভ্যতা সম্পূর্ণ 'এককোঁকা' হয়ে গেল। ... তার পরে পরে কী কী ঘটল, একালের ঐতিহাসিকরা সেসব কথা কমবেশি সবাই জানেন।

ব্রহ্মই যে মানবসভ্যতার প্রাণভোমরা, একথা সেকালে সবাই জানতেন। তাই ব্রহ্মজ্ঞানীর বা উদ্ভাবকের স্থান ছিল সমাজের শীর্ষে। আবিষ্কারকের সঙ্গে জনসাধারণের (শিবের সঙ্গে সতী-মহামায়ার) দ্বৈরাজ্যিক প্রেমবন্ধনে সেই স্বাভাবিক প্রাকৃতিক সমাজ চলছিল। দক্ষোৎপত্তির পর, সমাজশীর্ষ থেকে আবিষ্কারক ব্রহ্মজ্ঞানীকে (শিবকে) নামিয়ে দিয়ে সেখানে স্পেশালিস্ট-দক্ষকে বসিয়ে মানুষের সমাজ আর পরিস্থিতি সামাল দিতে পারেনি। পণ্য, পুঁজি, ক্ষমতা, রাজা-বাদশা, লুঠতরাজ, যুদ্ধ, হিংসা, হত্যা ... ইত্যাদির উদ্ভবের পথ করে দিয়ে সেই কণ্টকিত রক্তাক্ত ক্লেদাক্ত পথের উপর দিয়ে দক্ষ-পরিচালিত সমাজ মানুষের সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে এসে অবশেষে মুখোমুখি হয়েছে দুইখানি বিশ্বযুদ্ধের। কিন্তু তাতেও তার মুক্তি জোটেনি। এখন সে আবার বিশ্বজোড়া 'পণ্যজীবিতা'য় (দৈবে) ভর করে বেঁচে যাওয়ার সোজা রাস্তা খুঁজতে গিয়ে বিশ্বায়নের ডাক ডেকে বসে আছে। আর, তার পেছনে খাঁড়া হাতে আগুয়ান তারই 'প্রতিক্রিয়া' — সন্ত্রাস। অপরদিকে, উদ্ভাবক শিবগুণসম্পন্ন মানুষেরা থেকেছেন সমাজবৃক্ষ থেকে দূরে। সমাজ তাঁদের থেকে উদ্ভাবন, আবিষ্কার, হাত পেতে নিয়েছে, কিন্তু কখনো

তাঁদের প্রাপ্য সম্মান তাঁদের আর ফেরত দেয়নি, রেখেছে অপাঙ্‌ক্তেয় করে। অপরদিকে, জনসাধারণ অবহেলিত হতে শুরু করেছে সেই দক্ষযজ্ঞের পর থেকেই। কর্মের প্রতি তার কামনাকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে মদনভস্মের মাধ্যমে। রতিবিলাপ বন্ধ হওয়া তো বহু দূরের কথা, এখন তা হাজার গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। একই কর্মের পুনরাবৃত্তির একঘেঁয়ে পোষা জন্তুর জীবন মানুষের আত্মাকে দলিত মথিত করে দিচ্ছে। চিৎকার করে, মদ খেয়ে, সমস্ত প্রকারের উগ্র রসের মধ্যে ডুবে নিজ নিজ আত্মার গ্লানির হাত থেকে মুক্তি চাইছে সাধারণ মানুষ।

তবুও আদি মহর্ষিদের বিষয়ে কিছু কিছু স্মৃতি সমাজের ছিল বলে, ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত আর যাই হোক, সমাজে উদ্ভাবনকর্ম বা ব্রহ্মন্ অসম্ভব হয়ে পড়েনি। যথোচিত মর্যাদা না পেলেও আবিষ্কারকেরা তাঁদের সৃজনকর্ম কমবেশি চালিয়ে গেছেন। কিন্তু সম্প্রতি সারা বিশ্বজুড়েই এই উদ্ভাবনকর্ম বন্ধ করে দেওয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিস্থিতি যদি চলতে থাকে মানবসভ্যতা অচিরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অথচ আজকের বিশ্বসভ্যতা সেদিকেই এগোচ্ছে কেন? যে-গাছের উপর চড়ে প্রাণ বাঁচাতে হয়, কোন বাধ্যবাধকতায় আজকের মানুষ সেই গাছের গোড়া কাটতে লেগেছে?

ছিনে-জোঁকের উৎপাত : সন্ত্রাসের উপাখ্যান

টাকার-কুমির, রাঘব-বোয়াল, রুই-কাতলা, চুনো-পুঁটি কাদের বলে, কেন বলে, হয়তো জানেন;[১৭] কিন্তু জোঁক বা ছিনে-জোঁক কাদের বলে জানেন কি?

বাংলাভাষী বড়ই ভাগ্যবান। তাঁদের রয়েছেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ। যে-কোনো সমস্যায় তাঁর কাছে গেলে একটা-না-একটা সমাধান পাওয়া যায়। তখনও ভারত স্বাধীন হয়নি, জমিদারদের বিরুদ্ধে অনেকেই বিষোদ্গার করতে শুরু করেছে; কেউবা তাদের মেরে ফেলার কথাও বলছে; 'রায়তের কথা' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সাবধান করে দিলেন — এই বড়ো জোঁককে মারতে চাও, মারো। কিন্তু একটা বড়ো জোঁক মারলে যে শত শত ছিনে-জোঁক জন্মাবে, সে কথাটি ভুলে যেয়ো না![১৮]

তো, কে শোনে কার কথা। স্বাধীনতা লাভের পর শুরু হল জোঁক মারা। কাজটি শুরু করল কংগ্রেস, শেষ করল সিপিএম। দশ-বিশটা গ্রামে থাকত এক একটা জমিদার, তাদের জমিদারি কেড়ে নেওয়া হতে লাগল। জোঁক গেল মরে। সঙ্গে সঙ্গে শত ছিনে-জোঁকের জন্ম হয়ে গেল। প্রতিটি গ্রামেই দু-পাঁচজন, বড় গ্রাম হলে বিশ-তিরিশজন এমন লোকের আবির্ভাব হল, যারা সুযোগ পাওয়া মাত্রই প্রতিবেশীর গায়ে চিপকে যায় এবং তার কিছু-না-কিছু ছিনিয়ে নিয়ে তবে ছাড়ে। এই হল ছিনে-জোঁক। এদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া খুবই মুশকিল। গ্রামে-শহরে, পাড়ায়-পাড়ায়, অফিসে-আদালতে, দোকানে-বাজারে, স্কুল-হাসপাতালে, পথে-ঘাটে, মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে এবং পশ্চিমবাংলার সর্বত্র এখন এই ছিনে-জোঁকেদের অবাধ রাজত্ব।

রবীন্দ্রনাথ বলে গেলেন, বড় লোকের বড়জালে বড় ফাঁস থাকে, তাতে বড় মাছ ধরা

পড়ে, চুনোপুঁটি বেঁচে যায়। কিন্তু এই ছিনে-জোঁকেদের ছোটজালে থাকে ছোট ফাঁস। তাতে চুনোপুঁটিও মারা পড়ে। জমিদারের বদলে যে নতুন শাসকেরা এখন গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত জাল ফেলে বেড়াচ্ছে, তাদের জালের ফাঁস খুবই ছোট। একেবারে চুনোপুঁটিরাও তাদের হাত থেকে রেহাই পায় না।

আগেকার কালে টাকার কুমির থেকে জোঁক পর্যন্ত যে মানুষেরা ছিল, জনসাধারণের মধ্যে তাদের হার ছিল বড়জোর দু-তিন শতাংশ। কিন্তু ছিনে-জোঁকের সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ায় এখন এই সংখ্যাটা গিয়ে ঠেকেছে হয়তো বা বিশ শতাংশে। এদের এই অস্বাভাবিক সংখ্যাবৃদ্ধির কারণে বাকি আশি শতাংশ মানুষের অভ্যাসও তেমন ভালো থাকতে পারছে না। একটুখানি আলগা পেলে বা চান্স পেলে কেউ যদি কাউকে না-ছাড়ে, বিপরীত পক্ষ কাঁহাতক সইবে! সেও পালটা কামড় লাগায়। অনিবার্য ফল হয়েছে এই যে, বাংলাভাষীদের গোটা সমাজটাই এখন কামড়াকামড়ি করে মরছে। ছিনে-জোঁকেরা মুখিয়ে রয়েছে, অন্যেরা সদাসতর্ক, সন্ত্রস্ত; এই বুঝি কেউ তার গায়ে চিপকে গেল, খানিকটা রক্তমাংস খুবলে নিল! ফলত পশ্চিমবাংলার মানুষের জীবন আজ নিতান্তই দুর্বিষহ। প্রতিটি মানুষ সদাসতর্ক, সদাসন্ত্রস্ত। যে সতর্ক নয়, সে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে কিছু না কিছু খোয়াচ্ছে।

ছিনে-জোঁকেরা রক্তের স্বাদ পেয়ে যাবার পর থেমে থাকতে পারে না। সেটাই এখন কাল হয়ে দেখা দিয়েছে; এমনকি বর্তমান পশ্চিমবাংলার শাসকদেরও মাথাব্যথার কারণ তারাই। পশ্চিমবাংলার সমাজের সামঞ্জস্যটাই এরা নষ্ট করে দিয়েছে। বিরোধের বা 'পার্থক্যের উপর সামঞ্জস্যের'[১৯] চাদর বিছিয়ে চলাই সমাজের স্বাভাবিক অভ্যাস ছিল। বিগত যুগগুলিতে আমাদের সমাজে ধনী দরিদ্র ছিল না, বিরোধ ছিল না, এমন নয়। কিন্তু সে বিরোধ কখনোই কাম্য স্তরের (অপটিমাম লেভেলের) উপরে যেত না। দিনমজুর, বাগদি, জেলে, মেথর, রাখাল-বাগালদেরও গেরস্থবাড়ির লোকেরা কাকা-মামা-জেঠা-দাদু বলে সম্বোধন করত; হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেও এইধরনের সামাজিক ভাববিনিময় প্রতিষ্ঠিত ছিল; এককথায় 'সামাজিকতা' ছিল। শিক্ষক শিক্ষকতার ধর্ম মানতেন, বিপরীত দলের নেতার ছেলেমেয়েকে পড়ানোর সময় শিক্ষা দেওয়ার ধর্ম থেকে তিনি বিচ্যুত হতেন না। ডাক্তার, উকিল প্রভৃতি সমস্ত পেশার মানুষেরা নিজ নিজ ধর্মের সত্যকে আগে স্থান দিতেন, তারপরে স্থান দিতেন নিজের ব্যক্তিস্বার্থের সত্যকে বা দলের সত্যকে কিংবা দেশের সত্যকে। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই দেখা গেল, লোকে স্বার্থের সত্যকে, দলের সত্যকে ধর্মের সত্যের আগে স্থান দিতে পিছপা হচ্ছে না। দক্ষযুগের থেকে যে ক্রম-অধঃপতন চলে আসছিল, দেহবাদী ছোটো-ইংরেজের সংস্পর্শে তার গতি স্বভাবতই তীব্রতর হয়। প্রথমে তা হয় কংগ্রেস পার্টির হাত ধরে; যুক্তফ্রন্ট-বামফ্রন্টের বা সিপিএমের আমলে তা আরও বেড়েছে। যে-নিয়মে এই অধঃপতন ঘটেছে, সিপিএম না হয়ে অন্য কোনো দল যদি পশ্চিমবাংলার ক্ষমতায় থাকত, এই পরিস্থিতি এতটুকুও অন্যরকম হত না। ফলে 'মানুষের ধর্ম'-এর উপর মানুষের আস্থা কমে গেছে। এই অনাস্থা, যে-প্রতিবেশীদের মধ্যে মানুষ বাস করে তাদেরই সন্দেহ করতে মানুষকে প্ররোচিত

করে। আর সন্দেহ মাত্রই নিজেকে নিজে পুষ্ট করে থাকে। এর অনিবার্য ফল হয় একধরনের ত্রাসের মধ্যে দিন গুজরান করা।

এর ওপর রয়েছে রাষ্ট্রের ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাসের প্রশ্ন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, সোভিয়েতের প্রতিষ্ঠা, ফ্যাসিবাদের প্রতিষ্ঠা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পৃথিবীর আরও কয়েকটি দেশে সমাজতন্ত্রীদের ক্ষমতাদখল প্রভৃতি ঘটনা রাষ্ট্রের স্বভাব বদলে দেয়। যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস থাকত সীমান্তে, তা ঢুকে পড়ে দেশের ভেতরেও। যাদের রাষ্ট্র, রাষ্ট্রক্ষমতা তাদের উপরই নজরদারি শুরু করে। এর ভিতরে আবার রাষ্ট্রক্ষমতার পেছনে আশ্রয় নিয়ে নেয় ছিনে-জোঁকেরা। তাদের নিয়ত আক্রমণে নাগরিকদের জীবন সর্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকে। ছিনে-জোঁকদের এই দুর্বিষহ আক্রমণের প্রতিক্রিয়া সর্বাগ্রে দেখতে পায় ছিনে-জোঁকেরাই। তাঁরা নিশ্চিত জেনে যায়, আগামীকাল যদি তাদের 'ক্ষমতার আড়াল' চলে যায়, তাদের কিছু লোকের একমাত্র ভবিষ্যৎ — এলাকাছাড়া হওয়া অথবা মৃত্যু। কেউ যদি জানতে পারে, পাড়ার অমুক বাড়িতে যে-সভা চলছে তা যদি সফল হয়, আগামীকাল তার নিশ্চিত মৃত্যু, তাহলে সে কি বসে থাকতে পারে? সে কি দলবেঁধে গিয়ে সেই সভাটাকেই সবসুদ্ধ জ্বালিয়ে মানুষগুলোকে মেরে নুন দিয়ে জারিয়ে দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেবে না? নন্দীগ্রামের কিছু মানুষ আজ নন্দীগ্রামের বাইরে কাটাচ্ছেন, তাঁদের পরিবারের অনেকেই এখন ছন্নছাড়া অবস্থায় রয়েছেন। বিতাড়কদের সঙ্গে মারামারিতে তাঁদের দু-এক জন মারাও গিয়েছেন। কিন্তু বিগত আক্রমণ-প্রতিআক্রমণের ঘটনাগুলিতে আজকের ঘরছাড়ারা যদি জয়ী হতেন, তাহলে কি বিরোধীদের অবস্থা এই ঘরছাড়াদের থেকেও খারাপ হত না? হতই।

সারা পশ্চিমবাংলায় এখন এই পরিস্থিতি। বিরোধ অপটিমাম লেভেল অতিক্রম করে গেছে। আর পরিস্থিতির এই ভয়ানক রূপের পেছনে রয়েছে ছিনে-জোঁকেরা। যেখানে যে দল ক্ষমতায় রয়েছে, এরা তাদের 'ক্ষমতার আড়ালে' রয়েছে। ক্ষমতাসীনের পেছনে দাঁড়িয়ে তার সামনের মানুষের কলাটা-মূলাটা, রক্ত-মাংস থেকে ইজ্জতটা পর্যন্ত আঁচড়ে নিয়ে নিচ্ছে এরা। ফলে উভয় পক্ষই সদাসন্ত্রস্ত। যার নিচ্ছে সে তো সদাসন্ত্রস্তই, এই বুঝি আবার কিছু আঁচড়ে নিল কেউ। আর, যে নিচ্ছে সে জানে, ক্ষমতার ছায়া চলে গেলে তার মৃত্যু কিংবা এলাকাছাড়া হওয়া নিশ্চিত। গোটা সমাজ সর্বদা একটা সন্ত্রাসের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। শাসিতরা সন্ত্রস্ত, সন্ত্রস্ত শাসকরাও। 'সামঞ্জস্যের আস্তরণ' বিছানোর কোনো উপায় নেই।

এমন মনে করার দরকার নেই যে, ভোট দিয়ে বা অন্য কোনোভাবে ক্ষমতার সিংহাসন থেকে শাসক পার্টিকে বদলে দিতে পারলে এইরকম পরিস্থিতি থাকবে না। একেবারেই ভুল। যে গতিতে আজ আমাদের সমাজ নীচের দিকে নামছে, ওইরকম ক্ষমতাবদল সেই অধঃপতনের গতিকে এতটুকুও কমাবে না, বরং তীব্রতর করবে; তা সে ক্ষমতায় বিজেপি, তৃণমূল, কংগ্রেস, নকশাল, যেই আসুক। আজ রাম শ্যামকে মারছে, কাল শ্যাম রামকে মারবে; মারামারি কিন্তু চলবেই এবং তার পরিমাণ বাড়বেই। এই অনিবার্য ভবিতব্য থেকে তারা কেউই আমাদের বাঁচাতে পারবে না।

এ তো গেল দেশের, সমাজের ভেতরের সন্ত্রাস। সম্প্রতি কালে আর এক ভূত এসে দেখা দিয়েছে আমাদের দেশে। তার নাম বিশ্বসন্ত্রাস। তার উপদ্রবে আজ সারা বিশ্বই তটস্থ। পরিস্থিতি এমন যে, গত এপ্রিল ২০০৭-এ, 'ইয়াহু ডট কম'-এর মাধ্যমে আমাদের রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল কালাম বিশ্ববাসীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন — 'সন্ত্রাসমুক্ত-বিশ্ব গড়া যাবে কেমন করে?' নিশ্চয় তিনি বুঝেছিলেন, সন্ত্রাস আজকের বড় বিপদ, অথচ তাকে নির্মূল করার কোনো উপায় তিনি দেখতে পাচ্ছেন না; তাই তিনি বিশ্ববাসীর কাছে জানতে চান সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্ব গড়ার কোনো উপায় কেউ জানেন কি না। সম্ভবত তিনি জানতেন, এ-ব্যাপারে পুলিশি প্রহরাবৃদ্ধি কোনো কাজের কথা নয়; সমগ্র দেশকে বেহুলার লৌহবাসর বানানো যায় না। হয়তো তিনি দেখেছেন, তাঁর জানা কোনো দেশের কোনো নেতানেত্রী বা বুদ্ধিজীবীর কাছে এ-প্রশ্নের উত্তর নেই; নেই কোনো অ্যাকাডেমির কাছেও। আর, যে সাধারণ মানুষ প্রতিটি সন্ত্রাসের ঘটনায় নিজেদের পরিবার-পরিজনকে হারিয়ে আকুল কাঁদছেন তাঁদের কাছে তো নেইই। কোথাও যদি এ-প্রশ্নের যথার্থ উত্তর থাকত, নিশ্চয় তিনি জেনে নিতেন। একশো কোটি মানুষের একটি দেশের রাষ্ট্রপতি হয়ে সমগ্র জাতিকে তাদের অনিকেত যাত্রায় এগিয়ে নিয়ে চলার সর্বোচ্চ দায়িত্বে কাণ্ডারীর আসনে বসে নিজের এই অজ্ঞতার কথা তিনি মুখ ফুটে সারা দুনিয়াকে বলতে যেতেন না।

আর, কথা তো ঠিকই! দেশের কাণ্ডারী হয়ে সমাজকে তিনি যে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, সে তো এক অনিকেত যাত্রাই! এবং অনিকেত-যাত্রার মাঝপথে পাইলট যদি চারিদিকে কুয়াশা দেখেন, দিকদিশা ঠিক করতে না পারেন এবং সেকথা তাঁর প্লেনের যাত্রীদের বলে বসেন, যাত্রীরা তো কান্নাকাটি শুরু করে দেবে! তা সত্ত্বেও তিনি যখন মুখ ফুটে বলেছেন, তখন বোঝা যায়, তিনি বড়ই আতান্তরে পড়েছেন — বললে পরিস্থিতি আরও বিগড়ে যেতে পারে, অথচ না বলে থাকা যাচ্ছে না! সম্ভবত তিনি ভেবেছেন, না-বললে যে একপ্রকার অসততা হয়ে যায়! সৎ ভালোমানুষদের এমন প্রতিক্রিয়া হতেই পারে।

এই ঘটনা আমাদের জানিয়ে দেয়, সন্ত্রাস এত বড় বিপদ যে তার মোকাবিলা করবার কোনো উপায় দেখতে পাচ্ছেন না একালের মানবসভ্যতার রাষ্ট্রনায়কেরা; কিন্তু তার চেয়েও জরুরি কথা হল, আমরা কিন্তু সন্ত্রাসের চেয়েও অনেক বড় এক মহাবিপদের মুখে পড়ে গেছি! মানুষের মাথা যেমন কখনো-সখনো তার শরীরকে রক্ষা করার বুদ্ধি হারায়, সেইরকম আজকের মানবসভ্যতার জ্ঞানসম্পদের অধিকারীরা মানবসভ্যতাকে রক্ষা করার জ্ঞান-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে। পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য যে জ্ঞানবুদ্ধি দরকার, আজকের মানবসমাজের নেতানেত্রী-বুদ্ধিজীবীদের তেমন জ্ঞানবুদ্ধির অভাব পড়ে গেছে; কারও কাছেই কোনো সমাধান নেই! অকস্মাৎ কল্পনাতীত কোনো মহাবিপদে পড়ে দিকদিশা খুঁজে না পেয়ে 'কাণ্ডজ্ঞান' হারিয়ে ব্যক্তিমানুষের যেমন পাগলের মতো অবস্থা হয়, আজকের বিশ্বমানবের সেই দুরবস্থা। সবাই জানেন, মানুষ তার ঘরবাড়ি ধনদৌলত আত্মীয়স্বজন খোয়ালেও বহুকষ্টে তবুও কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারে, এমনকি পুনরায় ঘুরে দাঁড়াতেও পারে; কিন্তু মাথা খারাপ

হয়ে উন্মাদ হয়ে গেলে, তার সর্বনাশ হয়ে যায়; সে প্রকৃত অর্থে সর্বহারা হয়ে কিছুদিন জন্তু-জানোয়ারের চেয়েও মন্দভাবে বেঁচে থাকে, তারপর মরে যায়। আজকের মানবসভ্যতা যেন তার 'কাণ্ডজ্ঞান' হারিয়ে সেই উন্মাদ হওয়ার পূর্বাবস্থায় পৌঁছে গেছে; ফলত এক মহাসর্বনাশ সমুপস্থিত দেখা যাচ্ছে! বিপদের মোকাবিলা করবে কী, যেন-বা মানবসভ্যতার মাথাটাই গেছে খারাপ হয়ে! তার সামনে না-মরে-ভূত-হওয়া সন্ত্রাস সদা সর্বত্র বিরাজিত ঈশ্বরপ্রতিম রূপে দেখা দিয়েছে, অথচ ধরাছোঁয়ার মধ্যে কোথাও সে নেই। সে পুরোদমে আছে অথচ একেবারে নেই। তাকে দেখা যায় না, অথচ যে কোনো সময় পৃথিবীর যে কোনো স্থানে সে শত-শত হাজার-হাজার মানুষের প্রাণ নিয়ে নিতে পারে!

প্রাণ যাচ্ছে যাক। সুনামি-জাতীয় প্রলয়কাণ্ডে বহু মানুষের প্রাণ যায়। সমাজ আবার উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু এ তো তা নয়। উঠে দাঁড়াবে কী! এ যে সমগ্র সমাজকে ত্রাসিত করে কোনো নতুন ভাবনা ভাবতেই দিচ্ছে না। বাইরে ভূতের সন্ত্রাস, ঘরে অভূতের সন্ত্রাস! ত্রস্ত ভীত শঙ্কিত মানুষ ভয়ে সিঁটিয়ে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। বাঁচার পথ নিয়ে ভাববার অবকাশ কই?

তার মানে, আমরা পশ্চিমবাংলার মানুষেরা স্পষ্ট দেখছি, আমরা বাইরে ভেতরে সব দিক থেকে আক্রমণের ভয়ে সদাসন্ত্রস্ত জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছি। আজকের পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অবস্থা নিশ্চয় আমাদের মতোই হবে, হয়তো আমাদের চেয়ে তাদের সমাজের ভেতরে সন্ত্রাসের মাত্রাটা একটু কম। কিন্তু একই বিশ্বের একই একাকারের যুগের বাসিন্দা হয়ে আমাদের সঙ্গে তাদের খুব যে ফারাক হবে তা মনে হয় না। অর্থাৎ আজকের দিনের সারা বিশ্বের মানুষ মূলত একই ভাবে সন্ত্রস্ত জীবন যাপন করছেন। আর, সেটাই হয়েছে আমাদের সবচেয়ে ভাববার কথা।

সন্ত্রস্ত থাকলে মানুষ নিজের বিকাশের কথা, সন্তানসন্ততির লালনের কথা,[৮] আবিষ্কার-উদ্ভাবন-সৃজনের কথা আর ভাবতেই পারে না। ব্রহ্মসাধনা স্তব্ধ হয়ে যায়। আজ আমাদের দেশীয় পরিস্থিতি, বিশ্বপরিস্থিতি এমনই ভয়ঙ্কর আতঙ্কগ্রস্ত যে, সাধারণ দেশবাসী তো বটেই, দেশের পরিচালকরাই কোনো দিকদিশা দেখতে পাচ্ছেন না। যে কোনো মুহূর্তে সমাজ প্লেনটি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। মহাসর্বনাশের আর বাকি কোথায়?

আজকের বিশ্বপরিচালকদের অধিকাংশই যদি কেবলমাত্র ব্যক্তজ্ঞানের জ্ঞানী স্পেশালিস্ট না হতেন, যদি তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক ব্রহ্মজ্ঞানী থাকতেন, তাহলে আজকের মানবসভ্যতা এরকম কাণ্ডজ্ঞানহারা হত না। তাঁরা নিশ্চয় একটি উপায় বের করে নিতে পারতেন। মোটকথা, সার্বিকভাবে ভাবলেই বোঝা যায়, পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর। একে ঠেকানো যেন-বা অসম্ভব। মনে হয়, আজকের সিলিকন ভ্যালির (বাহ্যসম্পদ পিয়াসীদের চোখে) বিপুল ধনসম্পদ, ইনফর্মেশন টেকনোলজির বিশাল বাগাড়ম্বর এই মহাসর্বনাশের তোড়ের সামনে অতি তুচ্ছ, খড়কুটোর মতো ভেসে যাবে সেসব। মানবসভ্যতা 'কাণ্ডজ্ঞান' হারিয়ে ফেলেছে! অবিলম্বে বিশ্বমানবের 'কাণ্ডজ্ঞান' যদি সুস্থিত করে ফেলা না যায়, মানবসভ্যতার বিলুপ্তি বুঝি-বা অবশ্যম্ভাবী। কোনো মহাবিজ্ঞানী মহাবীর মহাধনী এসেও এই বিলুপ্তি আর বুঝি ঠেকাতে

পারবেন না। রবীন্দ্রনাথ 'সভ্যতার সংকট' দেখেছিলেন, কিন্তু সভ্যতার এত বড় ও এত ভয়ানক 'উপ-সংহার' তিনি দেখে যেতে পারেননি।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আমাদের জানায়, আজ থেকে প্রায় ৩৫০০ বছর আগে ভারতবর্ষে পৃথিবীর আদিরাষ্ট্র (পৃথুর) প্রতিষ্ঠাকালে প্রথম সন্ত্রাসের জন্ম হয়। জনসমুদ্র খণ্ডিত হয়ে হ্রদ সরোবর পুষ্করিণীতে পরিণত হতে থাকে। ত্রাস বা terror এই সমস্ত territory-গুলি গড়ে তোলে। তবে সেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর সন্ত্রাসের স্থান নির্দিষ্ট হয় প্রান্তে — 'মিলিত জল'-এর বা 'জাতিগুলি দ্বারা অধ্যুষিত দেশ'-এর পরিধিতে। দেশের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসের কোনো প্রয়োজন পড়েনি; যা ছিল সবই দেশের সীমান্তে। ক্রমে পরিস্থিতি বদলায়। দেশীয় রাজার স্বৈরাচার, বিদেশী রাজার আগমন, পরাধীনতার বিরুদ্ধাচরণ ইত্যাদি নানান সামাজিক ব্যাধি ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং সন্ত্রাসও সীমান্ত থেকে মাঝে মাঝেই দেশের ভেতরেও পা রাখতে শুরু করে। সরকারি সন্ত্রাসের পাশাপাশি বেসরকারি সন্ত্রাসেরও জন্ম হয়। পালিত কুকুরের বাহিনীর সঙ্গে বুনো কুকুরের বাহিনীর লড়াইয়ের মতো দুই সন্ত্রাসের যুদ্ধও শুরু হয়ে যায়। তবুও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত বিশ্বে দেশাভ্যন্তরে সন্ত্রাসের আবির্ভাব ছিল সাময়িক ঘটনা মাত্র। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে সন্ত্রাস সার্বিক রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসরূপে দেখা দিতে শুরু করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তা চূড়ান্ত রূপ পায়। তার পর থেকে প্রতিটি দেশের ভিতরে এবং বর্ডারে সর্বত্র সবসময় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের উপস্থিতি প্রকট হতে থাকে। মানুষ তার দৈনন্দিন ব্যক্তিজীবনে পুলিশের নজরদারি টের পেতে থাকে। এরই মধ্যে এসে যায় বিশ্বায়নের সার্থবাহী ক্যারাভান। পৃথিবীর প্রায় সব দেশের সীমানা সে ফুটো করে দেয়। ফলস্বরূপ সেই ফুটো দিয়ে সন্ত্রাস ঢুকে পড়ে সর্বত্র — সন্ত্রাসও বিশ্বায়িত হয়ে যায়।

অথচ আজ থেকে বারো-তেরোশো বছর আগেও সমাজের অভ্যন্তরে 'সদাত্রাস' রূপে কেউ ছিল না। তখনও মানবসভ্যতার কাণ্ডজ্ঞান কমবেশি সুস্থিত ছিল। রাজা-রাজড়া ছিল, তারা যুদ্ধবিগ্রহ দেশদখল খুনখারাবি করত, কিন্তু সেসবের অধিকাংশই ছিল সমাজের উপরিতলে। সাধারণ মানুষের জীবন আজকের তুলনায় অনেক শান্ত ছিল, সন্তানসন্ততির লালনের উপর কোনো ত্রাসের প্রভাব ছিল না, সমাজের সার্বিক পরিবেশ ব্রহ্মসাধনার পক্ষে সাধারণভাবে অনুকূল ছিল। তখনও এশিয়া ও ইয়োরোপে সমাজগুলি পরিচালিত হত ব্রহ্মজ্ঞানী-মহর্ষিদের দ্বারা, যাঁদের জ্ঞানের আলোর সমগ্র রূপ সম্পর্কে একটা ধারণা ছিল, সমাজজীবনে সৎপথে হাঁটার অভ্যাস ছিল, ব্রহ্মের প্রতি সদাসতর্ক নজর ছিল। তাঁরা থাকতেন সবার আগে, তাঁদের অনুসরণ করত রাজারাজড়ারা, তাঁদের পেছনে থাকতেন জনসাধারণ। আলেকজান্ডার পুরুকে আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু 'রাজার সঙ্গে রাজার মতো আচরণ' তিনি করতেই পারতেন না, পিছনে যদি মহান গ্রীক দার্শনিকরা না থাকতেন। অর্থাৎ ইতিহাসের পাতা উল্টে যত পেছনের দিকে যাই, মানুষের মধ্যে এবং তাঁদের পরিচালকদের মধ্যে তত বেশি পরিমাণে ব্রহ্মনিষ্ঠা ও মানবিক গুণের সাক্ষাৎ পাই। এমনকী ভাষার ক্ষেত্রেও আমরা দেখছি, যত পেছনের দিকে যেতে পারছি, শব্দের ভিতরে তত গভীর অর্থ রাখার রীতিকে চাক্ষুষ করছি।

যাঁরা মনে করেন যত পেছনে যাব, তত বেশি বর্বর মানুষের ও তার বর্বর ভাষার দেখা পাব, তাঁরা না বোঝেন ইতিহাস, না ভাষাতত্ত্ব। ভাববেন না, আমরাই প্রথম এমন কথা বলছি, বহু আগে থেকেই এসব কথা যাঁদের মুখে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে আসছে সেই মানুষদের সারিতে বিদ্যাসাগর থেকে এঙ্গেলস পর্যন্ত অজস্র মানুষ রয়েছেন।

ইয়োরোপে শিল্পবিপ্লবের পর সমাজশীর্ষে ব্রহ্মজ্ঞানীদের যে-কয়জন টিকে ছিলেন, দুই বিশ্বযুদ্ধ, একদিকে রাশিয়ায় কমিউনিস্টদের প্রতিষ্ঠা ও অন্যদিকে ফ্যাসিবাদের প্রতিষ্ঠা তাঁদেরকে সমাজশীর্ষ থেকে বিতাড়ন করে দেয়। এরপরও যতটুকু যা ছিল, চীন প্রভৃতি দেশে কমিউনিস্টদের ক্ষমতাদখল এবং মধ্যপ্রাচ্যে মৌলবাদের আবির্ভাব তাও মুছে দেয়। অতঃপর তাঁদের একমাত্র আশ্রয়দাতা হয়ে দাঁড়ায় ইংলন্ড আমেরিকাসহ কয়েকটি পাশ্চাত্য দেশ। সম্প্রতি সেইসব দেশগুলিতেও মৌলবাদী দক্ষের বাড়বাড়ন্ত এবং সন্ত্রাসের সঙ্গে মোকাবিলা করতে গিয়ে আরও কট্টর হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া চলতে থাকায়, সেখানেও ব্রহ্ম-আরাধনার পথ রুদ্ধ হতে চলেছে।

এই পরিস্থিতিতে আবির্ভূত হয়েছিল বিশ্বায়িত সন্ত্রাস। বিশ্বজোড়া মৌলবাদী ব্যক্তজ্ঞানী দক্ষের শাসন তাকে 'বিনা বাছনিতে'[২০] কবরস্থ করে দিয়েছে। ফলত সে মরেনি, ভূত হয়ে সারা বিশ্বের সর্বত্র প্রেতনৃত্য করে বেড়াচ্ছে। সেই প্রেতকে মারার জন্য সদা তটস্থ হয়ে রয়েছেন আজকের মানবসভ্যতার রথী-মহারথীরা। কিন্তু মাথায় তো রয়েছে কেবল ব্যক্তজ্ঞান। নতুন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য যে 'কাণ্ডজ্ঞান' দরকার তা তাঁরা পাবেন কোথায়? মাঝ থেকে হাজার হাজার মানুষের রক্তে মাটি ভিজছে। মানুষ ত্রস্ত, শঙ্কিত, আতঙ্কিত। আবিষ্কার স্তব্ধ। ব্রহ্ম-আরাধনা বন্ধ। বিপদে পড়লে পথ খোঁজার পথটিই তো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে!

তাই আজকের মানবসভ্যতা এই ভয়ংকর পরিবেশের মুখোমুখি। একালের সমাজ পরিচালক নেতানেত্রীরা বিশ্বাস করে ফেলেছেন যে, সমস্ত জ্ঞান রয়েছে অ্যাকাডেমিতে, অ্যাকাডেমিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত বড় বড় সার্টিফিকেটওয়ালা পণ্ডিতদের কাছে, বিশেষজ্ঞদের কাছে। তাঁরা যে কেবল ব্যক্তজ্ঞানের ধারক-বাহক, ব্রহ্মজ্ঞানের ঝরনা থেকে আসা নদীর জলসম্পদের ধারক মাত্র, নিজেরা তো ঝরনা নয়ই, ঝরনার পেছনে যে বিশাল অব্যক্তজ্ঞানের মহাভাণ্ডার রয়েছে, সেবিষয়েও তাঁরা যে কিছু জানেন না; সেকথা একালের নেতানেত্রীরা একেবারেই ভুলে গেছেন। **ওই দক্ষ-জ্ঞানীদের যদি আদৌ কিছু করার যোগ্যতা থাকত, এতদিন তাঁরা করেই দিতেন; বসে বসে শত সহস্র মানুষের মৃত্যু দেখতেন না। আমাদের রাষ্ট্রপতিও বিশ্ববাসীর কাছে 'সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্ব গড়া'র উপায় জানতে চাইতেন না।**

মানবসভ্যতার প্রাণভোমরাকে বাঁচাবো কেমন করে!

সব দিক থেকেই বোঝা যায়, মানবসমাজের অস্তিত্বের মূলে রয়েছে মানুষের ব্রহ্মজ্ঞান। তাকে তার স্বাভাবিক অবস্থান থেকে সরিয়ে দেওয়ার ফলেই মানবসভ্যতা বিপদে পড়েছে। পণ্য,

ব্যক্তিমালিকানা, পুঁজি, হিংসা, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, যুদ্ধ ... একের পর এক অহিতের জন্ম হয়েছে। তাদের মোকাবিলা করতে গিয়ে দক্ষ-পরিচালিত বর্তমান মানবসভ্যতা আরও অহিতের জন্ম দিয়েছে। মানুষের উপর মানুষের শোষণ পীড়ন অত্যাচার ক্রমে বেড়েছে। সবশেষে এসেছে সন্ত্রাস। আজকের পরিস্থিতি এমন যে, মানবসভ্যতার অস্তিত্বের মূল যে-ব্রহ্মসাধনা, তাই স্তব্ধ হয়ে যেতে চলেছে। মৃত্যুঘণ্টার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। আর দেরি করা যাবে না। এখনই যদি ব্যবস্থা গ্রহণ না করা যায়, মানুষের সভ্যতা বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

মনে হতে পারে, বুঝিবা সন্ত্রাস ও ব্যক্তজ্ঞানই মানবসভ্যতার শত্রু। এরকম ধারণা ঠিক নয়। ব্যক্তজ্ঞান তো সৃষ্টিধর অর্থাৎ সে হল নদী; অন্যকথায় ঝরনাধারার ধারক; সে তো থাকবেই। স্রষ্টা থাকবেন আর সৃষ্টিধর থাকবেন না, ঝরনা থাকবে আর তার ধারাবাহক নদী থাকবে না, তা হতে পারে না। সমস্যার সূত্রপাত হয়েছে তখনই, যখন ঝরনাকে তার ভূমিকা পালন করতে দেওয়া হয়নি। বলা হয়েছে নদীই ঝরনা। অর্থাৎ সমাজশীর্ষ থেকে আবিষ্কারক-শিবকে সরিয়ে দেবার ফলে মানবসভ্যতা 'একঝোঁকা' হয়ে যাওয়ায় যত অশুভের সূচনা হয়েছে। একঝোঁকা সভ্যতার বিপরীত প্রতিক্রিয়া থেকে জন্মেছে সন্ত্রাস। সভ্যতাকে তার একঝোঁকা অবস্থান থেকে সিধে করে নিতে পারলে সন্ত্রাসের জন্মই হবে না। হ্যাঁ, ইতিমধ্যে যে সন্ত্রাস জন্মলাভ করে গেছে, তাকে স্তিমিত করতে একটু সময় লাগবে। তবে সন্ত্রাসের নিয়ত উদ্ভব বন্ধ হয়ে গেলে ইতোমধ্যে জাত সন্ত্রাসও ক্রমেই নির্জীব হয়ে পড়বে এবং তখন তাকে স্তিমিত করা যাবেও।

কিন্তু সভ্যতা তো তার প্রাচীন অবস্থানে বসে নেই। আদি দক্ষযজ্ঞের সূত্রপাত থেকে সে প্রায় ৩৫০০ বছর এগিয়ে চলে এসেছে। রোগটি বহু প্রাচীন এবং কালে কালে তার বৃদ্ধি ঘটেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু রোগীর চিকিৎসা করতে হবে এখন। এখনকার পৃথিবীতে মানবসভ্যতার যে অবস্থান, সেই অবস্থানে তাকে রোগমুক্ত করার ভাবনা ভাবতে হবে। আমরা জানি, শরীর নিজেই রোগের হাত থেকে মুক্ত হবার নানান চেষ্টা চালায়। সেই নিয়মে ইয়োরোপ মহামায়ার সম্মান ফিরিয়ে আনে, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে, কিন্তু গণনেতাদের আসনে শিবের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সে করতে পারে না, অশিবের উত্থানের পথ খোলা থেকে যায়। তবুও সেই অশিব-গণনেতাদেরকেও শিব বানিয়ে ফেলা যেত, যদি গোপন ভোটপ্রথার মাধ্যমে জনসাধারণের সঙ্গে গণনেতাদের নাড়ীর সম্পর্কটি ছিন্ন করে ফেলা না হত। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, সত্যগোপনই সর্বপ্রকারের সামাজিক ক্ষমতার মূল উৎস।[২১] আজকের সমাজ 'ট্রান্সপারেন্সি'র ডাক দিয়ে ফেলেছে। এরই পাশাপাশি এসেছে বিশ্বায়নের একাকারের প্রলয়। এ অবস্থায় অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে কূর্ম্মাবতার সক্রিয় হতে চাইছে।[২২] যে 'গ্রামব্যবস্থা'র ধারণা প্রাচীন ভারত উদ্ভাবন করেছিল, আজকের পরিস্থিতি তারই নবরূপায়ণ দাবি করছে। সেই সমস্ত ভাবনাকে মানবসভ্যতার প্রাণভোমরার পূর্ণ সুরক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ রেখে নতুন সামাজিক প্রকল্পের কথা এবার ভাবতে হবে। আজ আমরা সেই প্রকল্পনার কথা ভাবব।

তবে সবার আগে আমাদের জেনে নিতে হবে মানুষের সমাজের টিকে থাকার ও এগিয়ে

চলার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তা আসে কোথা থেকে এবং কীভাবেই তা বাস্তবায়িত হয়। ভারতের ইতিহাস আমাদের জানায়, দক্ষযজ্ঞের সূত্রপাতের কাল থেকেই মানবসভ্যতা যে সমস্ত মহৎ মানসিক অর্জনগুলিকে একের পর এক খুইয়েছে তার মধ্যে অন্যতম একটি হল, সমাজের চালিকাশক্তি বিষয়ক যথার্থ ধারণা। এ বিষয়ে আধুনিক যুগের প্রায় সমস্ত রাজনীতিবিশারদের ধারণাই ত্রুটিপূর্ণ। তাঁরা কার্যত মানুষের ষড়রিপুকে — কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্যকে, কিংবা পূর্বতন নিপীড়নজনিত ঘৃণা, ক্ষোভ, ব্যথাকে সমাজ চালানোর সামাজিক শক্তি বলে মনে করেছেন। মার্কসের শ্রেণীসংগ্রামও এই পর্যায়ে পড়ে। প্রাচীন ভারতের প্রকৃত ইতিহাস মার্কস যদি জানতেন, এরকম একটা ভুল কথা তিনি কিছুতেই বলে যেতে পারতেন না। অনেকে এগুলির প্রয়োগও ঘটিয়েছেন, এবং তার ফল ভাল হয়নি। শ্রেণীঘৃণা নামক একটি শক্তিকেও কখনো-সখনো সেই শক্তির স্থানে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। তার ফল হয়েছে আরও মন্দ। কারণ এগুলি সবই মানুষের রিপু। রিপু মানুষকে অন্য মানুষের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করতে প্ররোচিত করে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বললে, 'অন্যায় করিয়া যে ফল পাওয়া যায় তাহাতে কখনোই শেষ পর্যন্ত ফলের দাম পোষায় না, অন্যায়ের ঋণটাই ভয়ংকর ভারী হইয়া উঠে।' (ছোটো ও বড়ো)। ধর্মের ভাষায় বললে, এই রিপুগুলি সবই শয়তানের শক্তি, ঐশ্বরিক শক্তি নয়। সমাজের চালিকা-ঐশ্বরিক শক্তি তবে কোথায়?

সে শক্তিকে এখন স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ব্রহ্মকে কেন ঈশ্বর বলা হয়, সেকথা আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেই ব্রহ্মন্-এর মাধ্যমে তাকে যিনি আয়ত্ত করেন, তিনিই উদ্ভাবক-আবিষ্কারক-স্রষ্টা শিব। সবাই জানেন, মানুষের সকল চেষ্টার মূলে রয়েছে তার 'তৃপ্তি লাভের ইচ্ছা' এবং সকল তৃপ্তির সর্বোচ্চ তৃপ্তি জোটে আনন্দে। এই আনন্দকে চেনার সহজ উপায় দেখিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। লোকে সুগন্ধী সাবানে গায়ের ধুলো ধুয়ে পায় সুখ, আর ধুলায় গড়াগড়ি দিয়ে পায় আনন্দ। মানবাত্মার চরম তৃপ্তি হয় 'আনন্দ' লাভ করতে পারলে। স্রষ্টা-কবি যখন তাঁর 'কবিগান' গেয়ে তাঁর নিজের ব্রহ্মলাভের আনন্দের ভাগ দেন তাঁর শ্রোতাদের, তাঁরা আকুল হয়ে শোনেন। স্রষ্টা-আবিষ্কারক তাঁর ব্রহ্মলাভের ভাগ দেন তাঁর প্রকল্পিত কর্মে যোগদানকারী সতী-মহামায়া-জনসাধারণকে। 'বেদাহমেতম্' — আমি একে জেনেছি বলে ব্রহ্মজ্ঞানের অগ্নিশিখাবহনকারী শিব ডাক দেন তাঁর সহযোগীদের — শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। সতী-জনসাধারণ আপন যথার্থ মর্যাদা দেখতে পেয়ে সেই জানাকে কর্মে প্রয়োগ করে ব্রহ্মলাভের আনন্দের ভাগ পান। বর্তমান কাল একে ঠিকভাবে চিনতে না পারলেও 'job satisfaction' বা 'কর্মানন্দ' কথাটি সেই আনন্দের দিকেই আঙুল দেখায়। সহজ করে বললে, আবিষ্কারক আনন্দ পান তার নতুন আবিষ্কারের কথা বলে; দক্ষ-স্পেশালিস্ট সহ সমগ্র জনসাধারণ আনন্দ পান সেই আবিষ্কারকে কর্মে রূপায়িত ক'রে। আজকের চূড়ান্ত স্পেশালাইজেশনের (দক্ষতার) যুগ এই আনন্দকে টাকায় মেপে তাকে কলুষিত করে দিয়েছে। তাই তার প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে একালে অসুবিধে হয়। তবে এই **আবিষ্কারক ও তাঁর সঙ্গে কর্মে লিপ্ত জনসাধারণের দ্বৈরাজ্যিক প্রেমবন্ধন (বা শিব-সতীর প্রেমবন্ধন) থেকে**

কর্মরতি-জাত আত্মতৃপ্তিই যে মানবসমাজের প্রকৃত চালিকাশক্তি, সে-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এটিই মানবসমাজের প্রকৃত চালিকাশক্তি, প্রকৃত ঐশ্বরিক বা অলৌকিক শক্তি, মানবসমাজকে যা টিকিয়ে রাখে ও এগিয়ে নিয়ে চলে।

মানুষের উৎপাদন কর্মযজ্ঞে দক্ষ-বিশেষজ্ঞদের অধিষ্ঠান আবিষ্কারক ও জনসাধারণের মধ্যেকার এই বন্ধনকে কেটে দেয়, ফলস্বরূপ তাদের উভয়ের মর্যাদা ধূলিলুণ্ঠিত হয়ে যায়। তবুও রেওয়াজ-মতে তখনও সমাজের এই বিশ্বাস থেকে যায় যে, মহর্ষিরা সবাই (দক্ষরাও যার মধ্যে পড়েন) ব্রহ্মজ্ঞানী, অতএব ঐশ্বরিক শক্তির আধার। পরবর্তী কালে তাঁরা রাজা নিয়োগ করলেন, মহর্ষিদের মারফতে রাজা পেলেন সেই ঐশ্বরিক শক্তি। তারই শাসনে থাকেন মর্যাদাহীন জনসাধারণ। কিন্তু প্রেম নেই, প্রেমভিত্তিক কর্মের বন্ধন নেই, রয়েছে নিষ্কাম প্রেম ও রতিবিলাপ, ফলত উদ্ভূত হয় ক্ষোভ, দুঃখ, ব্যথা, ঘৃণা। আবিষ্কারক বা শিব হয়ে যান খানিকটা বিবাগী অথবা খানিকটা শঙ্কর ভোলানাথ। এইভাবেই চলতে থাকে।

ইয়োরোপীয়দের গৌরব এই যে, তাঁরা ইতিহাস না জেনেই শিব-সতীর পুনর্মিলনের পথে অন্ততপক্ষে দুটি মহত্তম ঐতিহাসিক কাজ করেছেন। প্রথমটি হল সতীর বা জনসাধারণের মর্যাদার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এটি তাঁরা করে ফেলেন 'গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার নামে। যদিও, গোপন ভোটের ব্যবস্থা রেখে দেওয়ায়, এবং শিবের পুনঃপ্রতিষ্ঠার যথাযথ ব্যবস্থা না করায় শিব-সতীর পুনর্মিলন সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয়টি হল স্বচ্ছতার বা ট্রান্সপারেন্সির ডাক দেওয়া। দক্ষের বা স্পেশালিস্টের সমস্ত ক্ষমতার মূলে যে অস্বচ্ছতা বা 'সত্যগোপন' রয়েছে, একথা তাঁরা না জেনেই এই দাবিটি তুলে দিয়েছেন এবং তা প্রতিষ্ঠা করতে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। এবার হাত লাগাতে হবে আমাদের। আবিষ্কারক ও জনসাধারণের (শিব-সতীর) প্রেমবন্ধন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার কাজটি আমাদের করতে হবে। কেননা, সেটিই মানবসমাজের প্রকৃত চালিকাশক্তি। সেই চালিকাশক্তিকে কাজে লাগাতে পারলে মানবসভ্যতার টিকে থাকা ও বিকশিত হওয়ার পথে সব বাধাই সে কাটিয়ে ফেলতে পারবে।

আমরা স্বাধীন ভারতের নাগরিক। কিন্তু এমনই আমাদের দুর্গতি, যে, আমরা না জানি 'স্বাধীন' কথাটির মানে, না জানি 'ভারত'-এর মানে; আর 'বর্ষ' মানে কী, 'ভারতবর্ষ' কী জিনিস, সেসব আমরা এখন আর ভাবিই না, জানা তো দূরের কথা। যদিও কপালগুণে আমাদের মধ্যে একজন মানুষ জন্মেছিলেন, যিনি 'স্বাধীন' কথাটির মানে জানতেন এবং সেকথা আমাদের বলেও গিয়েছিলেন; তাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ। আমাদের অ্যাকাডেমিগুলি তাঁকে 'কবিগুরু' বলে পূজা করে তাঁরই লেখা গান গায় — 'তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলে থাকি'। সেই অ্যাকাডেমি থেকে লেখাপড়া শিখে আমাদের শিক্ষিত বাংলাভাষীরা দৌড়ায় ইয়োরোপ আমেরিকা, জানতে চায় 'স্বাধীনতা' কাকে বলে! পশ্চিম দেশ যে এ-বিষয়ে 'অর্ধসত্য' মাত্র জানে, সবটা জানে না, সেকথা রবীন্দ্রনাথই আমাদের বলে গিয়েছিলেন।

পশ্চিমের প্রভাবে 'স্বাধীন' বলতে এখন আমরা বুঝি independent, অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি

কারও উপর নির্ভরশীল নয়'। কিন্তু বাস্তবে সেরকম হয় না, হওয়াও অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন, 'মানুষ যেখানে সম্পূর্ণ একলা সেইখানে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। সেখানে তার কারো সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই, কারো কাছে কোনো দায়দায়িত্ব নেই, কারো প্রতি কোনো নির্ভর নেই, সেখানে তার স্বাতন্ত্র্যে লেশমাত্র হস্তক্ষেপ করবার কোনো মানুষই নেই। কিন্তু মানুষ এ স্বাধীনতা কেবল যে চায় না তা নয়, পেলে বিষম দুঃখ বোধ করে। রবিনসন ক্রুশো তার জনহীন দ্বীপে যতখন একেবারে একলা ছিল ততখন সে একেবারে স্বাধীন ছিল। ...' (সমস্যা / কালান্তর)। অর্থাৎ নেচারের অমোঘ নির্দেশে মানুষ 'ঝাঁকজীব'-শ্রেণীর[২৩] অন্তর্ভুক্ত এবং সেকারণেই অন্যের সঙ্গে 'সম্বন্ধ' ছাড়া মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। আর, 'সম্বন্ধে' আবদ্ধ হলেই দেখা দেয় 'বন্ধন', পরাধীনতা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'সম্বন্ধ মাত্রেই অধীনতা'। এই অধীনতা থেকে, এই বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কেমন করে? তারও উত্তর তিনি দিয়ে গিয়েছেন — 'সম্বন্ধেই বন্ধন, সম্বন্ধেই মুক্তি'। কীভাবে সেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব?

পৃথিবীতে মানুষে মানুষে যত সম্বন্ধ গড়ে ওঠে, দেখা যায় সেগুলি চার শ্রেণীর। সেই সম্বন্ধগুলির মধ্যে বন্ধুত্বের সম্বন্ধ হল শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধ, যাতে 'পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহার'-এর নীতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। একে পুরুষ-প্রকৃতির অভেদ বা দ্বৈরাজ্যও বলা হয়, বলা যায় 'অন্যোন্য সম্বন্ধ'।[২৪] এই 'বন্ধু'ত্বের 'সম্বন্ধে' আবদ্ধ হয়ে কর্মরত হলেই মানুষের মুক্তি ঘটে। রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে, শহরে-গ্রামে, সংস্থায়-সংস্থায় এই দ্বৈরাজ্যের সম্বন্ধ যেমন তাদের বিকাশ ত্বরান্বিত করবে, তেমনি পরিচালক-পরিচালিতের, গুরু-শিষ্যের, স্বামী-স্ত্রীর, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ পর্যন্ত সকল সম্বন্ধ যদি এই নীতি অনুসরণ করে চলে, তাহলেই মানুষ মুক্তি লাভ করতে পারে, মোক্ষ লাভ করতে পারে, তৃপ্তি ও আনন্দ পেতে পারে।

সেই সুবাদে একটি নতুন সমাজব্যবস্থার মডেলের কথা এখানে সকলের চিন্তাভাবনার সহায়ক রূপে রাখা হচ্ছে। **এটি একটি প্রকল্পনা মাত্র।** এমন মডেল তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে, যা একই সঙ্গে ব্রহ্মসাধনা অব্যাহত রাখা থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করা পর্যন্ত সব সমস্যার সমাধান দিতে পারবে। যে ব্যবস্থায় নির্ধন থেকে ধনী, অজ্ঞান থেকে জ্ঞানী, প্রত্যেকে আপন জীবনের সার্থকতার সুযোগ দেখতে পাবে, মুক্তিলাভের সুযোগ দেখতে পাবে। এই মডেল যদি বাস্তবে প্রয়োগ করা যায়, তাহলে —

১) যে-সন্ত্রাস ও মৌলবাদ আজকের সমাজের এক ভয়ানক বিপদ রূপে দেখা দিয়েছে, তা দেশের ভিতর থেকে কার্যত বিলুপ্ত হয়ে যাবে; দেশের বাইরে থাকলেও তা দেশের ভিতরে কিছুতেই ঢুকতে পারবে না;

২) শিল্প ও কৃষির যে বিরোধ প্রধান বিরোধ হিসেবে দেখা দিয়েছে, তা-ও আর থাকবে না;

৩) শহরমুখী মানুষ পুনরায় গ্রামমুখী হয়ে যাবে, শহরের জনসংখার চাপ অত্যন্ত কমে যাবে;

৪) মানবিক মূল্যবোধের বহুকালক্রমাগত ক্রমান্বয় অবক্ষয় অতঃপর বিপরীতমুখী হয়ে ক্রমান্বয়ে মূল্যবোধ পুষ্টির দিকে এগোতে শুরু করবে;

৫) প্রকৃতি থেকে ক্রমান্বয়ে বিচ্ছিন্ন মানুষ পুনরায় প্রকৃতির সঙ্গে ক্রমান্বয়ে সম্পৃক্ত হয়ে

মানসিক শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করবে। ...;

৬) অফিস-আদালতে যে-অজস্র বিরোধ সমাজের ওপর বোঝা রূপে জমা হয়েছে, তা এত কমে যাবে যে, তাকে বিলুপ্ত বলে মনে হবে;

৭) চিকিৎসা ও শিক্ষার যে নিদারুণ অধঃপতন ঘটেছে, তার থেকে সমাজ নিষ্কৃতি পাবে এবং মানুষ কেবল মানসিক রোগ থেকেই মুক্ত হবে না, শারীরিক রোগমুক্তিও ঘটবে তার; সর্বোপরি একালের দিশাগ্রস্ত ও বেদিশাগ্রস্ত শিক্ষার হাত থেকেও মুক্তি লাভ করবে আমাদের সমাজ;

৮) উদ্বৃত্ত সম্পদ নিয়ে কী করা হবে — সমাজে স্পেশালাইজেশনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার পর থেকে মানুষের সভ্যতা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায়নি, ফলে উদ্বৃত্ত সম্পদ নিয়ে মারামারি করে এসেছে; এবার সেই উত্তরটিও সমাজের হাতে এসে যাবে;

... ...

এখন তবে সেই নতুন ভারতবর্ষের কথা হোক।

নতুন ভারতবর্ষের মূলনীতি

এই ভারতবর্ষের মূলনীতি হল — ১) বাহ্যসম্পদে অনীহ আবিষ্কারক-ব্রহ্মজ্ঞানী মানুষের সঙ্গে সমগ্র জনসাধারণের দ্বৈরাজ্যিক (পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহার-ভিত্তিক দায়িত্ব ও মমতার) বন্ধনে কর্মরত থাকা; ২) উৎকৃষ্ট প্রজা সৃষ্টি করা (উত্তরপ্রজন্মকে শিবরূপে গড়ে তোলা); ৩) প্রকাশ্য সাক্ষ্যসম্মত ভোটনির্ভর পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চলা; ৪) অণুবর্ষগুলির সম্পূর্ণ স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে কার্যক্রম অনুসরণ করা।

নতুন ভারতবর্ষের কথা

কমবেশি ১৫,০০০ অণুবর্ষ রয়েছে এই ভারতবর্ষে, কমবেশি ৪০০ থেকে ৬০০ পর্যন্ত বিভিন্ন সংখ্যক অণুবর্ষ ও নগর নিয়ে গড়ে উঠেছে প্রায় ৩০ টি উপবর্ষ, তাদের যোগে গড়ে উঠেছে নতুন ভারতবর্ষ। উপবর্ষের অন্তর্ভুক্ত যে নগরগুলি রয়েছে সেগুলি সবই বড় নগর। এগুলি অণুবর্ষের শাসনাধীন এলাকার বাইরে, কিন্তু উপবর্ষের বা বর্ষের অধীনে। এই উপবর্ষগুলিকে আগে রাজ্য বা প্রদেশ বলা হত।

প্রতিটি অণুবর্ষের লোকসংখ্যা এক লক্ষের কম। অণুবর্ষ গড়ে উঠেছে কমবেশি ১০টি মণ্ডল নিয়ে, প্রতিটি মণ্ডল গড়ে উঠেছে কমবেশি ১০০০০ মানুষের কয়েকটি গ্রাম নিয়ে।

বর্ষ হল সেই এলাকা, যে এলাকা থেকে সেই এলাকার কেন্দ্রীয় শাসনের সূর্যকিরণে শক্তি ও অর্থসম্পদ কর রূপে বাষ্পীভূত হয়ে মেঘে পরিণত হয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে পুনরায় সেই এলাকাতেই বৃষ্টি রূপে বর্ষিত হয়।

নতুন ভারতীয় অণুবর্ষের কথা

অণুবর্ষগুলি হল ভারতশরীরের এক একটি কোষ। এদের মূল চরিত্র হল, এরাই নতুন

ভারতবর্ষের প্রাণশক্তির ধারক-বাহক। অনাড়ম্বর বা সরল জীবন ও মুক্ত সাবলীল চিন্তা এর সাংস্কৃতিক ভিত্তি। অণুবর্ষগুলির প্রধান ও প্রথম লক্ষ্য হল উদ্ভাবনী গুণসম্পন্ন (ব্রহ্মগুণসম্পন্ন) বলিষ্ঠ উত্তরপ্রজন্ম গড়ে তোলা; একালের পাশ্চাত্য ভাষায় বললে 'quality people product'[২৫] উৎপাদন করা, সেকালের ভাষায় যাকে বলা হত 'উৎকৃষ্ট প্রজা সৃষ্টি করা' বা 'শিব গড়ে তোলা'।[২৬] খেয়ে না-খেয়ে হলেও এই কাজটিই তারা একান্ত নিষ্ঠায় করে থাকে। কারণ তাদের বিশ্বাস, তেমন উত্তরপ্রজন্ম গড়ে তুলতে পারলে, মানবসভ্যতার যা কিছু সমস্যা, সেসব তারাই সমাধান করে ফেলবে; মানবসভ্যতার বিকাশকে তারাই ত্বরান্বিত করে নিতে পারবে।

এরপর অণুবর্ষগুলি চেষ্টা চালায়, যাতে শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, অর্থনীতিতে তারা সম্পূর্ণ স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে। নিজের এলাকার সর্বপ্রকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থা অণুবর্ষ নিজেই চালিয়ে নেয়। তার কোনো বাইরের পুলিশ লাগে না, লাগে না কোর্ট-কাছারি। সেসবের ব্যবস্থা তারা নিজেরাই করে নেয়। অণুবর্ষের বিধানসভাই অণুবর্ষের সরকার। তার সমস্ত কর্মচারী তারই এলাকার বাসিন্দা। কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের অর্থাৎ উপবর্ষের বা বর্ষের যে সরকারি বিভাগগুলির অণুবর্ষের এলাকায় কাজ থাকে, যথা রেশন খাঁজনা ... ইত্যাদি, সেসব তাঁরা অণুবর্ষের বিধানসভার অফিস থেকে পেয়ে যান — লেন দেন উভয়ই। তবে অণুবর্ষের এলাকায় উপবর্ষের বা বর্ষের কোনো সরকারি কর্মচারী অণুবর্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে থাকতে পারেন না। অণুবর্ষের এলাকায় বসবাসকারী নাগরিকদের কাছে ভারত সরকারের বা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যা কিছু প্রাপ্য তা অণুবর্ষের সভাপতিদ্বয়ের অফিস থেকেই দিয়ে দেওয়া হয়। ভারত সরকারের কাছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে এই এলাকার মানুষের যা কিছু প্রাপ্য, তা দিয়ে দেওয়া হয় অণুবর্ষের সভাপতির অফিসে; তারাই তা বিতরণ করেন। ভারত সরকারের সমর বিভাগ বা অন্যান্য সার্বজনীন বিভাগের জন্য যে মানবসম্পদ লাগে, প্রতিটি অণুবর্ষ তার কোটা অনুসারে সেই মানবসম্পদ যোগান দিয়ে থাকে। এ বিষয়ে আর কোনো প্রশাসনিক ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের থাকে না।

পরিচালক বরণ (নির্বাচন) প্রক্রিয়া

কমবেশি ১০০ জন ভোটারের ২ জন প্রতিনিধি, ১ জন পুরুষ ও ১ জন মাইলা। এঁরা হলেন মণ্ডলসভার দুজন মণ্ডল (সদস্য)। কমবেশি ৫০০ জন ভোটার দ্বারা নির্বাচিত হন আরও ২ জন প্রতিনিধি (১ পুরুষ + ১ মহিলা), যাঁরা অণুবর্ষের বিধানসভার সদস্য। মণ্ডলসভার সদস্যরা তাঁদের দুজন অভিমণ্ডল (সভাপতি) এবং অণুবর্ষের বিধানসভার সদস্যরা বিধানসভার দুজন অণুবর্ষপতি (সভাপতি) নির্বাচন করেন। অণুবর্ষপতিদের ভোটে নির্বাচিত হন উপবর্ষের সদস্যরা। উপবর্ষের কিছু সদস্য আসেন নগরনিগম থেকে। উপবর্ষের সভাপতিদ্বয়ের ভোটে নির্বাচিত হন ভারতবর্ষের লোকসভার দুজন করে সদস্য। লোকসভার দুজন লোকপতিই দেশের রাষ্ট্রপতি। নতুন আবিষ্কারমূলক কাজের বিষয় হোক আর অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্বন্ধের

বিষয় হোক, দেশের বহির্বিষয়ে প্রতিনিধিত্বের বেলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষ বর্ষপতি-উপবর্ষপতি-অণুবর্ষপতিই যথাক্রমে বর্ষ-উপবর্ষ-অণুবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। দেশের অন্দরমহলের অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহিলা বর্ষপতি-উপবর্ষপতি-অণুবর্ষপতিরাই দেশের সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন।

সমস্ত ক্ষেত্রেই ভোট হয় প্রকাশ্য ও সাক্ষ্যসম্মত। গোপন ভোটের রীতিকে ঘৃণ্য রীতি বলে মনে করা হয়। প্রতিটি ভোটপত্রের তিনটি ভাগ থাকে; তার প্রতিটিতে ভোটপরিচালক, ভোটার, ও ভোটপ্রাপকের (কিংবা ভোটপ্রাপক নিযুক্ত প্রতিনিধির) সই থাকে। ভোটদানের পর ভোটপত্রের ভাগ তিনটি তিনজনের কাছে থেকে যায়। প্রয়োজনে প্রত্যেকেই এটিকে ভোটের প্রমাণপত্র হিসেবে দেখাতে পারেন।

ভোটারের পরিচয়পত্র ও ভোটের উপরোক্ত ডকুমেন্ট অণুবর্ষের প্রত্যেক ভোটারের কাছেই থাকে, থাকে অণুবর্ষের কমপিউটারে। তাছাড়া সবাই সবাইকে চেনেন। ফলে, অণুবর্ষের এলাকায় বাইরের কেউই থাকতে পারেন না। থাকলে যার কাছে থাকেন, সেই ভোটার তার দায়িত্ব নেন। ফলে অণুবর্ষের ভেতরে কোনো সন্ত্রাসবাদী থাকতেই পারেন না।

ধন অর্জনকে যিনি জীবনের লক্ষ্য স্থির করে জীবনযাপন করে থাকেন, তিনি এ-ভারতবর্ষের কোনো বরণমেলায় (নির্বাচনে) 'বরণীয়' (প্রার্থী) হতে পারেন না। সবাই জানেন, নারীলোলুপ কোনো ব্যক্তিকে যেমন লেডিস হোস্টেলের দায়িত্বে বসানো যায় না, তেমনি বাহ্যসম্পদলোভীকে জনসাধারণের বাহ্যসম্পদ দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া যায় না। সেকারণে কোনো ব্যবসায়ী এখানে নির্বাচনে দাঁড়াতে পারেন না।

এ ভারতবর্ষে কোনো দল বা পার্টি নেই, পরিবর্তে রয়েছে ঘটক। সাধারণত মহিলারাই এই ঘটকালির কাজটি করে থাকেন। তাঁরা গিয়ে ব্রহ্মাণ্ডগুণসম্পন্ন, বাহ্যসম্পদ-লিপ্সু নয়, এমন মানুষকে মণ্ডলের, অণুবর্ষের বরণমেলায় 'বরণীয়'রূপে যোগ দেওয়ার জন্য অনুনয় করতে পারেন। তিনি রাজি হলে, তাঁরা তার নামটি বরণমেলার পরিচালন কর্তৃপক্ষের (নির্বাচন কমিশনের) কাছে নির্ধারিত নিয়মে জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। মণ্ডল ও অণুবর্ষের বর-বরণের জন্য কোনোপ্রকার টাকা জামানত রূপে জমা দেওয়ার রেওয়াজ নেই। বিবাহের পর বরকনের যেমন পরস্পরের প্রতি 'মমতা ও দায়িত্বের বন্ধন' থাকে, ঘটকের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা থাকে না; তেমনি বরণের পরে বরণীয় ও বরণকারী ভোটারদের মধ্যেও দায়িত্ব ও মমতার বন্ধন থাকে।[২৩] ঘটক এক্ষেত্রে কোনো রকমের পার্টি হতে পারে না।

নির্বাচিত নেতানেত্রী কোনো বিশেষ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাত মূলক আচরণ করলে, কিংবা শিবসুলভ আচরণ না করলে সেই নির্বাচনক্ষেত্রের ১৫ শতাংশ ভোটার সেই নেতানেত্রীর বিরুদ্ধে উপবর্ষের / বর্ষের মহিলা সভাপতির কাছে প্রতিবিধান চাইতে পারেন, এবং সেক্ষেত্রে সেই ভোটক্ষেত্রে নির্বাচন বাতিল হয়ে পুনর্নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে। কোনো অণুবর্ষ এমন নীতিতে চলতে লাগল যে, সমগ্র দেশের চলার সঙ্গে তার চলার ছন্দ মিলছে না; সেক্ষেত্রে মূলনীতির থেকে সেই অণুবর্ষ সরে গেছে কিনা তা দেখা হয়। তা যদি

না হয়, তাহলে তাদেরকে তাদের মতোই চলতে দেওয়া হয়। অন্যথায় তাদের অণুবর্ষত্ব থাকে না, তা উপবর্ষের নাগরিক শাসনব্যবস্থার অধীনে চলে যায়।

নতুন ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থা

সাতটি অণুবর্ষের রয়েছে একটি করে শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন, ও শুশ্রূষানিকেতন। শান্তিনিকেতনের ১৫/২০/৩০ টি শিশুশাখা ছড়িয়ে থাকে সমগ্র অণুবর্ষে। এগুলি সম্পূর্ণ আবাসিক। অণুবর্ষের সমস্ত উত্তরপ্রজন্ম এই শান্তিনিকেতনে লালিত-পালিত-শিক্ষিত হয়। শান্তিনিকেতনের 'রবিঠাকুর' হন অণুবর্ষের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার কর্ণধার। তাঁকে বরণ করে নিয়ে আসেন অণুবর্ষের সভাপতিদ্বয়। এখানে শিক্ষক-ছাত্রেরাই কেবল থাকেন। কোনো অশিক্ষক কর্মচারী এই শান্তিনিকেতনে থাকে না। নিজেদের কাজ তাঁরা নিজেরাই করে নেন। 'আধুনিক' কালের ইস্কুল-কলেজ নামক বিদ্যাকারখানার সঙ্গে এর আদৌ মিল নেই। এর মিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবৎকালের শান্তিনিকেতনের সঙ্গে, তার আদর্শে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষা' ও শিক্ষা বিষয়ক বক্তৃতাগুলি অনুধাবন করে এটি চালানো হয়। শিক্ষকেরা হন ঋষির মতো, জ্ঞান-আরাধনাই তাঁদের ব্রত। ...

বিষয়টি অনেক বড়। এর জন্য লিখিত হয়েছে একটি পৃথক প্রবন্ধ। 'উত্তরপ্রজন্মের লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষা' নামে সেই প্রবন্ধটিতে বিষয়টিকে আগেই বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

নতুন ভারতবর্ষের লক্ষ্মী-আরাধনা (অর্থনৈতিক ব্যবস্থা)

এ-ভারতবর্ষের অর্থনীতির মূলে রয়েছে, অর্থসম্পদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। এ ভারতবর্ষের মানুষ সম্পদকে কুবের হিসেবে দেখেন না, দেখেন লক্ষ্মী হিসেবে। এঁদের বিশ্বাস, অর্থসম্পদ বা পুঁজি হল পূর্বপুরুষের ঘাম, মেধা, রক্ত, মেদ; পূর্বপুরুষের আত্মার ছায়া থেকে যায় পুঁজির ভেতর। তাই তাঁরা একে শ্রদ্ধা করেন। তাঁরা জানেন, বৃদ্ধিগুণ এর স্বভাব। বৃদ্ধি দুই প্রকার — উদ্দেশ্যময় বৃদ্ধি, উদ্দেশ্যহীন বৃদ্ধি। এই উদ্দেশ্যময় বৃদ্ধিমূলক পুঁজি বা সম্পদই লক্ষ্মী, যিনি লাগামদেওয়া ঘোড়াগাড়িতে সওয়ারি করেন; স্টিয়ারিং-ব্রেক-স্বচ্ছ কাচওয়ালা গাড়িতে যেখানে যাওয়ার সেখানে যান। আর, উদ্দেশ্যহীন বৃদ্ধিমূলক পুঁজি বা সম্পদ হল কুবের, যিনি লাগামহীন ঘোড়াগাড়িতে সওয়ারি করেন; যাঁর গাড়ির স্টিয়ারিং-ব্রেক নেই, কাচ দিয়ে সামনেটা দেখাও যায় না; তাও তিনি বেদম বেগে গাড়ি ছোটান, কোথায় যাচ্ছেন কেউ জানে না, তিনি নিজেও জানেন না।[২৭] এই কারণে কুবেরের গাড়িতে সওয়ার হওয়া বিপজ্জনক, অকল্যাণকর; বিপরীতে লক্ষ্মী হলেন কল্যাণী; তাঁর গাড়িতে সওয়ার হলে যার যেখানে যাওয়ার তাকে সেখানে তিনি পৌঁছে দেন। এ-ভারতবর্ষ এই কল্যাণী লক্ষ্মীর আরাধনা করে থাকে।

অণুবর্ষের অধিবাসীরা কল্যাণী সম্পদের বৃদ্ধির জন্য চেষ্টার অন্ত রাখেন না, কিন্তু সবার আগে ভেবে রাখেন সেই সম্পদের বৃদ্ধি হলে, তা দিয়ে কী করা হবে। কারণ, তাঁরা বিশ্বাস

করেন, 'দু দুগুণে চার, চার দুগুণে আট, আট দুগুণে ষোলো ...' কুবের পুঁজির 'অঙ্কগুলো ব্যাঙের মতো লাফিয়ে চলে — সেই লাফের পাল্লা কেবলই লম্বা হতে থাকে। এই নিরন্তর উল্লম্ফনের ঝোঁকের মাঝখানে যে পড়ে যায়, তার রোখ চেপে যায়, রক্ত গরম হয়ে ওঠে, বাহাদুরির মত্ততায় সে ভোঁ হয়ে যায়।' (শিক্ষার মিলন / রবীন্দ্রনাথ)। তাঁরা সেই লাফালাফির ঝোঁকের মাঝখানে কখনো পড়েন না। তাই প্রচুর সম্পদ বৃদ্ধি হলেও তাঁদের কারও রোখ চাপে না, রক্ত গরম হয় না, তাঁদের কোনো বাহাদুরির প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় না।

অণুবর্ষের কোথাও কোনো 'পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি' নেই। সবাই জানেন, এটি অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ। এতে যে পাইয়ে দেয় এবং যে পায়, উভয়েই উভয়ের চোখে ছোট হয়ে যায়, উভয়ে উভয়কে ছোটমানুষে পরিণত করে দেয়। এতে মনুষ্যত্বের অবমাননা করা হয়। কেননা, উভয়ের মনের গভীরে ব'সে অব্যক্তজ্ঞান মহামায়া রূপে সক্রিয় থাকেন। দাতা-নেতাকে তিনি শিখিয়ে দেন, যে পেল সে আসলে এত ছোট যে, সামান্য প্রাপ্তির জন্য নিজের মনুষ্যত্বের খানিকটা খোয়াতে তার লজ্জা করে না; বিপরীতে গ্রহীতাকে তিনি শিখিয়ে দেন, যে দিল, সে আসলে ধান্দাবাজ, অন্য মানুষের অসুবিধাজনক অবস্থার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে, কয়টা টাকা বা সামান্য সুযোগ দিয়ে যে-দাতা গ্রহীতার মনুষ্যত্বকে হীন করতে লজ্জা বোধ করে না। ফলে মনের গভীরে উভয়েই উভয়কে 'ছোটলোক' বলে ঘৃণা করে থাকেন। মহামায়ার এই সক্রিয়তা এতই নির্মম এবং অমোঘ যে, এর হাত থেকে মুক্ত হয়ে 'পাইয়ে দেওয়ার নীতি' অনুসরণ করতে পারে এমন মানুষের জন্ম হয়নি, হবেও না কোনোদিন।

অণুবর্ষে রয়েছে অর্জনের নীতি। অণুবর্ষের প্রতিটি সদস্য যাতে নিজ অর্জনে জীবনযাপন করতে পারেন, অণুবর্ষের পরিচালকেরা সর্বদা সেই পথ উন্মুক্ত করার চেষ্টা করে থাকেন; আর, সদস্যরাও সেই পথে হেঁটে নিজেদের প্রয়োজনীয় মানসিক, শারীরিক, আর্থিক অর্জন নিজেরাই করে থাকেন। 'বন্ধুবান্ধব'রা সেই চেষ্টায় পরস্পরকে সহায়তা করে থাকেন। ফলে, অণুবর্ষের প্রতিটি মানুষই মাথা উঁচু করে চলতে পারেন। তাঁরা মজা করতে পারেন, খুশির হাসি হাসতে পারেন, আনন্দ করতে পারেন। 'মনমরা মানুষ', যা কিনা বিগত 'আধুনিক' যুগের সাধারণ মানুষের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল, তা এখানে নেই বললেই চলে।

অণুবর্ষের বিধানসভার হাতে থাকে তার নিজস্ব রাজকোষ। তার নিজস্ব কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেচ, আমদানি, রপ্তানি, বিচারব্যবস্থা, পুলিশ-প্রশাসন — সবই তাকে দেখাশোনা ও পরিচালনা করতে হয়। অণুবর্ষের রয়েছে নিজস্ব ব্যাঙ্ক, নিজস্ব কমপিউটার কেন্দ্র, নিজস্ব শান্তিনিকেতন (বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্কুল পর্যন্ত); শ্রীনিকেতন ও শুশ্রূষানিকেতন (হাসপাতাল) ইত্যাদি। এগুলি চালানো অণুবর্ষের আর্থিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

এই রাষ্ট্রকাঠামোর মানসিক দিকটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। অণুবর্ষগুলির মূল লক্ষ্য স্বনির্ভর হওয়া। অণুবর্ষের মানুষ রসে-বশে থাকে এবং তার ব্যবস্থা সে নিজেই করে; জ্ঞানসম্পদ ও বাহ্যসম্পদের প্রবাহ অব্যাহত রাখার ব্যাপারে সে স্বনির্ভর হওয়ার চেষ্টা চালায়। তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহ তাকে নিজেকেই করতে হয়।

অণুবর্ষের জনপদবাসীর খাদ্য-বস্ত্র-আবাসের ব্যবস্থা, অণুবর্ষগুলি যে-যার করে নেয়। প্রয়োজনে উপবর্ষ থেকে বা প্রতিবেশী অণুবর্ষ থেকে সহায়তা নেয়। অণুবর্ষের কোন কোন উৎপাদন বাইরে না পাঠালেই নয়, এবং কোন কোন পণ্য বাইরে থেকে না আনলেই নয়; তার তালিকা বানায় তারা। অণুবর্ষের লক্ষ্য, এই তালিকাটিকে কীভাবে শূন্যে পরিণত করা যায়। অর্থাৎ এই অণুবর্ষগুলি সর্ববিষয়ে যেন সম্পূর্ণ স্বনির্ভর হয়ে ওঠে।

অণুবর্ষের সদস্য বাসিন্দাদের ব্যক্তিমালিকানা থাকবে কি না, থাকলে কীভাবে থাকবে, কতখানি থাকবে, জমির মালিকানা কেবলমাত্র মেয়েদেরই থাকবে কি না[২৮] ... এইসব নানা প্রশ্ন বিচার করে সিদ্ধান্ত নেবেন অণুবর্ষের বাসিন্দারাই। এসব বিষয়ে বাইরের কোনো নির্দেশ-উপদেশ একেবারেই চলবে না।

নগরের সঙ্গে অণুবর্ষের সম্বন্ধটিও পারস্পরিক সমমর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত। নগরের কোনো বিশেষ পণ্য সে নেয়, পরিবর্তে তার কোনো বিশেষ পণ্য সে তাকে দেয়। উভয়ের উৎপাদন পরস্পরের দাবির উপর নির্ভরশীল হয়ে চলতে পারে। শিল্পের যে প্রধান বিপদ, ভবিষ্যৎ না-জানতে পারা, এই সম্বন্ধ সেই অনিশ্চয়তাকে অনেকখানি কমাতে সাহায্য করে। সেকারণে এই নতুন ভারতবর্ষের শিল্পগুলি আগের মতো অনিশ্চয়তায় ভোগে না। সবাই মনে রাখে, নিশ্চয়তা-অনিশ্চয়তার মধ্যবর্তী অবস্থানই সুস্থ অবস্থান, এবং সেই অবস্থানে থাকার চেষ্টা চালান অণুবর্ষের সুচিন্তকেরা।

নতুন ভারতবর্ষের নগরনিগম ও শিল্পাঞ্চল

অণুবর্ষগুলির ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে বড় বড় নগর ও শিল্পাঞ্চল। এগুলি শাসিত ও পরিচালিত হয় মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশন, উপবর্ষ ও বর্ষের দ্বারা। এই নগর ও শিল্পাঞ্চলের আদালত থানা সবই উপবর্ষসভা ও ভারতবর্ষের কেন্দ্রিয় লোকসভার দ্বারা শাসিত ও পরিচালিত। যে নাগরিক শাসনব্যবস্থা এখানে চলে, জটিল জীবন ও নির্দিষ্ট-চিন্তা তার সাংস্কৃতিক ভিত্তি, অর্থাৎ তা আগেকার শাসনব্যবস্থার মতোই। পার্থক্য এই যে, অণুবর্ষগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার ফলে এদের লোকসংখ্যা গেছে অনেক কমে। ফলে, এদের শাসনব্যবস্থার যে দুর্নীতি ইত্যাদি ছিল, তা অত্যন্ত কমে গেছে। যেহেতু সমগ্র দেশ অণুবর্ষনির্ভর এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছাড়া তাদের অন্যতর সমস্যার সম্ভাবনা কম, অণুবর্ষের জন্য উপবর্ষ ও বর্ষের কোনো ঝুঁকি থাকে না। কিন্তু নগর ও শিল্পাঞ্চল যেহেতু দেশের শক্তির কেন্দ্র, এর জন্য অনেক ঝুঁকি থাকে। তার মধ্যে ব্যক্তিমালিকানাধীন বড় বড় কোম্পানির ক্ষেত্রে ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। সেই কারণে, বর্ষ ও উপবর্ষগুলিকে এগুলির বিষয়ে প্রচলিত আইনকানুন মোতাবেক সতর্কতা নিতে হয়। যে সমস্ত সেজ (স্পেশাল ইকনমিক জোন) গড়া হয়েছিল, সেগুলি সবই এই 'নাগরিক শাসনব্যবস্থা'র মধ্যে। মীরজাফর বিচার-সালিশ করবে, দেশে শান্তি বজায় রাখবে আর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কেবল টাকা কামাবে — ব্রিটিশের প্রথম যুগে যেরকম ছিল, সেজগুলি শুরুতে সেইরকম আচরণ করত; ভারতবর্ষের সরকারকে তারা মীরজাফরের মতো গোলাম

বানিয়ে ফেলেছিল। অণুবর্ষগুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, সেই পরিস্থিতি আর নেই। সবাই জেনে গেছে, এগুলি কুবেরের বংশধর; এদের সংস্পর্শে কল্যাণ নেই। কিন্তু এদের শক্তিকে সংযত ভাবে কাজে লাগানোর জন্য ভারতবর্ষের সরকার এদের সঙ্গে আইনসম্মত সতর্কতা অনুসারে চলে। তবে অণুবর্ষের এলাকায় এদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত। সেখানে কিছুমাত্র করতে হলেও অণুবর্ষ, উপবর্ষ ও বর্ষের অনুমতি লাগে।

নতুন ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় বিষয়

সামরিক বাহিনী, রেল, টেলিফোন, টেলিভিশন, স্যাটেলাইট, ব্যাঙ্কিং, কারেন্সি, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বৈদেশিক সম্পর্ক ইত্যাদি সার্বজনীন বিষয়গুলির দায়িত্ব থাকে উচ্চতর (উপবর্ষ ও বর্ষের) সভাগুলির উপর। তাঁরাই অধিক ব্যয়সাপেক্ষ ও বৃহত্তর গবেষণাগুলি চালান। তার জন্য অণুবর্ষের শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ট যোগ থাকে। কোনো কোনো অণুবর্ষ বিশেষ বিশেষ গবেষণার কাজে সহায়তা করে থাকে। তার জন্য অণুবর্ষগুলি যেমন বাৎসরিক খরচ যোগায়, তেমনি কেন্দ্র, রাজ্য সভাগুলিও অণুবর্ষের প্রাপ্য যথাবিহিত ভাবে দিয়ে থাকে।

ভারতবর্ষের প্রশাসনব্যবস্থা

অণুবর্ষের সমস্ত প্রশাসনিক ও পুলিশী ব্যবস্থা অণুবর্ষ নিজেই করে নেয়, তাই তার জন্য আলাদা কোনো ব্যবস্থা উপবর্ষ বা বর্ষকে করতে হয় না। অণুবর্ষের বাসিন্দা বাইরের দেশে থাকতে পারেন, কিন্তু বাইরের কোনো মানুষ অণুবর্ষে থাকতে গেলে যে-দেশ থেকে তিনি আসছেন সেই দেশের কাগজপত্র দাখিল করে অণুবর্ষের অফিস থেকে তাঁকে অনুমতি নিতে হয়। একটি অণুবর্ষের বাসিন্দা অন্য অণুবর্ষে গেলে তাঁর ভোটার পরিচয় তাঁর নিজের কাছে থাকলেই চলে, অণুবর্ষের অফিস প্রয়োজনে কমপিউটারে তার পরিচয় পরখ করে নেন, নোট নেন, এবং প্রয়োজনে যে-অণুবর্ষ থেকে আগন্তুক এসেছেন, তাঁদের কাছে জানতে চান। ... কিন্তু নগর থেকে অণুবর্ষে যাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু বিধিনিষেধ মানতে হয়। ...

অণুবর্ষের নিজস্ব আদালত রয়েছে। কিন্তু মানুষকে শাস্তি দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। মানুষ মানুষকে শাস্তি দিতে পারে, এ অন্যায় আবদার অণুবর্ষ মান্য করে না। ঈশ্বরের জীবকে শাস্তি দিতে হলে ঈশ্বরই দেবেন। অণুবর্ষের রয়েছে অষ্টপাশ ও প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা। মানুষের জন্য এগুলি নেচারের নিজস্ব 'সেনসর' ব্যবস্থা। এর কোনো বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয় না; শাস্তি পেতে পেতে মানুষ উগ্রপন্থী, চরমপন্থী, বা সন্ত্রাসবাদীতে পরিণত হয় না। এই 'অষ্টপাশ' হল 'অষ্টবন্ধন'। এদের নাম — ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, সন্দেহ, মান, অভিমান, জাতি, ও শীল। প্রচলিত সমাজকে ঠিক জায়গায় রাখার জন্য এই আটটি পাশ বিপুল শক্তি রূপে সক্রিয় থাকে। সেই শক্তি এতই বিপুল যে, তাকে ঐশ্বরিক শক্তি বললে কম বলা হয়।

কিন্তু কীভাবে তা সক্রিয় থাকে, পাশ্চাত্য প্রভাবিত অ্যাকাডেমিক শিক্ষার চশমা দিয়ে তা দেখা যায় না। যদিও এর ভিতর কেবল 'লজ্জা'র অতি সামান্য অংশকে ব্যবহার করে নোবেল প্রাপক মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে বাংলাদেশ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক প্রমাণ করেছিল, সামাজিক লজ্জার

কারণে ৯৯ শতাংশ মানুষ প্রতিশ্রুতিভঙ্গের অপরাধ করেনি। এই অষ্টপাশ সামগ্রিক ভাবে ব্যবহৃত হয় বলে, অণুবর্ষের সকল সদস্য সামাজিক অপরাধ থেকে মুক্ত থাকেন। তার পরেও কেউ যদি অসতর্কতাবশত কিছু করে ফেলেন, অণুবর্ষের আদালত তাকে প্রায়শ্চিত্তের বিধান শোনায়। কিন্তু এতকিছুর পরেও যদি দেখা যায় কেউ সামাজিক অপরাধে লিপ্ত রয়েছে, তাকে অণুবর্ষ থেকে ভারতবর্ষের নাগরিক শাসনব্যবস্থার অধীনস্থ এলাকায় নির্বাসনে যেতে বলা হয়। সেখানে রয়েছে আধুনিক শাসনব্যবস্থা, যা 'আধুনিক' বিচারব্যবস্থার নিয়মে চলে। পৃথিবীতে যতদিন মানুষের সমাজ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিভাজিত থাকবে ততদিন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় হিংসামূলক এই নাগরিক শাসনব্যবস্থাও থাকবে, ভারতের সীমান্তে ও প্রয়োজনে নাগরিক শাসনব্যবস্থার অধীন এলাকাগুলিতেও থাকবে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। তবে অণুবর্ষের এই অষ্টপাশের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকেন ব্রহ্মনকারী ব্রহ্মসাধক মানুষেরা। কারণ অষ্টপাশের বন্ধন আবিষ্কারকে বাধা দেয়। তবে ব্রহ্মসাধকের সে বিচারের ভার থাকে প্রধানত দুজনের হাতে — অণুবর্ষের মহিলা সভাপতি ও অণুবর্ষের 'রবিঠাকুর'-এর হাতে। তাঁরা আপত্তি না করলে ব্রহ্মসাধক অষ্টপাশ উল্লঙ্ঘন করেও নিজ নিজ সাধনা চালিয়ে যেতে পারেন। তাঁরা আপত্তি করলে ব্রহ্মসাধক উপবর্ষের বা বর্ষের সভাপতিদ্বয়ের শরণাপন্ন হতে পারেন। ... ...

আগেই বলা হয়েছে, এটি একটি প্রকল্পনা এবং প্রকল্প রচনা করা সহজকর্ম নয়। এই প্রকল্পে হয়তো অনেক রকমের অসম্পূর্ণতা আছে। এতে নিশ্চয় আরও বহু বিষয় যুক্ত হবে। যাঁরা এসব বিষয়ে আমাদের চেয়ে অনেক ভাল জানেন, তাঁরা নিশ্চয় আরও ভাল 'সমগ্র ও সুবিন্যস্ত' প্রকল্প রচনা করতে পারবেন। ...

তবে এই উপস্থাপনের ক্ষেত্রে আমাদের কমপক্ষে দুটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যেতে হবে। প্রথমত : জনসাধারণের পরিচালক রূপে যে বাহ্যসম্পদ-অনীহ ব্রহ্মজ্ঞানীকে এই ব্যবস্থার মূল ও প্রধান ভূমিকায় রাখা হয়েছে, তেমন মানুষ পাওয়া যাবে কোথায়? প্রাচীন মহর্ষিদের সেরকম উত্তরাধিকার আর কি আমাদের অবশিষ্ট আছে?

আমাদের বিশ্বাস, এই উত্তরাধিকার, ধ্বংসাবশেষ রূপে হলেও, ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজগোষ্ঠীগুলির আচরণের মধ্যে আজও প্রবহমান রয়েছে। যিনি বাহ্যসম্পদ অর্জন করাকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে মনে করেন, তাকে মনের গভীর থেকে কেউই যথেষ্ট সম্মান করেন না; তেমন ধনলোভীকে ভারত বাংলাদেশের সমাজ তাঁদের নেতানেত্রীর আসনে স্বীকার করতে আজও রাজি হয় না। সবাই বোঝেন, বাহ্যসম্পদলোভীকে বাহ্যসম্পদের জগৎ শাসনের দায়িত্ব দেওয়া চলে না কিছুতেই। সমাজের পরিচালক-নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে এইরকমের বিশ্বাসের উত্তরাধিকার ভারতীয় উপমহাদেশের জল-মাটি-হাওয়ায় আজও মিশে রয়েছে। আমাদের শিক্ষকশ্রেণীর একটি বড় অংশ এখনও বাহ্যসম্পদকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। আমাদের তরুণ-তরুণীদের মধ্যে এই বাহ্যসম্পদে অনীহা আজও বিদ্যমান, যদিও পাশ্চাত্য-প্রভাবিত আজকের বঙ্গসমাজের নিম্নমেধাসম্পন্ন পরিচালকেরা তাদেরকে কেবলমাত্র টাকা-রোজগারের

যন্ত্র বানানোর সবরকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তা সত্ত্বেও, বাহ্যসম্পদ রোজগার করাকে গুরুত্বই দেন না, এরকম বহু ধর্মপ্রাণ মানুষ রয়েছেন আমাদের দেশে; এমনকি এরকম বহু নেতানেত্রী এখনও আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে কিছু না কিছু সংখ্যায় রয়েছেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আর যাই অভিযোগ করা যাক, তাঁরা ব্যক্তিজীবনে টাকা-রোজগার করাকে যে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেননি, সেকথা একমাত্র স্বভাবনিন্দুক ছাড়া সবাই মানবেন। কেন তাঁরা টাকা রোজগার করতে গেলেন না? কে তাঁদের আটকাচ্ছিল? — উত্তরাধিকার! আমরা জেনেছি, প্রাচীন ভারতীয় মহর্ষিদের উত্তরাধিকারের স্রোতধারা শুকিয়ে এলেও উপমহাদেশের মাটি ভিজিয়ে এইসব শিক্ষক-ছাত্র-নেতা, ধর্মপ্রচারক, গায়ক ... প্রভৃতি নানা শ্রেণীর মানুষদের মাধ্যমে এখনও তা ঝুরুঝুরু করে বইছে! সুতরাং, আর কোনো দেশে না হোক, আমাদের বাংলার মাটিতে যে আজও কিছু কিছু 'শিব'মানুষ, 'সদাশিব' মানুষকে পাওয়া যাবে; সে বিষয়ে আমরা আশাবাদী হতে পারি।

তবে একটি বিপরীত হাওয়াও এখন আমাদের দেশে বইতে শুরু করেছে। 'বাহ্য ফললাভ'ই মানুষের মোক্ষ,[২৯] এমন কথা বিশ্বায়নবাদীরা বলে চলেছেন। যাঁরা ব্যক্তিজীবনে টাকা-রোজগারকে জীবনের লক্ষ্য করতে রাজি হননি এমনকী তাঁরাও, গোটা দেশের সমস্ত মানুষকে টাকা কামানোর জন্য জীবন উৎসর্গ করার ব্রত গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন। মনুষ্যত্ব চাই না, ব্রহ্মকে চাই না, মানবসভ্যতার বিকাশ ও অগ্রগতি চাই না, টাকা চাই! তার জন্য মানবসভ্যতাটাই যদি ধ্বংস হয়ে যায়, যাক; আমাদের পার্থিব সম্পদ চাই!

আমাদের বিশ্বাস, এরকম আত্মহননকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাংলার সমাজমন কিছুতেই রাজি হবে না। অচিরে এই হাওয়া কেটে যাবে। বাংলার মাটি আবার শিবের আবাহন শুরু করে দেবে। আমাদের উত্তরপ্রজন্মের উপর আমরা ভরসা রাখতে পারি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হল : উপরোক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করা যাবে কীভাবে? অণুবর্ষ-উপবর্ষ-ভিত্তিক এরকম ভারতবর্ষ গড়ে তোলার জন্য সংগ্রাম, আন্দোলন, বিপ্লব, ইত্যাদি করতে হবে কি? আমাদের ধারণা, ওই পথগুলি সবই নষ্ট পথ, এক্ষেত্রে ওগুলি কখনোই অবলম্বন করা যাবে না। হিংসার ফল সবসময়ই মন্দ হয়। গান্ধী প্রদর্শিত অহিংসার পথের নাম করে গোপন মারদাঙ্গার পথেও হবে না। যথার্থ সত্যের পথে থেকেই এটা করতে হবে, করা যাবেও। একটি এলাকার সব মানুষ যদি দাবি করেন, তাঁদের অণুবর্ষ গঠনের অধিকার দেওয়া হোক, সরকার মানবেন না কেন? তারা তো নতুন কিছু চাইছেই না, নিজেদের দায় নিজেরা নিতে চাইছেন; দেশের মধ্যেকার সমস্ত রীতিনীতি মেনেই চাইছেন; সরকার পরিচালকদের মাথাব্যথা কমিয়ে দিতে চাইছেন। তাছাড়া তাঁরা তো নিজেদের পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও মেধা দিয়ে 'দেশ'কে অর্জন করে নিতে চাইছেন। এ তো হিংসাশ্রয়ীদের মুক্তাঞ্চল নয়। প্রাচীন যুগের ইতিহাস থেকে জেনেছি, দক্ষোৎপত্তি রুখতে গিয়ে আদি শিব রুদ্রমূর্তি ধারণ করার আগেই যদি 'সংকোচ'গ্রস্ত হতেন; তাহলে মানবসভ্যতাকে বিগত চার হাজার বছরের ক্লেদাক্ত রক্তাক্ত পথটি অতিক্রম করতে হত না, পথটির দৈর্ঘ্যই কমে হয়ে যেত দু-তিনশো বছর। আজ যদি শিবের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

হিংসার মাধ্যমে আদৌ করা যায়; আগামী দশহাজার বছরেও সে-পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না। ... এ অণুবর্ষভিত্তিক নতুন ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠা করা যাবে কেবল মাত্র সহজ সরল অহিংস পথেই, ধর্মপ্রচারকদের মতো করে। ... আগামীকাল একটি রাজ্যও যদি অণুবর্ষ-ভিত্তিক উপবর্ষ হিসেবে গড়ে ওঠে, তার গৌরব কেবল ভারতবর্ষের চেহারাই বদলে দেবে না, সারা পৃথিবীকেই জানিয়ে দেবে, বাঁচার এই হচ্ছে এখন একমাত্র পথ।

ফিরে ফিরে ডাক দেখিরে পরাণ খুলে, ডাক ডাক ডাক ...

হকিং সাহেব তাঁর বহুল প্রচারিত *A Brief History of Time* গ্রন্থে জানিয়েছেন, অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত দার্শনিকেরা বিজ্ঞানসহ সর্বপ্রকারের জ্ঞানকে তাঁদের চিন্তাভাবনার এলাকা বলে মনে করতেন। কিন্তু ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর দার্শনিকেরা বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে আর তাল রাখতে পারেননি। তাঁর মতে, দার্শনিকদের এই অধঃপতন দেখে, 'বিংশ শতাব্দীর অত্যন্ত বিখ্যাত দার্শনিক ভিট্‌গেনস্টাইন' নাকি মন্তব্য করেছিলেন, 'The sole remaining task for philosophy is the analysis of language।' আর তা উল্লেখ করে হকিং সাহেব মন্তব্য করেন — 'What a comedown from the great tradition of philosophy from Aristotle to Kant!'

এর সবচেয়ে ক্ষতিকর ফল কী হয়েছে, তা তিনি জানাননি, জানিয়েছেন, যে, অতঃপর বিজ্ঞানীরাই হয়তো একটি complete theory আবিষ্কার করবেন এবং তখনই জানা যাবে 'ঈশ্বরের মন'কে। এখান থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খবর আমরা জানতে পারছি। প্রথমত অব্যক্তজ্ঞানের বিষয়ে হকিং সাহেবের মতো একালের বিজ্ঞানীদেরও কোনো ধারণাই নেই, যেমন নিউটন ও আইনস্টাইনের ছিল। দ্বিতীয়ত, আদি অধ্যাত্মবিদ্যা ব্যক্তজ্ঞানের অজস্র খণ্ডজ্ঞানশাখাতে বিভাজিত হয়ে গেলেও, দর্শন নামক শাখাটি অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাকি সব ব্যক্তজ্ঞান-শাখাকে একত্র করে খণ্ডজ্ঞানসমূহের একপ্রকার যোগসাধন করে 'কাণ্ডজ্ঞান'-এর কাজ চালানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। আমরা দেখছি, ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে জ্ঞান-গাছের ডালপালা সব আছে, কাণ্ডটি নেই। ব্যক্তজ্ঞান খণ্ডে খণ্ডে বিচ্ছিন্ন; তাদের যোগসাধনও বন্ধ হয়ে গেছে। ফলত একালের জ্ঞানশাখাগুলির প্রত্যেকটিই মাথাহীন প্রত্যঙ্গ মাত্র এবং মাথাটিও ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন। তৃতীয়ত, হকিং সাহেব জানেন না, আদি অধ্যাত্মবিদ্যার কনিষ্ঠ পুত্রই পাশ্চাত্য দেশে 'Aristotle to Kant'-এর রূপ গ্রহণ করেছিলেন; এবং তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এশিয়ায় বসে রয়েছেন 'মহর্ষি কপিল থেকে রবীন্দ্রনাথ' পর্যন্ত বিশাল চেহারায়। সর্বোপরি, ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির সহায়তায় সেই 'কপিল থেকে রবীন্দ্রনাথ'-এর যে পুনরাবির্ভাব আমরা দেখতে পাচ্ছি, তা দেখে আমরা হকিং সাহেবের বিপরীতে অনায়াসেই বলতে পারি — What a coming-up from *analysis of language* by philosophy to a New World-View for the future!

যাঁরা আরাধ্য বিষয়ের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন, দেখা গেছে, তাঁরা বহু কষ্টস্বীকার

করেছেন ওই সিদ্ধি লাভ করার জন্য। তার থেকে একটা ভুল ধারণা প্রচলিত হয়ে যায় — 'কষ্ট করলে কেষ্ট মেলে'। কৃষ্ণসাধনার জন্য প্রয়োজনে কষ্ট করতে হয়; কষ্ট করার জন্য কষ্ট করার কোনো মানে হয় না। তেমনি মানবসভ্যতার কোনো উদ্দেশ্য নেই, সাধনা নেই, কিন্তু তার কষ্টকর বিজ্ঞান আছে, কষ্টকর গণতন্ত্র আছে — এমন কথারও কোনো মানে হয় না। অথচ বিগত দুই শতাব্দী ধরে আমরা বিশ্বাস করে এসেছি, গণতন্ত্র ও ভৌতবিজ্ঞান 'সেবন' করে যেতে পারলেই আমাদের মোক্ষলাভ ঘটে যাবে। সেই মোক্ষলাভ তো বহু দূরের কথা, সেই সাধনাহীন উদ্দেশ্যহীন বিজ্ঞান-গণতন্ত্র-সেবন যে মানবসভ্যতার অস্তিত্বের উপরই চরম আঘাত হানতে শুরু করেছে, সে তো দেখাই যাচ্ছে। ঠিক বিপরীত ব্যাপারটিও আজ আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি — গণতন্ত্র ও বিজ্ঞানের মাথায় যদি মানবসভ্যতার ব্রহ্ম-আরাধনাকে বসিয়ে দেওয়া হয়, ধূলিই হয়ে যাবে চন্দন।

শেষ কথা এই যে, মানবসভ্যতার মস্তিষ্ক ব্যাধিগ্রস্ত হতে চলেছে। এ যে কতবড় বিপদ, আশা করি পাঠক অনুভব করতে পারছেন। তাই বলে হতাশ হয়ে বসে থাকলে চলবে না। আমাদের উত্তরপ্রজন্ম, আমাদের শিশুরা আমাদের মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। আসন্ন বিপদের অগ্নিকুণ্ডে আমরা তাদের ফেলে দিয়ে যেতে পারি না। এ বিপদ যাঁদের চোখে পড়ে গেছে, তাঁদের উদ্যোগ নিতে হবে। উপরোক্ত প্রস্তাবিত পথেই এই সামাজিক বিকৃতির সুরাহা করতে হবে, এমন দাবি আমরা করি না। আরও অনেকের ভাবনাচিন্তা যোগ হয়ে হয়তো আরও ভাল উপায় বেরিয়ে আসবে। কিন্তু যাই উপায় বেরোক না কেন, সে যদি যথার্থ উপায় হয়, তার কোনো সহজ পথ যে কিছুতেই হতে পারবে না, তা আমরা নিশ্চয় করে বলতে পারি। বরং তাকে এক অসাধ্যসাধন বলেই মনে হবে। কিন্তু তাসত্ত্বেও তা প্রকৃতপক্ষে অসাধ্য হবে না। তার জন্য মানুষকে হয়তো দুর্গম পথে চলার জন্য ডাক দিতে হবে। আজকের দায়িত্ববান সৎ মানুষ, বুদ্ধিজীবী, গণনেতারা সেই ডাক দেওয়ার যোগ্য হয়ে উঠবেন, মানুষও সেই ডাকে সাড়া দেবে — এমন আশা করব না কেন? বিশেষত রবীন্দ্রনাথ যখন আমাদের বলেই গেছেন, 'মহত্ত্বই মানুষের আত্মার ধর্ম; ... অসাধ্যসাধনাকেই সে সত্য-সাধনা বলিয়া জানে।'[৩০]

তাছাড়া এ তো মানবসভ্যতার কৈশোরের স্বাভাবিক ত্রুটির ফল, আজ যৌবনে তাকে শুধরে নিতেই হবে। সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জন করে মানবসভ্যতাকে সত্যিকারের সাবালক হতে হবে। কেবল মানুষে মানুষে সামঞ্জস্য বিধান করলেই হবে না; এই পৃথিবীর সমস্ত জড় ও জীবের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে হবে; এই পৃথিবীর যোগ্য প্রতিনিধি রূপে সকলের জন্যই আরেক পৃথিবী নির্মাণের স্বপ্ন দেখতে হবে। আর সেকাজটি 'টাকার থলির' উপর বসে কিংবা পেন্টাগনের অস্ত্রভাণ্ডার দিয়ে হবে না; পূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনা করেই করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মনুষ্যত্বে বড়ো না হইয়াও কোনো জাতি বড়ো হইয়াছে, একথাটাকে বিনা সাক্ষ্যপ্রমাণে গোড়াতেই ডিসমিস করা যাইতে পারে।'

মানবজাতির এই দুঃসময়ে আমাদের সামনে এখন দুটি মাত্র পথ। যথার্থে সাবালক হয়ে উপরোক্ত সমাজবিন্যাসের (কিংবা আরও কোনো ভাল উপায়ের) মাধ্যমে মানবসভ্যতাকে

রক্ষা করার চেষ্টা করা; অথবা সমগ্র উত্তরপ্রজন্মকে আসন্ন মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া। যে সর্বনাশের তপ্ত আধারে আমরা আমাদের সন্তানদের রেখে যাব, তা তাদের পক্ষে যে-পরিমাণ অসহনীয় দুর্দশার কারণ হবে, তার চেয়ে প্রচলিত মানবসমাজের সবংশে আত্মহত্যা করা অনেক সহনীয় দুর্দশা হবে বলে মনে হয়। আজ আমাদের সিদ্ধান্ত নিতেই হবে, আমরা, আমাদের বন্ধুরা, আমাদের বিরোধীরা, আমাদের শত্রুরা, আমাদের পরিচিত অপরিচিত সবাই, আমরা আত্মঘাতী হবো না কি সাবালক হবো।

টীকা ও টুকিটাকি

১. এই রচনাংশটি John Donne-এর। এরই উপর নির্ভর করে হেমিংওয়ে তাঁর *For Whom the Bell Tolls* উপন্যাসটির নামকরণ করেছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যে যে কয়জন অব্যক্ত মহাজ্ঞানের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, শেক্সপীয়রের পর John Donne তাঁদের অন্যতম। 'অব্যক্ত মহাজ্ঞান' কী বস্তু, এই নিবন্ধে একটু পরেই পাঠক তার সাক্ষাৎ পাবেন।

২. রবি চক্রবর্তী ও কলিম খান রচিত 'প্রাচ্যের সম্পদ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে বেদের প্রধান দেবতা অগ্নি ইন্দ্র ও মিত্রাবরুণের অর্থ নিষ্কাশন করে দেখানো হয়েছে। যাঁরা এই লেখকদ্বয়ের লেখা প্রথম পড়ছেন, তাঁদের জন্য নিবেদন এই যে, পৃথিবীর আদি ভাষা যে ক্রিয়াভিত্তিক ছিল, পরে সেই ভাষাই রূপান্তরিত হয়ে হয়ে আজকের পৃথিবীর সমস্ত ভাষাগুলিতে পরিণত হয়েছে, এ তথ্য একালের ভাষাতাত্ত্বিকরা জানেন না; যদিও তার বিশাল উত্তরাধিকার বাংলাভাষীদের রয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের লেখা গ্রন্থগুলি দ্রষ্টব্য।

৩. এ বিষয়ে কলিম খান-এর লেখা 'মৌলবিবাদ থেকে নিখিলের দর্শনে' গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য। মার্কসের ভাষায় 'Primitive Indian community has made division of labour before production of commodity.' কিন্তু কিভাবে তারা তা করেছিল মার্কস সাহেব তা জানতে পারেননি।

৪. 'Information revolution is taking us out of the Machine Age into ... ... who knows what.' Ian Angell : 'Winners and Losers in the Information Age' in *Production of Culture / Cultures of Production*. (উদ্ধৃতির বিন্দু-চিহ্নিত ফাঁকা জায়গাটি Ian Angell-এরই।)

৫. আধুনিক সভ্যতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ যে-কয়টি শব্দে প্রায়শই প্রকাশ পেয়েছে, তার মধ্যে 'দেহবাদী', 'একঝোঁকা' অন্যতম। সভ্যতার স্বভাব বিষয়ে বলতে গিয়ে 'একঝোঁকা' শব্দটি রবীন্দ্রনাথ বহু জায়গায় ব্যবহার করেছেন। 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে শব্দটিকে তিনি আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন এইভাবে — 'একঝোঁকা আধ্যাত্মিক বুদ্ধিতে আমরা দারিদ্র্যে দুর্বলতায় কাত হয়ে পড়েছি, আর ওরাই কি একঝোঁকা আধিভৌতিক চালে এক পায়ে লাফিয়ে মনুষ্যত্বের সার্থকতার মধ্যে গিয়ে পৌঁচচ্ছে?'

৬. এ বিষয়ে লেখকের এযাবৎ সাতটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাতে এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে।

৭. আত্মা শব্দের অর্থ উদ্ধার করতে গিয়ে 'মন' শব্দটিকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে উপরোক্ত 'প্রাচ্যের সম্পদ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে।

৮. এই বিষয়টি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে পূর্ববর্তী 'উত্তরপ্রজন্মের লালন-পালন ...' নিবন্ধে।

৯. দুঃখের বিষয়, বহু শতাব্দী, হয়তো-বা দুই সহস্রাব্দের অধিক কাল ধরে ভারতবর্ষের ব্যাপক মনুষ্যসমাজ ব্রহ্ম শব্দের দ্বারা শুধু নির্গুণ ব্রহ্মকে বুঝেছে। ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থতত্ত্ব থেকে চ্যুতি এবং পতন যে এই অভ্যাসের মূলে, তাতে সন্দেহ নেই। আবার, এই শব্দার্থতত্ত্ব খোয়ানো ছিল ইতিহাসের ভবিতব্য, সমাজ বিবর্তনের আবশ্যিক শর্ত। (ব্রহ্ম শব্দের এইরকম কেবলমাত্র নির্গুণাত্মক অর্থ করার ফলে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত অদ্বৈতবাদী বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ, তাঁদের নিজ নিজ প্রতিভা ও সাধনার জোরে ব্রহ্ম শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য অনেকখানি পুনরুদ্ধার করে গেলেন।)

ব্রহ্ম শব্দটিকে প্রচলিত সংকীর্ণ অর্থে সীমিত করলে 'ব্রাহ্মণ' বা 'প্রজাপতি ব্রহ্মা' ... এইসব শব্দের সঙ্গে ব্রহ্ম শব্দের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থতত্ত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আমরা ব্রহ্ম, ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণ ... প্রভৃতি শব্দগুলিকে তাদের সৃষ্টিশীল গৌরবে পেয়ে যাই।

১০. আদিতে ব্রহ্মগুণসম্পন্ন বা আবিষ্কারক অর্থেই 'ব্রাহ্মণ' শব্দটির প্রচলন ছিল। পরে ব্রাহ্মণত্ব বংশানুক্রমিক হয়ে যাওয়ায় 'ব্রাহ্মণ' শব্দটি অধঃপতিত হয়ে যায়। এমনকি ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে যাস্কমুনি তাঁর নিরুক্ত গ্রন্থে জানিয়ে যান যে, অগ্নির স্থান প্রথমে, তারপর ব্রাহ্মণের স্থান।

১১. এ বিষয়ে কলিম খান-এর 'রসকথার কথকতা : রিডিজাইনিং লাইফস্টাইল' নিবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে ঢাকার 'মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা'র ৭১ সংখ্যায়।

১২. 'বিশ্বভারতী' / রবীন্দ্র-রচনাবলী, সুলভ সংস্করণ, ১৪ শ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৫।

১৩. 'সত্য ও বাস্তব' / রবীন্দ্র-রচনাবলী, সুলভ সংস্করণ, ১৪ শ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০০-২০১। এই উদ্ধৃতিতে মোটা হরফ ও 'তার বিজ্ঞান' কথাটি বর্তমান লেখকদ্বয়ের।

১৪. দ্রষ্টব্য 'অমরকোষ বা অমরার্থ চন্দ্রিকা' এবং এই গ্রন্থের অষ্টম নিবন্ধ।

১৫. এই জটিল বিষয়টিকেও যথার্থ বুঝেছিলেন আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা এবং অবশ্যই একালের অনেকেই — রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ। তাঁদের সিদ্ধান্ত : মন শ্রেষ্ঠ কিন্তু দেহ প্রথম। নৌকার ফুটো দিয়ে ঢুকে পড়া জল দিন দুবেলা সেচে না ফেললে (খাদ্য গ্রহণ না করলে) নৌকাটি তার আরোহী-মনকে নিয়েই ডুবে যাবে। কিন্তু নৌকাযাত্রার উদ্দেশ্য নৌকার সেবা নয়, তার আরোহীর নৌকাবিহার, জগদ্দর্শন, আরোহীর তৃপ্তিসাধন। রামকৃষ্ণ তাই বলতেন — খালি পেটে ধর্ম হয় না। কিন্তু ধর্মের জন্যই দেহ। রবীন্দ্রনাথ মন ত্যাগ করে শরীর বাঁচিয়ে মনমরা মানুষ রূপে বেঁচে থাকার গ্লানির বিষয়ে স্পষ্ট বলেছেন তাঁর 'চরকা' নিবন্ধে। মোটকথা, মনপাখিটার জন্যই দেহখাঁচা, কিন্তু খাঁচা না থাকলে পাখিটা থাকতেই পায় না। এদের তুলনা হয় না। যার যেখানে গুরুত্ব সেখানে তাকে থাকতে দিতে হয়। প্রাচীনেরা বলতেন পিতঃ আকাশের থেকেও উঁচু, মাতা পৃথিবীর থেকে বড়। ওত-র (ভার্টিক্যালের) সঙ্গে প্রোত-র (হরাইজন্টালের) তুলনা হয় না, তারা ওতপ্রোত।

১৬. 'জগন্নাথের জন্মমৃত্যু : শতাব্দীশেষের ঈশ্বরভাবনা' নামক নিবন্ধে কলিম খান বিষয়টি বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। নিবন্ধটি সংকলিত হয়েছে তাঁর 'দিশা থেকে বিদিশায়' গ্রন্থের প্রথমেই।

১৭. জল, চুনোপুঁটি, রাঘববোয়াল, টাকার কুমীর প্রভৃতির অর্থের জন্য এই গ্রন্থের প্রথম নিবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১৮. 'রায়তের কথা' / কালান্তর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৯. কালান্তর-এর 'লোকহিত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কথাটিকে ব্যবহার করেছেন এই ভাবে — 'সমাজের উদ্দেশ্যই এই যে, পরস্পরের পার্থক্যের উপর সুশোভন সামঞ্জস্যের আস্তরণ বিছাইয়া দেওয়া।'

২০. কথাটি ব্যবহার করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। 'দেশের ব্যাকুল চেষ্টাকে বিনা বাছনিতে এক দমে কবরস্থ করিলে তার প্রেতের উৎপাতকে কি কোনোদিন শান্ত করিতে পারিবে?' (ছোটো ও বড়ো)

২১. সত্যগোপন বা 'ইনফরমেশন হাইডিং' যে সামাজিক ক্ষমতার আদি মূল ও চরম উৎস, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে লেখকের 'দাপের বাপ কে' শীর্ষক রচনায়। এটি কলিম খান-এর 'এনলাইটেনমেন্ট টু ইমোশনাল বঙ্গেজ : জ্যোতি থেকে মমতা' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

২২. কৃর্ম্মাবতার কী বস্তু, কীভাবে আজকের বিশ্বায়িত সমাজে সে সক্রিয় হতে চাইছে, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে 'অপরের সন্ধানে' নিবন্ধে। উপরোক্ত ১৭ নম্বর পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

২৩. কলিম খান রচিত 'মানুষের ঝাঁক-ম্যানেজমেন্ট সামাল দেব কেমন করে' শীর্ষক নিবন্ধ দ্রষ্টব্য। নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে ঢাকা থেকে 'মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা'র (এপ্রিল-জুন ২০০৪) ৭৪ সংখ্যায়।

২৪. অপর পত্রিকার ২০০৭ পূজা সংখ্যায় অনুরাগ দাস মহাশয়ের একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাতে তিনি এই সম্বন্ধটিকে দেখেছেন একালের বিশেষ্যভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। তাতে 'পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহারকারী' সত্তা দুটিকে চিহ্নিত করা হয়। অবশ্য এইরূপ নামকরণে পরস্পরের মধ্যে চলা 'ক্রিয়া'টি

নজর এড়িয়ে যায়। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' গ্রন্থে এইরকম একজোড়া সন্তাকে চিহ্নিত করেছেন 'নিশি' ও 'শশী' রূপে। 'নিশিতে শশীর শোভা শশীতে নিশির'।

২৫. এই শব্দবন্ধটি একালের পশ্চিমী সুচিন্তকদের। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে কলিম খান-এর 'দিশা থেকে বিদিশায় ...' গ্রন্থের 'সাংস্কৃতিক মহাবিস্ফোরণের অশনিসংকেত' নিবন্ধে।

২৬. 'আর শিব গড়তে বানর নয় : চাই কোয়ালিটি পিপল' নিবন্ধে এই বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। নিবন্ধটি সংকলিত হয়েছে কলিম খান-এর 'আত্মহত্যা থেকে গণহত্যা : আসমানদারি করতে দেব কাকে' গ্রন্থে।

২৭. কুবের ও লক্ষ্মীর মধ্যেকার পার্থক্যকে যথাক্রমে হংকার ও সংগীতের মধ্যেকার পার্থক্য হিসেবেও বোঝা চলে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় — 'শব্দকে কেবলই অত্যন্ত বাড়িয়ে দিয়ে এবং চড়িয়ে দিয়ে যে জিনিসটা পাওয়া যায়, সেটা হল হংকার; শব্দকে সুর দিয়ে, লয় দিয়ে, সংযত সম্পূর্ণতা দান করলে যে জিনিসটা পাওয়া যায়, সেইটেই হল সংগীত।' — 'বাতায়নিকের পত্র'। কালান্তর।

২৮. বিশ্বভ্রমণকারিণী মেয়েদের মতে জাপানী যুবকেরা সবচেয়ে ভদ্র, মেয়েদের একা পেয়ে গেলেই অশালীন আচরণ করে বসে না। লক্ষণীয় যে, আজকের পৃথিবীতে জাপান একমাত্র দেশ, যেখানে নাগরিকত্ব কেবল নারীর; বিপরীতে ভারতে নাগরিকত্ব পুরুষের। তাই, ভারতের পুরুষ জাপানী নারীকে বিয়ে করলে তারা দৈত নাগরিকত্বের অধিকারী হয়, কিন্তু জাপানী পুরুষ ভারতীয় নারীকে বিয়ে করলে উভয়েই নাগরিকত্ব হারায়। তাছাড়া আমরা দেখেছি, যে-সমাজের জমি বিষয়ক আইন যতখানি মুক্ত, সেই সমাজের নারী ততখানি মুক্ত। অর্থাৎ, স্থাবর অধিকারগুলি নারীর হাতে থাকলে, তা কেবল পুরুষকেই ভদ্র করে না, মানবজাতির পক্ষেও শুভ। এ বিষয়ে মহম্মদ ইউনুসের গ্রামীণ ব্যাঙ্কের নীতি স্মর্তব্য। আমাদের বিবেচনায়, এক্ষেত্রেও দ্বৈরাজ্যের নীতির যথাযথ প্রয়োগ হওয়া বাঞ্ছনীয়। বারান্তরে বিষয়টি আলোচনা করা যাবে।

২৯. 'বাহ্য ফললাভই যে চরম লাভ এ কথা সমস্ত পৃথিবী যদি মানে তবু ভারতবর্ষ যেন না মানে — বিধাতার কাছে এই বর প্রার্থনা করি।' রবীন্দ্রনাথের এই প্রার্থনা কি বিধাতা পূর্ণ করবেন না? — 'ছোটো ও বড়ো' / কালান্তর / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩০. আগ্রহী পাঠকপাঠিকার প্রতি নিবেদন, রবীন্দ্রনাথের 'ততঃ কিম' নিবন্ধটি পুরোটাই পড়ে নিন। যাঁরা তাতের কাছে নিবন্ধটি পাচ্ছেন না, তাঁদের জন্য এখানে একটু দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিচ্ছি। '... যাঁহারা মানুষকে অসাধ্যসাধনের উপদেশ দিয়াছেন, যাঁহাদের কথা শুনিলেই হঠাৎ মনে হয় ইহা কোনোমতেই বিশ্বাস করিবার মতো নহে, মানুষ তাঁহাদিগকেই শ্রদ্ধা করে অর্থাৎ বিশ্বাস করে। তার কারণ মহত্ত্বই মানুষের আত্মার ধর্ম; সে মুখে যাহাই বলুক, শেষকালে দেখা যায় সে বড়োকেই যথার্থ বিশ্বাস করে। সহজের উপরেই তাহার বস্তুত শ্রদ্ধা নাই; অসাধ্যসাধনাকেই সে সত্য-সাধনা বলিয়া জানে; সেই পথের পথিককেই সে সর্বোচ্চ সম্মান না দিয়া কোনোমতেই থাকিতে পারে না।

যাঁহারা মানুষকে দুর্গম পথে ডাকেন, মানুষ তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করে, কেননা মানুষকে তাঁহারা শ্রদ্ধা করেন। তাঁহারা মানুষকে দীনাত্মা বলিয়া অবজ্ঞা করেন না। বাহিরে তাঁহারা মানুষের যত দুর্বলতা যত মূঢ়তাই দেখুন না কেন তবুও তাঁহারা নিশ্চয় জানেন যথার্থত মানুষ হীনশক্তি নহে — তাহার শক্তিহীনতা নিতান্তই একটা বাহিরের জিনিস; সেটাকে মায়া বলিলেই হয়। এইজন্য তাঁহারা যখন শ্রদ্ধা করিয়া মানুষকে বড়ো পথে ডাকেন তখন মানুষ আপনার মায়াকে ত্যাগ করিয়া সত্যকে চিনিতে পারে, মানুষ নিজের মাহাত্ম্য দেখিতে পায় এবং নিজের সেই সত্যস্বরূপে বিশ্বাস করিবামাত্র সে অসাধ্যসাধন করিতে পারে। ... ' — 'ততঃ কিম' / রবীন্দ্র-রচনাবলী, সুলভ সংস্করণ, ৭ম খণ্ড।

(নিবন্ধটি লেখকদ্বয়ের যৌথ মননের ফসল হলেও সামাজিক সৌকর্যের স্বার্থে কেবলমাত্র কলিম খান-এর নামে কলকাতার 'অপর' পত্রিকার ২০০৭ পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।)

[প্রকাশের প্রাক্কালে, ২০০৭-এর আগস্ট মাস থেকে ২০০৮-এর জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত নানা সময়ে রবি চক্রবর্তী, কলিম খান, ও 'অপর' পত্রিকার সম্পাদক সোমনাথ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে গ্রন্থে প্রকাশিতব্য নিবন্ধগুলি নিয়ে কথা হয়। আলোচনা হয় এমন কয়েকজন পাঠকপাঠিকার সঙ্গে, যাঁরা নিবন্ধগুলি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পরেই পড়ে নিয়েছিলেন। এখানে তাঁদের কথাবার্তা কথোপকথন আকারে পরিবেশিত হল। কথকগণের নাম লেখা হল এভাবে — কখ (কলিম খান), রচ (রবি চক্রবর্তী), সোমু (সোমনাথ মুখোপাধ্যায়), পা-১ (পাঠক /পাঠিকা ১), পা-২, পা-৩ ... ইত্যাদি।]

১

সোমু : আপনার লেখা 'অপরের সন্ধানে' নামে নিবন্ধটি আমার সম্পাদিত পত্রিকা 'অপর'-এর ২০০৬ পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল; আর 'বাংলাই বিশ্বকে পথ দেখাতে পারে' নামে অন্য একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল ২০০৭-এর পূজা সংখ্যায়।

কখ : হ্যাঁ। সে-দুটির প্রথমটিকে রাখা হয়েছে এই সংকলনের ন'টি নিবন্ধের সর্বপ্রথমে এবং দ্বিতীয়টিকে রাখা হয়েছে শেষে, সাজিয়েছি কিছুটা কালানুক্রমে। ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থকোষের কাজ করতে করতে এক-একটি নতুন বিষয়ের উপলব্ধি ঘটেছে আমাদের, আর তা এক-একটি নিবন্ধে রূপ পেয়েছে। আমরা তাই ঠিক করেছিলাম এই সংকলনের নাম রাখা হবে 'অপরের সন্ধানে : বাংলা থেকে বিশ্বে'।

সোমু : সেসব ২০০৭-এর পুজোর আগের কথা, তখনই আমাদের প্রথম কথা হয়েছিল।

কখ : হ্যাঁ, তখন আপনি বলেছিলেন, 'অপর' কথাটির সঠিক অর্থ আমরা যেমন বুঝি, সবাই তেমন বোঝেন না। সাধারণভাবে সবাই 'অপর'কে 'other'-এর বাংলা প্রতিশব্দ বলে মনে করেন। তাই আপনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন, এ বইয়ের নাম 'বিকল্পের সন্ধানে : বাংলা থেকে বিশ্বে' দিলে পাঠকসাধারণের বুঝতে সুবিধা হবে।

সোমু : হ্যাঁ, আপনিও সেই নাম দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

রচ : আমাকেও সেকথা জানিয়েছিলেন। তাৎক্ষণিকভাবে আমিও আপত্তি করিনি।

কখ : কিন্তু শেষমেষ নামটি বদল করে 'অবিকল্পসন্ধান : বাংলা থেকে বিশ্বে' করতেই হল।

রচ : আমরা দুজনে আলোচনা করেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আসলে বইয়ের নাম 'অপরের সন্ধানে ...' থাকলে পাঠকপাঠিকা 'অপর' শব্দটির অর্থ আমরা যেমন বুঝি, বইটির ভিতরে প্রথম নিবন্ধেই তাঁরা তা পেয়ে যেতেন, কিন্তু 'বিকল্প' শব্দটির অর্থ এই বইটির ভিতরে ব্যাখ্যা করা নেই। সেক্ষেত্রে পাঠকপাঠিকা 'বিকল্প' শব্দটির কেবলমাত্র alternative মানেটিই বুঝতেন, 'বিকল্প' শব্দটির ভিতরে যে বাংলা মানেটি রয়েছে তা জানতে-বুঝতে পারতেন না। যে বাংলা শব্দের এরকম ইংরেজিমূলক ব্যবহার চলে, সেগুলি খুব বিপজ্জনক। এধরনের বাংলা শব্দের গর্ভে তার নিজের অর্থ চাপা দিয়ে ইংরেজির অর্থ ঢুকিয়ে দেওয়া থাকে। এই গ্রন্থের অষ্টম নিবন্ধে 'ধর্ষিত বাংলা শব্দ' নামে তার আলোচনা আছে। আমরা বুঝতে পারছিলাম, 'বিকল্পের সন্ধানে' নাম রাখলে পাঠকপাঠিকা প্রতীকী ইংরেজি ভাষার খপ্পরে পড়ে যাবেন।

তাঁরা ভাববেন, এ-গ্রন্থে আমরা বুঝি alternative-এর অনুসন্ধান করেছি। কিন্তু তা ঠিক নয়। যার অনুসন্ধান করেছি, ইংরেজি ভাষার সাহায্যেই যদি তাকে বোঝাতে হয় তবে বলতে হয় In Quest of the Grand Design, লক্ষ-কোটি alternative যার ফল ও কারণ। একটি মানুষের সন্ধান আর তার পায়ের নখের সন্ধান, এই দুই ক্রিয়ার মধ্যে যে পার্থক্য, 'অপর' শব্দের জায়গায় 'বিকল্প' বসালে সেই পার্থক্য ঘটে যায়; আর এ পার্থক্য ঘটে যায় তখনই যখন 'বিকল্প' শব্দের মানে বোঝা হয় alternative।

কখ : বাংলাভাষীরা যদি ক্, ক, কল্, কল্প, প্রকল্প, বিকল্প — এই ক্রমে বাংলা শব্দগুলির মানে বুঝতেন, তা হলে এই সমস্যা হত না। যদিও, সেক্ষেত্রেও 'অপর' আর 'বিকল্প' একই বিষয়কে বোঝাত না; কেননা 'বিকল্প'র চেয়ে 'অপর'-এর ব্যাপ্তি অনেক বেশি। 'অপর' শব্দের ইশারার দৌড় গিয়ে পৌঁছায় একেবারে 'পরব্রহ্ম' পর্যন্ত। 'বিকল্প' শব্দের সে যোগ্যতা নেই।

রচ : (সোমু-র উদ্দেশে) কিন্তু 'অপর' শব্দে আপনার আপত্তি নিয়ে ভাবতে গিয়ে আমরা বুঝতে পারি, এক্ষেত্রেও পাঠকপাঠিকা ইংরেজি other-এর সীমিত এলাকায় বন্দী হয়ে যাবেন। বুঝতে পারি, এমন শব্দের প্রয়োজন, যার সূত্রপাতে alternative বা other থাকলেও যার গন্তব্য 'পরব্রহ্ম' পর্যন্ত এবং যার গর্ভে এখনও ইংরেজি অর্থ প্রবেশ করানো যায়নি।

পা-১ : আপনারা কি জানেন, ক'দিন আগেই টেলিভিশনের 'তারা নিউজ' চ্যানেলে 'বিকল্পের সন্ধানে' নামে একটি অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছে; একটি বইও বেরিয়েছে 'বিকল্পের সন্ধানে' নামে। অবশ্য তাঁদের 'বিকল্পের সন্ধানে' কথাটি 'alternative-এর সন্ধানে'ই বোঝায়।

পা-২ : সেদিক থেকে দেখতে গেলে 'বিপ্লব' শব্দের মতো 'বিকল্পের সন্ধানে' কথাটিও ইতিমধ্যেই বহু-ব্যবহারে নষ্ট হতে চলেছে। আচ্ছা, 'বিকল্পের সন্ধানে' কথাটি কি শ্লীল?

কখ : আমরা সেসব নিয়ে ভাবিনি। আমাদের দুজনের ভাবনার মূল বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল একটিই — নিবন্ধগুলিতে আমরা যা বলতে চেয়েছি, গ্রন্থের নামের মধ্যে তার যথাযথ প্রতিফলন ঘটানো যাচ্ছে কি না। আমরা বুঝেছিলাম, বিশ্বজগতের যে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক মহাকল্প, যার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রাচীন মানুষ তাঁদের কল্পগুলির কল্পনা ও বাস্তবায়ন করতেন, তার বিরুদ্ধাচরণ করেই মানুষের সমাজে জন্ম নিয়েছিল 'বিকল্প'। এই প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজের ফল ফলেছে অচিরেই। আর তখনই জন্ম নিয়েছে বিকল্পের বিকল্প, তস্য বিকল্প, তস্য বিকল্পের বিকল্প ... এইভাবে চলতে থেকেছে যুগের পর যুগ এবং এইভাবে চলতে চলতে মানুষ প্রকৃতি থেকে ক্রমশ দূরে সরে গেছে। এখন আর বিকল্পের সন্ধান করে লাভ নেই, দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। এখন বহুকালক্রমাগত বহুবিবর্তিত অজস্র ক্রমবিকল্পের 'অ'বসান চাই; অর্থাৎ অ-বিকল্প চাই — এমন এক অবিকল্পকে চাই যা চিরন্তন মহাকল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আদিকল্পের 'একালিত' (updated) স্বরূপ। আর, আমরা তো সেটিই খুঁজেছি। তাই আমরা একটি নতুন শব্দ তৈরি করি — 'অবিকল্পসন্ধান'। ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির নিয়মে 'যে সন্ধানের বিকল্প নাই' তা যেমন 'অবিকল্পসন্ধান', তেমনি 'অবিকল্পের সন্ধান'ও 'অবিকল্পসন্ধান'।

রচ : অর্থাৎ এ-অবিকল্প সে-ই, যা একই সঙ্গে সমস্ত বিকল্পকে এক মহাজাগতিক মহাকল্পের

অভ্যন্তরে আত্মসাৎ করে থাকে, যা এক হয়েও অনেক, অনেক হয়েও এক। আমরা তাঁকেই বুঝে নিতে চেয়েছি আমাদের ব্যক্তিজীবনে, পারিবারিক জীবনে, সমাজজীবনে, জগজ্জীবনে; তাঁকেই উপলব্ধি করতে চেয়েছি আমাদের যাপনের বিভিন্ন স্থান-কাল-পাত্রে, সমাজকাঠামোর নবরূপায়ণে। আমাদের প্রবন্ধগুলিতে সে-চেষ্টাই রয়েছে। এতে যে মহত্তত্ত্বের মহানীতির অনুসন্ধান করবার চেষ্টা করা হয়েছে, তা আমাদের দার্শনিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, মোট কথা জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রের সমস্ত নৈতিক দিশার দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করে দেয়। কার্যত আমরা একই নীতির বিন্দুরূপ থেকে সিন্ধুরূপ পর্যন্ত সমগ্রকেই খোঁজার চেষ্টা করে গেছি। এ অবিকল্পসন্ধান কতটা সফল পাঠকপাঠিকাই তার বিচার করবেন।

সোমু : সেক্ষেত্রে শব্দটির ব্যাখ্যা বইয়ের ভূমিকায় দিয়ে দেওয়া দরকার।

পা-১ : কিন্তু বইয়ের নাম হিসেবে 'অবিকল্পসন্ধান' কথাটি কভারের উপরে লেখা থাকলে লোকে তো কথাটির মানেই বুঝতে পারবে না; বইটি কিনবেই না, পড়া তো দূরের কথা। লোকে যে স্তরে বোঝে, বক্তব্যকে সেখানে নামিয়ে আনা উচিত নয় কি?

রচ : অর্থের অবনমন না ঘটিয়ে লেখাকে যতদূর সরল করা যায়, অবশ্যই তা করা উচিত। কিন্তু সে যোগ্যতা অর্জন করতে সময় লাগে। আমরা দেখেছি, নতুন অর্জিত তত্ত্ব ও তথ্য যত হজম হয় তাকে প্রকাশ করার ভাষা তত সরল হতে থাকে। আমরা এখন পর্যন্ত যতখানি পেরেছি, ততখানি করেছি।

কখ : আমাদের মনে হয়, গ্রাহকের জিহ্বায় যেরকম খাদ্য আকর্ষক, তেমন খাদ্য প্রস্তুতের দিকে বেশি জোর দেয় দোকানদার, যার লক্ষ্য গ্রাহকের ধন। বিপরীতে গ্রাহকের শরীর মনের বেশি বেশি পুষ্টিসাধন করবে যে খাদ্য, তেমন খাদ্য প্রস্তুতের দিকে বেশি জোর দেয় তার মা কিংবা অন্য আপনজন, যে তাকে ভালবাসে। তবে খাদ্যটি যাতে গ্রাহকের কাছে বিকর্ষক না-হয়, খাদ্যগুণ নষ্ট না করে খাদ্যটিকে যদি আকর্ষক করা যায়, অবশ্যই সে চেষ্টা করা উচিত।

রচ : কিন্তু যতক্ষণ তা করা যাচ্ছে না, পুষ্টিসাধক তিতো খাবারই দিতে হবে। তিতো আমাদের ভোজনের প্রথম পদ। আমাদের নীতি হচ্ছে 'সত্যং ব্রুয়াৎ', পারলে 'প্রিয়ং ব্রুয়াৎ'। প্রিয় বলতে গিয়ে সত্যকে বিকৃত করে অসত্য বানিয়ে ফেলা যাবে না। অসত্য হল বিষ এবং পারমার্থিক অর্থে সেটিই সবচেয়ে অপ্রিয়। তা বলা যাবে না। আমরা সত্যই বলব, পুষ্টিসাধনই আমাদের খাদ্য প্রস্তুত করার প্রাথমিক লক্ষ্য। এই রীতিটি কিছুতেই লঙ্ঘন করা যাবে না। তা করলে পাঠকের, মানুষের, সমাজের, প্রকৃতির বিশ্বাসভঙ্গ করা হবে।

কখ : তাছাড়া, পুরুষ-প্রকৃতির যথাযথ সাম্য, আমরা যাকে বলি 'পুরুষ-প্রকৃতির পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহার', তা মেনে নিলেও প্রশ্ন থেকে যায়। যেখানে একজনের প্রবেশের মতো দরজা আছে, সেখানে কে আগে যাবে? পুরুষ না প্রকৃতি? শিব না শক্তি? পরিবারের কর্তা কে? স্বামী না স্ত্রী? কার মর্যাদা বেশি — জ্ঞানের না ধনের? এইখানে আমরা দেখছি যে, শেষ বিচারে জ্ঞানকে সামনে না রাখলে সমগ্র মহাকল্পই ধ্বংসের দিকে পা বাড়ায়।

রচ : রতন টাটা একলাখি গাড়ি বের করেছেন। দেখা যাচ্ছে, সমগ্র প্রকল্পে দুটি প্রধান ও মূল

ক্ষেত্রে ধনের আগে জ্ঞান এসে গেছে। এক, এ-গাড়ি তৈরির ভাবনাটা সবার আগে কাজ করেছে রতন টাটার মাথায়, তাঁর ব্যাঙ্কের টাকায় নয়। দুই, ভাবনাটাকে কাজে পরিণত করার জন্য সবার আগে ৩৪টি অনু-আবিষ্কার (innovation) করতে হয়েছে; এটিও ব্যাঙ্কের টাকায় পাওয়া যায়নি, পাওয়া গেছে অন্বাবিষ্কারকদের মাথায়। জ্ঞানের এই অগ্রণী ভূমিকা মুখে স্বীকার করুন আর না করুন, কাজে করতেই হয়। এ অমোঘ নিয়ম স্বয়ং প্রকৃতির।

কখ : অথচ সেই রতন টাটা ও তাঁর সমর্থকেরাই জীবনের ক্ষেত্রে, সমাজের ক্ষেত্রে জ্ঞানীর 'প্রাথমিক ভূমিকা'টিকে সম্মান দিচ্ছেন না, জ্ঞানকে ধনের দাস হিসেবে দেখছেন।

রচ : তাঁর কারখানার কাজে রতন টাটা জ্ঞানকে ধনের দাস হিসেবে দেখতে চান দেখুন, কিন্তু সমগ্র সমাজের ক্ষেত্রে? সমগ্র সমাজের অস্তিত্ব, অগ্রগতি ও বিকাশের মিছিলের সামনে কে থাকবে — জ্ঞান না ধন? জ্ঞানী পথপ্রদর্শক সমাজনেতা, না ধনী মালবিক্রেতা? কথাটির অর্থ ও উত্তর রতন টাটা ও তাঁর অনুগামীরা না বুঝলেও তাঁর পূর্বজগণ ও ভারতের বৈশ্য সম্প্রদায়ের আদি পুরুষেরা বিলক্ষণ জানতেন ও বুঝতেন। তাঁরা নমস্য।

কখ : সমাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে জ্ঞানের এই প্রাথমিক ভূমিকাই হল পুরুষের প্রাথমিক ভূমিকা। পুরুষ প্রকৃতির সমস্ত ভূমিকার ক্ষেত্রগুলি পর্যালোচনা করে আমরা দেখেছি, সবচেয়ে শুভ রতির ক্ষেত্রেও এমন বহু পরিস্থিতি আসে, যেখানে যে-কোনো একজনের প্রাথমিক ভূমিকা রয়েছে; অন্যের সাহায্যে তাকে স্থানচ্যুত করা চলে না।

রচ : যেমন, সন্তানধারণের ক্ষেত্রে প্রকৃতির আসন এক নম্বরে, পুরুষের আসন দু নম্বরে; আবার সন্তানসৃজনের ক্ষেত্রে পুরুষের আসন প্রথমে, প্রকৃতির আসন পরে।

কখ : তেমনি গ্রন্থসৃষ্টির ক্ষেত্রে মানুষের মানসিক পুষ্টির বা সত্যের আসন এক নম্বরে, স্বাদের বা ভাললাগার আসন দু নম্বরে। আমাদের বিশ্বাস, নেচারের এই বিধান।

পা-২ : আপনারা তাহলে বইটির গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তার দিকে তাকাতে চান না?

রচ : অবশ্যই চাই। কিন্তু সেদিকে নজর দিতে গিয়ে সত্যবিকৃতি ঘটুক, তা চাই না। আবিষ্কারের বা সৃষ্টির সামাজিক স্বীকৃতি তাকে বাস্তবায়িত হতে সহায়তা করে। তাছাড়া মানুষ তো ঝাঁকজীব, একজনের অনুসন্ধানের ফল ঝাঁকের কাজে না লাগলে তাকে তার অনুসন্ধান চালানোর জন্য প্রকৃতি ও সমাজ এত সাহস, উদ্যম, ধৈর্য এবং তৃপ্তি যোগায় কেন? ঝাঁকের অস্তিত্ব ও বিকাশের সহায়ক হবে বলেই তো পরমাপ্রকৃতির এই লীলা। তাই গ্রন্থের স্বীকৃতি আমরাও চাই। কিন্তু স্বীকৃতির বিনিময়ে সত্যের বিকৃতি ঘটাতে আমরা রাজি নই।

কখ : কলকাতা বইমেলার কথাটাই ভাবুন। জ্ঞানকে যদি প্রাইমারি ধরেন, বরং নিরিবিলি বাইপাশে বইমেলাটা হতেই পারে; জ্ঞান লেনদেনে আগ্রহীরা সেখানে যেতে আগ্রহান্বিতই হবেন। কিন্তু ধনকে প্রাইমারি ধরলে, যেখানে বেশি লোক আসবে, বেশি ব্যবসা হবে, সেখানেই বইমেলা করতে হবে। পাবলিশার্স গিল্ড 'গাছেরটা খাব, তলারটাও কুড়োব'র চক্করে পড়ে গেছে। তারা জ্ঞানের গৌরব আত্মসাৎ করে ধনের সৌরভ কামাতে চায়। বইমেলার স্থান নিয়ে তাই এত ঝামেলা। বিক্রিটাকে প্রাইমারি করলে, জ্ঞানের প্যাকেজিং-এ ত্রুটি ঘটে যেতে পারে।

২

রচ : আজকের মতো যুগসন্ধির কাল বোধ করি আগে কখনো আসেনি। গ্রীক-রোমক সভ্যতার পতনের কাল, পশ্চিমী হিসাবে ফিউডাল যুগের অবসান, বা আমাদের দেশে পশ্চিমী বণিকের সাম্রাজ্য কায়েম করার সময় — এ সবের তো বিবরণ পাওয়া যায়। দেখা যায়, এক দল মানুষ যদি হা-হুতাশ করছে, তো অন্য এক দল মানুষ করছে জয়োল্লাস। কিন্তু আজ সকল দিকে শঙ্কা। একদিকে রয়েছে পরিবেশ দূষণ ও পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি সংক্রান্ত ভীতি; পৃথিবী যদি মানুষের বাসের অযোগ্য হয়ে যায় তাই নিয়ে ভাবনা। অন্যদিকে বিশ্বজোড়া সন্ত্রাসের আতঙ্ক, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সন্ত্রাস, প্রতিদিন সারা পৃথিবীতে গড়ে পাঁচের অধিক সন্ত্রাসমূলক বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটছে; যেন মৃত্যুর ফাঁদ পাতা ভুবনে। দুঃখের কথা এই, বিজ্ঞান প্রযুক্তি আজ যে তুঙ্গে উঠেছে, তাতে অন্ন বস্ত্র আচ্ছাদন প্রভৃতির সংস্থান নিয়ে সমগ্র পৃথিবীর একটি মানুষেরও কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। মানবিক অর্জনগুলির সাহায্যে আজ যখন পৃথিবীটাকে বাস্তব স্বর্গে পরিণত করা যেতে পারত, তখনই মানুষ সবচেয়ে বিপন্ন। আজই চলছে মানুষ মারার ব্যাপক ব্যবস্থা আর রক্ত নিয়ে হোলিখেলা। অথচ বিবদমান ও সংঘর্ষরত সকল পক্ষই মনে করে তারা নিজেরা ঠিক, আর অন্যেরা ভুল।

কখ : একবার গত শতকের বিশ বা ত্রিশের দশকের সঙ্গে আজকের অবস্থা তুলনা করুন, তফাৎটা বুঝবেন। তখনও পৃথিবী দাঁড়িয়েছিল যুদ্ধ আর ধ্বংসের কিনারায়। কিন্তু তখন ছিল সুখসমৃদ্ধির স্বপ্ন, শান্তির আশা, আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

রচ : ঠিক। তখন স্পেন-এ গণতন্ত্র বিপন্ন, দেশবিদেশ থেকে সমাজবিপ্লবী, কবি-লেখক-শিল্পী সেখানে ছুটছেন। চীনের আক্রান্ত মানুষের জন্য পরাধীন ভারত থেকেও গিয়েছিল মেডিক্যাল মিশন। তখন ছিলেন আইনস্টাইন-রলাঁ-রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বিশ্বপথিক, আর ছিল তাঁদের কথা ছড়িয়ে দিতে আগ্রহী মিডিয়া। পৃথিবীর বিবেক যথেষ্ট সক্রিয় ছিল।

কখ : এমনকি পঞ্চাশ-ষাটের দশকেও মিশর, কিউবা, বা ভিয়েতনাম নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে ইয়োরোপ বা আমেরিকার যুবশক্তি; অন্যায় আক্রমণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন রাসেল বা সার্ত্রর মতো লেখক বা দার্শনিকরা। বিশ্বের বিবেক তখনও চুপ থাকেনি।

রচ : আর আজ? সভ্যতার নিয়মনীতি বড় ছোট কেউই মানছে না। তেলের দুনিয়ায় কোনো ডাকাতিই বাকি রাখেনি আমেরিকা। সন্ত্রাসবাদীরাও সব নীতি বিসর্জন দিয়ে টাওয়ার গুঁড়িয়ে, লোকালয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নারী-শিশু নির্বিশেষে মানুষ মারছে। বানানো অজুহাতে ইরাকের ওপর নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমেরিকা। ধ্বংসলীলা উভয় পক্ষেই। প্রতিবাদ যতটুকু যা হচ্ছে, তাকে বিপরীত পক্ষের উসকানী বলে দাগিয়ে দিচ্ছে ধ্বংসের কারবারীরা। ফলত বিশ্বের বিবেক আজ নীরব। কিছু বললেই কারও না কারও পক্ষভুক্ত হওয়ার কলঙ্কের দাগ লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে তার গায়ে। বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের কোনো ভরসাস্থল আজ নেই; সমাজতন্ত্রের দুর্গ বলে যারা নিজেদের পরিচয় দিত, সেই রুশ বা চীনে সমাজতন্ত্রের পতাকা নামিয়ে নেওয়া হয়েছে। আজ চারিদিকে হতাশা। কোনো দিকে নেই আশার বাণী।

সোমু : তবে উন্নয়ন, শিল্পায়ন, বিশ্বায়ন --- এসব নিয়ে এক ধরনের উদ্যোগ এসেছে; উন্নয়ন কোন পথে তা নিয়ে নানারকম ভাবনা চলছে। বিশ্বায়ন এখন এক বাস্তব সত্য।

রচ : আমরা কিন্তু তার স্বরূপ বুঝে এগোনোর কথা বলছি। এই উন্নয়ন-শিল্পায়ন-বিশ্বায়নে কোনো উন্মাদনা-উদ্দীপনা নেই। লোকে পরম আবেগে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে না। তার কারণ, এই উন্নয়নের চরিত্রটা প্রাণহীন কৃত্রিম ও জড়বাদী। এই শিল্পায়ন দিশাহীন ধনবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অন্ধ দৌড়ে পরিণত হয়েছে। এতে মনুষ্যত্ব অর্জনের কোনো কথাই নেই। মানুষের মনে উদ্দীপনা সৃষ্টি দূরের কথা, এই উন্নয়ন ও শিল্পায়ন মানুষকে ধূর্ত ও ধান্দাবাজ হয়ে ওঠার প্ররোচনা যোগাচ্ছে। এই উন্নয়ন ও শিল্পায়নে যে ঝিলিক দেখছেন তা খুবই সাময়িক।

কখ : ঠিক বলেছেন। আমরা তো দেখলাম, সমাজতন্ত্রের ঝিলিক উবে যেতে মাত্র পঞ্চাশ বছর লেগেছে, এর ঝিলিক নিভে যাবে আগামী দশ-পনেরো বছরের মধ্যেই। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, বিশ্বায়নের বন্যা ঘটছে প্রকৃতির নিয়মে। কেউ সেই বন্যার ঘোলাজলে মাছ ধরতে চায়, আমরা সেই বন্যার হাত থেকে বেঁচে, পেরিয়ে যাবার উপায় খুঁজছি। ...

রচ : এখনই সবাই বুঝছেন, শিল্পায়ন নিয়ে আসছে বাজার অর্থনীতির বিশ্বায়ন, বা গোটা বিশ্বের এক বাজার হয়ে যাওয়া। চকচকে বাড়ি, রাস্তা, আর থরে থরে পশরা সাজানো দোকান --- মুষ্টিমেয় কয়েকটি দেশের সংখ্যালঘু কিছু মানুষের অতুল বৈভব আর স্থূল আনন্দমত্ততা। অন্যদিকে অন্নাভাবে বা অস্ত্রাঘাতে অগণিত মানুষের মৃত্যুর মিছিল --- এই হল বিশ্বায়নের অবদান। আর সব কিছুকে ঘিরে সন্ত্রাসের পরিমণ্ডল। প্রাণবন্ত সজীব মানুষের লীলাময় জীবনের কথা এখন ভাবাই হয় না, শাসক-শাসিত, বড়-ছোট সবাই সদাসন্ত্রস্ত। এমনকি পৃথিবীকে আবহাওয়ার দিক থেকে মানুষের বাসযোগ্য রাখার গ্যারান্টিও এ দিতে পারছে না।

সোমু : তবে উন্নয়নের প্রশ্নে প্রায় সকলেই এক মত যে, জীবনযাত্রার মানের বস্তুগত উন্নতিই উন্নয়ন। আর এ কথাও বোধগম্য যে, সেই উন্নতি শুধু কৃষিকাজের ওপর দাঁড়িয়ে হতে পারে না। শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রের বিস্তার প্রয়োজন। আজকের হাওয়া একথাই বলে।

কখ : আমি চাষি পরিবারে জন্মেছি। প্রতি বছর ধান কত হল, তা গোলায় তোলার সময় মেপে হিসেব রাখা হত বটে, কিন্তু বাবা-কাকাদের মুখে কোনোদিন শুনিনি যে তা দিয়ে আমাদের পরিবারের উন্নতি মাপা হচ্ছে। অথচ একটি জাতির উন্নতি মাপা হচ্ছে, তার 'গ্রস ন্যাশনাল ইনকাম' দিয়ে। অর্থনীতিবিদদের বুদ্ধির দৌড় তো এ পর্যন্তই। মানুষের উন্নতি মাপতে বললে এঁরা নিশ্চয়ই তার লম্বা, চওড়া, ওজন, পেশির মাপ দিয়েই বিচার করবেন।

রচ : আমার বাবাকেও আমি বাৎসরিক আয় দিয়ে পরিবারের উন্নতি মাপতে দেখিনি। জীবনযাত্রার মানের বস্তুগত উন্নতি দিয়ে মানুষের উন্নয়ন মাপা রীতিমত ত্রুটিপূর্ণ চিন্তা। আমাদের বিচারে এসব ঠিক কথা নয়, অ্যাকাডেমি-শিক্ষায় প্রোগ্রামড মস্তিষ্কের বাঁধা বুলি। সত্যকে তা দিশাগ্রস্ত করে দেয়, নেচার থেকে সরিয়ে দেয়।

সোমু : অ্যাকাডেমিকে আপনারা এত হীন ভাবেন কেন?

কখ : আমরা ভাবি না, এটা বাস্তব। আজকের অ্যাকাডেমি জানেই না তার গৌরব কোথায়,

কলঙ্কই বা কোথায়। জন্মসূত্রে সে হল সমাজের অর্জিত জ্ঞানের সুপটু 'দক্ষ' ঘরণী, তার গৌরব হল আবিষ্কৃত তত্ত্ব-তথ্যের যথার্থ রক্ষণাবেক্ষণে, যা আর কেউ পারে না। সে হল জ্ঞানের দুনিয়ার 'বেটার হাফ', মাননীয়া গৃহকর্ত্রী। তার দুর্বলতা, অধিকৃত জ্ঞানের এলাকার বাইরে গিয়ে নতুন জ্ঞানার্জন করে আনতে সে অপারগ। একাজ যাঁরা করেন, তাঁদের শিব বলে, একালের মতো করে আমরা তাঁদের নাম দিয়েছি 'প্যারা-অ্যাকাডেমিসিয়ান'। তাঁরা স্বভাবতই চলে যান অ্যাকাডেমির জ্ঞানের এলাকার বাইরে। রবীন্দ্রনাথ, আইনস্টাইন, শেক্সপীয়র, বানার্ডশ, বুদ্ধ, যিশু, মহম্মদ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ ... প্রকৃত আবিষ্কারক-স্রষ্টারা প্রায় সবাই এই 'প্যারা-অ্যাকাডেমিসিয়ান'দের দলেই পড়েন। ...

রচ : যত অতীতের দিকে যাবেন, গ্রামের দিকে যাবেন, ততই দেখবেন, এই গুরুসত্তাটি শিব-দক্ষে মিলেমিশে ক্রমশ অভেদ হয়ে গেছে, আর যত আধুনিক কালের দিকে আসবেন, দেখবেন, এই গুরুসত্তাটি ক্রমশ ফেটে গিয়ে দ্বিখণ্ডিতই হয়নি, পরস্পরবিরোধী হয়ে গেছে।

কখ : এই শিবরূপী গুরুসত্তার বিশেষত্ব এই যে, প্রচলিত জ্ঞানে এঁদের মস্তিষ্ক প্রোগ্রাম্‌ড হয়ে যায়নি। নতুন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য এঁদের প্রয়োজন। সেকালে যাঁরা সমাজকে পথ দেখাতেন, তাঁরা সবাই ছিলেন 'প্যারা-অ্যাকাডেমিসিয়ান'। এখন তাঁদের উদ্ভব নানাভাবে ঠেকান হয়। তাঁদের কাজ এখন অ্যাকাডেমিসিয়ানরাই করতে লেগেছেন। নতুন পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য গৃহকর্ত্রী স্বয়ং তাঁর অধিকারে থাকা পূর্বার্জ্জিত জ্ঞানভাণ্ডার থেকে বুদ্ধি যোগাচ্ছেন। আর, তাঁর সেই বাসী জ্ঞান দিয়ে টাটকা পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যাচ্ছে না কিছুতেই। একালের সব সমস্যার উদ্ভব সেখান থেকেই।

সোমু : এঁরা কিন্তু সবাই উন্নয়ন-শিল্পায়ন-বিশ্বায়নের পক্ষে রায় দিচ্ছেন।

কখ : দেবেনই তো। ব্রেনগুলো তো প্রোগ্রাম্‌ড হয়ে আছে। নতুন কোনো ধরনের সমাজ কাঠামোর কথা এঁরা ভাবতেই পারেন না। হয় সমাজতন্ত্র, নয় ধনতন্ত্র। তাও আবার ঠিক আগের অভিজ্ঞতা মতো। থোড়-বড়ি-খাড়া, খাড়া-বড়ি-থোড়। ...

রচ : শহরগুলো 'জটিল জীবন নির্দিষ্ট চিন্তা'র দর্শনে এবং গ্রামগুলো 'সরল জীবন মুক্ত চিন্তা'র দর্শনেও চালানো যেতে পারে, এমন দ্বৈরাজ্যিক সমাজ কাঠামোর কথা তো আজ ভাবা যাচ্ছে। আমাদের প্রস্তাবিত 'অণুবর্ষভিত্তিক সমাজকাঠামো' তো এরকমই এক দ্বৈরাজ্যিক সমাজকাঠামো। ভুল হোক ঠিক হোক, এ তো নতুন করে ভাবা। সমাজতন্ত্র পেরিয়ে ভাবা।

কখ : বিশ্বায়ন-সমর্থকদের শিল্পায়ন-উন্নয়ন কি কোনো নতুন কথা? মানব-ঝাঁকের সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষ নিজের ও সমাজের উন্নয়ন-চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যুগে যুগে তার রূপ বদলেছে।

রচ : গত একশো বছর ধরে এই 'উন্নয়ন' কথাটিকেই বলা হচ্ছিল 'প্রগতি'। তার আগে এই কথাটিই চলছিল 'রেনেসাঁস' বা 'এনলাইটেনমেন্ট' নাম নিয়ে। এখন সেই জায়গায় এসেছে উন্নয়ন-শিল্পায়ন-বিশ্বায়ন, যদিও 'প্রগতি' বা 'রেনেসাঁস'-এর বিশাল বটবৃক্ষের তুলনায় এ যেন বাজপড়া নেড়া তালগাছ। এর ডালপালা নেই, দর্শন-শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত-আবেগ-উন্মাদনা কিছুই নেই, 'প্রগতি'-'রেনেসাঁস'-এর যা ছিল।

কখ : আমাদের পৌরাণিক যুগে এই 'উন্নয়ন' কথাটি বলা অন্যভাবে — 'রাজার পুত্র নাই, পুত্র চাই।' কিংবা পরে, হর্ষবর্দ্ধনের যুগটাই ধরুন। তাঁর পূর্বসূরীর দুটো নাম শোনা যায় — 'প্রভাকরবর্দ্ধন', একালে যাকে বলা হয় 'এনলাইটেনমেন্ট'; আর 'গোবর্দ্ধন', একালে যাকে বলা হয় 'উৎপাদন-বৃদ্ধি' বা 'উন্নয়ন' অর্থাৎ পণ্যবৃদ্ধি। পণ্যবৃদ্ধি অত্যন্ত বেশি হয়ে গেলে নতুন বাজার বা অনুগত দেশ চাই। তাই প্রভাকরবর্দ্ধনের ছেলে 'রাজ্যবর্দ্ধন', একালে যাকে বলা হয় 'ইমপিরিয়ালিজম' — এসব কি 'উন্নয়ন'-এরই নানা রূপ নয়? এর ফলে কি মানুষের 'হর্ষবর্দ্ধন' হয় না, 'রাজ্যশ্রী' ফিরে আসে না? মার্কস কথিত 'পুঁজির এনসিয়েন্ট ফর্মে'-ই আমরা ভারতীয়রা এই পথ পেরিয়ে এসেছি।

রচ : কিংবা আমাদের বাংলার 'গোপাল', তার পুত্র 'ধর্মপাল', পৌত্র 'দেবপাল' — এঁরা কারা? বর্দ্ধন ও পালদের নামের এই পারম্পর্য কি অর্থহীন? আমাদের পূর্বসূরী সেকালের জ্ঞানীগুণীরা রাজার নামকরণ সেই ব্যক্তির নাম দিয়ে করা বোকামী বলে মনে করতেন। যে 'গো (পণ্য) পালন'কারী শক্তি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল তাকে তাঁরা তার ক্রিয়ানুসারেই চিনে নিয়ে তার নামকরণ করেছিলেন 'গোপাল'। শব্দার্থের গভীরে গেলে যে-কেউ টের পাবেন, দেবপালে আর পণ্যবর্দ্ধনে কোনো ভেদ নেই। রাজা-রাণীদের এই নামকরণ-পদ্ধতি মোগল আমল পর্যন্ত কমবেশি চলেছে।

কখ : সবচেয়ে বড় কথা, প্রতিটি বৈপ্লবিক যুগের হাতে শিল্প-সাহিত্যের এক মহা-উদ্ভাবনযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় এবং তার ফসল জমা হয় মানবসভ্যতার অর্জনের ভাণ্ডারে। রেনেসাঁসের হাতে কী বিপুল মানসসম্পদের উদ্ভব ঘটেছিল তা সবাই জানেন। 'প্রগতি'র হাতও শূন্য ছিল না। আমাদের দেশে সেই মহা-উদ্ভাবনযজ্ঞের সাক্ষ্য দেয় বৌদ্ধযুগ বা কালিদাসের কাল এবং পাল-পরবর্তী বাংলায় কৃত্তিবাস-কাশীরাম, মঙ্গলকাব্য ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের কাল। এই ধারা রাধাকৃষ্ণের নবরূপায়ণ পেরিয়ে মুসলিম পদকর্তাদের রসসাহিত্য ও মুর্শিদীয়ার আশিক-মাশুক পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে। আজকের এই বিশ্বায়নের কাল সে তুলনায় বন্ধ্যা।

সোমু : ইয়োরোপের ইতিহাসেও দেখছি 'এনলাইটেনমেন্ট', 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন', 'ইম্পিরিয়ালিজম' এগুলোও ঠিক পর পর এসেছিল। আপনাদের কথা অনুসারে ভারতেও সেভাবে এসেছিল। কিন্তু তার উত্তরাধিকার কোথায় গেল?

রচ : আমাদের দেশে পুরো অগ্রগতিটি ঘটেছিল পুঁজির প্রাচীন রূপের মধ্যে থেকেই। রামরাজত্ব পুঁজির প্রাচীন রূপের শিল্পবিপ্লব বই অন্য কিছু নয়। অশোকের হাত ধরে তার সূত্রপাত, হর্ষবর্দ্ধনের হাতে (৬৫০ খ্রিস্টাব্দে) তার সমাপ্তি। কিন্তু অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের নেতারূপে বাংলা তার পরবর্তী অধ্যায়েও হাত লাগিয়েছিল। সেই অধ্যায়টি হল পুঁজির প্রাচীন রূপের ভেতরেই ব্ল্যাকমানি পর্যন্ত পৌঁছোনো। সেই অধ্যায়ে আমরা পাই বাংলার গোপাল-ধর্মপাল-দেবপালকে (৭৫০-৮৫০ খ্রিস্টাব্দ)। তারই ফসল অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গের রাধাকৃষ্ণলীলা ও তৎসংশ্লিষ্ট সংস্কৃতি। নিশ্চয় জানেন, ব্যাসের মহাভারতে রাধার চিহ্ন পর্যন্ত নেই। নগদ-নারায়ণ তার রাধাকৃষ্ণ রূপ পেয়েছেন বাংলাভাষীর হাতে। পাঠান রাজত্বের ছত্রছায়ায় তা পুনর্নবীকৃত হয়ে সম্পূর্ণতা

পেয়েছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে। মুসলিম পদকর্তারা তারই ইসলামীকরণ করেছেন সুফিতত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে-মিশিয়ে। মুজতবা ঠিকই বলেছেন, ধর্ম বদলালেও জাতির চরিত্র বদলায় না।

পা-১ : পুঁজির প্রাচীন রূপের ভিতরেই ব্ল্যাকমানির অধ্যায় পেরোনোর মানে কী?

রচ : পুঁজির বিকাশ রাষ্ট্রের ক্ষমতার চেয়ে বেশি হয়ে গেলে, রাষ্ট্র তাকে আটকায়। লাভ, উৎপন্ন, সবকিছুর উপর তখন সে অধিকার দাবি করে। এরই নাম ইনকাম ট্যাক্স ইত্যাদি। অথচ পুঁজির এই বৃদ্ধিতে রাষ্ট্রের কোনো অবদান নেই। এভাবে রাষ্ট্র পুঁজিকে বাড়তে বাধা দেয়। এরপরও পুঁজি নিজের নিয়মে রাষ্ট্রকে উপেক্ষা করে বাড়ে, লোকে ট্যাক্স না দিয়ে সেই পুঁজির মালিক হয়। রাষ্ট্রের চোখে সেটিই ব্ল্যাকমানি। আমরা অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গবাসীরা পুঁজির প্রাচীন রূপে এই অধ্যায় পেরিয়েছি, পুঁজির আধুনিক রূপেও এই অধ্যায় পেরিয়েছি, পেরোচ্ছি।

সোমু : আমরা কিন্তু আমাদের আলোচনা থেকে অনেক সরে যাচ্ছি। আমি মানুষের জীবনযাত্রার বস্তুগত উন্নতির কথা পেড়েছিলাম। ...

রচ : 'জীবনযাত্রার মানের বস্তুগত উন্নতি'কেই মানুষের বা তার সমাজের 'উন্নয়ন' বলে মনে করা এশিয়ার তথা ভারতের মূল ধর্মের বিরোধী। যণ্ডাগুণ্ডা চেহারা যার তাকেই উৎকৃষ্ট মানুষ ('quality people') বলে না। এটি এমনকি ইয়োরোপীয় মননেরও ফসল নয়, সম্পূর্ণতিই মার্কিন। আর, আমাদের মাটির ধর্মই হল 'সরল জীবন ও মুক্তচিন্তা', লোকে যাকে বলে 'প্লেন লিভিং অ্যান্ড হাই থিংকিং'। বাহ্য ফললাভ বা বস্তুগত উন্নতিকে আমাদের মাটি তৃতীয় স্থান দিয়েছে বহু প্রাচীন কাল থেকেই। আজ সারা পৃথিবী বাহ্য-ফললাভকেই মানবসভ্যতার অস্তিত্বের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে ভাবতে লেগেছে। আমাদের মাটি এ ধারণার ঘোর বিরোধী।

কখ : রবীন্দ্রনাথ তো বলেই গেছেন — 'বাহ্য ফললাভই যে চরম লাভ, এ কথা সমস্ত পৃথিবী যদি মানে তবু ভারতবর্ষ যেন না মানে — বিধাতার কাছে এই বর প্রার্থনা করি।' আমাদের দুঃখ এই যে, রবীন্দ্রনাথের এই কথাটির অর্থ যাঁরা বুঝতেন, তেমন দেশনেতার সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে; যদিও দেশের সাধারণ মানুষের মন থেকে এখনও 'টাকার কুমীর' হওয়ার প্রতি ঘৃণাকে খুব-একটা কমানো যায়নি।

রচ : সভ্যতার মাপজোক করার কাজটি মার্কিন-প্রভাবিত অ্যাকাডেমির হাতে চলে যাওয়ায় আমাদের শিক্ষিত ছেলেমেয়েদেরও মনে হচ্ছে 'জীবনযাত্রার মানের বস্তুগত উন্নতি' হলেই মানুষের উন্নয়ন বা জাতির উন্নয়ন হয়। হাত-পা রোগা-প্যাটকা হয়ে যাক, আমরাও চাই না, কিন্তু তাই বলে পেশীবান মানুষকে বড়মানুষ বলতে পারি না। মানুষ ক্ষুধার্ত থাকুক, তা কেউই চায় না; কিন্তু ধনবান হলেই সে বড়মানুষ হয়ে গেল, একথা কে মানবে!

কখ : মোটকথা আমরা বাহ্য ফললাভের বিরোধী নই, কিন্তু তাকেই চরম, পরম ও একমাত্র করে তোলার ঘোর বিরোধী। আমরা ব্যক্তিগত জীবনে 'সরল জীবন ও উচ্চ চিন্তা'র সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনমান চেয়েছি, তাই যাপন করে চলেছি। তার চেয়ে বেশি কখনো চাইনি।

রচ : আমরা শিব ও শক্তি দুজনকেই মানি এবং তাদের আরাধনা করি, কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে শিবের সাধনাকে স্থান দিই শক্তিসাধনার আগে, আবার ক্ষেত্রবিশেষে উলটোটাই করি। পুঁজির

উপাসনাকে আমরা নস্যাৎ করি না, তাকে জ্ঞানসাধনার পরে স্থান দিই। পুঁজির উপাসকদের আমরা লক্ষ্মীসাধনার পরামর্শ দিই, তাঁদের কুবেরসাধনায় আপত্তি করি। কেননা, আমরা জেনেছি, কুবেরসাধনায় কেবল তাঁদেরই ক্ষতি হবে না, সমগ্র মানবসমাজের তথা সারা বিশ্বব্যবস্থার ক্ষতি হয়ে যাবে। আমরা বলি — সাধু, সাবধান।

পা-৩ : কুবেরসাধনা কীরূপ ব্যাপার?

পা-১ : আপনি 'বাংলাই বিশ্বকে পথ দেখাতে পারে' নিবন্ধটি পড়েননি? তাতে আছে। ...

৩

সোমু : প্রায় গোটা পৃথিবীই আজ এক ধরনের কাঠামো অনুসরণ করছে। সেটি হল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুক্ত বাজারনীতি, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বহুদলীয় গণতন্ত্র, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মুক্তচিন্তার বিস্তার ও জনকল্যাণে অসরকারি সংস্থার প্রসার। ...

রচ : আমার আপত্তির গোড়াটা ওখানেই। সমগ্র মানবসমাজকে এই যে 'ত্রিপুরে' বন্দী করা হচ্ছে, এ তো ভয়ানক ব্যাপার! রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বললে বলতে হয়, যদি কোনো বিশেষ মতবাদ "সমস্ত দেশকে কোনো একটা ধ্রুব আদর্শে বাঁধিয়া ফেলিতে চায়, তখন তাহাকে 'জাতীয়' বলিতে পারিব না; তাহা সাম্প্রদায়িক, অতএব জাতির পক্ষে তাহা সাংঘাতিক।"

কখ : সোমনাথ যেরকম বলছেন, কার্যত কিন্তু সেরকমও হচ্ছে না। আজকের গোটা পৃথিবীই একধরনের দ্বিচারী সামাজিক কাঠামো অনুসরণ করছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুখে মুক্ত বাজার অর্থনীতি, পেটে কর্পোরেট পুঁজির একাধিপত্য; রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুখে বহুদলীয় গণতন্ত্র, পেটে এমন একধরনের কট্টর মৌলবাদিতা যে বর্তমান রাজনৈতিক কাঠামো ছাড়া আর কোনোরকম কাঠামো হতেই পারে না; সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মুখে মুক্তচিন্তার বিস্তার, পেটে অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রামড্ চিন্তার একাধিপত্য। মুখে এক, পেটে আর — এই দ্বিচারিতার স্পষ্ট নিদর্শন আজকের 'উন্নয়ন-শিল্পায়ন-বিশ্বায়ন'। আজকের 'উন্নয়ন'-এর গোটা পরিকল্পনাটাই কুবেরের হাত ধরে এগোচ্ছে, লক্ষ্মীর সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই বললেই চলে।

রচ : আর সেজন্যই এই উন্নয়ন-শিল্পায়ন-বিশ্বায়নের হাতে নতুন পৃথিবী গড়ার নতুন কল্পনা নেই; নতুন স্বপ্ন তুলে ধরার সাহস পর্যন্ত নেই। আপনি রতন টাটার কথা ছেড়ে দিন, সে তো ভারতীয় বৈশ্যের এক অকুলীন উত্তরাধিকারী মাত্র। তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি পুঁজির শক্তি যাদের রয়েছে, সেই সিলিকন-ভ্যালির দেবেন্দ্রদের জিজ্ঞেস করে দেখুন — 'আগামী প্রজন্মের জন্য সুন্দর এক বিশ্ব'-এর কোনো সম্ভাব্য মডেল বা পরিকল্পনা তাঁদের আছে কি, যা বাস্তব হোক না হোক, অন্তত বুদ্ধি-যুক্তি-কল্পনা দিয়ে যেখানে পৌঁছানো যায়? জিজ্ঞেস করুন একালের কোনো দেশনেতাকে? তার কাছে কি কোনো নতুন মডেল আছে?

সোমু : না, তেমন কোনো বিকল্প স্বপ্ন, তত্ত্ব বা ইউটোপিয়াও এখন আর নেই। অথচ আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি, ইউটোপিয়া ছাড়া, স্বপ্ন ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না।

কখ : এইখানে আমাদের বাংলার মনের মাটি আমাদের শক্তি যোগাচ্ছে, আর সে শক্তির

সন্ধান আমরা পেয়েছি বাংলার ভাষা-সংস্কৃতি-ইতিহাস থেকে, উত্তরাধিকার থেকে ...

রচ : আমাদের বাংলার মানুষের মনের মাটির বিশেষত্ব কোথায়, তা যদি একটু গুরুত্ব দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেন, আপনি অবাক হয়ে যাবেন। ভাষা, সংস্কৃতি উভয় দিক থেকেই এই মাটি একেবারেই অন্য চরিত্রের। জ্ঞানের রসবোধ বা ভাষাবোধ, ধনের রসবোধ বা পুঁজিবোধ, এবং রসনার রসবোধ বা বাহ্যরসবোধ — এই তিন ক্ষেত্রেই তার অর্জন সমস্ত জাতির তুলনায় বেশি। সবচেয়ে বড় কথা তার বোধে মানবজাতির আগা-গোড়া পুরোটাই বিদ্যমান।

কখ : নদীর উৎসে জলের যে স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক গুণ থাকে, প্রবাহের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে থাতাপাতা-নোংরা-পলি মিলেমিশে ক্রমে তা কলুষিত হয়। নদীর কোনো মোড়ে সেই কলুষকে ডেকে নিয়ে জলকে সংস্কার করার কোনো ব্যবস্থা করা গেলে সে জল পুনরায় তার স্বরূপ ফিরে পেতে পারে। নদীপ্রবাহের ক্ষেত্রে না হলেও ভাষাপ্রবাহের ক্ষেত্রে মানুষ তা করতে পেরেছিল। বাংলাভাষার গৌরব এই যে, সে দু'বার সংস্কৃত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে। আমাদের ভাষাগুলি সে সৌভাগ্য লাভ করেছে মাত্র একবার; আর বাকি পৃথিবীর কোনো ভাষাই কখনো সেভাবে সংস্কৃত হওয়ার সুবিধে পায়নি।

গঘ : অপরদিকে, পুঁজির 'এনসিয়েন্ট ফর্ম' তার আদি মীন-অবতার (mine) রূপ থেকে কৃষ্ণ অবতার (black-money) রূপ পর্যন্ত, সব রূপগুলিতে বিকাশ লাভ করেছিল আমাদের অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে। পুঁজির এরকম আগাগোড়া বিকাশ পৃথিবীর আর কোনো দেশে হয়নি।

ঙচ : সেই বাংলা আজ জ্ঞানের ও ধনের অর্থাৎ ভাষার ও পুঁজির আধুনিক রূপের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর স্বভাবতই তার স্বরূপে জ্ঞান ও ধনের সম্পূর্ণ প্রতিফলন হচ্ছে এবং, আমার মনে হয়, তার মাধ্যমে মানবসভ্যতার এক নবজন্মের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ...

ছজ : বাংলার সে-মাটিকে যাঁরা চিনতেন তাঁদের একজন সৈয়দ মুজতবা আলী। তাঁর মতে :

> "... অন্যান্য আর্যদের তুলনায় বাঙালী কিছুমাত্র কম সংস্কৃত চর্চা করে নি, কিন্তু সে-চর্চা সে করেছে আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে। আদিশূর থেকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সকলের বহু চেষ্টাতেও বাঙালী উত্তর ভারতের সঙ্গে স্ট্রীমলাইনড্ হয়ে সংস্কৃত পদ্ধতিতে সংস্কৃত বর্ণমালার উচ্চারণ করে নি এবং বাঙলাতে সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণ করার সময় তো কথাই নেই।
>
> বাঙালীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টি তার পদাবলী কীর্তনে। এ সাহিত্যের প্রাণ এবং দেহ উভয়ই খাঁটি বাঙালী। এ সাহিত্যে শুধু যে মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ বাঙলায় খাঁটি কানুরূপ ধারণ করেছেন তাই নয়, শ্রীমতী শ্রীরাধাও যে একেবারে খাঁটি বাঙালী মেয়ে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ভাটিয়ালির নায়িকা, বাউলের ভক্ত, মুর্শীদীয়ার আশিক ও পদাবলীর শ্রীরাধা একই চরিত্র একই রূপে প্রকাশ পেয়েছেন।
>
> বাঙালীর চরিত্রে বিদ্রোহ বিদ্যমান। তার অর্থ এই যে, কি রাজনীতি, কি ধর্ম, কি সাহিত্য, যখনই যেখানে সে সত্য শিব সুন্দরের সন্ধান পেয়েছে তখনই সেটা গ্রহণ করতে চেয়েছে; এবং তখন কেউ 'গতানুগতিক পন্থা', 'প্রাচীন ঐতিহ্য'-এর দোহাই দিয়ে সে প্রচেষ্টায় বাধা দিতে গেলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। এবং তার চেয়েও বড় কথা, — যখন সে বিদ্রোহ উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হতে চেয়েছে, তখন তার বিরুদ্ধে আবার বিদ্রোহ করেছে।

এ বিদ্রোহ বাঙালী হিন্দুর ভিতরই সীমাবদ্ধ নয়। বাঙালী মুসলমানও এ কর্মে পরম তৎপর। ধর্ম বদলালেই জাতির চরিত্র বদলায় না।"

পা-১ : কথাগুলি শুনতে অদ্ভুত লাগছে, মুজতবার এরূপ অভিমত ছিল জানতাম না। কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশের দিকে তাকালে মুজতবার আলীর কথাগুলি সত্যি বলে মনে হয়।

পা-২ : একজন মানুষের মনের মাটির চরিত্রই আমরা ঠিকঠাক বুঝতে পারি না, সেই জাতিটির মনের মাটির চরিত্র বুঝতে পারা কি সহজ কাজ!

রচ : খুব কঠিনও নয়। মার্কসসাহেব যাকে বলেছেন 'পুঁজির প্রাচীন রূপ', সেই রূপের সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটেছিল অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গে অর্থাৎ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায়। নগদ নারায়ণের কৃষ্ণরূপের (black money-র) সন্ধান পেয়ে তার আরাধনা বাঙালি করে নিয়েছিল তার ইতিহাসের 'গোপাল-ধর্মপাল-দেবপাল' অধ্যায়েই। সেই কৃষ্ণ-আরাধনা বৈদিক ভারতে, এমনকি রামরাজত্বেও নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু বাংলার মাটি তাঁর পরিপোষণে দ্বিধা করেনি।

কখ : কিংবা গোপালের নবনীত ও গোজাত গোরোচনার নানা রূপের বিকাশের কথাই ধরুন। আমাদের পূর্বপুরুষেরা গোদুগ্ধকে কেবল নবনীত ও ছানায় রূপান্তরিত হতেই দেখেননি, সামাজিক উৎপন্নকে সারপ্লাস ভ্যালু থেকে ব্যক্তিগত ডিভিডেন্টে রূপ পেতেও দেখেছিলেন। ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবোধ আমাদের জানায় 'নবনীত' ও 'ছানা' শব্দদুটি একই সঙ্গে যথাক্রমে সারপ্লাস ভ্যালু ও ডিভিডেন্টকেও বোঝায়। আর, কৃষ্ণরূপে নগদ নারায়ণ তো ননীচোরাই! ... সেই ছানা খাওয়া বৈদিক ভারতে নিষিদ্ধ ছিল, আর বাংলায় তা সবরকমভাবে গ্রাহ্য ও প্রিয় হয়ে উঠেছিল। কেবল তাই নয়, সেই ছানা রসগোল্লায় রূপান্তরিত হয়ে বলতে গেলে বাঙালির 'জাতিচিহ্নে' উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

পা-৩ : ছানা খাওয়া সারা ভারতেই নিষিদ্ধ ছিল? জানতাম না তো! আমাদের ভাষা সত্যিই অত্যন্ত রহস্যময়।

কখ : যতক্ষণ ইয়োরোপের চশমা আমাদের চোখে লেগে থাকে ততক্ষণ রহস্যময়। কিন্তু যে মুহূর্তে আপনি সেটি ত্যাগ করবেন, দেখবেন আমাদের ভাষা-সংস্কৃতি-ইতিহাস আদৌ রহস্যময় নয়; খুবই সিধেসাধা। আমাদের ভাষা-সংস্কৃতি-ইতিহাস থেকে আজ আমরা সেই শক্তি পাচ্ছি, যা দিয়ে কেবল বাংলাভাষীর জন্য নয়, ভারতবাসীর জন্য নয়, সমগ্র বিশ্বজগতের সমস্ত অস্তিত্বের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশের স্বপ্ন দেখতে পারি এবং সেই স্বপ্নের কথাই এই গ্রন্থে বলার চেষ্টা করেছি আমরা। কতটুকু পেরেছি, সে বিচারের ভার আমাদের নয়।

পা-১ : হ্যাঁ, আপনাদের এই গ্রন্থ আর কিছু করতে পারুক না পারুক, অন্তত একটা ইউটোপিয়া আমাদের উপহার দিয়েছে। কিন্তু ইউটোপিয়া ইউটোপিয়াই। তা বাস্তব হয় না।

পা-২ : আমার মনে হয় ইউটোপিয়াই হোক আর কল্পনাই হোক, একটা চেষ্টা থাকলে, একটা স্বপ্ন থাকলে, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা চললে মানুষ আজ না হোক কাল একটা সুরাহা খুঁজে পেতে পারে। কিন্তু ভাবনাটাই যদি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে সুরাহার কোনো রাস্তাই থাকে না। অবাস্তব স্বপ্ন হলেও, এটুকুই বলার সাহস জোটানো আজকাল ক্রমশ অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সোমু : আমি কিন্তু ইউটোপিয়া ও ইউটোপিয়ানদের শ্রদ্ধা করি।

রচ : সাহসের উৎসের কথা আমি বলছি। একথা ঠিক, পৃথিবীর কোনো শ্রেষ্ঠ বিদ্যাঙ্গনে কাজ করার সুযোগ আমাদের ঘটেনি। তবু এত বড় ভাবনা আমাদের মাথায় এল কী করে? কারণ খুব জটিল কিছু নয়। প্রাচীন ভারতের ভাষাতত্ত্বকে সাধ্যমত পুনরুদ্ধার করতেই আমরা এক মহত্তম শক্তির সহায়তা লাভ করি। সেই অর্জনকে আজকের বিদ্যার সঙ্গে মিলিয়ে, তার জোরে পশ্চিমী ভাবনার ছক থেকে আমরা বার হয়ে আসতে পেরেছি। এখানেই আমরা মুক্তির প্রথম স্বাদটি পাই। ... আমাদের মনে হয়েছে, সমকালের মানবসভায় আমাদের বক্তব্য পেশ না করলে নিজেদের বিবেকের কাছেই আমাদের ছুটি নেই। সবচেয়ে বড় কথা, আমরা খালি হাতে জগতের সামনে দাঁড়াইনি। আমাদের সাহসের উৎস এই।

৪

রচ : আপনি জানেন, আমরা সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে দূরে সরে থাকা মানুষ। অনেক বছর ধরে সাধারণভাবে মানবভাষা ও বিশেষভাবে দেশীয় ভাষার অনুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে আমাদের দিন কাটছে, যে কাজের কেন্দ্রে এখন আমাদের 'ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থকোষ'; আমাদের দিন কাটছে এই কোষ সংকলনের কাজে। তাই আমাদের সময়ের অভাব ঘটছে। তার ওপর আমাদের রয়েছে আয় ও আয়ুর বাধা। তবুও আমরা কখনো কখনো নিবন্ধাদি লিখছি এবং তা কেবল তখনই, যখন সেরকম কিছু লেখার কারণ ঘটছে।

পা-৩ : সে কীরকম?

কখ : শব্দার্থকোষ সংকলনের কাজ করতে গিয়ে, এক-একটি শব্দের ভিতর থেকে যে-ইতিহাস বেরিয়ে আসছে, তা একই সঙ্গে আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে বর্তমানকে আরও স্পষ্টভাবে বুঝবার উপায়, দেখিয়ে দিচ্ছে বর্তমানের নানা সমস্যা সমাধানের উপায়।

রচ : যেমন ধরুন, যখন গ্রামসমাজের প্রকৃত ধারণাটি আমাদের হাতে এল 'কৃর্ম্ম' শব্দের মূল উদ্ধার করতে গিয়ে, তখনই কলিম খান লিখলেন 'অপরের সন্ধানে' নিবন্ধটি। এভাবেই 'তর্পণ', 'ব্রহ্ম' ... প্রভৃতি এক-একটি শব্দ, 'আকাশ ভেঙে পড়া', 'আঙুল ফুলে কলাগাছ' ... প্রভৃতি এক-একটি বাক্‌মাণিক আমাদের সামনে এক-একটি দিগন্ত খুলে দিয়েছে এবং আমরা তার আনন্দের দোলা সামাল দিতে তাকে নিবন্ধাকারে বেঁধে-বুঁধে প্রকাশ করে নিজেদের ব্রহ্মবিহারের নৌকাকে খানিকটা হাল্কা করার চেষ্টা করেছি।

কখ : এই কারণে আমাদের রচনাগুলিকে কালানুক্রমিক পাঠ করা দরকার। কারণ, প্রথমদিকে এমন বহু কথা পাঠকপাঠিকারা পাবেন, পরে ঠিক তার উলটো কথা বলা হয়েছে কিংবা বক্তব্য আগের তুলনায় বদলে গেছে বা অনেক স্পষ্ট হয়েছে। কারণ অনুসন্ধান করতে করতে, পড়তে পড়তে, জানতে জানতে আমরাও তো বদলাচ্ছি। তাই আমাদের লেখাও বদলে যাচ্ছে। নিঃসন্দেহে যত দিন গেছে এবং যাচ্ছে আমাদের ভাবনা পরিণত হয়েছে, হচ্ছে। আমাদের সমস্ত নিবন্ধাদি সম্পর্কেই একথা খাটে।

পা-১ : ধর্মের ব্যাপারে আপনাদের মতামত কি বদলেছে?

রচ : না। অতীতে যে সব আদর্শ মানুষকে পথ দেখিয়েছে সেগুলি তো ধর্মই। ধর্মের ভাবাদর্শ দিয়ে সমাজ তথা রাষ্ট্রের রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে বারেবার। নিঃসন্দেহে সে চেষ্টাগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই ধর্মভিত্তিক পরিকল্পনা ও উদ্যোগ বিশেষ বিশেষ দেশ ও কালে বড় রকমের সৃষ্টি ও রক্ষার কাজ করে গেছে। ধর্মের সেই গৌরবকে আমরা সম্মান দিতে ভুলি না।

কখ : কিন্তু কালধর্মে সেই সব আদর্শ গতিশীলতা হারিয়েছে আর নানা প্রতিষ্ঠানের কুক্ষিগত হয়ে পড়েছে। তবে প্রতিটি সামাজিক আদর্শের যা চরিত্র — উদ্ভবকালে বৈপ্লবিক, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর ক্রমে একই কর্মের পুনরাবৃত্তিকারী মৌলবাদী হয়ে পড়া — এই অমোঘ বিধান কেউই লঙ্ঘন করতে পারেনি, পারবেও না কোনোদিন। ধর্মগুলিও পারেনি, পারেনি মার্কসবাদ, গান্ধীবাদ প্রভৃতি সামাজিক মতবাদ, এমনকি অর্থনৈতিক মতবাদগুলিও। তবুও তাদের উদ্ভবকালের গৌরবজনক অর্জনগুলি মানবজাতির অর্জন। তার মূল্য চিরকালীন।

পা-৩ : কথাটি নিশ্চয় আপনাদের অবিকল্পসন্ধানের ক্ষেত্রেও খাটবে। আপনারা যা-সব সাপ্লাই দিচ্ছেন, কালে কালে তা-সব মিলে একটি মতবাদ হয়ে উঠতে পারে। সেও নিশ্চয় উদ্ভবকালে বৈপ্লবিক এবং ক্ষমতাদখল করলে মৌলবাদী হয়ে পড়বে।

কখ : ঠিক ভেবেছেন। এর অন্যথা হওয়ার কোনো উপায় নেই। অন্যথা হতে পারে কেবল তখনই, যখন পৃথিবীতে দেহহীন মানুষের আবির্ভাব ঘটবে। সেরকম যতদিন হচ্ছে না, ততদিন এ-মরজগতে প্রতিটি সামাজিক তত্ত্বের উদ্ভবকালে বৈপ্লবিক এবং প্রতিষ্ঠানভুক্ত হওয়ার পর মৌলবাদী হয়ে পড়ার অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়মের হাত থেকে রেহাই নেই। বাঁচার একটি মাত্র পথ — নতুনকে আশকারা দেওয়া ও লালন করার রীতিটি চালু রাখা।

রচ : বিশ্বব্যবস্থার মহাকল্পের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যে অবিকল্পের কথা আমরা ভেবেছি, মানুষের সমাজে তার বহু রূপ। আমরা মানবসমাজের কাঠামো বিষয়ে আপাতত যে অবিকল্পের কথা বলেছি তাকে নাম দেওয়া হয়েছে 'অণুবর্ষভিত্তিক সমাজকাঠামো'। আগে যাকে আমরা 'ত্রিপুর' বললাম, তার থেকে বেরিয়ে আসার এটা একটা উপায়।

কখ : গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মতো বিগত ও প্রচলিত সময়ের বিকল্প-সমাজকাঠামোর মডেলগুলির গুণাগুণ পর্যালোচনা থেকে এর পরিকল্পনা উঠে এসেছে।

রচ : সমাজতন্ত্র সকল মানুষের অন্ন-বস্ত্র-আচ্ছাদন বা জীবনধারণের ন্যূনতম চাহিদার দিকে নজর দিয়েছে বটে, কিন্তু মানুষের মনের তৃপ্তিকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দেয়নি। গণতন্ত্র মানুষের মনকে গুরুত্ব দিলেও পার্টিপ্রথা ও গোপন ব্যালটপ্রথার দরুণ নিজেকে কার্যকরী করে তুলতে পারে না, এমনকি মানুষের জীবনের ন্যূনতম চাহিদা মেটানোর নিশ্চয়তাও দিতে পারে না।

কখ : দুটি আদর্শই আর একটি প্রশ্নকে এড়িয়ে গেছে — সমাজের নেত্র বা চোখ। অন্য কথায় 'নেতৃস্থানীয়'দের অবশ্যই কী কী গুণসম্পন্ন হতে হবে, সেবিষয়ে তারা মাথা ঘামায়নি।

রচ : আরও বড় কথা, দুটি আদর্শই এই মূলকথাটি ভুলে গেছে যে — মানবসমাজ বিশ্বশরীরের একটি ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। গোটা শরীরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা না করে মানবসমাজের

যে কোনো পদক্ষেপ তার অস্তিত্বের পক্ষেই বিপজ্জনক হতে পারে। ... আমরা বিচ্ছিন্নভাবে সমাজ বা রাষ্ট্রের পুনর্গঠনের কথা বলি না। আমরা বিশ্বাস করি, খণ্ড খণ্ড ভাবে বিচার, সংস্কার বা প্রতিকারের রাস্তায় মুক্তি নেই। সেজন্য আমরা মানুষের শিক্ষা বা নতুন মানুষ তৈরির পরিকল্পনা নিয়ে এত ভেবেছি এবং রাষ্ট্রিক তথা সামাজিক পুনর্গঠন নিয়েও আমাদের কল্পনা পাঠক সাধারণের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমরা ভাবি না যে, আমরা শেষ কথা বলছি। আমরা যতদূর পর্যন্ত দেখেছি, ততদূর পর্যন্ত আলোচনায় এনেছি। নিত্য পরিবর্তন এবং নিত্য সংশোধনের রাস্তা খোলা রাখা অবশ্যকর্তব্য বলেই আমরা মনে করি।

পা-১ : বাংলাই সারা পৃথিবীকে পথ দেখাবে, এত বড় ভাবনা, এত বড় কথা, শুনতে ভাল লাগলেও, ভাবতে রীতিমত অস্বস্তিবোধ হচ্ছে।

রচ : মানবদেহের প্রতিটি কোষের ভিতর একটি সমগ্র দেহের সম্ভাবনা সুপ্ত আকারে থেকে যায়, এটি আধুনিক বিজ্ঞান স্বীকৃত সত্য। তেমনি সমাজদেহেরও প্রতিটি অংশেই থাকে একটি সমগ্র সমাজের সম্ভাবনা। ... বাঙালির সম্বন্ধেও এই ভাবে বিশেষ বিচার চলে।

কখ : গোখলে যখন বলেছিলেন 'What Bengal thinks today, the rest of India thinks tomorrow', তখন তিনি বাঙালির অগ্রণী ভূমিকার দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন।

রচ : বাঙালির এই অনন্যতা কিছুটা আঁচ করতে পারেন অনেকেই। তথাকথিত আর্যাবর্তের বর্ণাশ্রমপন্থী বৈদিক ধারার বিরুদ্ধে বঙ্গদেশে বিকাশলাভ করেছিল বর্ণাশ্রমবিরোধী (অর্থাৎ জাতিভেদ-বিরোধী) বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক সংস্কৃতি। সেই কারণে ভারতে যাঁরা ইসলামকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন তার অনুপাত সবচেয়ে বেশি এই বঙ্গদেশে।

কখ : সেকারণেই শুধু হিন্দু এবং মুসলিম দুই সমাজের মধ্যবর্তী এলাকায় আউল-বাউল প্রভৃতি ধারার উদ্ভব হয়েছিল তাই নয়, এই সমন্বয়ের পরোক্ষ ফলেই বলা চলে দেশীয় সংস্কৃতির মধ্যেও নানা রকম নতুন রসের সঙ্গীত ও সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল।

রচ : ঠিক ঐ সময়ে বাঙালির মনীষার প্রকাশ ঘটেছিল নব্যন্যায়ের বিকাশে এবং একই সঙ্গে ভাষার জগতে প্রাচীন রীতির পুনরুজ্জীবন ও নবীকরণে। আবার ইতিহাসের বিধানে পশ্চিমের সংস্কৃতির অভিঘাতও ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি করে পড়েছিল কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালির ওপর। বাঙালির কাছ থেকে ইংরেজ শাসকও প্রথম পায় ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা, পরে পায় সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা। এই পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মহাপুরুষদের মধ্যে বাঙালি মনীষার অনন্য স্ফুরণ। ওপার বাংলায় বাংলাদেশ সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ পেল বাঙালির স্বাতন্ত্র্যবোধ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের আকাঙ্ক্ষা।

কখ : আবার ঘরকুনো ও শ্রমবিমুখ বলে বাঙালির অপবাদ ঘুচে গেল এযুগে বাঙালির বিশ্বজোড়া বিস্তার বা ডায়াস্পোরার মধ্যে ও তথ্যপ্রযুক্তিতে অসামান্য দক্ষতা অর্জনের মধ্যে। এই বাঙালির ভিতরেই আজকের আমেরিকা দেখতে পায় 'বিগ্ বেঙ্গলি'কে।

রচ : সম্প্রতি 'বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল' (Special Economic Zone = SEZ) বা 'সেজ' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মার্কসবাদের নবরূপায়ণের চেষ্টা ও তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ দুইয়ের

মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেল বাঙালির প্রাণবন্ত সত্তা। শিল্প বিজ্ঞান বিদ্যাচর্চা নানা ক্ষেত্রেই বাঙালির সৃষ্টিশীলতা প্রমাণিত হচ্ছে।

কখ : বাঙালির ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে প্রাচীন উত্তরাধিকারের সজীবতা ও একালের অর্জনের তীব্রতা — দুইই ইতিহাসের সৃষ্টিতে বাঙালিকে এক অনন্য ভূমিকায় অভিষিক্ত করেছে। আমাদেরকে মাধ্যম করে নিয়ে বাংলার ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থতত্ত্বের পুনরাবির্ভাবও বাঙালির পথিকৃৎ চরিত্রের প্রমাণরূপে উঠে আসছে। ...

রচ : বিদেশী পণ্ডিতেরা ভারতের মনীষাকে চিনতে পেরে অনেক কথা বলে গেছেন। বলেছেন আমাদের তুলসীগাছ বেলগাছের কথা। আমি বলি, যে জাতি 'ব্রহ্ম'কে 'বামনিশাক'-এ পরিণত করে ব্যবহারিক জীবনে মনে রাখে, লীলাময়ীর শক্তি সে জাতির কোন গভীরে সক্রিয় রয়েছেন, যাঁরা বাইসেপ দিয়ে মানুষের উন্নতি মাপেন, তাঁরা তা বুঝতে পারবেন না। বিশ্বের প্রথম ভাষাভিত্তিক (জ্ঞানভিত্তিক) বিদ্রোহ ঘটিয়ে একটি বাংলাদেশ বানিয়েই কি সে থেমে যাবে? নাকি তার মনের গভীরে রয়েছে অবিকল্পের অন্য কোনো সঙ্কল্প? কে জানে!

৫

জগৎ-খাঁচার ভিতরে সমাজ-খাঁচা, তার ভিতরে নিজের দেহ-খাঁচা; তার ভিতরে আমাদের নিজ নিজ মন এবং সেই মনের তৃপ্তির চেষ্টা — কম কথা নয়! প্রতি পদে তিন খাঁচার সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক রেখে মানুষের মনকে এগোতে হয়। সেভাবে এগোতে পারলে তবেই তৃপ্তি, শান্তি; না পারলে বিপর্যয়, এমনকি মৃত্যুও। সুদীর্ঘকালের চেষ্টায় এই তিন ক্ষেত্রে মানুষের মনের সম্বন্ধকে একসূত্রে গ্রথিত করে তাকে 'মানুষের ধর্ম' নাম দিয়ে মনকে ঠিকভাবে রাখার চেষ্টা করেছিল প্রাচীন ভারতের অধ্যাত্মবিদ্যা। তখন মানুষের সমাজ ছিল একাকার হয়ে। তখন প্রতিটি মানুষের মনকে সুতৃপ্ত করে সুখে ও আনন্দে জীবন কাটাতে মানুষের অসুবিধা হয়নি।

সেই সুখ কিন্তু চিরস্থায়ী হয়নি। একদিন সেই আদি একাকারের বুক চিরে পণ্যের উদ্ভব ঘটে যায় এবং মানবসমাজের সেই যৌথ অস্তিত্বকে সে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। তার পরের ইতিহাস দীর্ঘ। ...

আজ আবার সেই আদি একাকারের পরিবেশ নতুন রূপে ফিরে এসেছে। সেই একাকার, যখন পুনরায় তিনটি সম্বন্ধকেই একসূত্রে গ্রথিত করে ফেলা যেতে পারে। নিজের শরীরের সঙ্গে নিজের মনের সম্বন্ধ কীরূপ হবে, সমাজের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ কীরকম হবে, জগতের সাথেই বা কীরূপ সম্বন্ধ হবে, তা এখন পুনরায় একসূত্রে গ্রথিত করে ঠিক করে নেওয়ার পরিবেশ দেখা দিতে শুরু করেছে। এখন সময় এসে গেছে, ব্যক্তির দর্শন, সামাজিক দর্শন, ও জাগতিক দর্শনকে পুনরায় একসূত্রে গ্রথিত করে নতুন যুগের নতুন আধুনিকতম অধ্যাত্মবিদ্যা গড়ে তোলার। ... নতুন মানুষের যুগ আসছে।

কলিম খান রবি চক্রবর্তী

বৃষোৎসর্গ

কলিম খান

মর্ত্যলোকে ধর্মের ষাঁড়ের আকাল

কালিগাইটা নেচেছে। দাখিন ছোঁড়া বলেছিল বটে, মকবুলের বাপ জুম্মন মিঞা তার কথায় কান দেয়নি। কিন্তু ক'দিন পর জুম্মন মিঞা নিজেই দেখল, পিরপুকুরের পাড়ে গরুগুলোকে নিয়ে দাখিন যখন চরাতে যাচ্ছিল, তখন। দেখল, পাতিয়ালার পিঠে লাফ দিয়ে উঠল কালিটা। নিঘ্‌ঘাত বাই উঠেছে কালিগাইয়ের। বাছুর তার দুধ খাওয়া ছেড়েছিল মাস দুই আগে। বাই ওঠার ঠিক সময় বটে। আর, সেজন্যেই অত বড়ো বলদটার পিঠে লাফ দিয়ে উঠেছিল কালিগাই। গরুদের মাদীরা তো এভাবেই পিরিতের ডাক দেয়!

তখনও দেশে হাইব্রিড ধানের চাষ শুরু হয়নি — উনিশশো সাতষট্টি-আটষট্টি হবে। তখনও বছরে একবার মাত্র চাষ — হেমন্তের। মকবুলের বাপ তখন এ অঞ্চলের বড়ো চাষি। গোয়ালে তার চব্বিশটা গরু। ছ-টা হাল। তেরোটা বলদের সবচেয়ে লম্বা চওড়া তেজি আর কাজের বলদ ছিল পাতিয়ালা। আর ছিল ভুট্টো, গজেন, কাঁচি, গুরণ, রাজু, ঝাঁপড়া, গুখোর, মুখিয়া, রেন্টু। বাকি তিনটা নিকম্মা। মঙলুটা বুড়ো হয়ে গিয়েছিল, বাকি নদা আর পদা। তাদের অবস্থা ছিল — 'আছে গরু না বয় হাল, তার দুঃখ চিরকাল'। আর ছিল তিনটা গাই, তিনটা বকনা, পাঁচটা বিভিন্ন বয়সের বাছুর আর দামড়া। কিন্দ্রা সিং-এর ব্যাটা দাখিন সিং জুম্মন মিঞার বারোমেসে রাখাল, সেই-ই প্রথম বলেছিল — কালিগাইটা নেচেছে গো!

গাই-বকনা নাচলে গোয়ালের বলদগুলোকে নিয়ে ভারি ঝামেলা হয়। তারা নাচুনে গাই-বকনার গন্ধ পেয়ে যায়, তাদের পিরিতের ডাক বুঝতে পারে, আর সেই ডাকে সাড়া দিয়ে বলদগুলো তাদের নিত্যনৈমিত্তিক আচরণ ভুলে নাচনির পেছন পেছন ছোটে, নাকমুখ বেঁকিয়ে গন্ধ শোঁকে, নাচনির যোনি চাটে, লাফ দিয়ে পিঠে ওঠে, কিন্তু সঙ্গম করতে পারে না। বলদ তো! করঙ্গায় তাদের অণ্ডকোষ ছেঁটে দিয়েছে শৈশবেই! সেজন্যে তাদের লিঙ্গ আর বাড়েনি, ছোটো হয়ে থেকে গেছে। অথচ তাসত্ত্বেও বিধির বিধানে, বলদদেরও যৌবনে যথারীতি প্রবল ইচ্ছা হয়, যৌবনজ্বালা হয়, সে জ্বালায় তারা ছুটোছুটি দৌড়াদৌড়ি করে, কিন্তু সে-জ্বালা নিরসনের উপায় থাকে না তাদের। তাই তারা গর্জায়, বেশিই গর্জায়, কিন্তু বর্ষাতে পারে না। তারা যে বৃষ নয়, অবলিঙ্গ-গরু, বলদ! মানুষের চাষবাসে তারা বল দান করে।

মোটকথা, গাই নাচলে বলদদের ভিতরে ভারি হুড়োহুড়ি পড়ে যায়, প্রবল সঙ্গমেচ্ছার বিপুল তাড়নায় কে আগে নাচনির পিঠে চাপবে তার প্রতিযোগিতায় গুঁতোগুঁতি মারামারি পর্যন্ত করে ফেলে, আর সেজন্যেই জুম্মন মিঞার বলদদের সামলাতে দাখিনের দৌড়ঝাঁপ বেড়ে গিয়েছিল। তাই সে অনুযোগ করেছিল — কালিগাইটা নেচেছে গো!

নেচেছে, ভালো কথা। একটা এঁড়ে নিয়ে এসে পাল খাওয়ানো দরকার। তাতে গাই গাভীন হবে, বিয়োবে, দুধ দেবে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল এঁড়ে নিয়ে! এঁড়ে কোথায়? ধারে-কাছে কারও গোয়ালেই এঁড়ে নেই। ভারি মুশকিল! কী হবে এখন? জুম্মন মিঞা খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল।

কিছুদিন আগেও জুম্মন মিঞার নিজের গোয়ালেই একটা এঁড়ে ছিল। তবে এঁড়ে পুষলে যা হয়! এক তো কাঁধে জোয়াল চাপালেই সজোরে তেড়ে মেড়ে একেবারে জোয়াল ভেঙে বসে, নয়তো হেগেমুতে একসা ক'রে ল্যাজেগোবরে হয়। মানুষের কাজের নিয়ম, বলদের মতো, সে কিছুতেই রপ্ত করতে পারে না। তাসত্ত্বেও কিন্দ্রা তার কানে দড়ি বেঁধে মেরে ধরে মাঝেমধ্যে তাকে হাল টানাতে পারত। অথচ আশেপাশে কারও গাই বকনা নাচলে এঁড়েটাকে বেঁধে রাখাই মুশকিল হত। মানে কথা, পাল দিতে এঁড়েটার যত না মতি, হাল টানায় তার ছিটেফোঁটাও ছিল না। তাছাড়া পাড়াপড়শিদের গাই বকনা নাচলে পাল দেওয়ার জন্য গোয়ালের এঁড়ে খুলে দিয়ে দেওয়া তখনকার কালে গ্রামের মানুষের সামাজিক রীতি ছিল, কেউ এঁড়ে চাইলে 'না' বলা যেত না, লোকে কী বলবে! আর, তার জন্য পয়সাকড়ির কথা তোলা তখনকার কালে ছিল মহাপাপ! অবশ্য পয়সাকড়ির কথা জুম্মন মিঞার মাথাতেও আসেনি, তার বিরক্তির কারণ ছিল ভিন্ন -- রোজদিন কেউ না কেউ এসে এঁড়ে চায়, দিতেও হয়। মহা ঝামেলা! কাজ তো এঁড়েটা করে ঢের, সেটুকুও বন্ধ রেখে রোজ রোজ এভাবে লোকের গাই-বকনা পাল দিয়ে বেড়াবে; এমন গরু পোষার তো কোনো মানে হয় না। তার ওপর যথাসময়ে এঁড়ে দেওয়া-নেওয়া নিয়ে পাড়াপড়শির সঙ্গে মন কষাকষি। সকালে নিয়ে গেলি তো দুপুরে দিয়ে যা। না, এনে হাজির করলি সেই সন্ধ্যেবেলা! এসব কাঁহাতক সহ্য করা যায়!

এর মধ্যে একদিন হল কী, সত্য সাঁথ-এর সঙ্গে এই এঁড়ে দেওয়া নিয়ে হয়ে গেল কচসা। সত্য সাঁথ, মানে সত্যগোপল সামন্ত, জুম্মন মিঞার গিন্নি আঙ্গুরাবুড়ির সইয়ের বর! বুড়ি শুনে বলল — ইসব কী কথা, অ্যাঁ? একটা এঁড়ে নিয়ে আত্মীয়-বন্ধুর সঙ্গে ঝামেলা! এঁড়েটা বেচে দাও।

— কিন্তু ঘরের গাই নাচলে তখন কার দুয়ারে যাব এঁড়ে চাইতে?

বুড়ি বলেছিল — কেন? দেশে ধম্মের ষাঁড় নাই?

ঠিকই! জুম্মন মিঞাও জানত একটা ধুমসো ষাঁড় পাশের গঞ্জের বাজারে ঘুরে বেড়ায়, আশপাশের দশ-বিশটা গাঁয়েও ঢোকে বটে। গাই-বকনাগুলোকে তার পাল খাওয়াতে পারলে মোটাসোটা তাগড়া বাছুর হয়। সুযোগ থাকলে অধিকাংশ চাষিরা তাই করেও। সেদিক থেকে দেখতে গেলে, গাই-বকনাগুলোকে ঘরের এই রোগা-পটকা হাল-টানা এঁড়েটার পাল না খাওয়ানোই ভালো।

অতএব, শেষমেষ জুম্মন মিঞার এঁড়েটা গেল গরু পাইকারের হাতে। ঝামেলা চুকল!

তবে, ঝামেলা চুকল না বাড়ল সেটা হাড়ে হাড়ে বোঝা গেল কালিগাই নাচার ক'দিন পর।

আসলে লোকে ভাবে এক, হয় আর। হলও তাই। দেখা গেল, কালিগাইয়ের জন্য যখন একটা এঁড়ের খুবই দরকার, ধর্মের ষাঁড়ের ভরসায় যখন কিনা ঘরের এঁড়েটাকে পাইকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, তখন জানা গেল ধর্মের ষাঁড় পাওয়া যাবে না! শিবের যে-ষাঁড়টি ধারে কাছের দশ-বিশটা গ্রামে ঘুরে বেড়াত, এর-তার ক্ষেতের ফসল খেত যেন সবই তার বাপের সম্পত্তি, আর অধিকাংশ সময় থাকত বাজারে, সব্জিঅলাদের সব্জি খেত, বিশ্বাসীদের বাড়ির প্রভাতী উৎসর্গ খেত, সেটিকে নাকি অনেকদিন হল দেখা যাচ্ছে না। কিন্দ্রা সিং খোঁজ খবর নিয়ে এসে জানাল ষাঁড়টিকে আর কোনোদিনই পাওয়া যাবে না।

— কেন?

— মরে গেছে।

— কেন?

— কেন কী? বুড়ো হলি মরবেনি! একটা ষাঁড় কি চিরকাল বেঁচে থাকবে আর লোকের গাই-বকনা পাল দিয়ে বেড়াবে!

জুম্মন মিঞা ভাবল, হাঁ, কথাটা ঠিক বটে! জীব মাত্রেই আয়ু বলে একটা কথা আছে। ধর্মের ষাঁড় বলে তো আর বিধির বিধান খণ্ডাতে পারে না। তাকেও সময় হলে মরতে হবেই। এসব ভাবতে ভাবতে জুম্মন মিঞা বলল — কিন্তু ...! কিন্তু ...

— কিন্তু কী?

— কিন্তু তা বলে গোটা এলাকার সব গাই-বকনা কি বিধবা হয়ে গেল? একটা ষাঁড় নাই বলে কি তাদের যৈবন নাই? নাচ নাই? তারা গাভীন হবে না? বিয়োবে না? এটা একটা কথা হল!

জুম্মন মিঞার ছোটোচাচা রহমত, তখনও বেঁচে, মুরুব্বি মানুষ, জুম্মনকে বলল — একবার শশী পাতরের কাছে যা। অর ত অতগুলা গাই! কিন্তু এঁড়ে নাই। গাই নাচলে উ কী করে, জান্। শুনছি, অরা নাকি গাইগরুকে সুচ ফুটিয়ে পোয়াতি করে দেয়।

শশী পাত্র, এলাকার নামকরা চাষি, তখন সবে মাদার ডেয়ারিকে রোজ সকালে এক ম্যাটাডর দুধ সাপ্লাই করতে শুরু করেছিল। তার অনেকগুলো গাই, মোষও পুষতে শুরু করেছিল। সব দুধেলা। রহমতের উপদেশ মতো জুম্মন নিজে তার কাছে গেল।

শশী বলে — সিধা চলে যা বিডিও অফিস। দেখবি, মাঝখানে বড়ো ঘরটা বিডিওর, বাঁদিকে কোয়াটার আর ডানদিকে ছোটোমতো চার কামরার অফিসটা, ওখানেই বিডিও অফিসের খুচরা বিভাগের কাজকাম হয়। সেখানেই দেখবি ভেটিনারির নগেন জানা, টাক মাথা, চোখে চশমা, টেবিলে ঠ্যাং তুলে বসে আছে। বলবি, জোড়াহানার শশী পাত্র পাঠিয়েছে। গাই পোয়াতি করতে হবে। বীর্য চাই। বিশটা টাকা দিবি। টাকা না দিলে অনেক দিন ঘুরতে হয়। দিবি। দিলে, উ লোক পাঠিয়ে যা করার করে দিবে। তোকে আর কিছু ভাবনাচিন্তা করতে হবেনি। যা।

— কিন্তু বাছুরটা? আমি তো তোমার মতো দুধ বেচবনি, আমাকে হাল চষতে হবে। বাছুরটা যাতে তাগড়া হয়, ভালো হয় ...।

— হক কথা। তা, অস্ট্রেলিয়ান গাইয়ের তো তাগড়া বাছুর হয়, তোর গাইটাকে নাহয় অস্ট্রেলিয়ান এঁড়ের বীর্য দিতে বলিস নগেনবাবুকে, সে নিশ্চয় একটা ব্যবস্থা করে দিবে।

টাকাটা হাতে নিতে নিতে নগেনবাবু বললেন — বুদ্ধিটা কার? শশী পাত্রের?

— আজ্ঞে হ্যাঁ।

— ঘোড়ার পেটে হাতির বাচ্চা ধরে? বাছুরটা প্রসব হবার আগেই তোমার গাইটা মরে যাবে।

— সে কী! তাইলে উপায়?

— উপায় আর কী! দেশি এঁড়ের স্পার্মই দিতে হবে। দেশি গাইয়ের পক্ষে দেশি এঁড়ের বীর্যই ভালো। সাহেব গরুর বীর্য দেশি গর্ভে সইবে কেন! সবাইকে যা দিই তাই দেব, দেশিই পাঠিয়ে দেব।

— কিন্তু ... সে তো পালতু এঁড়ের বীর্য হবে। গাড়ি-লাঙল-টানা রোগা-পটকা এঁড়ের বীর্য। ঠিক কি না বলেন?

— কী করে বলব! সরকার থেকে পাঠায়। কার বীর্য কে জানে! তবে দেশি গাইকে দিলে দেখেছি নরম্যাল ডেলিভারি হয়, বাছুরটাও বাঁচে; মরে না।

— কেন, দেশি ষাঁড়ের বীর্য নাই? ধর্মের ষাঁড়ের?

— ধর্মের ষাঁড়! সে আবার কী?

— ওই যে ষাণ্ডা-গাণ্ডা ষাঁড়, দেশে গাঁয়ে ঘুরে বেড়ায়, কারও গোয়ালে থাকে না, কারও হাল-

লাঙল টানে না, যার কোনো মালিক নাই, নিজেই নিজের মালিক, কারও হুকুম খাটে না, দেখেননি কখনো? শিবঠাকুরের নামে ছেড়ে দেওয়া ষাঁড় গো।

— না না, ওসব ষাঁড়-ফাঁড়ের বীর্য বলে কিছু নেই। সরকার থেকে যেটা পাঠায় সেটা কার থেকে নেওয়া হয়, কে জানে! সাপ্লাই যা আসে, তার দুটা ভাগ — দেশি আর অস্ট্রেলিয়ান।

— দেশি ষাঁড়ের বীর্য নাই? ধর্মের ষাঁড়ের?

— শোনো মিঞা, আমাদের কাছে দেশি এঁড়ের বীর্য আছে। সেটা ষাঁড়ের কি না, সে ষাঁড় ধর্মের নাকি অধর্মের, ওপরঅলা জানে। আমাদের গাই গাভীন করা নিয়ে কথা। তুমি যখন শশী পাত্রের লোক বলছ, 'হাঁ' বললে আমি লোক পাঠিয়ে যা করার করে দেব। আর 'না' বল তো টাকাটা ধরো, ধর্মের ষাঁড় কোথায় পাওয়া যায়, খোঁজো গিয়ে।

জুম্মন মিঞা দমে গেল। মাথা নাড়িয়ে বলল — হাঁ।

কিন্তু জুম্মন মিঞার মনটা সত্যি খারাপ হয়ে গেল। যে ধর্মের ষাঁড়ের ভরসায় ঘরের এঁড়েটাকে সে বেচে দিল, সেই ষাঁড়ের বীর্য তাহলে পাওয়া যায় না! দেশে কি তবে আর ধর্মের ষাঁড়ই নেই? সারা দুনিয়া থেকে ধর্মের ষাঁড় বিদায় নিয়েছে? সব বলদ হয়ে গেছে! তাহলে তো ভালো জাতের গরু আর জন্মাবেই না!

ক'দিন পরে নগেন জানার লোক এসে কালিগাইকে ইনজেকশন দিয়ে গেল। সবাই দেখল। আঙ্গুরাবুড়ি গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসল — সুঁই দিয়ে পেটে বাচ্চা! নর মাদীর মিলন হল না, যৌবনের নামে আল্লার দেওয়া বেহেস্তি নেয়ামত, সেই নেয়ামত বরবাদ হল, আত্মার শান্তি হল না, অথচ বাচ্চা! হায় আল্লা, মানুষের এ কী বেআক্কেলে বুদ্ধি গো, খোদার উপর খোদকারী!

এর মধ্যে একদিন আঙ্গুরাবুড়ির সই এল। বলল — বলিস কী! ইনকেজশনে বাচ্চা! নর-মাদীর সঙ্গমটাই বাদ! অ সই, আমাদের যদি ওইরম হত! বরের সঙ্গে না শুয়ে সুঁই দিয়ে পেটে বাচ্চা! কী সাংঘাতিক! আমি কিছুতেই রাজি হতাম না সই, কাঁসাইয়ে ডুবে মরতাম।

আঙ্গুরা বলে — বর বাদ দিলে মেয়েমানষির আর থাকল কী বল! বেঁচে থাকার স্বাদ-আহ্লাদ সবই তো বরবাদ হয়ে গেল! আল্লার কিরা সই, অমন হলি তোর হাত ধরে একসাথে ডুবে মরতাম।

সই বলে — সত্যি, কী ভয়ানক! উঃ! শিবলিঙ্গের বদলে সুঁচ! ভাবলেও গায়ে কাঁটা দিয়ে জ্বর আসে। তুই-ই বল্, বিছ্নায় তাগড়া ষাঁড়ের মতো বরকেই যদি না পাব তো শিবের মাথায় অত জল ঢাললাম কেন, শিবলিঙ্গে দুধ ঢাললাম কেন? অত শিবরাত্রির ব্রত করলাম কী করতে? উপোস করলাম কী করতে?

— ঠিক কথা! কিন্তুক সই, মোদের মেয়েলোকদের মন যদি অ্যামুন কথা কয়, একবার অবলা-জন্তু গাইগরুগুলোর দুঃখের কথা ভাব্। তারাও তো মেয়েমানুষ, মাদী, না কী!

সই চুক চুক করে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপর বলে — যে-বেদাবাচ্চাটা গাই-বকনাদের সুঁই দিয়ে বাচ্চা করার মতলবটা বার করেছে তাকে পেলে জলবিছুটি দিতম, নেঙ্গুস দিতম, জামাকাপড়ে আলুকসি দিতম। অলম্বুষা, গুষ্টিসুদ্ধা অলাউঠায় মরবে! দেখিস!

ওদিকে আবার ধর্মের ষাঁড়ের বীর্য পায়নি বলে জুম্মন মিঞার ভারি দুঃখ হয়েছে শুনে সইয়ের বড়ো মায়া হল। খানিক পরে জুম্মন মিঞাকে ঘরের পানে আসতে দেখে সইয়ের মুখ খইয়ের মতো ফুটতে লাগল। হাসতে হাসতে বলল — অ জামাইদাদা, তুমিই না হয় এবার একটা ধম্মের ষাঁড়

ছেড়ে দাও! দেশের গাই-বকনাগুলা তুমাকে দু-ঠ্যাং তুলে আশির্বাদ করবে, তাদের ষাণ্ডা-গাণ্ডা বাছুর হবে, তুমার অনেক পুণ্যি হবে গো!

হাসির কথা। ঠাট্টার কথা। কিন্তু হলে কী হবে, কথাটা জুম্মন মিঞার মনের গভীরে মোটা দাগ কেটে যায়। সত্যি তো! দেশে যখন একটাও ষাঁড় নেই, ষাঁড় ছাড়লে ক্ষতি কী! ষাঁড় ছাড়লে সে যেখানে খুশি চরে খাবে, রোদ-বৃষ্টি-জলে তেতেপুড়েভিজে যাণ্ডাগুণ্ডা হবে, তার কোনো অসুখ থাকবে না, সেই ষাঁড় এলাকার সমস্ত গাই-বকনাগুলোকে পাল দেবে, তাদের ষাণ্ডা-গাণ্ডা তাগড়া বাছুর হবে, গরুর জাতটা তরতাজা থাকবে ...

অতঃপর যা হবার তাই হয়, জুম্মন মিঞার মনে ষাঁড়-ছাড়ার পোকা কুর কুর করতে থাকে এবং সে এর-তার সঙ্গে পরামর্শ করতে শুরু করে। খবর নেয়, দেশে ষাঁড় ছাড়ার নিয়ম কী? ধর্মের ষাঁড় ছাড়তে গেলে কী কী করতে হয়।

কিন্তু ওই যে বলে, মানুষ ভাবে এক, হয় আর। হঠাৎ তিনদিনের জ্বরে জুম্মন মিঞার ইহলোকের বাস গেল উঠে। মৃত্যুর আগে সে মকবুলকে বলে গেল — গুড়চাকুলির রঘু চক্কোত্তি বলেছিল, একটা উপায় করে দেবে। তার সঙ্গে পরামর্শ করে একটা ষাঁড় ছাড়িস বাপ। গরুর জাতটা বাঁচবে।

মৃত্যুশয্যায় বাপের হাত ধরে মকবুল মাথা নেড়ে বলেছিল — ঠিক আছে।

স্বর্গলোকে ধর্মের ষাঁড়ের আকাল

এসব পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর আগের কথা। তারপর কংসাবতী দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। দেশে হাইব্রিড ধানের চাষ এসেছে। বামফ্রন্টের শাসন এসেছে। মকবুলের কিছু জমি পার্টির লোকেরা দখল করেছে, কিছু সে বেচে দিয়েছে, যেটুকু আছে সেটুকুও সে হাল-লাঙল দিয়ে চাষ করে না, মিনি ট্রাকটর দিয়ে করে। গোয়াল তার খালি, রয়েছে কেবল একটা গাই আর দুটো বাছুর। ওই একটা গাই থেকেই তার সংসারে দুধ জোগানর কাজ চলে যায়।

বাছুর দুটোর ছোটোটা বকনা আর বড়োটা দামড়া। মকবুল দামড়াটাকে ছাঁট করায়নি। মনের ইচ্ছে, ষাঁড় ছাড়তে হলে এটাকেই সে ছেড়ে দেবে।

আঙ্গুরাবুড়ি কিন্তু এখনও জীবিত। বুড়ি থুথুড়ি। মাঝেমধ্যেই বুড়ি মকবুলকে বলে — বেটা, তুই কিন্তু বাপকে কথা দিছিলি, গরু জাতটাকে বাঁচাবি, একটা ষাঁড় ছাড়বি।

এর মধ্যে একদিন বুড়ি উঠোনে পড়ে গিয়েছিল। তাইতে তার মনে মৃত্যুভয় ঢুকেছে। আজকাল প্রায়ই বলে — আর ক'দিন!

মকবুল আর দেরি করে না। এমনিতেই জমিদখল, মামলা-মোকদ্দমা, অসুখ-বিসুখ, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া বিয়েসাদী, এইসব ঝামেলায় তার অনেক দেরি হয়ে গেছে। আর নয়। সে ষাঁড় ছাড়ার উদ্যোগ নেয়। বাবার কথামতো গুড়চাকুলির রঘু চক্কোত্তির কাছে যায়।

গুড়চাকুলি গ্রামে পৌঁছে মকবুল শুনল রঘু চক্কোত্তি মরে গেছে! তার বড়ো ছেলে জগা, জগন্নাথ চক্কোত্তি, আর ছোটো ছেলে রসো, রসিক চক্কোত্তি, এই দুই ভাই যা পৈতৃক ভিটেতে থাকে। বাকিরা সব উচ্চশিক্ষিত, হিল্লি-দিল্লি থাকে। জগা-ই যাহোক পুজো-আচ্চা টুকটাক করে, আর রসো গঞ্জের হাইস্কুলে সংস্কৃতের মাস্টার। জগা এখন লাঠি হাতে হাঁটে। মকবুল গিয়ে তাকেই ধরল।

সব শুনে জগন্নাথ চক্কোত্তি বলল — ষাঁড় ছাড়া মানে তো বৃষোৎসর্গ। কিন্তু বৃষোৎসর্গ তো মুসলমানের কাজ না মকবুল। সনাতন ধর্মে শ্রাদ্ধে বৃষোৎসর্গ করা হয়। একটা সাবালক নীরোগ

ষাঁড়কে শিবের নামে ছেড়ে দেওয়া হয় -- যাও তোমাকে উৎসর্গ করা হল, শিবের জন্য, জগতের জন্য, সমাজের জন্য, গোজাতির জন্য। কিন্তু তোমাদের মুসলমানদের শ্রাদ্ধে বৃষোৎসর্গের বিধান আছে বলে তো কখনো শুনিনি। তুমি বলছ, আমার বাবার সঙ্গে তোমার বাবা পরামর্শ করে রেখেছিলেন। কিন্তু সেরকম কোনো কথা আমি তো জানি না। বাবা আমাকে কিছু বলেও যাননি।

-- তাইলে কি ষাঁড় ছাড়তি পারবনি? আপনি যেমন বললেন, একজন মুসলমান কি তেমন বৃষোৎসর্গ করতি পারে না? সমাজের জন্য, গোজাতির জন্য একটা ষাঁড় ছাড়তি পারে না?

— পারবে না কেন? পারবে, ধর্মে আটকাবে না। সরাসরি না পারলে ঘুরিয়ে পারবে। একজন হিন্দুকে দাঁড় করিয়ে তার নামে ছাড়তে পারে। অসুবিধা কী! শুনেছি আগের কালে মুসলমান রাজা-জমিদাররাও ষাঁড় ছাড়ত। বাবা হয়তো সেরকম কিছুই ভেবে থাকবেন। তাই বলছি, ধর্মে আটকাবে না, আটকাবে রাজনীতি। পার্টির বাবুরা এখন কি আর ষাঁড় ছাড়তে দেবে? মনে হয় না।

— কেন? পার্টি আটকাবে কেন? একটা সাবালক গরুর দাম এখন কত জানেন? পাঁচ হাজার টাকা। সেই টাকা আমি সমাজের জন্য কুরবানি করছি, গোজাতির ভালোর জন্য উৎসর্গ করছি। তাও পার্টি আটকাবে কেন?

— আটকাবে। ষাঁড়টা তো বাবা লোকের ফসলে মুখ দেবে, না কী? তার খেসারত এখন কে সইবে? আগে ভক্তি ছিল। হিন্দু কেন, মুসলমান খ্রিস্টান আদিবাসী ভূমিজ কেউই ধর্মের ষাঁড়ের কোনো ক্ষতি করত না। ষাঁড়ে ফসল খেলে, লোকে বিশ্বাস করত, ফসল বাড়বে। এখন তো শুধু মেরে তাড়াবে না, অত চর্বিঅলা মাংস, ষাঁড়টাকে মেরে খেয়েই নেবে।

মকবুল ভারি ধন্দে পড়ে যায়। ঠিক করে, বন্ধু শওকতের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যা করার-করবে। এককালের সহপাঠী শওকত হোসেন, তার সঙ্গে সে নাইন পর্যন্ত পড়েছিল। শওকত এখন গঞ্জের হাইস্কুলে অঙ্কের মাস্টার, কিন্তু এখনো তাদের বন্ধুত্ব অটুট। স্কুলছুটির পর সুবল সিংয়ের চা-দোকানে মাস্টাররা আড্ডা মারে। পরদিনই সেখানে গিয়ে সে শওকতকে ধরল।

সব শুনে শওকত বলে — কথাটা খারাপ বলিসনি মকবুল। আফটার অল, ধর্মের ষাঁড়টাই তো গরু প্রজাতির একমাত্র নেচারাল এগজিসটেন্স, গরুর স্বাভাবিক প্রাকৃতিক চেহারা। রোদে জলে বনে বাদাড়ে নিজের খুশিমতো ঘুরে বেড়ায়, রোগবালাই নেই, স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক গরু। আরগুলো তো ঠিক স্বাভাবিক গরু নয়, ঘরে পোষা গরু, মানে, বেশ-খানিকটা বিকৃত। বলদগুলোর তো অণ্ডকোষটাই নেই। মানুষের ইচ্ছাপূরণ করতে গিয়ে ওরা তো নিজেদের প্রজাতিধারাটাই বহমান রাখতে পারে না। আর গোয়ালের এঁড়েও তো ঠিক ন্যাচারাল নয়, মানুষের হুকুম খেটে সেও তো অনেকটাই আনন্যাচারাল। আমার বিচারে, কথাটা জুম্মনচাচা ঠিকই বুঝেছিল, বুঝলি মকবুল। সুস্থ গো-প্রজাতির ধারা রক্ষা করতে চাইলে ধর্মের ষাঁড় থাকা জরুরি বটে। হয়তো আগের কালের বামুনরা সেজন্যেই বৃষোৎসর্গ চালু করেছিল।

রসিক চক্কোত্তি, জগা চক্কোত্তির ছোটো ভাই, শওকতের পাশে বসে এতক্ষণ শুনছিল। সে আর চুপ করে থাকতে পারল না। প্রায় চেঁচিয়ে উঠল — খালি গো-প্রজাতি কেন, যে কোনো প্রজাতির ক্ষেত্রেই জাত বামুনের ওই বিধান। মানুষের ক্ষেত্রেও। কিছুদিন আগেও, বাঙালির যৌথ পরিবারের পাঁচ সাতটা ছেলের একজনকে ছেড়ে দেওয়া হত ষাঁড়ের মতো -- যাও, ছকের বাইরে হাঁটো, তোমাকে সংসারের জোয়াল টানতে হবে না, আমরা তোমার ভাইরা সেসব বুঝে নেব, তুমি যাও, জগতের নতুন নতুন ধর্ম আবিষ্কার করো, সে ধর্ম প্রচার করো, দেশে দেশে ঘুরে বেড়াও, দেশোদ্ধার

করো, গান গাও, যাত্রাপালা করো, সৃষ্টি করো, শিল্প-ভাস্কর্য করো ... এইরকম। বাঙালির সমাজে ধর্মের ষাঁড় ছিল এরাই, বাপের পাঁচ-সাত নম্বর ছেলে। নেতাজি রবীন্দ্রনাথের কথাই ভাবো না, স্বভাব-সন্ন্যাসী! মানুষের সমাজে এরাই ধর্মের ষাঁড়। এরাই মানুষের সমাজের রাজা। এদের জন্যই মেয়েদের শিবরাত্রি। গরু-ষাঁড়কে কখনো দেখেছ ভালো করে? দেখবে কেমন রাজা রাজা ভাব, গুরুগম্ভীর চাল, যেন গোটা দুনিয়াটাই তার! মানুষের সমাজের মানুষ-ষাঁড়ই হল বৃষভ, ঋষভ, সৃষ্টিকারের শিবের বাহন, প্রকৃত শৈব। এরা হল রেতঃবর্ষক বৃষ। সৃষ্টি করতে পারে কেবল এরাই। যারা আমাদের মতো চাকরি করে, অন্যের চাকর, কারও না কারও হুকুম খাটে, প্রভুকে বলদান করেই যাদের জীবন কাটে তারা হল বলদ। পেটের রুজি পায় আর প্রভুর দরকার মতো খাটে, তারই গোয়ালে থাকে। বিধির বিধানে এই বলদদের সৃষ্টি করবার অধিকার নাই, যোগ্যতাও নাই। লোকের হুকুম খাটব আবার সৃজন করব, তা হয় না। আর স্রষ্টা মানে তো রাজাই, মনের রাজা, মুক্ত, স্বাধীন। মনের রাজা না হলে আবিষ্কারক হওয়া যায় না, স্রষ্টা হওয়া যায় না। চাকরি করব, অন্যের চাকর হয়ে থাকব আবার একই সঙ্গে রাজাও হব, সৃষ্টি করব, অমন হয় না। বড়ো জোর অনা-সৃষ্টি করা যেতে পারে।

ইংরেজির মাস্টার ই কে রে, এককড়ি রায়, নামের কারণেই কিনা কে জানে, সবসময় সিরিয়াস থাকে, শওকতকে উদ্দেশ করে বলল — বার্নার্ড শ কী বলেছেন জানো শওকত, The reasonable man adapts himself to the world. The unreasonable man tries to adapt the world to his idea. Therefore all kinds of progress depend on the unreasonable man. যারা সংসারের জোয়াল-টানার নিয়ম মেনে চলে তাদের দিয়ে কোনো নতুন বিকাশ সম্ভব নয়। তারা চালু ব্যবস্থায় কনডিশনড্ হয়ে যায়। বেনিয়মের লোকেরাই নতুন দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

— তার মানে যারা চাকরি করে, অন্যের দ্বারা নিযুক্ত পেশাদার মাস্টার, ডাক্তার, কেরানি, আমলা, উজির, নাজির, কুলি, মজুর, এরা সবাই কনডিশনড্? এরা ধর্ম-সংস্কৃতির স্রষ্টা হতে পারে না? আবিষ্কারক হতে পারে না? বলো কী?!

— হতে পারে, তবে রেয়ার, কদাচিৎ। কেবলমাত্র নিয়োগকারী আর নিযুক্তের মধ্যে পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহারের বন্ধন যদি থাকে, 'বন্ধুত্ব' যদি থাকে, তবেই নিযুক্ত মানুষও স্রষ্টা হতে পারে। তবে আজকাল তেমন হয় কোটিতে গুটিক, আগের কালে তবুও কিছু হত। তাই বার্নার্ড শ বলে গেছেন — All professions are conspiracies against the laity. কাউকে কোনো পেশায় নিযুক্ত করা, চাকরি দেওয়া মানেই বলদে পরিণত করা। মানুষ হোক গরুই হোক, তাকে যদি ন্যাচারাল রাখতে চাও, নেচারের হাতেই ছেড়ে দাও। রসিকদা ঠিকই বলেছে। বিশ্বাস না হলে ইতিহাসটা দেখো, আগের কালে মানীগুণী মানুষদের অধিকাংশই ধর্মের ষাঁড় ছিলেন। প্রাচীন পৃথিবীর সব দেশেই নন্দীষাঁড়ের মূর্তি দেখতে পাওয়া যায় ওই কারণেই। প্রাচীন ভারতে তো হাজার হাজার বৃষবিগ্রহ ছিল, আজও তার অজস্র নিদর্শন রয়েছে। বেশি পেছনে যেতে হবে না, গত ত্রিশ-চল্লিশ দশকের বড়োমানুষদের, শিল্পী-সাহিত্যিক আর রাজনৈতিক নেতাদের জীবনী পড়ো, দেখবে, তাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন শিবের ষাঁড়। তাঁদের সংসার টানত তাঁদের ভাই-দাদারা। আর তাঁরা একটা নতুন আদর্শ, নতুন ধর্ম প্রচার করে বেড়াতেন। কী মবিলিটি ছিল তাঁদের! এক বাড়িতে তেরাত্তির কাটাতেন না, সাক্ষাৎ সন্ন্যাসী। এমনকী খোদ রবীন্দ্রনাথ, আইনস্টাইনদের জীবনীটা ভালো করে দেখো, দেখবে এঁরাও সমাজের ন্যাচারাল প্রোডাক্ট, অ্যাকাডেমির দ্বারা পালিত বা পোষা বিদ্বান নয়,

এঁরাও শিবের বাহন, মানুষ-ষাঁড়, রবীন্দ্রনাথ নিজেও নিজেকে তাই শৈব বলতেন। বলতে কী, আবিষ্কারক-স্রষ্টা মাত্রেই শিবশক্তির বাহন, তা সে বৈজ্ঞানিক, কাব্যিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ধার্মিক যে কোনো জ্ঞানশাখার আবিষ্কারকই হোন। মানুষ-প্রজাতিতে এই ন্যাচারাল মানুষগুলো জন্মায় বলেই সমাজের বিকাশ হয়, সমাজ এগিয়ে চলে।

রসিক চক্কোত্তি আবার বলে — কেবল গরুদের সমাজেই নয়, মানুষের সমাজেও আজ ধর্মের ষাঁড়ের নিতান্ত অভাব দেখা দিয়েছে। আর, পাবলিকের অবস্থা জুম্মন মিঞার কালীগাইয়ের মতো, বীর্যের বাসনায় হাহাকার করছে! আর, মানুষ-বলদগুলো প্রবল ইচ্ছায় দাপাদাপি করছে, গর্জন করছে — রাজনীতিতে, ধর্মে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে সর্বত্র; কিন্তু বর্ষাতে পারছে না। সংসারের জোয়াল-কাঁধে যে কয়টা এঁড়ে এখনও আছে সেগুলোর তো ল্যাজেগোবরে অবস্থা! তারা বর্ধাবে কী! না ঠিকমতো সংসার টানতে পারে, না সৃজন করতে পারে। চাকরি করলে গাঁজা-মদ খেয়ে পড়ে থাকে, কিংবা শেষমেষ চাকরি ছেড়ে পালায় নয় আত্মহত্যা করে। একশো ভাগ ধর্মের ষাঁড়, রবীন্দ্রনাথের মতো, যে কারুর চাকরি করে না, নিজে নিজের নতুন ধর্ম অর্জন করেছে, সে ধর্ম প্রচার করাই যার কাজ, সেরকম কোনো ধর্মের ষাঁড় মানুষের সমাজে এখন নেই, অন্তত বাঙালির এই পোড়া দেশে আর নেই।

এককড়ি বলে — একদম নেই বলবেন না। মানুষ তো এখনও প্রাকৃতিক স্বভাব নিয়েই জন্মায়। কিন্তু আমাদের এই কট্টর দেশের অবস্থাবৈগুণ্যে সেই স্বভাব তার অবিকল থাকে না, থাকতে দেওয়া হয় না। তা সত্ত্বেও যে দু-চারজন তাদের ষাঁড়-স্বভাবটা কিছুতেই ছাড়তে পারে না, তারা পরিবার পরিজন জলাঞ্জলি দিয়ে তাদের স্বধর্মঅর্জনে ও প্রচারে একনিষ্ঠ ভাবে লেগে থাকে পাগলের মতো, তাও না পারলে সব ছেড়ে নিজ নিজ সৃজনকেন্দ্র শান্তিনিকেতন বানাতে লাগে রবীন্দ্রনাথের মতো, নয়তো শেষমেষ পালায়, বঙ্গের বাইরে, হিল্লি-দিল্লি, লন্ডন-নিউইয়র্ক, যেখানে এঁড়েদের সগৌরবে বেঁচে থাকার মতো পরিবেশ এখনও রয়েছে। সেই প্রবাসী বাঙালি এঁড়েগুলোকেই তো ইউরোপ আমেরিকায় এখন 'বিগ-বেঙ্গলি' বলে, এককালে যেমন ডেভিড হেয়ারের মতো ব্রিটিশ এঁড়েগুলোকে রবীন্দ্রনাথ 'বড়ো ইংরেজ' বলতেন। তবে এটা ঠিক যে, বাংলাভাষীদের নিজেদের দেশে এখন এঁড়ের নিতান্তই অভাব দেখা দিয়েছে, আর ধর্মের ষাঁড় প্রায় নেইই। ফলে দেশে বড়ো-বাঙালি তো জন্মাচ্ছেই না। কী যে হবে জাতটার!

শওকত হোসেন বলে — তা যদি হয়, গো-জাতির জন্য মকবুল যেমন ষাঁড় ছাড়ার কথা ভাবছে, মানুষ প্রজাতির ব্যাপারে আমাদেরও ধর্মের ষাঁড় ছাড়ার ভাবনা ভাবা উচিত। কী বলো রসিকদা।

সুবল সিং চুপচাপ শুনছিল। সে ফুট কাটে — কিন্তু মাস্টারমশয়, লোকের তো এখন 'হম দো হামারা দো', একটা ছেলে একটা মেয়ে। একটা মাত্র ছেলেকে কি শিবের নামে উৎসর্গ করা যায়!

রসিক চক্কোত্তি বলে — তা কেন? বাপের দুটো ছেলেও থাকে। থাকলে, একটা ছেলেকে ছেড়ে দাও শিবের নামে। সংসারের জোয়াল তার কাঁধে চাপানো হবে না। কারও চাকরি করবে না সে, প্রকৃত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অধিকারী, নিজেই নিজের পুরো চব্বিশ ঘণ্টার মালিক, তাকে বলা হবে — যাও, ন্যাচারাল মানুষ হও! কারও পালিত নয়, পোষা নয়, মুক্ত, স্বাধীন।

এককড়ি আপত্তি তোলে — এরকম হয় না। যেকোনো ছেলেই তো শিবের বাহন হতে পারে না। ছকের বাইরে হাঁটতে কারও ভালো লাগে, কারও লাগে না। ওটা ন্যাচারাল, স্বভাব। যে ছেলেরা ক্লাসে মন দিয়ে আমাদের কথা শোনে, ফার্স্ট-সেকেন্ড হয়, তারা স্বভাববশতই কনডিশনড হতে পছন্দ

করে, প্রোগ্রামড্ হতে তাদের ভালো লাগে, তাদের মধ্যে দক্ষ বলদ হওয়ার প্রবণতা বেশি। আর যে ছেলের ক্লাসের পড়ায় মন বসে না, জানলার বাইরে যার দৃষ্টি পড়ে থাকে, সংসারে যার মন বসে না কিছুতেই, তার মধ্যে শৈবতেজের বাহন হওয়ার স্বভাব বেশি। তাই দু-ছেলের এক ছেলেকে বৃষরূপে উৎসর্গ করবার মেকানিক্যাল নিয়ম এক্ষেত্রে চলবে না।

— তাহলে কী হবে?

— ছকের ভেতরে থাকতে যার ভালো লাগে, তাকে বলদ হতে দাও, বলদও আমাদের প্রয়োজন; নইলে প্রচলিতকে ধরে রাখবে কে? আবার ছকের বাইরে থাকতে যার ভালো লাগে তাকে ধর্মের ষাঁড় হতে দাও, ধর্মের ষাঁড়ও আমাদের প্রয়োজন; নইলে নতুনের আমদানি করবে কে? মানুষের সমাজে সংসারের জোয়াল-টানা বলদও চাই, ধর্মের ষাঁড়ও চাই। দক্ষও চাই, শিবও চাই।

— সংসারে থেকে কি ধর্মের ষাঁড় হওয়া যায় না?

— হয়, হয় ওই এঁড়েগুলোর মতো। সবসময় ল্যাজেগোবরে অবস্থা। এক্ষুনি একটা নতুন পরিকল্পনা নিয়ে কী ছুটোছুটি! তারপরই ফ্লপ। ছেড়েছুড়ে হতাশ। আবার অন্য একটা বুদ্ধি। তার জন্য আবার ছুটোছুটি। টাকা পয়সা এই আছে তো এই নেই। আজ রাজা তো কাল ফকির। তেমন মানুষের গোটা পরিবারটাই সবসময় অনিশ্চয়তায় ভোগে।

— কিন্তু, ধর্মের ষাঁড় হলে সে মানুষটা খাবে কী?

— গরুদের ষাঁড় যেমন খায়, সেরকমই খাবে। এর তার ফসল খাবে, তা নিয়ে হই-হাই চলবে, হেট-হেট যা-যা ভাগ-ভাগ চলবে, আবার কিছু লোকে ভক্তিতে দেবেও, আর সে নেবেও, যেন ওগুলো তার ন্যায্য পাওনা।

— আজকাল আর ভক্তিতে দেয় কই, লোকে তো আজকাল ষাঁড় দেখলেই দুরছাই করে, জল ছিটিয়ে তাড়িয়ে দেয়, না গেলে আগুন দেখায়, এমনকী দল বেঁধে ডাণ্ডা নিয়ে মারেও।

— সে ঠিক! তবে ...

মকবুল আর থাকতে পারে না। সে শওকতের উদ্দেশে বেশ জোরেই বলে ওঠে — কী ঝামেলা! আমি তোমার কাছে এলম আমার ষাঁড়-ছাড়া নিয়ে কথা বলতে, আর তোমরা পড়লে মানুষ-ষাঁড় নিয়ে। আচ্ছা মুশকিল হল!

শওকত তড়িঘড়ি প্রসঙ্গ বদলায়, বলে — ও রসিকদা, তুমি যে ষাঁড়-ধর্মের কথা বলছ, সে নিয়ে ভাবা যাবে 'খন। এখন মকবুল কী করবে, সেকথা বলো?

— কেন, রমেশ মাইতির কাছে যাবে, ওই তো এখন পার্টির এলসিএস, লোকাল কমিটির সেক্রেটারি। দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ওকে বলবে, একটা ষাঁড় ছাড়তে চাই, পারমিশন দাও! ব্যস!

পাতাললোকে ধর্মের ষাঁড়ের দুরবস্থা

অগত্যা মকবুল গেল রমেশ মাইতির কাছে। রমেশ বিরক্ত হয়ে বলল — ইসব বাজে ঝঞ্ঝট কিনতে যাওয়া কেন? এমনিতেই দম ফেলার ফুরসৎ নেই, দুনিয়ার ইস্যু, কারটা সলভ্ করি আর কোনটা রাখি! তুমি আবার আরেকটা নতুন ইস্যু তৈরি করার কল করছ? টাকা বেশি থাকলে দান করে দাও। ষাঁড় ছেড়ে এলাকার মানুষকে বিরক্ত করার কী মানে? যত্তো সব!

পাশেই বসেছিলেন সন্তোষ ভটচায। শিক্ষিত মানুষ। এম এল এ। শুনে বললেন — কথাটা একেবারে ফেলে দিয়ো না রমেশ। এ হল বৃষোৎসর্গ! হিন্দুদের ধর্মীয় কর্তব্যের নামে পশুপালন

করবার বৈজ্ঞানিক ভাবনাকে সামাজিক ভাবে সচল রাখার উপায়। ভেবে দেখো। ও মুসলমান হয়েও গোজাতির প্রতি একটা কর্তব্য করে পিতৃঋণ শোধ করতে চাইছে। তাছাড়া ও তো নিঃস্বার্থ ভাবেই টাকাটা খরচ করতে চায়। এদিকে আজকাল পার্টিতে পরিবেশ, বিলুপ্ত প্রজাতি — এসব নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। তুমি বরং ওকে বলো একটা দরখাস্ত করতে, যে, আমি একটা ষাঁড় ছাড়তে চাই, অনুমতি দেওয়া হোক। সেই দরখাস্তের উপর এল সি-র একটা প্রস্তাব করে সেটা জেলা কমিটির অনুমোদনের জন্য পাঠিয়ে দাও। আমিও সই করে দেবো।

সেই ভালো। মকবুল শওকত হোসেনের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা দরখাস্ত লিখে জমা দিল। ক'দিন পরে রমেশ মাইতি বলল, উপরে পাঠিয়েছি। উত্তর এলেই তোমাকে জানাব।

জেলা কমিটির মিটিংয়ে বসে বিমল সাহার চোখ দুটো চকচক করে উঠল। টেবিলে, সম্পাদকের সামনে, সন্তোষ ভটচাযের সুপারিশ করা এলসি-র প্রস্তাবসহ 'ষাঁড় ছাড়ার আবেদনপত্র'। সন্তোষ ভটচায, যাকে সে দু-চক্ষে দেখতে পারে না, যার কারণে সে কখনো এমএলএ হতেই পারল না, সেই বামুন-কমরেড সন্তোষ ভটচায! বিমল সাহা চিবিয়ে চিবিয়ে বলল — কমিনিস্ট পার্টিও করব আবার ধর্মের ষাঁড় ছাড়ার সুপারিশও করব, এ-দুটো একসঙ্গে চলতে পারে না। এ একটা ঘোরতর পার্টি-বিরোধী কাজ! কংগ্রেস, তৃণমূল কিংবা বিজেপির এমএলএ এমন সুপারিশ করলেও বুঝতাম! শেষে কিনা কমিনিস্ট পার্টির এমএলএ হয়ে এমন কাজ! পার্টির উচিত, বিষয়টি গভীর ভাবে পর্যালোচনা করা। পার্টির একজন এমএলএ এরকম কাজ করতে পারেন কি না, সেটা ভেবে দেখা দরকার।

সম্পাদক বললেন — আবেদনপত্রে কিন্তু ন্যাচারাল গরুর কথা বলা হয়েছে। আমাদের দেশের লাইভস্টক ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে 'ন্যাচারাল গরু' কথাটা গুরুত্বপূর্ণ। হতে পারে অমন গরুকে আমাদের সাধারণ মানুষের ভাষায় ধর্মের ষাঁড় কিংবা শিবের যাঁড় বলে। তা বলুক। কিন্তু এতে ধর্ম কোথায়? বিজেপি কোথায়? আবেদন করেছে একজন মুসলমান। দেশে ওরকম ষাঁড় নেই বলেই সে ষাঁড় ছাড়বার অনুমতি চেয়েছে।

তরুণ কমরেড অশোক মহান্তি, মেদিনীপুর শহরে পাঁচপুরুষের বাস, পেশায় উকিল, বললেন — এক্ষেত্রে আমাদের দুটো জিনিস জানা দরকার। এক নম্বর, দেশে অমন ন্যাচারাল গরুর সংখ্যা সত্যিই কমে গেছে কিনা; দু নম্বর, দেশের আইনে এরকম সোস্যাল অ্যাকটিভিটি নিয়ে কী বিধান রয়েছে।

কোঅর্ডিনেশনের দায়িত্বে থাকা কাজল ঘোষ, বালিচকের সন অব দ্য সয়েল, জেলা সেনসাস অফিসের বড়বাবু, নড়েচড়ে বসলেন। তারপর জেলা-সম্পাদকের উদ্দেশে বলতে লাগলেন — কমরেড, একটা বিষয় কিন্তু এ ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের মেদিনীপুর জেলায় বলদের সংখ্যা হঠাৎই প্রায় ৯০ শতাংশ কমে গেছে। ১৯৭২, ৭৭, ৮২, ৮৯-এর গো-গণনাতেও সংখ্যাটা ছিল ১০ লাখের ওপরে, কিন্তু ১৯৯৪ সালের গো-গণনায় দেখা গেছে সংখ্যাটা হঠাৎই অস্বাভাবিক ভাবে কমে গিয়ে, হয়ে গেছে ১ লাখেরও কম।[১] গো-প্রজাতিতে বলদের সংখ্যা এমন ভয়ানক ভাবে কমে যাওয়ায়, তা নিয়ে দপ্তরে অনেক কথাও হচ্ছে।

অশোক মহান্তি জানতে চাইলেন — কিন্তু ধর্মের ষাঁড়ের সংখ্যা বেড়েছে না কমেছে, তার পরিসংখ্যান জানেন কি?

— না। আজ পর্যন্ত কোনো গো-গণনাতেই মালিকহীন গরুর, মানে ধর্মের ষাঁড়ের কোনো হিসেব করা হয়নি। যে-গরুর মালিক আছে কেবল তাদেরই গণনা করা হয়েছে, আর গণনা করা হয়েছে তিন ভাগে : গাইগরুর সংখ্যা কত, এঁড়ে-বলদের সংখ্যা কত আর বাছুরের সংখ্যা কত? অবশ্য হাল-টানা

এঁড়ের সংখ্যা এখন খুবই কম। আমাদের মেদনিপুর জেলায় এখন পঞ্চাশটা গ্রাম খুঁজলে পর একটা এঁড়ে পাওয়া যায়। তবে হ্যাঁ, আণ্ড্রাকাটাগুলোকেও ওই এঁড়ে-বলদদের গুনতির সঙ্গে একই সাথে গণনা করা হয়েছে, আলাদাভাবে গণনা করা হয়নি।

— আণ্ড্রাকাটা কী জিনিস? অশোক মহান্তি ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করলেন।

এর উত্তর দিলেন অশোক মহান্তির পার্টি-গুরু, জেলার সহসম্পাদক, প্রবীণ কমরেড পরমেশ্বর সেন — তাও জানো না। আরও একটু গ্রামের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করো, অশোক। তোমরা পার্টির ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। কেবল মেদনিপুর-কলকাতা, সাহাভড়ংবাজার আর ভজকোট করলেই হবে? শোনো — ফিমেল গরুকে যে গাইগরু বলে, সেটা তো জানো। কিন্তু মেল-গরুর যে চারটে ভাগ আছে, মনে হচ্ছে, সেটা জানো না। মালিকহীন ধর্মের ষাঁড়ের কথা তো শুনলে। বাকি যে তিনরকম পুরুষ গরু হয়, যেগুলো চাষিদের গোয়ালে থাকে, সেগুলো হল -- বলদ, এঁড়ে আর আণ্ড্রাকাটা। যে দামড়া বাছুরের অণ্ডকোষ ছাঁটা হয় না, সেগুলো এঁড়ে হয়, তাদের প্রজনন ক্ষমতা থাকে। আর, যে দামড়াগুলোর নাবালক অবস্থায় অণ্ডকোষ ছেঁটে দেওয়া হয়, সেগুলোই বলদে পরিণত হয়; এদের প্রজনন ক্ষমতা থাকে না। তবে এঁড়েগুলো তেমন কাজের হয় না, বলদগুলো সহজেই কর্মদক্ষ হয়; এরাই চাষির কাজের গরু। আর, যে দামড়াগুলোর ছাঁট করা হয় সাবালক হয়ে যাবার কিছুদিন পর, মানে সদ্য এঁড়েতে পরিণত হওয়ার পর, কাজটা রিস্কি, সেগুলো আর পূর্ণ-এঁড়েতে পরিণত হতে পারে না, এঁড়ে হতে হতে ক্রমশ বলদে পরিণত হয়ে যায়। সেগুলোকেই আণ্ড্রাকাটা বলে। এরা প্রথম যৌবনে প্রজনন করতে পারলেও, পরে আর প্রজনন করতে পারে না, কিন্তু দেখতে অনেকটা ধর্মের ষাঁড়ের মতোই হয় যদিও আসলে বলদ। অবশ্য, বলদদের মতো এদের হালটানা-গাড়িটানার কাজে ট্রেন-আপ করা সহজ নয়, তবে করতে পারলে এরা বলদদের তুলনায় অনেক বেশি কাজের হয়। জোড়া বলদে বড়জোর আট-দশ কুইন্টালের গাড়ি টানতে পারে, ট্রেন্ড আণ্ড্রাকাটার কাছে পনেরো কুইন্টালও অনায়াস। সেই জন্য গাড়োয়ানরা আণ্ড্রাকাটাদের খুবই পছন্দ করে।

অশোক মহান্তি হাসতে হাসতে ফুট কাটলেন — অ, বুঝেছি! আমাদের নতুন এডিএম নিমাই সোমের মতো! প্রথম যৌবনে প্রতিষ্ঠানবিরোধী-বিপ্লবী, এখন ডব্লুবিসিএস। এখনও বিপ্লবী বিপ্লবী ভাব, কিন্তু আসলে হুকুমের চাকর। যে-কাজ সাধারণ সিভিল সার্ভিসের ক্যাডার করতে ভয় পায়, এরা তা অনায়াসে করে দেয়। পারফেক্ট আণ্ড্রাকাটা!

সম্পাদক হেসে ফেললেন। তারপর আগের মতো গম্ভীর ভাবে বলতে লাগলেন -- যাকগে, ওসব ছাড়ো! তাহলে বোঝা যাচ্ছে, দেশে হালটানা গরুর সংখ্যা অস্বাভাবিক রকম কমে গেছে, আর ন্যাচারাল গরু বা ধর্মের ষাঁড় বেড়েছে না কমেছে তার হিসেবটাই আমাদের সেনসাসের বাবুরা করেনি। তবে এটুকু আমিও বলতে পারি, দেশে ন্যাচারাল গরুর বা ধর্মের ষাঁড়ের সংখ্যা খুবই কমে গেছে। ছেলেবেলায় রাস্তাঘাটে যে পরিমাণ ধর্মের ষাঁড় দেখতে পেতাম, আজকাল তেমন আর দেখতে পাই না। কদাচিৎ দু-একটা চোখে পড়ে। তাই আবেদনকারীর আবেদন যে মিথ্যার উপর দাঁড়িয়ে আছে এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু প্রশ্ন হল, এ ব্যাপারে আমাদের পার্টি কী করতে পারে? দেশে ষাঁড় ছাড়ার আইন থাকলে লোকে ষাঁড় ছাড়বে, তাতে যদি লাইভস্টক, পশুপালন এসবের বিকাশ হয়, সে তো ভালোই।

জেলা সম্পাদক এবার প্রবীণ পার্টি সদস্য আবদুল গণির দিকে তাকান। আইন গুলে খাওয়া মানুষ। কমরেড গণি ধীরে ধীরে বলেন — না, আইনের কোনো বাধা নেই। ষাঁড় ছাড়া এদেশের বহু প্রাচীন প্রথা। পাঠান মোগল আমলেও সরকার ষাঁড় ছাড়ার অধিকার ও সে ষাঁড়ের ক্ষতি কেউ যাতে

না করে তা দেখার দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। ব্রিটিশও সে অধিকার এবং কর্তব্য মেনে নেয়। সেই আইনই এখনও বলবৎ রয়েছে। তোমার ধান খেলে, তোমার ইচ্ছে হলে খেতে দাও, নইলে তাড়িয়ে দাও, কিন্তু ষাঁড়ের কোনো ক্ষতি করা চলবে না। এটাই প্রচলিত ন্যায়বিধি। ধর্মের ষাঁড়ের বিষয়ে আমাদের যা-কিছু পুরোনো রেকর্ড, আইন রয়েছে, তাতে এই কথাই বলে।

বিমল সাহা আর ধৈর্য ধরতে পারে না। বলে ওঠে — তাহলে কি এখন থেকে কমিউনিস্টরাও ষাঁড় ছাড়তে লেগে যাবে? গ্রামে গ্রামে লাল পতাকা টাঙিয়ে পার্টির ব্যানার লাগিয়ে পুরোহিত ডেকে বৃষোৎসর্গের অনুষ্ঠান করবে? আর সেই অনুষ্ঠানে আমাদের পার্টির এমএলএ মন্ত্রীরা বক্তৃতা করবেন? এসব করলে, বিজেপির সঙ্গে আমাদের পার্টির আর কী পার্থক্য থাকল?

সবাই চুপ করে গেল। সম্পাদক বিরক্ত হলেন। তাঁর মুখ কালো হয়ে গেল। বুঝালেন, বিমল এই সামান্য দরখাস্তের ব্যাপারটাই শেষ পর্যন্ত রাজ্য কমিটির কানে তুলবে। তখন হয়তো, ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে যাওয়ার আগে কেন রাজ্য সম্পাদককে জানানো হয়নি, সেকথাও উঠতে পারে। এর মধ্যে এইসব বৃষোৎসর্গ-ফর্গ নিয়ে কোনো একটা ঝামেলা হয়ে গেলে তো আর কথাই নেই, সব দায় এসে পড়বে তাঁরই মাথায়। তার চেয়ে বরং বলটা বিমলের কোর্টে পাঠিয়ে দেওয়াই ভালো। এইসব বিবেচনা করে তিনি বললেন — যদিও বিষয়টি পশুপালনের বিকাশের পক্ষে, এবং আমি দেখছি জেলাকমিটির অধিকাংশ সদস্যই এই আবেদন মঞ্জুর করা উচিত বলে মনে করেন, তথাপি এর সঙ্গে ধর্মের সামান্য হলেও সম্পর্ক আছে। তাই এই দরখাস্তে আমি কোনো মতামত না দিয়ে রাজ্য সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করছি। আপনারা কী বলেন?

কমরেডরা এর তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। দু একটা হুঁ, হাঁ, ঠিকাছে শোনা গেল।

অতএব মকবুলের 'ষাঁড় ছাড়ার আবেদনপত্র' চলে গেল কলকাতা!

না। উপর থেকে কোনো উত্তর এখনও আসেনি। দু-এক সপ্তাহ ছেড়ে ছেড়ে মকবুল এলসিএস রমেশের বাড়ি যায় আর শুকনো মুখে ফিরে আসে। উত্তর আসেনি। কিন্তু আসবে। রমেশ বলেছে — এম এল এ সন্তোষ ভটচায বৃষোৎসর্গের পক্ষে জোরালো রেকমেন্ড করেছেন। নিশ্চয় তার একটা ভালো রেজাল্ট হবে। মকবুলের হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নাই। অদূর ভবিষ্যতে সে বাপকে দেওয়া কথা রাখতে পারবে, ষাঁড় ছাড়তে পারবে, দেশের গোজাতি বাঁচবে। কিন্তু ততদিন তার মা আঙ্গুরাবানু বেঁচে থাকবে কি? সে কি দেখে যেতে পারবে, ছেলেটা তার বাপকে দেওয়া কথা রাখতে পেরেছে? পিতৃসত্য পালন করতে পেরেছে?

---

১. District Statistical Handbook 2002, Paschim Medinipur Published by Bureau of AE&S, Govt. of West Bengal.

(গল্পটি 'কৌরব' পত্রিকার ১০১ সংখ্যায় এবং তাঁদের ইন্টারনেট পত্রিকার ১৬ নম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল ২০০৬ সালে)